শ্রেষ্ঠ গল্প

বুদ্ধদেব গুহ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা— ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ :
শ্রীসুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ISBN - 81 7079-047 6

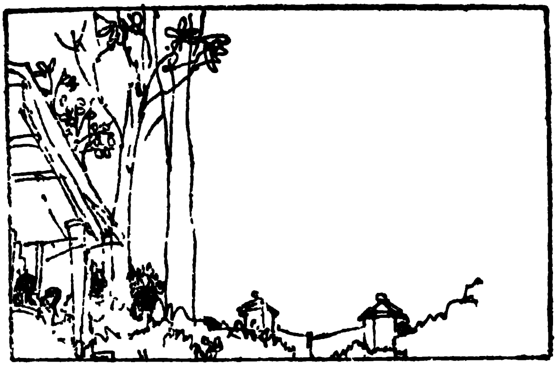
লেজার টাইপ সেটিং
পেজ মেকার্স
২৪বি, লেক রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৯

কৈশোরের লেখালেখির,
ছবি আঁকার প্রেরণা,
আমার প্রিয়,
প্রয়াত বড়মামা
সুকবি, সুগায়ক, সুশিল্পী
সুনির্মল বসুর উদ্দেশে।

লেখকের অন্যান্য বই :

অভিলাষ
ঋভু
সাজঘরে, একা
সবিনয় নিবেদন
কোজাগর
বাজা তোরা, রাজা যায়
ধুলোবালি
মহড়া
পারধী
সোপর্দ
চবুতরা
স্বগতোক্তি
প্রথম প্রবাস
প্রথমাদের জন্যে
লবঙ্গীর জঙ্গলে
জলছবি, অনুমতির জন্যে
আয়নার সামনে
দূরের দুপুর
দূরের ভোর
জঙ্গল মহল
সুখের কাছে
জঙ্গলের জার্নাল
যাওয়া-আসা
ঝাঁকি-দর্শন
রিয়া
কোয়েলের কাছে
একটু উষ্ণতার জন্যে
বিন্যাস
দু নম্বর
অ্যালবিনো
নগ্ন নির্জন / বাতিঘর
মহুলসুখার চিঠি
পারিজাত পারিং
ইলমোরাণদের দেশে
পঞ্চপ্রদীপ
খেলা যখন
ঋভুর শ্রাবণ
টাঁড়বাঘোয়া
গুগুনোগুম্বারের দেশে
মউলির রাত
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
ওয়াইকিকি
বনবিবির বনে
হলুদ বসন্ত
নাজাই
পলাশতলীর পড়শী
ভাবার সময়
ভোরের আগে
ইলিশ
আলোকঝারি
মহুয়ার চিঠি
শালডুংরি
সন্ধের পরে
সাসানডিরি
পুজোর সময়ে
জেঠুমণি এণ্ড কোং
ল্যাংড়া পাহান
রূআহা
বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
বাংরিপোসির দু'রাত্তির
বাবলি
পহেলি পেয়ার
মাধুকরী
অন্বেষ
হাজারদুয়ারী
নিনি কুমারীর বাঘ
বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে
অববাহিকা

সূচীপত্র



টাটা

এখন সকাল সাড়ে আটটা।

হরেনবাবু রোজকার মত বাইরের ঘরের হাল ফ্যাশানের আসবাবের মধ্যে একমাত্র বেমানান আসবাবের মত বসে বসে দৈনিক কাগজের বড় হরফে ছাপা প্রথম পাতার নাম থেকে শুরু করে শেষপাতার "প্রিন্টেড অ্যান্ড পাবলিশড বাই" পর্যন্ত পড়ছেন।

সময় এখন পাথরের মত ভারী। নড়তে চায় না। চোখও আর দেখতে চায় না। অনেকই তো দেখল।

বুবু, হরেনবাবুর নাতি। সাদা শর্টস সাদা শার্ট আর টাই পরে ইংরিজি মিডিয়াম স্কুলে যাচ্ছে। হরেনবাবু যখন অফিস যেতেন, তখনও তাঁর অত তাড়া ও টেন্‌সান্ ছিলো না। আট বছরের বুবুর জীবনে একটুও অবকাশ নেই। ওঁদের আট বছর বয়সে ওঁরা শিশুই ছিলেন। খেলতেন, দুষ্টুমি করতেন, হুটোপাটি করতেন, গ্রামের মাঠে দৌড়োদৌড়ি করে বাতাবী লেবু দিয়ে ফুটবল খেলে ঘর্মাক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে শাঁখ-বাজানো সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসতেন, সামনে লণ্ঠন নিয়ে। তাঁরা পিঠোপিঠি এত ভাইবোন ছিলেন যে, বাড়িটি ছিল একটি অশান্তি নিকেতন। অথচ সেই আপাত-অশান্তির মধ্যেই এক আশ্চর্য শান্তি নিহিত ছিল, অনিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এক অলিখিত নিয়মানুবর্তিতা। ঠাকুমা দিদিমার মুখে মুখে রামায়ণ, মহাভারত, জাতক, ইত্যাদির গল্প শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছিল। তাঁদের সময় গুড ম্যানার্স্ আর ব্যাড ম্যানার্সের সীমারেখার দেওয়াল তুলে, কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়ে, শিশুর স্বাভাবিকতাকে আজকের মত খণ্ডিত দ্বিধাগ্রস্ত, ওয়াটার-টাইট করা ছিলো না। তাঁদের জীবনে প্রাচুর্য ছিলো না, কিন্তু সুখ ছিলো ; এত আরাম ছিলো না ; কিন্তু আনন্দ ছিলো অসীম।

বুবু বলল "টা-টা" দাদু। বলেই বলল, দাদু তোমার লুঙিটা, পায়ের কাছে ছিঁড়ে গেছে।

বুবুর মা দময়ন্তী তাড়া দিয়ে বলল, কথা পরে হবে, বাবা নেমে গেছেন। ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। যত কথা, ঠিক তোমার স্কুলে যাওয়ার সময়।

হরেনবাবু নাতির প্রশ্নর উত্তর দিয়ে তার অমূল্য সময়ের অপব্যবহার না করা সত্ত্বেও, লজ্জিত হলেন। বোকা-বোকা মুখে নাতির দিকে তাকিয়েই টেপড্ মেসেজের মত বললেন, 'টা-টা দাদু।"

দময়ন্তীও তৈরী হয়েই বেরিয়েছে। মার্কেটে কাজ আছে। জয়ন্ত ছেলেকে নামিয়ে, স্ত্রীকে নামিয়ে, তারপর অফিস যাবে। মার্কেটে কাজ সেরে ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে, খাওয়ার

সময় ফিরে আসবে দময়ন্তী একেবারে।

ওরা চলে যেতেই হরেনবাবুর মনে এল কথাটা। এই "টা-টা" কথাটা।

কথাটার মানে কি ?

ওরা যখন ছোট ছিলেন তখন মা কি বাবাকে প্রণাম করে অথবা কুলুঙ্গীর দেবতাকে প্রণাম করেই বাড়ির বাইরে বেরোতেন। মা যদি কাজে ব্যস্ত থাকতেন তাহলে নিদেনপক্ষে দূর থেকেই হাঁক ছাড়তেন "মা যাচ্ছি"। মাও দূর থেকেই জবাব দিতেন, "যাওয়া নেই বাবা, এসো।" কোনোদিন সময় থাকলে কাছে এসে হয়ত আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছিয়ে দিতেন। চিবুকে হাত ছোঁওয়াতেন। বঙ্গভূমির তখন আঁচল দিয়ে সন্তানের মুখ মুছোনোটা অসভ্যতা বলে গণ্য হতো না।

যাইই হোক, "টা-টা" কথাটার মানেটা যে কি, তা তাঁকে জানতেই হবে।

পরশু হিতেন ফোন করেছিল। বাতের ব্যথাটা নাকি খুবই বেড়েছে। অ্যাকুপাংচার করবে। রাজগীরেও গেছিল গত পুজোর সময়। হিতেনের লাইব্রেরীতে অনেক বই পত্র আছে। একদিন হিতেনের বাড়ি গিয়ে ডিক্সনারীগুলো ভাল করে খুঁটিয়ে দেখবে, "টা-টা" কথাটার মানে খুঁজে পাওয়া যায় কী না!

বেশ আছে হিতেন। রমা গত হয়েছে পাঁচ বছর হল। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে দিল্লীর এক প্রবাসী পরিবারে। জামাই আই-এ-এস্। পাঞ্জাব ক্যাডারের। মেয়ে জামাই ওদের দেখাশুনা করে খুবই। প্রতি পুজোয় ওদের কাছে গিয়েই কাটিয়ে আসেন হিতেন। তবে জামাই এবং নাতি-নাতনীরা কেউই বাংলা পড়তে বা লিখতে পারে না। ওরা সকলেই ইংরিজিতেই চিঠি লেখে হিতেনকে। "মাই ডিয়ার ড্যাডুভাই" বলে। ওদের দোষ নেই। ওরা তো প্রবাসী। তাঁর কোলকাতাবাসী নাতি বুবুও তাইই লেখে। হরেনবাবু আজকাল লক্ষ্য করেন যে, শিক্ষিত সচ্ছল বাঙালী পরিবারের মাতৃভাষা ইংরিজিই। ছেলে জয়ন্ত এবং বৌমা দময়ন্তী প্রতি চারটি কথাতে একটি করে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে। বোরড্, হেল্, কনফিউজ্ড, ফ্রাস্ট্রেটিং, ইলেটেড, রিলিজিয়াস্লী, ওয়েল-অফফ্, কুডনট্ কেয়ারলেস্, এবং আরো হাজার কথা এখন বাংলা হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে এখন কোনো কিছুই লেখা হচ্ছে না বলে, ওরা ইংরিজি পেপারব্যাক ছাড়া কিছুই পড়ে না। হরেনবাবুরা পড়েছিলেন ছাত্রাবস্থায় যে, যে-কোনো ভাষাই সমৃদ্ধ হয় বিদেশী শব্দ চয়ন করে। আনন্দেরই কথা। বাংলা ভাষা, বাঙালী জাতি ; এত সমৃদ্ধ হয়েছে। এবং হচ্ছে।

নীহারবালা এলেন। বাড়িতে বৌ ছেলে না থাকলেই নিজেরা একটু খোলামেলা বোধ করেন। ছেলের নির্দেশে বিয়ের পরদিন থেকেই দময়ন্তীকে নীহার "তুই" বলে ডাকেন। বৌমা আর মেয়েতে তফাৎ না-রাখার কারণে। দময়ন্তীও নীহারকে এবং হরেনবাবুকে বাবা মা এবং "তুমি" বলেই ডাকে। হরেনবাবু তুই-তোকারী না করতে পেরে "তুমি" তে এসেই রফা করেছেন।

নীহার এসে এক কাপ চা নিয়ে সোফায় বসলেন। বসতে যেতেই, একটু চা চল্কে পড়ল সোফার উপর।

এই রে! ভয়ার্ত কণ্ঠে নীহার বললেন।

কি হল ? বলে মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে হরেনবাবু তাকালেন।

সর্বনাশ হয়েছে। দমু পনেরো দিন হল নতুন কভার বানিয়েছে সোফার। পালিশ করিয়েছে ফার্ণিচার। এর চেয়ে বড় সর্বনাশের কথা ভাবাই যায় না। সামনের শনিবার রাতে পার্টি আছে। এ-বাড়িতে প্রথম পার্টি। জয়ন্তর অফিসের বস্ এবং কয়েকজন ডিস্টিংগুইশড কাপলসকে বলবে ঠিক করেছে দমুরা। ঠিক এই সময়েই এমন দুর্ঘটনা।

নীহার আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি দাগটা মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন। তাতে দাগটা আরও স্পষ্ট হল। নীহারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

হরেনবাবু দাঁত চিবিয়ে বললেন, যেমন স্বভাব। কেষ্টর সঙ্গে রান্নাঘরে পা ছড়িয়ে বসে কলাই-করা গ্লাসে চা খেলেই তো পারো। দরকার কি মেমসাহেব হওয়ার ? ছেলে বউ সাহেব মেমসাহেব বলে ; কি তুমিও মেমসাহেব হলে ?

মেমসাহেব।

কথাটা পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নীহারের বুক ঠেলে কান্না এল। চায়ের কাপ সেন্টার টেবলের কাঁচের উপর সাবধানে নামিয়ে রেখে আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছলেন। মুখে কোনো কথা বললেন না।

হরেনবাবুর কাগজ পড়া শেষ হলে, নীহার বললেন, কী বলব ?

কাকে ?

অন্য... গলায় হরেনবাবু বললেন।

দমুকে। দাগটাতো উঠবে না।

হরেনবাবু এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে ধারে-কাছে কেষ্ট আছে কি নেই তা দেখে নিয়ে বললেন, বিড়ালটা আছে, না চলে গেছে ?

বিড়াল ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। বিড়াল।

ও। আছে। আছে। রোজই তো গ্রিলের ফাঁক দিয়ে আসে। কালকে দুপুরবেলায় রান্নাঘরে জিইয়ে-রাখা মাগুর মাছ নিয়ে গেছে দুটো।

বাঁচা গেছে। দমুকে বোলো যে, সোফায় বিড়ালেই ইয়ে করেছে।

মিথ্যা কথা বলব ? নীহার অসহায়ের মতো বললেন।

হ্যাঁ। তাই-ই বলবে। তেমন প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলে না কে ?

নীহার বললেন, ছিঃ।

হরেনবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। চুলের সামনের দিকে পাক ধরেছে। তারই মধ্যে এক চিলতে রক্ত-নদীর মত সিঁদুরে সিঁথি জ্বলজ্বল করছে। উঠেও গেছে চুল। কপালে বলিরেখা। চশমার কাঁচের আড়ালে দুটি বড় ক্লান্ত চোখ। সবে রান্নাঘর থেকে এলেন। শাড়িতে হলুদের ছোপ।

হরেনবাবু কিছু বলতে গেলেন নীহারকে।

কিন্তু কিছু বলার আগেই নীহার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

হরেনবাবু খবরের কাগজটা ফেলে দিলেন। ভাবলেন, নীহারের পাশে গিয়ে বসেন একবার। জড়িয়ে ধরে, আদর করে, কান্না থামান অনেক অনেক আগেকার দিনের মত। কিন্তু উঠতে পারলেন না। স্থির হয়ে বসে রইলেন। দোষ তো তাঁরই। সারা জীবন ধরে

ছেলে-মেয়ে মানুষ করে সর্বস্বান্ত হয়ে, শেষ বয়সে সাতশ টাকা পেনসান সম্বল করে বাঁচবেন কি করে ? যতদিন কোয়ার্টারে ছিলেন, তো ছিলেনই। কিন্তু ঐ টাকায় কোলকাতা শহরে দুজন মধ্যবিত্ত মানুষের থাকা-খাওয়া অসম্ভব। দমু অনেকবারই বলেছে যে, শান্তিনিকেতন ওর বাপের বাড়িতে গিয়ে, ওর মা-বাবার সঙ্গে নিরিবিলিতে থাকতে। কিন্তু যেতে পারেননি। জীবনে নিজেও কম রোজগার করেননি, কম খরচও করেননি। টাকার দাম ছিল তখন। তবে শেষ জীবনে ছেলে-বৌ-এর সংসারে এমন কুকুর-বিড়ালের মত বাঁচা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে বাঁচার উপায়ই তাঁদের নেই। শরীরেও আর জোর নেই যে, নতুন কিছু করেন।

নীহার চোখ মুছে বললেন, "নবনীড়ে" গিয়ে থাকব ভেবেছিলাম ; বেশ করেছেন ওঁরা, জানো। শচীন চৌধুরীর স্ত্রী সীতা চৌধুরী, এবং আরও অনেকে মিলে। ওখানে থাকার কথাটা দমুকে বলেও ছিলাম একদিন। দমু বলল, দাঁড়াও, তোমার ছেলেকে এক্ষুনি বলছি। ছিঃ ছিঃ। এ কি কথা মা। এমনি করেই কি এমন আইডিয়াল ছেলে-বৌকে সম্মান দিতে হয় ? "নবনীড়ের" কমিটিতে আমার জানাও আছেন কেউ কেউ। তাঁরা কী ভাববেন ? জয়ন্ত আর দময়ন্তী নিজেদের মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ীকে একেবারেই ফেলে দিল ? তোমরা কি ডেস্টিচুচ্যাট্স্ ? কোন অন্যায় বা খারাপ ব্যবহার করেছি আমরা তোমাদের সঙ্গে ? জয়ন্তকে বললে ও কিন্তু রাগে একেবারে "হিস্টিরিক্" হয়ে যাবে। তাই, বলছি না এখন। ছিঃ ছিঃ। এমন করেই কি ছেলের ভাল ব্যবহারের প্রতিদান দিতে হয় মা ?

হরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

তারপর বললেন, তাই বলল ? দমু ? তোমাকে ?

হুঁ।

নিরুপায় হরেনবাবু নীহারকে ক্ষণিকের জন্যে খুশী করার জন্যে বললেন, শাড়িটা ছেড়ে নাও। চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।

কোথায় ? তাছাড়া আমার কত কাজ বাকি আছে এখনও। ছানা কাটতে হবে, কুটনো কাটা বাকি। দমু, নারকোল-কুচি-দেওয়া মুগের ডাল করতে বলে গেছে। বুবু এবং তার মা দুজনেই খুব ভালবাসে। এখন যাওয়ার উপায় নেই।

হরেনবাবু চটে উঠলেন। বললেন, কে কি ভালবাসে তা তো মুখস্থ। আমি যে কতদিন হল ভাপা-ইলিশ করতে বলছি, তার কি হল ? বর্ষা তো শেষ হয়ে এল। আমি বুঝি আর মানুষ নই ?

ভাপা-ইলিশ ? ইলিশ মাছ দমু পছন্দ করে না। বলে, তেলওয়ালা মাছ। ফ্যাট আছে। তার উপর দুর্গন্ধ। আগে আগে কখনও ইলিশ রাঁধলে খেয়ে উঠে, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে হাতে ওডিকোলোন মাখত দমু।

ওডিকোলোন। সে তো জ্বর হলে, জলে-গুলিয়ে মাথায় পট্টি দেবার জন্যে।

হরেনবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন।

তুমি কোন যুগে বাস করো ? চান করে উঠে শরীরের নানা জায়গায় ওডিকোলোন মাখে দমু। জন্তুও মাখে। তবে পেছনে।

পেছনে ? মানে ? হরেনবাবু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

পেছনে মানে, ছাপুতে।

ছাপুতে ? আমার ছেলে ? কিন্তু ছাপুতে কেন ?

অফিসে অনেকক্ষণ চেয়ারে বসে থাকে বলে পেছনে দাগ হয়ে যায়, দড়কচ্চা মেরে যায়। দ্যাখোনি হাসপাতালের রোগীদের ওডিকোলোন মাখায়, যাতে বেডসোর না হয় সে জন্যে !

হুঁ। হরেনবাবু বললেন, তা দেখেছি। কিন্তু সারাজীবন ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসের তক্তাতে আর অফিসের কাঠের চেয়ারে বসে বসে জয়ন্তবাবুর বাবা কেরানী হরেনবাবুর ছাপু যে বেবুনের ছাপুই হয়ে গেল তা বুঝি.......আর......

বেবুনের ছাপু ? বেবুন কি ? নীহার অবাক গলায় শুধোলেন।

আঃ। তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। এমন অশিক্ষিত। তোমাদের পুরো পরিবারটাই অশিক্ষিত। কিছুই বলার নেই।

এই কথাটি বিয়ের পরে কমপক্ষে পনেরো লক্ষ বার শুনেছেন নীহার। তাই রাগ করলেন না। অনেক বছর হলোই করেন না।

আবারও বললেন, বেবুন কি ?

চিড়িয়াখানাতে দেখোনি ? আফ্রিকান বেবুন। মাকাল ফলের মত লাল টুকটুকে ছাপু।

নীহার ঐ অবস্থাতেও হেসে উঠলেন ফিক্ করে।

বললেন, এমন অসভ্য না। চিরকালের অসভ্য। কালো মোষের মত চেহারা, তার আবার...

এমন সময় কলিং বেল বাজল। নীহার তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন। হরেনবাবুও। জতু-দমুর স্ট্রিক্ট ইনস্ট্রাকশান আছে যে, দরজা খুলবে শুধুই কেষ্ট। কেষ্টর জন্য চাঁদনী থেকে বেয়ারার উনিফর্ম আনিয়ে রেখেছে ওরা। বেল বাজলেই, তার ছেঁড়া হাফ প্যান্ট ও ঘেমো গেঞ্জির উপরেই সাদা ধবধবে পোশাক পরে গিয়ে ও দরজা খোলে। স্লিপ এগিয়ে দেয়। বলে, সাহেব মেমসাহেব বাড়ি নেই।

উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট বড় কেউ একটা আসেও না। ভ্যাগাবন্ডরা ছাড়া না-বলে কয়ে কেউ কারো বাড়ি এমনিতেই আসে না।

বাইরে কে এল না এল তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। কারণ তাঁদের নিজেদের কাছে এখন আর কেউই আসে না। বন্ধুরা হয় কোলকাতা, নয় পৃথিবী ছেড়েই চলে গেছে। যারা আছে, তারা প্রায় সকলেই চলচ্ছক্তিহীন। একমাত্র হিতেনেরই গাড়ি আছে, তারই কিঞ্চিৎ মবিলিটি আছে।

কিন্তু সে কখনও আসে না। তাঁরাই যান।

নীহার এবং হরেনবাবু ভিতরে চলে গেলেন। কেষ্ট দরজা খুলতে গেল। এই পোশাকে আসল কেষ্টকে চেনাই যায় না।

২

সেই শনিবার সকাল থেকেই তুমুল বৃষ্টি। পথে-ঘাটে জল থৈ-থৈ। জতু আজ নিজে বাজারে গেছে। রাতে অনেকেই খাবে। বুবুকে, বাজার-ফিরতি দমুর বোনের বাড়ি নামিয়ে দিয়ে আসবে। আজ বুবুর ছুটি। তাই "ডে-স্পেণ্ড' করবে সে মাসির বাড়িতে। বুবুর সামনে

মদ খাওয়া দমু পছন্দ করে না। সেটাও একটা কারণ। আজ তো বাড়িতে পার্টি!

বুবু যাওয়ার সময় কাছে এসেছিল। বলেছিল টা-টা দাদু ভাই।

—টা-টা দাদু।

দমুর সঙ্গে জতু গড়িয়াহাটের দিকে যাচ্ছিল। আজ ড্রাইভারের ছুটি। বললে, ডিউটিতে যে থাকে না তা নয়; কিন্তু ওভারটাইম দিতে হয়। নতুন এম-ডি, এক্সিকুাটিভদের এইসব ব্যাপারেও চোখ রাখেন। লোকটা মীন্। হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেস্ট। ডুবিয়ে ছেড়ে দেবে সকলকে। তাকে এবং জয়েন্ট এম-ডিকেই খেতে বলেছে জতু। সঙ্গে সাহিত্যিক সুশোভন ঘোষাল, ফিল্ম ডিরেক্টর গজেন চাকী এবং নাট্যকার অনির্বাণ চট্টখণ্ডীকে। ওর বাড়িতে যে বিখ্যাত লোকদের আনাগোনা আছে এবং ও যে কোম্পানীর কাজ ছাড়াও আরও কিছু জানে এবং ও যে ভ'রসেটাইল্ তা বুঝবেন ওঁরা। দমু ওর বান্ধবী সুরূপাকেও বলেছে। ওর স্বামী অতি সামান্য একটি চাকরি করে। এই পার্টিতে তাকে ডাকা যায় না। কিন্তু সুরূপার রূপ চোখ-ধাঁধাঁনো। যে-কোনো পুরুষই মূর্ছা যাবে। শরীরের অন্যান্য সমস্ত স্থানে যা যা থাকার তা বিশেষ পরিমাণেই থাকায় তার মস্তিষ্ক ধূসর-পদার্থ শূন্য। সে কারণেই, মেয়ে হয়েও দমু ওকে ভয় পায় না। এম-ডি'র নাকি একটু ছুক্-ছুক্ রোগ আছে। এমনিতে জয়ন্ত কিছুতেই কাবু করতে পারছে না নতুন এম-ডি কে। যদি দমু সুরূপাকে দিয়ে করতে পারে। দমু যতটুকু জানে সুরূপাকে, তাতে সুরূপা উইল নট সে "নো" টু এনী গেম্। দমু বলল, বুবুকে আগে নামিয়ে দাও শেলীর বাড়িতে।

ঠিক আছে। বলে, জতু গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

কী কী কিনতে হবে লিস্ট করেছো তো?

হ্যাঁ। হ্যাঁ সব করা আছে। এখন চল। কিনব আবার কি? ভেটকি মাছ তার তপসে মাছ। এ ছাড়া হুইস্কী, জিন। এক বোতল সিন্‌জানো নিতে হবে। মিসেস সেন খুব ভালোবাসেন। সুরূপার জন্যে রাম্ নিতে হবে।

মেয়েরা রাম্ খায় কখনও শুনিনি। জতু বলল। রাম্ তো ঘোড়াদের খাওয়ায়, রেস শুরু হবার আগে।

দমু বলল, শী ইজ আ ব্রাইডার।

আর খাবার-দাবার; কি করলে মেনু?

তুমিও যেমন! মণিদীপাকে বলে দিয়েছি ক্যালকাটা ক্লাব থেকে ও স্মোকড্ হিলশা আনিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। পয়সা আমিই দেব। বলে দিয়েছি, বিলের অ্যামাউন্টটা সেট করে রাখতে। তোমার এমবারসমেন্টের কোনো কারণ নেই।

বলেই, বলল, ও ভালো কথা, ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বারশিপের কি করলে?

জতু বিরক্তি-মাখানো গলায় বলল, থামো তো! কাঁটালতলার টেনিস ক্লাবেই এখনও হল না। অ্যাপ্লিকেশন তো করেই দিয়েছি। করলেই কি হবে না কি? কত বছর হাঁ করে থাকতে হবে এখন। তাছাড়া যদি কখনও হইও, তাহলেও কি লেজ গজাবে?

দমু রাগটা চেপে বলল, গ্রেপস্ আর সাওয়ার। তোমায় নিলে তো হবে! সেই জন্যেই তো অনির্বাণকে আজ খেতে বলে দিয়েছি। ওর সঙ্গে অনেক কমিটি মেম্বারের ওঠা-বসা আছে। শখের থিয়েটারের অনির্বাণ ওঁদের হেল্প-টেল্প করে। দেখি। তোমার তো কোনো

চেষ্টা নেই কোনো ব্যাপারেই ! তুমি গিয়ে, ওরা আসার আগে অ্যাম্বার থেকে যা যা বলে দেব, তা তা নিয়ে আসবে। বাড়িতে রাঁধবে কে। কেষ্ট ? না তোমার গেঁয়ো মা ! আমি ইকেবানায় স্পেশ্যালিস্ট ! রান্না, আমার জন্যে নয় ! সবাই সব পারে না।

জতুর বিবেকটা এখনও পুরোপুরি ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে মরা-সাপের রিফ্লেক্স্ অ্যাকশনের মত হঠাৎই চমকে চমকে ওঠে। ও বলল, হোয়াট ইজ দিস ? আমার মা-বাবার সম্বন্ধে এরকম কথা বলবে না। রোজ কার হাতের রান্না খাও ? একটা, মিনিমাম রেসপেক্ট ! ছিঃ !

আহা ! ঢং কোরোনা। বলে, ভ্রূভঙ্গি করে তাকালো দমু জতুর দিকে।

বলল, নিজেই সবসময় যা-তা বলো না ? "সাকারস্" 'ইউসলেস্ ওল্ড ফুলস" ! মরলেই বাঁচি। তাহলেই ঘাটশিলার জমিটাতে একটা ছোট্ট বাংলো বানিয়ে ফেলা যায়। বলো না ?

ঘাটশিলার জমির কথাতে জতুর সম্বিৎ ফিরল।

বলল, আর ঘাটশিলা ! সে জমি জয়তীকে উইল করে যাবে বাবা। একমাত্র মেয়ে।

তুমিও তো একমাত্রই ছেলে !

ছাড়ো। তবে, এও বলছি। তাই-ই যদি করে বাবা, এতই আনগ্রেটফুল হয় ; তবে বাবার মৃত্যুর পর মাকে পত্রপাঠ জয়তীর পাছেই পাঠিয়ে দেব। শীকানট ইট দ্যা কেক অ্যান্ড হ্যাভ ইট ট্যু।

৩

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। হরেনবাবু জানালার কাছে বসেছিলেন। নীহারকে বলেছিলেন আরও এক কাপ চা দিতে। এখনও কোনো কোনোদিন একটু বিলাসিতা করতে ইচ্ছে করে। অনেক কথা ভাবছিলেন হরেনবাবু। ছোটোবেলার কথা। চাকরিতে ঢোকার দিনের কথা। তাঁর ইংরেজ মালিকদের কথা। স্বদেশী আন্দোলন। মাদক-বর্জন। খদ্দর পরা। তাঁর কত মেধাবী বন্ধুরা জীবনে ভেসে গেছে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মত এই আন্দোলনে। কতজন প্রাণ দিয়েছে, মান দিয়েছে। মূর্খ চূড়ামণিরা সব। ভাবছিলেন, যেদিন দেশ স্বাধীন হল, উনিশশ সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্টের কথাও। কত কথা।

ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার পর আজকে পুরো দেশটাই ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কালচারকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এর চেয়ে যে খাঁটি ইংরেজ কালচারও অনেক ভালো ছিল। আর বাঙালীদের নিজেদেরও ভালো বলতে কি কিছুই ছিলো না ? সব, সমস্ত জীবনটাই নিজের চোখের সামনে কেমন লন্ড ভন্ড ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো। ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে গেলেন হরেনবাবু।

জতু পড়াশোনায় মেধাবী ছিল। ভালো রেজাল্ট করে, ভালো চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু মনুষ্যত্ব কি শুধু মেধাবী হয়েই অর্জন করা যায় ? ছিঃ ! ছিঃ ! তাঁর ছেলে ! নীহারের ছেলে ! ভাবতে পারেন না তিনি। নিরুপায়। অসহায়। তাঁর বা নীহারের কোনো পূর্বপুরুষের চরিত্র এবং স্বভাব বোধহয় এরকম ছিল। একেই বলে জিন্। জিন্-এর প্রভাব। এক জীবনের হিসেবে সব কিছু মেলে না।

তবুও উনি খুবই রীজেনেবল্। মাঝে মাঝে ভাবেন, হয়ত জতুরও একটা পয়েন্ট আছে।

হরেনবাবুর বাবা বলতেন, "ওলওয়েজ ট্রাই টু এপ্রিসিয়েট দ্যা আদার ম্যানস পয়েন্ট অফ ভিউ"।

চেষ্টা করেন। হরেনবাবু এখনও অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু......

নীহার ঘরে এলেন। শোবার ঘরে। এ ঘরে নীহার বুবুকে নিয়ে শোন রাতে। হরেনবাবু শোন বসবার ঘরের শোফাতে। আর মেঝেতে কেষ্ট। হরেনবাবুর জামা-কাপড় ইত্যাদি অবশ্য সব এই ঘরেই থাকে।

নীহারকে বললেন, কী রাঁধছ আজ ?

যা রাঁধতে বলেছে দমু।

ওবেলা ভালোমন্দ আছে। এবেলা খিচুড়ি।

আঃ ! খিচুড়ি ? দমুটার বুদ্ধি আছে। আজ তো খিচুড়িরই দিন।

কী ডালের খিচুড়ি ?

মুসুর ডালের।

দুস্‌স্‌। তার চেয়ে মুগের ডালের করো। সোনা মুগের। নারকোল কুচি দিয়ে, ভালো করে ঘি ঢেলে, আর ডালটা ছাড়বার আগে বেশ ব্রাউন করে ভেজে নেবে আমার মা যেমন করতেন।

নীহার অবাক হয়ে হরেনবাবুর দিকে চেয়ে থাকলেন। তাঁর দৃষ্টিতে একাধারে বেদনা, ক্ষোভ এবং হরেনবাবুর এই খাদ্য-রসিকতার প্রতি এক তীব্র ঘৃণা মাখামাখি হয়ে গেল।

বললেন, সারা জীবনে অনেকই তো খেলে। অনেক রকম করেই খেলে। জিভের লালসা কি এখনও গেল না ?

হরেনবাবু একটু রসিকতা করতে চাইলেন। বললেন, আর সবই তো গেছে, এটা না হয় থাকলই। আর ক'টা দিনই বা।

আবার বললেন, তাহলে মুগের ডালেই করছ। সোনা মুগের ?

নীহার উঠে দাঁড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললেন, বাড়ির কর্ত্রী যা রাঁধতে বলেছেন, তাই-ই রাঁধতে হবে। তোমার মত স্বামীর হাতে পড়েছিলাম, তাই মৃত্যুর দিন অবধিও গোলামী করতে হল। বিয়ের পর দিন থেকে তোমার মায়ের, ছেলের বিয়ের পরদিন থেকে ছেলের বৌ-এর। কত তো পরিবার দেখি। সেখানে বাবা-মা সত্যিই বাবা-মার সম্মান পায়। আর আমরা যেন চাকর-ঝি। আর ভালো লাগে না গো। চলো, আমরা একসঙ্গে যা হোক করে মরি।—

মরি ? মানে ?

মরি, মানে মরি।

ছিঃ মরবে কি ? আত্মহত্যা করে কাপুরুষেরা।

—ছিঃ মরবে.......

কী আমার বীরপুরুষ। বলেই, নীহার খালি-কাপটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

না। আত্মহত্যা করবেন কেন ? সুখের দিনে ভগবানকে তো ধন্যবাদ দেননি একদিনও। আজ দুঃখের দিনেই বা তাঁকে অভিশাপ দিতে যাবেন কেন ? সমস্ত কিছুই প্রি-কন্ডিশানড্। এই হেনস্থা তাঁর কপালে ছিল। ছিল বলেই, মাথা পেতে নেওয়া উচিত। তবে নীহার যাই-

ই বলুক, ওঁদের কোনো কোনো বন্ধু বান্ধবের অবস্থা ওঁদের থেকেও অনেক খারাপ। তা তিনি নিজে চোখে দেখেছেন। তাঁদের মাথার উপর তাও তো ছাদ আছে। খিদের সময় খেতে পান। যা সামান্য কাজ তাঁকে ও নীহারকে করতে হয়, সে তো আনন্দেরই কাজ। ছেলে-বৌ-এর জন্য, নাতির জন্য করা কী করা নাকি? মেয়েরা, ইন জেনারেল ; বড় মীন্ হয়। এই নীহারই তাঁর মনটাকে আস্তে আস্তে বিষিয়ে দিচ্ছেন ছেলে-বৌ এর বিরুদ্ধে।

হরেনবাবু ঠিক করলেন, এ সব মনখারাপের কথা ভাবার চেয়ে ভালো খাওয়ার কথা মনে করবেন এখন। মন খারাপ ভাবটাই চলে যাবে। এমন বর্ষার দিনে মুড়ি-তেলেভাজা, অথবা কালোজিরে-শুকনোলঙ্কা দিয়ে মুড়িভাজা পেলে কেমন হত এখন? সঙ্গে আদা-দারচিনি দেওয়া গোরখপুরী চা? ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক। নয় তো পুঁই-ডাঁটা আর কুমড়ো দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে চচ্চড়ি। তেল-তেল ; ঝাল-ঝাল। উঃ। কত্তদিন খাননি। এবং ইলিশ, সর্ষে-কাঁচা-লঙ্কা দিয়ে, নয় তো দই-ইলিশ। অথবা পাৎলা করে কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল। না না, এমন বর্ষার দিনে তা ভালো লাগবে না। তার চেয়ে রাতের বেলা মুগের ডালের ভুনি খিচুড়ি। কিস্‌মিস, বাদাম দিয়ে কষে খাঁটি গাওয়া-ঘি ঢেলে। সঙ্গে শুকনো লঙ্কা ভাজা, পেঁয়াজী, ডিমভাজা, কুমড়ো ভাজা, পাতলা করে কেটে ; শাপলা ভাজা, তপসে মাছ ভাজা, মৌরলা বা পুঁটি মাছ ভাজা। নয়ত ভেতরটা নরম-রাখা [illegible] পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কার পুর দেওয়া ওম্‌লেট। আর কড়কড়ে লাল করে আলুভাজা।

হঠাৎই হরেনবাবুর মনে পড়ল কথাটা। টা-টা।

টা-টা কথাটার মানে কি? মানে কি বিদায়? এ কি, কাউকে, কিছুকে ছেড়ে যাওয়ার সময়কার সম্ভাষণ? কোনো গভীর ভালো লাগাকে, কোনো বিশ্বাস, জীবনযাত্রা, মূল্যবোধকে বিদায় জানানো? বিদায় জানানো, শৈশব থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা জীবনের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশকে? রক্তপাতহীন নিঃশব্দ অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণার শব্দর নামই কি এই :

টা-টা।

নাঃ।

কথাটার মানে হরেনবাবুকে জানতেই হবে।

৪

নীহারকে শুধু রসগোল্লার পায়েসই রাঁধতে বলেছিল দমু। নীহারের এই রান্নাটির বিশেষ সুখ্যাতি করে পুত্রবধূ। দুপুরেই রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন উনি।

বিকেলে চারটে নাগাদ নীহার যখন চা করে কেষ্টকে দিয়ে জন্তু-দমুর ঘরে পাঠিয়েছেন সেই সময় দমু দরজা খুলে চায়ের কাপটা নিয়ে বাইরে এসে একেবারে নীহারের সঙ্গেই খাওয়ার টেবলে বসল। এমন সুমতি, সচরাচর হয় না দ[illegible]। সে দুপুরে না বেরোলে ; এই সময় ঘরে শুয়ে শুয়ে ইংরিজি বই পড়ে। বাংলা বই ওর দু'চক্ষের বিষ। ও বলে, বাংলাভাষায় "কিস্‌সুই" লেখা হয়নি গত তিরিশ বছরে, "হস্‌সেও না"। যত্ত সব ট্র্যাশ! বুবুকেও বাংলা বই বিশেষ পড়তে দেয় না। বাড়িতেও ওর সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলে। নীহার নেহাত

ইংরিজি বলতে পারেন না, তাই ! আজকাল পাড়ায় পাড়ায় বাংলা বইয়ের লাইব্রেরীও নেই আগেকার মত যে, কোনো বই আনিয়ে পড়বেন। তবে নাতির পাল্লায় পড়ে একটা ইংরিজি কথা মেমসাহেবদের মতই বলতে হয় তাঁকে। বুবু স্কুল থেকে এসে দরজায় বেল দিলেই নীহারই গিয়ে খোলেন। সময়টা জানা আছে তার। ঐ সময় অন্য কেউও আসে না। ওকে খেতে-টেতে দেন। দরজা খুলেই বুবু বলে, "হাই" দিদা। জবাবে, নীহারকেও "হাই" বলতে হয়। না হলে, নাতি ছাড়ে না। বলিয়েই ছাড়ে। নীহার বলেন, "হাই বুবু" ! বলেই দিদা আর নাতি দুজনেই হেসে ওঠেন একসঙ্গে। বুবুটাই একমাত্র খুশির হাওয়া এই দমবন্ধ বাড়িতে। শিশুরা ভগবানের মত। ওদের মনে কোনো কালিমা লেগে থাকে না। ওরা কাউকে আঘাত দিতে জানে না। শুধুই ভালোবাসতে জানে।

দমু বলল, চায়ে চুমুক দিতে দিতে ; দেখো, মা ! আজ তোমার রসগোল্লার পায়েসের কী সুখ্যাতি হয়। সকলে, সবচেয়ে ভাল বলবে তোমারই রান্নাকে।

নীহারের এ সব শোনা অভ্যেস নেই ! উনি বুঝলেন, এর পরই কোনো অনুরোধ বা আদেশ আসবে দমুর কাছ থেকে।

দমু বলল, ও বলছিলো যে তোমরা, মানে তুমি আর বাবা আজ ন'টার শোতে সিনেমা দেখে এসো। চার্লি চ্যাপলিনের "মডার্ণ টাইমস" হচ্ছে। ও বলেও দিয়েছে। কারখানার একজন মেকানিক টিকিট কেটে দিয়ে যাবে একটু পরই। তবে, তোমরা বিকেল পাঁচটা-টাঁচটা নাগাদই বেরিয়ে পোড়ো দুজনে ; বেড়িয়ে-টেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটে চাইনীজ খেয়ে নিয়ে চলে যেও সিনেমাতে।

নীহার অবাক হয়ে, কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ; ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। রেস্তোরাঁতে গিয়ে চাইনীজ খাননি তা নয়, কিন্তু ওঁরা দুজনে ? একা একা ? তাছাড়া, ন'টার শোতে ইংরিজি ছবি !

দমু বলল, বাবাকেও বলেই এসো মা। তোমরা তৈরিও হয়ে নাও। এরপর বাড়িতে নানারকম লোক, নানা ঝামেলা ; তোমাদের ভালো লাগবে না থাকতে। দেখো না, বুবুকেও পাঠিয়ে দিলাম।

নীহার একটু কাশলেন। বললেন, সে জন্য নয়। তোর বাবার চোখের ছানি তো প্রায় পেকে এসেছে। রাতে যে উনি কিছুই দেখেন না। তাছাড়া...

তাছাড়ার কিছুই নেই। তোমার ছেলে ট্যাক্সি-ভাড়া, টাকা সব দিয়ে দেবে। তোমাদের কোনো অসুবিধেই হবে না। গাড়ি তো আজ ছাড়তে পারবে না। গাড়ির অনেক কাজ।

নীহার কথার মধ্যে কথা বললেন। না। তাছাড়া, তোর বাবার পেটটা বেশ নরম হয়েছে। দুপুড়ে খিচুড়ি খেয়ে। স্বভাব তো জানিস। কোনো সংযমই নেই। এত বেশী খেলেন।

দমু মনে মনে বলল, বেশী খাওয়ার কথা আর বলতে হবে না। দুধটা, খইটা, গুড়টা, এটা ওটা তো আছেই, তারপর কোয়ান্‌টিটি ! বাড়ি সুদ্ধু সকলে যা না খায়, উনি একাই তা খান। সংসার যে চালায় ; সেই-ই জানে !

মুখে বলল, বাবার পেট কি খুব বেশী আপসেট্ করেছে ?

হ্যাঁ। তা, খাবার পর থেকে, বার চারেক তো গেছেনই !

দমুকে বেশ চিন্তান্বিত দেখালো।

বলল, দাঁড়াও তোমার ছেলেকে বলে আসি। প্রবলেম্ হবে। রিয়াল্ প্রবলেম্।

চায়ের কাপ হাতে নিয়েই দমু শোবার ঘরে উঠে গেল। একটু পরে গেঞ্জী-পাজামা পরে জতু বেরিয়ে এসে নীহারকে বলল, বাবার কখনও আক্কেল হবে না। একটা দিনের তো ব্যাপার। ঠিক এই দিনটিতেই যত ঝামেলা বাধাল। আমার কিছু ভাল লাগে না।

চেঁচামেচি শুনে হরেনবাবু ধুতিটা বাঁধতে বাঁধতে উঠে এলেন, বললেন, কি হল'রে জতু? কি হয়েছে?

না। তোমাদের জন্য সিনেমার টিকিট কেটে, চাইনীজ খাওয়ার বন্দোবস্ত করে, এখন শুনি; তুমি পেট—আপসেট করে বসে আছো।

হরেনবাবু কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলেন।

বললেন, আগে জানলে; আমরাও হিতেনের বাড়ি চলে যেতাম। আজ না হয় সেখানে থেকেও আসতে পারতাম। আগে তো বলিস নি। আমার শরীরটা যে সত্যিই বড় খারাপ করেছে রে।

দমু শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সব শুনল। এবং যখন বুঝল যে, হরেনবাবুর পক্ষে সত্যিই যাওয়া সম্ভব নয়, তখন আবার ঘরের ভিতরে চলে গেল। হরেনবাবুও বাথরুমে গেলেন।

হরেনবাবু যখন বেরোলেন তখন দমু একটা পাটভাঙ্গা পায়জামা নিয়ে এসে হরেনবাবুর সামনে দাঁড়াল। বলল, দেখো তো বাবা, এটা তোমার হয় নাকি? বাবা শান্তিনিকেতন থেকে গতবার এসে, ভুলে ফেলে গেছিল।

হরেনবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন দমুর দিকে।

কি হবে মা?

জতু বলল, এটা তোমার হয় কী না পরে দেখো। দশজন গণ্যমান্য লোকের সামনে তো আর লুঙি পরে ঘুরতে পারবে না।

অসহায় গলায় হরেনবাবু বললেন, আমি পারি না রে জতু। পায়জামা পরলে আমার দমবন্ধ লাগে। তোর মা কত রাগ করেছে বিয়ের পর পর, বলেছে অসভ্যর মত লাগে; কিন্তু যার যা অভ্যেস। কোনোদিনও পারিনি, পারব না। তাছাড়া বার বাথরুমে যেতে...

দমু বিরক্তির সঙ্গে বলল, ফারসটক্লাশ।

তারপর কেষ্টকে ডেকে ডিসপেনসারিতে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে বসবার ঘরে মার্কেট থেকে আনা ফুল নিয়ে বসে ফুল সাজাতে বসল বিভিন্ন ফুলদানীতে।

রাগ-চাপা গলায় কেষ্টকে বলল, তাড়াতাড়ি আসবি। অনেক কাজ আছে।

নীহার জতুকে বললেন, গণ্যমান্য লোকদের সামনে আমরা বেরোবই বা কেন রে? ঘরের মধ্যে বসে থাকলেই হবে।

ঘরে বসে কি বোবা হয়ে থাকবে? ঘরে থাকলে অতিথিরা জিগগেস করবে না, ওঁরা কারা? আর জিগগেস করলে তখন তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই হবে।

যারা আলাপ করবার যোগ্য নয়, তাদের সঙ্গে আলাপ করাবিই বা কেন? যোগ্য মা-বাবা হলেও না-হয় কথা ছিল।

নীহার মাঝ থেকে বললেন।

আঃ। জতু বলল, মা। এটা মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। বাড়িতে পার্টি হবে। যাঁরা

আসবেন তাঁরা মেয়ে পুরুষ সকলেই মদ খাবেন। উপরতলার লোকেরা তাই-ই খায়। এতো আর আমাদের ভূতি সরকার বাই লেনের বাড়ি নয়। আমিও কেরানীগিরি করি না। তোমাদের বোঝাব কি করে? এটা রেয়াজ নয়। বাড়িতে পার্টি হলে, তোমরা থাকলে তোমাদেরই অসুবিধা। নাচবে, গাইবে, হৈ হল্লা হবে। পার্টি হলে বুড়োবুড়ি আণ্ডা-বাচ্চাদের থাকতে নেই।

অসুবিধা, তা যদি সকালে বলতিস, তাহলে কত জায়গায়ই তো যেতে পারতাম। রাস্তায় জল জমেছে। তোর বাবা চোখে দেখেন না রাতে। তারপর শরীর খারাপ। ঈস্‌স্‌ তোদের কি বিপদেই ফেললাম বলত!

দমু পরিবেশটা হাল্কা করার জন্যে জতুকে বলল, অত টেন্স্‌ হচ্ছো কেন? বাবার শরীর খারাপ হবে, এ তো আর তুমি জানতে না।

জতু রেগে বলল, তুমিই তো মাকে দিয়ে রসগোল্লার পায়েস রাঁধবার জন্যে মাকে আটকে রাখলে। মা-বাবা বিন্দু পিসিমার বাড়ি সকালেই চলে যেতে পারত। ওঁদের কি দোষ?

নীহার বলল, আহা দোষ-গুণের কথা হচ্ছে না। আমরা এমন করে থাকব দেখিস যে, কেউ বুঝতেও পারবে না যে, আমরা আছি। কেউই বুঝতে পারবে না। না-থাকার মতই থাকব। মাত্র কয়েকটা তো ঘণ্টা!

দমু বলল, কারো কোনো দোষ নেই মা, সবই আমার দোষ। তোমার ছেলের অফিসের বড়সাহেবরা এসে ড্রিঙ্ক করে, খেয়ে নেচে গিয়ে তোমার ছেলের প্রোমোশনের রাস্তা পাকা করবেন এই চেষ্টা করছি, এইটেই আমার অপরাধ।

নীহার বললেন, আহা! দমু, আবার ওসব কথা কেন? থাক না। দোষ তো আমাদেরই। সত্যিই এমন বে-আক্কেলে বাবা-মা নিয়ে যে কতরকমের ফ্যাসাদেই আজকাল পড়তে হয় তোদের। বুঝি।

জতু পায়জামা গুটিয়ে গাড়ির কাঁচ-মোছা হলুদ কাপড় বের করে নানা সাইজের কাঁচের গ্লাস মুছতে লাগল। বসার ঘরের একটা কোণাতে বার সেটআপ্‌ করতে লাগল। ড্রাইভার ক্রেটে করে সোডা আর কাম্পা-কোলা, লিম্‌কা, ফাণ্টা এসব এনে নামিয়ে রেখে কেষ্টর সঙ্গে সব ফ্রিজে ঢোকাতে লাগল।

দমুর ফুল সাজানো হলে সে বলল, আমি এবার গাটা ধুয়ে নেব, না তুমি যাবে। তুমিই যাও। এয়ার-কন্ডিশানড ঘর থাকে, তাহলে চান করে এত ঘামতে হয় না। সে সব তো আর নেই! আমি পরে যাব। তুমি করে নাও।

নীহারের দিকে ফিরে বলল, জানো তো মা, তোমার ছেলের প্রোমোশন হলে বিরাট ফ্ল্যাট পাবে এবারে। তিনটে এয়ার-কন্ডিশানড্‌ বেডরুম। কুক্‌। তবে, একটা মুশকিল হবে। কোম্পানীর ফ্ল্যাটে মা-বাবাকে থাকতে দেবে না।

দেবে না?

আতঙ্কিত গলায় বললেন নীহার। কেন দেবে না?

কোম্পানীর ফ্ল্যাটে কোম্পানী থেকে এন্‌টারটেইন্‌ করার খরচা দেবে, কতরকম লোক আসবে। পার্টি লেগেই থাকবে। সেই সব কারণেই এমন নিয়মকানুন।

আর বুবু? বুবুর কি হবে?

বুবুকে ডুন স্কুল কি আজমীরে পাঠিয়ে দেবো। বাবা মায়ের আদরে আদরে সব স্পয়েল্ড্‌ হয়ে যায়। মানুষ হতে হবে তো। বাঙালী হয়ে থাকলে তো আর চলবে না। রবীন্দ্রনাথের

কবিতা, পড়োনি, ছোটোবেলায় ? "রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করো নি, সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী।" একেই বলে জিনিয়াস। সেই কবে বলে গেছেন কথাটা আর আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। পাঞ্জাবীদের দেখো না ? কী স্মার্ট, কী ডেয়ারিং। মাড়োয়ারীরাও আজকাল খুব মডার্ন হয়ে উঠেছে। আগের মত আর নেই। কোলকাতা শহরের মালিক তো এখন তারাই। খাটে, পয়সা রোজগার করে। বাঙালী যত্ত, সব তো এখন ডেলি-প্যাসেঞ্জার। নতুন যুগ এসেছে মা। এখন অনেক প্র্যাকটিকাল, প্র্যাগম্যাটিক হতে হবে।

নীহার শেষ কথা দুটোর মানে বুঝলেন না।

জতুর যখন উন্নতি হবে, তখন আমাদের কি হবে দমু ?

দমু হাসল। বলল, ছেলের উন্নতির কথাতে কোনো মায়ের মুখ শুকোয়, এমনটি আর দেখিনি। না বলে বলল, অবনতি হবে।

কেষ্ট ফিরল ওষুধ নিয়ে। নীহার ওষুধ খাওয়াতে গেলেন হরেনবাবুকে। হরেনবাবু খুব ঘামছিলেন।

এত ঘামছো কেন ? আজ তো গরম একেবারেই নেই। বরং ঠাণ্ডা লাগছে আমার।

হরেনবাবু, এক সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ হরেন্দ্রনাথ, মিচিগান অ্যান্ড ম্যাকআইভরের টি ডিপার্টমেন্টের ছোটবাবু একেবারে ভয়ার্ত কেঁচোর মত বললেন, জানি না নীহার। আমার বুকের কাছে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। বাঁ দিকে।

সে কি ? জতুকে বলি।

না, না। তুমি কি পাগল হলে ? এই সময় ? সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়িতে লেবু থাকলে লেবু-নুন দিয়ে সরবৎ করে দাও একটু।

নীহার সরবৎ করার জন্যে ফ্রিজ থেকে লেবু বার করতে গেলেন।

দমু বলল, দেখো মা। লেবু নষ্ট কোরো না। অনেকেই জিন খাবে লেবু দিয়ে। লাইম-জুস বাড়িয়ালে অনেকের আবার অম্বল হয়।

জিন ? জিন কিরে দমু ? জিন-পরী ?

দমু অশিক্ষিত শাশুড়ির অজ্ঞতায় হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, সে জিন নয় মা। এ অন্য জিন। ঈসস তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

সাড়ে ছটা বেজে যেতেই বাড়িতে টেনসান বাড়তে লাগল। কেষ্ট উর্দিটুর্দি পরে সাহেব হয়ে গেল। সবকটা আলো জ্বালানো হল। পৌনে সাতটার সময় দমুও রেডি। দারুণ এক চমকালো সম্বলপুরী সিল্ক পড়েছে দমু। এমন একটা শাড়ির খুব শখ ছিলো নীহারের যৌবনে। অনেক শখই অপূর্ণ থেকেছে ; তার মধ্যে এও একটা।

সাতটা বাজতেই নীহারকে ঘরে ঢুকিয়ে দিল জতু। মুখ ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি বাবা ? তুমি যে একেবারে শুয়ে পড়লে ? এই বয়সে কেন যে লোভীর মত খাও একগাদা। ফুড-হ্যাবিটস চেঞ্জ না করলে এই বাঙালী জাতের কিসসু হবে না

৫

ঘরের মধ্যে অন্ধকার। কিন্তু ঘরের বাইরে বসবার ঘরে এখন অনেক আলো। আলো ঝলমল করছে। স্টিরীওতে ইংরিজি কি সব গান চাপাল ওরা।

নীহার ফিসফিস করে বলল, কেমন লাগছে এখন ? বুকের ব্যথাটা ?

ফাস্ট ক্লাস। ফাস্ট ক্লাস আছি। হরেনবাবু বললেন।

এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা একটু ফাঁক হয়েছে দেখতে পেয়েই জতু প্রায় ছুটে এসে বাইরে থেকে হুড়কো তুলে দিতে দিতে, মিথ্যা রাগের গলায় দমুকে বলল, আশ্চর্য! কুকুরটাকে ঢুকিয়ে রেখেছ, দরজাটাও বন্ধ করো নি?

বাইরে থেকে হুড়কো-বন্ধ অন্ধকার ঘরে বন্দী, অভিশপ্তা গর্ভধারিণী, অবিশ্বাসে, আঘাতে নিথর হয়ে, তাঁর স্বয়ম্ভু সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিঃশব্দ, নিশ্চল হয়ে রইলেন। চারদিকে চাপ চাপ অন্ধকার। অন্ধকারে সময়ও নড়ে না। টেবল ঘড়িটা শুধু টিক্-টিক্ করছিল।

নীহার, হরেনবাবুর কাছে এলেন। পাশে বসলেন। গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, হরেনবাবু খুবই ঘামছেন। ফিস্‌ফিস্ করে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে নীহার শুধোলেন, এখন কেমন লাগছে?

গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল।

তারপর খুবই কষ্টের সঙ্গে বললেন, চমৎকার নীরু; চমৎকার।

অনেক অনেক বছর পর নীহার তাঁর নিজের চিবুকটি বড় সোহাগে, বড় দুঃখে, বড় গভীর প্রেমে তাঁর স্বামীর ঘাম-ভেজা বুকের উপর ছুঁইয়েই ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কেঁদে উঠেই, দু'হাত দিয়ে নিজের কণ্ঠরোধ করলেন।

অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। সময়কে হুড়কো বন্ধ করে রাখা যায় না কোনো ঘরেই। তার চলা, অবিরত; অবাধ।

বাইরে বসবার ঘরে বোধহয় আলো একেবারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একদল মডার্ণ, প্র্যাক্টিক্যাল, প্র্যাগ্‌ম্যাটিক্ মানুষ-হওয়া বাঙালী খুব জোরে ইংরিজি গান বাজিয়ে এ দেশ থেকে যারা ইংরেজদের বিতাড়িত করেছিল একদিন নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তায়, তাদেরই ন্যক্কারজনক প্রেতাত্মাদের মত কোমরে কোমরে জড়িয়ে নাচানাচি করছিল।

হঠাৎ বাজনা থামিয়ে কে যেন গান ধরল, "ও সারা সারা, হোয়াটেভার উইল্ বী, উইল বী।"

সকলে গলা মিলিয়ে গাইল, "হোয়াটেভার উইল বী, উইল বী।"

হরেনবাবু ততক্ষণে এক স্বপ্নময় আলোর দেশে পৌঁছে গেছেন।

সেখানে সবে বৃষ্টি থেমেছে। বৃষ্টি-ভেজা বাদামী-সাদা দল-ছাড়া বক ডানা ঝাড়ছে হরিসভার পুকুরপারের পাশের জারুল গাছের নরম সবুজ ডালে বসে। বাতাবী ফুলের গন্ধের সঙ্গে বৃষ্টিভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ মিশে গেছে।

সন্ধে হয়ে যাবে একটু পরেই।

তিস্তা থেকে আসা ঘোঘট নদীর ক্যানালের পাশের চাপ চাপ সবুজ ঘাসের মাঠ পেরিয়ে দূরের দুগ্ধ-ফেননিভ মেঘপুঞ্জ ছাড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সিঁদুরে রেখা ঝিলিক্ মারছে উত্তরের দিগন্তে। ফুলমণি গরু ডেকে উঠল হাম্বা-আ-আ করে। বিদায়ের নীরব সুর বাজছে সমস্ত বিধুর প্রকৃতিতে। শহরের হাটে দুধ বিক্রী করে, কমলা-রঙা হালকা-রোদের চাদর গায়ে জড়িয়ে আসন্ন সন্ধ্যার ভয়ে ভীত, দুটি মুসলমান ছেলে জীবনদায়ী দুধ-যোগানো কালো মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে দিনান্তবেলার গান গাইতে গাইতে দ্রুত, ত্রস্ত পায়ে চলে যাচ্ছে বাঁশবন আর বেত-ঝাড়ের পাশে সিঁদুর-লাল আঁকাবাঁকা পথে।

যেদিকে শংকামারীর শ্মশান।



কুচিলা-খাঁই

জীপের স্টীয়ারিং ধরা বাঁ হাতের কব্জির দিকে তাকালাম।

ঘড়ির রেডিয়ামে আড়াইটা চকচক করেছে। সেই দুপুর দুটোয় কটক শহর ছেড়েছি। তারপর মহানদী আর বিরূপার অ্যানিকাট্ পেরিয়ে ঢেনকানলের উপর দিয়ে এসে, হিন্দোল পেরিয়ে অঙ্গুলে এসে পৌঁছেছি। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার রওয়ানা হয়ে পূর্ণাকোর্টের মোড়ে-এসে বাঁয়ে ঘুরেছি। তারপরও চলছি—পাহাড়ে জঙ্গলে, চড়াইয়ে উৎরাইয়ে। পথের রাঙাধুলোয় গা-মাথা সব একাকার হয়ে গেছে। জার্কিনের জলপাই রংটার উপর ধুলোর আস্তরণ এমনভাবে পড়েছে যে, ড্যাশবোর্ডের মৃদু আলোয় রঙটাকে খয়েরী বলে মনে হচ্ছে।

জীপের হেডলাইটে দেখলাম, সামনেই একটা শালের খুঁটির গায়ে সাদা এক ফালি তক্তার উপর কালোতে লেখা 'টুলকা ফরেস্ট রেস্টহাউস।'

একটি প্রায় সমকোণিক বাঁকে চাকাগুলো আপত্তি জানিয়ে কিচ কিচ করে উঠলো—ঢুকে পড়লাম টুলকার বাংলোর হাতায়। সামনে পড়ে রইল হিমেভেজা ভুরাণ্ডির রাস্তা। গাঢ় অন্ধকারে একটা ফ্যাকাশে স্বপ্নের মত।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

ভোর হয়েছে।

কুচিলা-খাঁই ডাকছে পাহাড়ের উপরের কুচিলা গাছ থেকে। ইঁক্ক ২ক্ক ইঁক, ইঁ কঁক্ক, ইঁ কক্ক, কঁ হ্যাঁক হ্যাঁক।

দিলো ঘুমটার বারোটা বাজিয়ে।

এমন অসভ্য অভদ্র পাখি ভারতবর্ষের পাহাড় জঙ্গলে আর দুটি নেই। অন্য অনেক পাখি ডাকে বটে, তবে তাদের ডাক এমন শ্রুতিকটু কিংবা অপ্রয়োজনীয় নয়। কোট্‌রার বাচ্চা যেমন বিনা কারণে লাফায়, এরা তেমনি বিনা কারণে ডাকে। সব সময় খাই খাই করছে, আর বিরাট বিরাট ডানা আর বিশ্বলোভী ঠোঁট দিয়ে যা পাচ্ছে তাই ঠোকরাচ্ছে। এমন লম্ফঝম্পমান পাখির তেলে বাত সারবে না, তো বাত সারবে কিসে?

ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ ঘুমুব। হল না তা।

জানালা দিয়ে ডিসেম্বরের সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছে।

এমন আশাবাদী আকাশ বহুদিন দেখিনি। ঝক-ঝকে রোদ্দুর হাওয়ায় উড়ছে—ছুটি—

ছুটি— ছুটি। কম্বলটা সরিয়ে উঠে বসলাম চৌপায়াতে। উঠে বসতেই দেখলাম, বাংলোর পাশের ফাঁকা জায়গাটাতে, কুয়োতলার কাছে, কাপড় শুকানোর দড়িতে কী একটা গোলাপী পদার্থ ঝুলছে।

চোখ কচ্‌লে ভালো করে দেখলাম। প্রথমে বিশ্বাস হল না। ভাবলাম কাল রাতের নেশা কাটেনি। কিন্তু আবার ভালো করে চাইতেই ইচ্ছা না করলেও পদার্থটির উপস্থিতি বিশ্বাস করতে হল। একটা গোলাপী-রঙা নাইলন প্যান্টি। এই নিবিড় জঙ্গলে, হাতি-বাইসন-বাঘ অধ্যুষিত পাহাড়ে, এ কোন মেমসাহেব যে এই ভেঙ্গে-পড়া, ছুঁচোয়-ভরা বাংলোয় এসে রয়েছে ?

ঘরের বাইরে যেতে সাহসে কুলোল না। ঘর থেকেই হাঁক দিলাম 'চৌকিদার'।

'কইন্তু আইজ্ঞাঁ', বলে চৌকিদার এসে দাঁড়াল।

সে আমাকে আগেও দেখেছে অনেকবার। আঙুল দিয়ে রমণী-বাসটি দেখাতেই, সে কাছে এসে বলল, ছিন্তিয়া মেম্বসাহেব। কাল রাত্তির আইলা, আর মত্তে কহিলা সাত্তদিন রহিব।

মনে মনে ভাবলাম জ্বালালে দেখছি।

কোথায় একটু নিরিবিলি খেয়ালখুশি-মতো দিন কাটাব না কোত্থেকে ছিন্তিয়া মেম্বসাব এসে জুটল।

হাত-মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় পরে বারান্দায় আসতেই দেখলাম, বারান্দার সামনের ঝাঁকড়া চেরীগাছটার পাশে, যেখানে অসম্ভব উদার একরাশ রোদ আর এক ঝাঁক ছাতার পাখি লুটোপুটি করেছে, ঠিক সেইখানটিতে বেতের চেয়ার পেতে একটি বিদেশী মেয়ে বসে আছে। বাংলোর সামনের পাহাড়টার দিকে চেয়ে। পাহাড়টি বলতে গেলে একেবারে বাংলোর গেটের গা ঘেঁষে উঠেছে। অনেকগুলো কুচিলা-খাঁই, হঁক্ক হঁক্ক করছে, কুচিলা গাছগুলোতে পাখা ঝাপটাচ্ছে, উড়ছে, বসছে, এক কথায় এই সুন্দর শান্ত শীতের সকালের সবটুকু সৌকুমার্য ওদের কদর্য সশব্দতায়, চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে।

মেয়েটি কুচিলা-খাঁইগুলোকে দেখছিলো ; এক-দৃষ্টে চেয়েছিলো। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলাম। ছিন্তিয়া মেমসাহেবকে দেখে নাস্তিকের মতিভ্রম হল।

এমন স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত সৌন্দর্য আগে আমি আর দেখিনি। মেমসাহেবের যে এমন বাঙালী মেয়ের কমনীয়ত্ব থাকতে পারে আমার ধারণার বাইরে ছিল। একটি কচি-কলাপাতা রঙের গরম পোশাকে সে বসেছিল। পায়ের উপর পা দিয়ে। তার গ্রীবাহেলনের মনোরম ভঙ্গী, তার বসার ভদ্রভাব, তার আত্মতন্ময়তা সমস্ত মিলেমিশে আমার একটি চমক লাগল। এই সুস্নাতা, সুগন্ধি, বিদেশী মেয়েটি প্রকৃতির অন্য অনেক সুন্দরী ফুলের মত এখানে এই টুল্‌কার জঙ্গলে আমার চোখকে তৃপ্ত করবে বলে কাল রাতেও ভাবতে পারিনি।

ভাবলাম, ওকে 'ডোন্ট-কেয়ার' করে বন্দুক-কাঁধে বেরিয়ে পড়ি। আজকের খাওয়ার সংস্থান করতে হবে।

এই ভেবে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, চেরী গাছটাকে বাঁয়ে ফেলে হন্‌হনিয়ে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু মেমসাহেব পেছন থেকেই সুপ্রভাত জানাল।

অতএব ভদ্রতার খাতিরে ফিরতে হল।

মেমসাহেব অহেতুক ফর্মালিটি এড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ঐ যে পাখিগুলো চেঁচা-

মেচি করছে, ওগুলোর নাম কী ? চৌকিদার বলছিল 'কুলা-খাঁই'। আমি হেসে বললাম, কুলা-খাঁই নয়, কুচিলা-খাঁই, বাংলায় আমরা বলি ধনেশ পাখি, ইংরিজি নাম, 'The Great Indian Hornbill.'

মেমসাহেব খুলে বলল, They are a nuisance to this serenity.

তক্ষুণি বেরুনো হলো না।

ওখানে বসে আর একবার কফি খাওয়া হল।

সীন্থিয়া জোন্‌স বলল, আমি এসে পড়াতে নাকি খুব ভালো হল। এক ধরনের বিশেষ লতা সম্বন্ধে গবেষণা করছে ও।

আমি শিকারে প্রায়ই এখানে আসি শুনে ও বলল, তাহলে তো খুব ভালোই হল, আপনার এখানের জঙ্গল পাহাড় সব চেনা আছে। তাছাড়া কাল তো আমি বিকেলে হাতির তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেঁচেছি। শিকার তো প্রত্যেক বারই করেন, এবার একটু অবলার সহায় হোন। নইলে, আমায় শূন্য হাতে ফিরতে হবে। লতা সংগ্রহ হোক আর না হোক ভয়-মুক্ত হয়ে জঙ্গলে পাহাড়ে বেড়িয়ে বেড়ানোটাও তো একটা আনন্দের মতো আনন্দ।

আমি বললাম, তথাস্তু তবে একটু-আধটু শিকার তো করতেই হবে – পটহান্টিং নইলে খাবেন কী ?

সীন্থিয়া বলল, কেন টিনের খাবার ? সব সঙ্গে আছে।

আমি বললাম, টিনের খাবারে আমার অরুচি। এখন উঠি, গোটা দুই মুরগী মেরে আনি।

কিন্তু তক্ষুণি ওঠা হল না। সীন্থিয়া উঠতে দিল না—বলল, বসুন না একটু—এমন সুন্দর সকাল, গল্প করা যাক।

সীন্থিয়া অনেক কথা জিজ্ঞেস করল, আমার নাম কী, কী পেশা, শিকার করতে ভালোবাসি কেন, আর কোনো নেশা আছে কি না, কী কী জানোয়ার মেরেছি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচুর ছেলেমানুষী প্রশ্ন।

অন্য জায়গা এবং অন্য লোক হলে হয়ত সব কথার উত্তর দিতাম না –কিন্তু লোকে যখন আমার মত ছুটি কাটাতেই আসে তখন একটা অকেজো ছেলেমানুষীর রেশ মাখানো থাকে সেই সমস্ত ছুটিটাতে। বরঞ্চ এখন বুড়োমানুষী করতেই মন [illegible]য় না।

শেষকালে আড্ডার মায়া কাটিয়ে উঠলাম। বন্দুকটা নিয়ে বাংলোর হাতা পেরিয়ে পাহাড়ের নিচের সুঁড়ি পথে হারিয়ে গেলাম।

আসবার সময় সীন্থিয়া বলল, তাহলে মারবেনই মুরগী, ছাড়বেন না ?

আমি বললাম, আগে মারিই।

ও বলল, তবে মারুন, রান্না কিন্তু আমি করব।

ভাবলাম, আরে এ যে গৌরীপুরী বৌদি আমার। কোথায়, কোন থালায়, কার হাতে যে কার ভাত বাড়া থাকে তা কি কেউ জানতে পায় ?

পরদিন বিকেলে চা খাওয়ার পর সীন্থিয়াকে বললাম, চলুন মাছ ধরে আসি।

—কোত্থেকে ?

—কেন ? ভূরাণ্ডির পথে যে জলপ্রপাতটা আছে, সেখান থেকে।

—আছে বুঝি জলপ্রপাত ?

—নেই নাকি। দেখেননি এখনো?

—না তো।

—চলুন নিয়ে যাচ্ছি। বাংলো থেকে বড় জোর দু ফার্লং হবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম লালমাটির রাস্তার উপরের সেই জলপ্রপাতে। বেশ উঁচু থেকে জল পড়ছে, ঝরঝরিয়ে। নিচে বেশ গভীর জল। একটা পুকুরের মত হয়েছে সেখানে। সেখান থেকে জল তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে চলে গেছে জঙ্গলের গভীরে। জলটা উপর থেকে যেখানে পড়ছে সেখানে হাজার হাজার শ্বেত সাপের মতো ফেনা কিল্‌বিল্‌ করছে। আর বড় বড় মহাশোল মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে জলের স্বচ্ছ ফোয়ারায়।

সীম্বিয়া তো দেখে অবাক। বাংলোর এত কাছে এমন সুন্দর জায়গা অথচ আগে আসেনি।

আমি বললাম, একা একা বেশি না-আসাই ভালো। বলে ওকে সঙ্গে করে, যেখানে ঝর্ণাটা বিভিন্ন ধারায় ভাগ হয়ে গড়িয়ে গেছে উপত্যকায় সেখানে নিয়ে গিয়ে জলের ধারে শম্বরের পায়ের দাগের সঙ্গে বাঘের পায়ের দাগও দেখালাম। সীম্বিয়া একটুও ভয় না পেয়ে বলল, আমাকে একদিন বাঘ দেখাবেন?

হেসে বললাম, বাঘ দেখাবো কিনা হলপ করে বলতে পারি না, তবে দেখতে চাইলে, বাইসন-চরুয়া মাঠে নিয়ে গিয়ে বাইসন দেখাতে পারি।

বাচ্চা মেয়ের মতো ভুরু নাচিয়ে বলল, তবে তো আরো ভালো হয়।

আমি বললাম, বেশ তো দেখাবো বাইসন—পুরো দলটা—নিশ্চয় দেখাবো।

একটা বড় পাথরের উপর বসে আমরা ছিপ ফেলছিলাম। হাত ছিপ্‌। তবে সুতো মজবুত্‌। আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসছিলো। শীতের বনে, জঙ্গল-পাহাড়ে, আসন্ন সন্ধ্যায় কী যে সে এক করুণ রাগিণী বাজতে থাকে তা কী বলব। ঘরের মানুষকে সে-সুর ঘরে ডাকে, প্রিয়জনকে সে-সুর কাছে টানে, আর আমার মতো খোদার ষাঁড়কে আরো বাউণ্ডুলে করে তোলে।

জলপ্রপাতের উপরের পাথরগুলো শুয়ে শুয়ে আদিবাসী ছেলের বুকের চেটোর মত বুক চিতিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কখন সন্ধ্যাতারা উঠবে সেই ক্ষণ গুনছে। সেখান থেকে একটি ময়ূর বার বার ডেকে উঠছে কেঁয়া, কেঁয়া। একটা কোটরা হরিণও জলপ্রপাতের ডানদিক থেকে ডাকছে, ব্বাক্‌, ব্বাক্‌, ব্বাক্‌। রাইফেলটাকে হাতের কাছে টেনে রাখলাম।

এই টানছে, টানছে, ফাতনা ডুবলে—চেঁচিয়ে উঠল সীম্বিয়া।

আমি বললাম, টানো টানো—এক হ্যাঁচকা টান মারল সীম্বিয়া। মাছটা শেষ সূর্যের আলো আর জলপ্রপাতের জলের ছটায় মুক্তির জন্যে শেষ বারের মতো ঝিকমিক্‌ করে উঠলো। তারপর সঙ্গের বেতের ঝুড়িতে তাকে পুরে ফেলা হল।

সীম্বিয়া আনন্দে লাফাচ্ছিল। একটা আকাশী নীল-রঙা স্কার্ট আর ফিকে গোলাপী-হাতওয়ালা উলের সোয়েটার পরেছে ও। ওর নরম, স্বপ্নিল সোনালী চুলে জলের গুঁড়ি হাওয়ায় এসে জমছে—তার উপর ক্লান্ত পৌষের বিষণ্ন রোদের চুমু লেগেছে—মনে হচ্ছে সীম্বিয়া জোন্স নয়, যেন এক প্রাচীনা আর্যকন্যা তার উদ্ধতা কোমল গ্রীবাভঙ্গিতে এই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি না আমার ওকে ভীষণ পেতে

ইচ্ছা করল। ওর মতো সুগন্ধী, সুহাসিনী, স্বচ্ছতোয়া নারী আমার জীবনে এলে, ভাবলাম ; হয়ত আমার ঐ রুক্ষ পৌরুষের দুর্গন্ধময় জ্বালা আর থাকবে না।

এই ভাবনাটা মনে ব্যাপ্ত হতে না হতে কোথা থেকে এক ঝাঁক ছাতার পাখি, ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করতে করতে কোণাকুণি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

আমার ছিপেও একটা মাছ উঠল। বেশ বড় মাছ।

এদিকে সন্ধ্যা এসে জলপ্রপাতের মাথায় তার কালো চুল মেলে দাঁড়িয়েছে দেখলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সন্ধ্যাতারাটি পিদিম হাতে পথ দেখাতে এল। বনের পাতায় শিরশিরানি তুলে তার পিছু পিছু একটা হাওয়াও এল।

আমি আর সীন্থিয়া বাংলোর দিকে চললাম।

চলতে চলতে সীন্থিয়া বলল, গোটাম্, চল আমরা এখানে সাঁতার কাটব। আপত্তি আছে তোমার ?

আমি বললাম, আপত্তির কিছু নেই। তবে সাঁতার কাটার চেয়ে শুধু স্নান করাটাই ভালো হবে। ওখানের পাথরগুলো ভারী অসমান আর জলের তলায় কোথায় যে উঁচু আর কোথায় নিচু তাতো তুমি দেখতে পাবে না। গতবার আমার এক পাইলট-বন্ধু এইখানে এসে সাঁতার কাটতে গিয়ে কলারবোন ভেঙ্গে ফিরেছিল। বেচারার ক্যারিয়ারটাই খতম হয়েছিল একটু হলে।

সীন্থিয়া ওর ডানহাতের পাতায় আমার বাঁ-হাতের পাতাটি নিয়ে বলল, আমাকে ভয় দেখিও না—তা ছাড়া তুমি তো আছ। তুমি থাকতে আমার ভয় কী ?

এমনভাবে সীন্থিয়া কথাটা বলল, যেন আমার উপর ভরসা করেই এই অবলা নারী এই রকম জায়গায় লতা খুঁজতে এসেছিল। তবু, যাকে ভালো লাগে, যার সঙ্গ ভালো লাগে ; যার হাতে হাত ছোঁয়ালে শিশু বয়সে মার স্তনে হাত ছোঁয়ানোর মতো আশ্বস্ত মনে হয়, সে যদি এমন করে বলে যে আমি আছি জেনে সে নিশ্চিন্ত, তবে তার চেয়ে বড় কিছু প্রাপ্তি আছে বলে তো আমি জানি না। যাকে ভালো লাগে কিংবা যাকে ভালোবাসি, তার সবটুকু বিশ্বাস যদি আমার উপর ন্যস্ত হয়, তাহলে আমি তার জন্যে কিনা করতে পারি। হয়তো প্রাণও দিতে পারি। তাছাড়া একটা প্রাণের জন্ম তো এক জৈব দুর্ঘটনা বই নয়, কিন্তু ভালোবাসা তো দুর্ঘটনা নয়, সে যে এক স্বেচ্ছারোপিত ব্যথার ফুল। যার অবয়ব নেই। তবু, নড়লে-চড়লে সে ঝুমঝুমিয়ে বাজে।

সীন্থিয়াকে দেখে যে আমার ভারতীয় বলে মনে হয়েছিল, তার কারণ ছিল। ওর মা ভারতীয়, বাবা ইতালীয়। পরে অবশ্য বিচ্ছেদ হয়ে গেছিল দুজনের। তার বেশী কথা ওর সম্বন্ধে জানতে পারিনি এবং জানতে চাইওনি। তাছাড়া ও নিজের থেকে খুশিমনে নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিল, তাই শুনেছিলাম।

গতকাল সকালে ওর সঙ্গে পাহাড়ে গেছিলাম। এই পাহাড়-জঙ্গলে একা একা ঘোরা ওর পক্ষে সত্যিই সম্ভব হত না। হাতি প্রচুর আছে, তাছাড়া বাইসন্ এবং ভাল্লুকও আছে। এদের কাছ থেকেই অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী। কালকে তো প্রায় আমাদের গায়ের উপর দিয়ে একটা ভাল্লুকের বাচ্চা ডিগ্‌বাজী খেয়ে চলে গেছিল। সীন্থিয়া খিলখিলিয়ে হেসে বলল, দেখো দেখো একটা ভাল্লুক-খাঁই।

আমি ওর কথার ধরন দেখে হাসি চাপতে পারলাম না। কুচিলা-খাঁই নাম দেখে, সব জানোয়ারের পেছনেই ও খাঁই বলতে শুরু করেছে।

জঙ্গলে পাহাড়ে চৈতন্য হবার পর থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেক গাছ দেখেছি, অনেক ফুল দেখেছি। অনেক লতা দেখেছি অথচ তাদের সকলের বৈজ্ঞানিক নাম কখনো জানিনি। তাদের স্থানীয় নাম জেনেছি ; তাদের ভালোবেসেছি, এই পর্যন্ত। এই যে জঙ্গল, এতে আসন, শাল, পিয়াশাল, সেগুন,. কুচিলা, মহুয়া এবং নানারকম বাঁশে ভরা।

একরকম মোটা-সোটা, গাঁট্টা-গাঁট্টা বাঁশ দেখিয়ে সীম্থিয়া বলেছিল, এদের নাম কি জান ? Bamboosa Robusta আর ঐটা কি বলতো ? Bamboosa Ardensia. যখনি ফুল ধরতে শুরু করবে, তখনি এদের মরবার পালা শুরু হবে। শুকিয়ে যাবে ধীরে ধীরে।

আমি বললাম বাঃ চমৎকার নিয়ম তো। মানুষদের জীবনেও এরকম হওয়া উচিত। ফুল ধরবার পরে বেঁচে থাকবার কি মানে হয় জানিনা। মৃত্যু, সার্থকতার অনুগামী হওয়াই উচিত। সার্থকতার পর বাঁচবার মতো কোনো যথেষ্ট অনুপ্রেরণা আমাদের নেই। সার্থক হবার চেষ্টাই তো জীবন। তুমি কি বল ?

সীম্থিয়া নীল-রঙা এক গুচ্ছ ফুল হাতে দোলাতে দোলাতে বলল, মৃত্যু যদি সার্থকতার অগ্রগামী হয় তা হলে ?

আমি কিছু বলি না। আমি শুধু শুনি।

গাছপালার মসৃণ গা বেয়ে উদার সূর্যের সহস্র সোনালী আঙুল সমস্ত বনভূমির শরীরে আদর ছোঁওয়াচ্ছিল। আমরা হাঁটছিলাম। শিশির ভেজা ঘাস, লতা পাতা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছিল। তার সঙ্গে কত শত নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ মিশে মন্থর শীতার্ত হাওয়ায় রোদের আঙুলে কাঁপছিলো। নানারকম হিবিস্কাসের মুখে সকালের মুখের ছবি দেখছিলাম। সীম্থিয়া আপনমনে এক-একটা বিরাট উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নাম বলছিল প্রায় স্বগতোক্তির মতো, আর সেই নামের বহর শুনে যে লতা, যে ফুলকে ছোটবেলা থেকে দেখেছি, তাদের খুব হঠাৎ রাশভারী বলে মনে হচ্ছিলো।

আমি বললাম Emerson-এর সেই কবিতাটা পড়েছো ?

কোন্ কবিতা ?

সীম্থিয়া বলল।

যতটুকু মনে ছিল, আমি তাই আবৃত্তি করলাম—

..."But these young scholars, who invade our hilla
Bold as the engineer who fells the wood,
Love not the flower they pluck and know it not,
And all their Botany is Iatind names–'

সীম্থিয়া বলল, Superb! Superb! আচ্ছা গোটাম্, তুমি এই জঙ্গল পাহাড়কে খুব ভালোবাসো না ? যদি তোমার মতো করে ভালোবাসতে পারতাম।

আমি বললাম, তোমার ভালোবাসা জঙ্গল-পাহাড়ের মতো নির্জীব বস্তুতে অপচয় করবে কেন ? ভালো যদি বাসতে চাও, তো তোমার কি পাত্রের অভাব ?

সীম্থিয়া কথাটার জবাব দিলো না, এড়িয়ে গেল, এবং কেমন ব্যথিত ও চকিত হয়ে

আমার দিকে ওর নিভৃত চোখ তুলে চাইলো।

আমার সীম্থিয়া মেমসাহেবকে ভীষণ ভালো লাগছিলো। জীবনে যা আমি বরাবর ভয় করে এসেছি, সরবে যার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছি, সেই নীড়-বাঁধার মত লজ্জাকর ও স্থাবর মনোবৃত্তিটা আমারও মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। মনে মনে তাকে অনেকবার বন্দুক উঁচোলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ভয় পেলো না।

রাত আটটা হবে। বারান্দায় বসেছিলাম। বাংলোর সামনে কিছুই চোখে পড়ে না! জমাটবাঁধা কালো অন্ধকার চোখের সামনে মনের জমাটবাঁধা ভাবনার মতো ভারী হয়ে বসে আছে। পাহাড়টাই বেশী ভারী, না অন্ধকারটাই বেশী, ঠাহর করতে পাচ্ছিনা। পাহাড়ের নিচের সেগুন গাছের জঙ্গলে জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে আর নিবছে। অমাবস্যার রাতের ঢেউয়ের বুকের ফসফরাসের মতো। এই ঘনান্ধকার ভয়গর্ভ রাতের একটা সুপুরুষ ব্যক্তিত্ব আছে। এই অন্ধকার রাতে, বন-পাহাড় যেমন ভাবে অদৃশ্য ও অসাধারণ ভাবে ব্যক্ত হয় তেমনি আর কোনো সময়ে নয়। প্রকৃতির বুকের কোরকে যে শক্তিমান পুরুষ বাস করেন, সেই পুরুষ এই অন্ধকারে প্রতীয়মান হন। যাদের চোখ আছে তারাই তাঁকে দেখতে পায়।

বাংলোর পেছনের সারি সারি আলপনা-দেওয়া ছোট ছোট মেটে ঘর। ছোট উঠোন, পাতকুয়ো, দু-একটি শান্ত বিজ্ঞ গরু, গুটিকয় চঞ্চল পোষা মুরগী, এবং অনেক নগ্ন, অসুস্থ অথচ সদাহাস্যময় শিশু। এই নিয়ে টুলকা গ্রাম। এখন রাত নেমেছে। কালো রঙের তুলির আঁচড়ে সব মুছে গেছে। নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। গ্রামের পেছনের ধানক্ষেতে হাতি নেমেছে। মাচায় বসে ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে ছেলেরা. শীতের রাতে পায়ের নিচের সরায় কাঠের আগুন নিয়ে। শাল কাঠের মশাল করে তাতে আগুন জ্বেলে আন্দোলিত করছে। হাতির দল বৃংহন করতে করতে আবার পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছে।

সীম্থিয়া চৌকিদারের হাতে বাসনপত্র দিয়ে বাবুর্চিখানা থেকে বারান্দায় এসে উঠল। বলল, শীগ্‌গীরী এসো, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নড়বড়ে কাঠের টেবলে খাবার সাজিয়ে, কম্পমান লণ্ঠনের আলোয় আমার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে, আমার জঙ্গলের প্রেমিকা বলল. খাও, গোটাম শুরু কর।

মুসুরীর ডালের স্যুপ, ফ্রায়েড রাইস এবং মুরগীর রোস্ট্। এ জঙ্গলে রোজ রোজ এমন খাবার খাব, আর শুধু তাই নয় এমনভাবে খাব, কে ভেবেছিল ? খেতে খেতে আমি বললাম তুমি আমার অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছ। আর চারদিন পরে যে চলে যাবে, তখন কী খাবো ? সীম্থিয়া বলল, কেন ? এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি, তাছাড়া তোমার ঘোড়া মার্কা রাম তো আছেই। তোমার মতো লোক মানুষ না হয়ে ঘোড়া হয়ে জন্মালেই পারত। বলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। তারপরই গম্ভীর এবং নিচু গলায় আমাকে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল. তুমি খুব মজার ছেলে। তোমার মধ্যে খুব প্রাণ আছে। যে মেয়ে তোমাকে বিয়ে করবে সে খুব সুখী হবে।

মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বললাম, দেশে এই জ্ঞানের ভয়ে লোকালয় ছেড়ে থাকি জঙ্গলেও যদি জ্ঞান দাও, তো পালাবার জায়গা দেখিনা। সীম্থিয়া বলল, আমি ঠাট্টা করছি না, যা বলছি তা সত্যি কি না দেখো।

ভাবলাম, এও তো আর এক জ্বালা। যাকে মনে মনে ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে

যাকে প্রেয়সী বলে ভেবে আকাশকুসুম কল্পনা করছি, সে হঠাৎ পিসীমা ব'নে উপদেশ দিতে আরম্ভ করল। পড়াশুনাটা করলে, কী করে কথা গুছিয়ে বলতে হয় তা লিখতে পারতাম। একে তো কাউকে আমার আদপে কিছু বলারই থাকে না, যদি বা বলার মতো কোনো কথা জমে, তাও মনে মনে হাঁড়ির মধ্যে খিচুড়ির মত টগবগ করে। তা বলা হয় না।

আমি কিছু বললাম না। উত্তরে চুপ করেই রইলাম। কারণ আমি জানতাম, বলার সময় এখনো আসেনি। জীবনে একটা ভীষণ রকম প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্যে একটু মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, অন্তত আমার পক্ষে।

আমরা চুপচাপ খাচ্ছিলাম। সীম্বিয়া, চামচে করে একটু একটু ফ্রায়েড রাইস্ আলতো করে মুখে তুলছিলো তারপর নিঃশব্দে চিবোচ্ছিলো। ওর হাঁটায়, কথা বলায়, চোখের চাউনিতে, এমন কি খাওয়াতেও এমন একটা শান্ত শ্রী, এমন একটা সহজীয়া রেশ আছে যে ওকে দে‘ আমার মনে হতো ওর জীবনে বোধ হয় কোনোদিন ওকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে হয়নি, নিজে যা ভালো বলে মনে করেছে সেই শুভবুদ্ধি থেকে নড়তে হয়নি। তাই ও পাহাড় থেকে প্রথম বেরুনো ঝর্ণার মতো পবিত্র ও স্বচ্ছতোয়া। কোনো বাঁধা বাঁধা হয়নি এ পর্যন্ত ওর ইচ্ছা বা রুচির বিরুদ্ধে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত ও যখন হাসত। প্রথমে চোখের তারায় একটু বিদ্যুতের ছটা দেখা যেত, তারপর সেই ছটা ছড়িয়ে যেত, সমস্ত মুখময়, পাতলা দুটি জিনিয়া ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁটে, দু'সারি সুচারু দাঁতে, সুকুমারী চিবুকে।

আমি ভাবতাম এমন করেও কি কেউ হাসতে পারে—কিংবা কোনো মেয়ের হাসি এমন ভাবে কোনোদিন দেখিনি বা দেখবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন হয়তো বা।

সীম্বিয়া যতক্ষণ কাছে থাকত ততক্ষণ আমার সমস্ত সত্তা ঘিরে একটি সুগন্ধ উঠত অনুক্ষণ। ওর সান্নিধ্যে কোনো জ্বালা ছিল না, কোনো কামনার ধারালো ছুরি কখনো আমাকে ফালা ফালা করত না। ওর সান্নিধ্য, আমার অনেক নৈরাশ্যের অতল গহ্বর আলোকিত করে রাখত, আমার অনেক ভালোলাগাকে মৌসুমী ফুলের মতো সমস্ত সত্তা জুড়ে ফুটিয়ে তুলত। মনে মনে, আমি নিজে যা নই, তাই মনে হত। মনে হত আমিও ওর মত শুচি, পবিত্র, ওর মত সরল। মাঝে মাঝে এমন হত যে আমার ওকে নিয়ে নীড় বাঁধবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে এমন ধারণাও আমার মনের মধ্যে শিকড় গাড়বার চেষ্টা করত। তখন সত্যিকারের ভালোবাসার সন্তান যে বিনয়, সেই বিনয় এসে আমাকে তুড়ে বলত 'তুই একটা অপদার্থ'। অমনি 'মুই অতি ছার' ভাব নিয়ে নিজের নৈরাশ্যের খনির ভেজা-সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে, অনিশ্চয়তায় আবার নেমে যেতাম।

আর যাই হোক, বোকা আমি কোনোদিনই ছিলাম না। আমি জানতাম, আমি বুঝতে পারতাম যে, সীম্বিয়া যে-কোনো কারণেই হোক আমাকে পছন্দ করে! মানে, নিছক পছন্দ করার জন্য নয়। আমাকে ওর বিশেষ এক ভাবে ভালো লাগে।

আমি বুঝতে পারতাম।

ওর চাউনি, ওর কথার সুর আমার সামান্য সুখের জন্য ওর উৎকণ্ঠা সবেই বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারতাম আর অবাক হয়ে যেতাম যে এই ছাত্রীটির পড়াশুনার চেয়ে আমার প্রতি আগ্রহ বেশি বলে। ওর মধ্যে কোনো সস্তা জিনিস ছিলোনা, কোনো ন্যাকাপনা ছিলোনা। আমার এই উদ্দাম জংলীপনা ওকে আকৃষ্ট করেছিল। ওর দু'চোখে আমি আমার

এই আলো হাওয়া বন পাহাড়ের জীবনকে শুষে নেওয়ার আকৃতি দেখতে পেতাম। ভারী ভালো লাগত। এত ভালো আমার কোনোদিন লাগেনি।

খাওয়ার পর, বারান্দায় বসে, আর একটু গল্প করা হল।

সীম্থিয়া বলল, তুমি রোজ আমাকে ঠকাচ্ছ। কাল আমাকে চান করতে নিয়ে যেতেই হবে সেই জলপ্রপাতে!

আমি বললাম, হবে'খন, রাত তো পোয়াক্।

তারপর যে যার ঘরে শুতে গেলাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, সীম্থিয়া প্রায়ই আমাকে বলে you are a darling you are so sweet ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ এমন করে বলে, যেন পাশের বাড়ির মহিলা তার পাশের মহিলার ছেলেকে বলছেন।

ওকে আমি বুঝতে পারি না। ওকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। বলতে গেলে পাগলের মতো ভালো লাগে। ওরও যে আমাকে ভালো লাগে তা বুঝতে পারি, অথচ কথাবার্তায় এমন একটা সম্মানজনক ও সম্ভ্রান্ত দূরত্ব ও বজায় রাখতে চায় যে, আমার ভালো লাগে না। ও বোধ হয় ভয় পায়; পাছে এই জঙ্গল পাহাড়ে দুরন্ত বেপরোয়া ছেলে, এমন কিছু আবদার করে বসে, যা ওর দেবার সাধ্য নেই। জানি না; কিছুই জানি না।

কুঁচিলা-খাহ্-এর ডাকের জন্যে কোনোদিন ভালো করে ঘুমুনোর জোটি নেই। রোজ সকালে, আর শুধু সকালে কেন? সমস্ত সময়ই তো হুঁক্ক, হুঁক্ক, হুঁক্ক, হ্যাঁক্ হ্যাঁক করছে!

ঘুম থেকে উঠতেই, সীম্থিয়া বাইরে থেকে আমায় ডেকে বলল, গোটাম্, you better shoot a couple of these noisy filthy birds. They are telling on my nerves.

চৌপায়েতে বসে বসেই বললাম, কেন? তোমার কি বাত হয়েছে না কি?

সীম্থিয়া রেগে বলল, না না সত্যি বলছি, এই পাখিগুলোকে আমি আসা অবধি সহ্য করতে পারছি না।

প্রাতরাশ খেয়ে সীম্থিয়ার সাদা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডে চেপে আমরা ঝর্ণাটায় গিয়ে পৌঁছলাম।

তখনো জল বেশ ঠাণ্ডা। আমি বললাম, আর একটু পরে নেমো, অসুখ করে যাবে।

সীম্থিয়া বলল, বেশ, তবে আগে চলো, জলপ্রপাতের মাথায় যে সুন্দর জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে উঠি। জলটা কোথা থেকে আসছে দেখবো।

আমি বললাম, চল, ঝোঁক যখন হয়েছে, তখন তো আর বাধা শুনবে না।

জলপ্রপাতটা বেশ উঁচু, মাথা থেকে নিচের পুকুর প্রায় একশ ফিট্ হবে। তবে সেখানে তিন চারটে প্রপাত। কম বেশি পনেরো কুড়ি ফিট উঁচু, একের মাথায় আর এক। পাকদণ্ডী ঘুরে উপরে উঠতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। আমিও কোনোদিন উপরে উঠিনি। গভীর জঙ্গল আর লতাগুল্মর আড়াল থেকে চওড়া পাথরের খয়েরী আর কালো চাতাল বেয়ে জলধারা কুল্ কুল্ করে বেয়ে আসছে, এসে শীতের সকালে ক্রীড়াচ্ছলে, রামধনু চুল উড়িয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে নিচে। উপরে দু'ধারে লতাপাতা ঝুঁকে পড়েছে। দু'ধারই চমৎকার ছায়া শীতল। রোদে পাথর যতটুকু গরম হয়েছে, তাতে তার উপর শুয়ে থাকতে ভারী আরাম। জলধারার দু'ধারে থোকা থোকা কী একটা জংলী লতায় ফিকে নীল ফুল ফুটে আছে। পাথরের কালোতে খয়েরীতে, জলের ফেনিল সাদাতে, আর এই নীল লতার নীলে এমন একটা অপার্থিব ছবি

হয়েছে সে কি বলব। সীম্বিয়া লতাগুলোর কাছে গেলো, তারপর বলল, এগুলোর নাম কী জান। প্যাশানফ্লাওয়ার। এগুলো জংলী লতা মোটেই নয়। নিশ্চয়ই কোনো সৌখীন লোক এখানে এনে কোনোদিন লাগিয়ে গেছিল।

সীম্বিয়া বলল, আমি এমন জায়গা ছেড়ে নিচে যাচ্ছি না।

সেই জলধারা ধরে সামান্য এগোলেও বেশ গভীর দু'তিনটি জায়গা আছে। যেখানে জল এক কোমর থেকে বুক অবধি। সবচেয়ে মজা হচ্ছে, এখানে জল একেবারে ফটিক স্বচ্ছ। মন হারালে, মন কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

সীম্বিয়া ফ্লাস্কে করে কফি বানিয়ে এনেছিলো। আমি বললাম, তুমি চান কর আমি কফি খাই।

ও বলল, ‌্মি চান করবে না নাকি?

আমি বললাম, করব, জল একটু গরম হোক।

হালকা গোলাপী রঙের একটা সাঁতারের পোশাক পরেছিল সীম্বিয়া। ঝকঝকে জলের মধ্যে একটা গোলাপী হাঁসের মতো মনে হচ্ছিল ওকে। বাদামীতে শ্বেতাতে মেশানো ওর আশ্রয়াকুল হাত দু'খানি জলের মধ্যে ফোয়ারা ওঠাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে বলছিল, সব কফি খেও না কিন্তু।

আমি কফিতে চুমুক দিচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম, এ ক'দিন শিকারে আমি প্রায় গেলামই না, অথচ কী করে যে ক'টা দিন কেটে গেল টেরই পেলাম না। সীম্বিয়া তো আর দু'দিন বাদেই চলে যাবে। তারপর সময়টা সকাল বেলার কুয়াশার মতো একেবারে আমার উপর চেপে বসবে। তবু বেশ কাটল এ ক'টা দিন। এত কাছে থেকে এত দূরে কি করে থাকতে হয় সীম্বিয়ার কাছে তা শেখার আছে। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সীম্বিয়া চীৎকার করে উঠলো, হেল্প হেল্প।

তাকিয়ে দেখি, জলের তোড়ে সীম্বিয়া নিচে প্রপাতের দিকে ভেসে চলেছে আর প্রাণপণে হাত পা দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সেখান থেকে প্রথম প্রপাতটি বড় জোর তিরিশ চল্লিশ ফিট হবে।

কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে লাফিয়ে পড়লাম জলে। জল তো সেখানে সামান্য, হাঁটুও নয়; কিন্তু কী পিছল। লাফাবার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড আছাড় খেলাম। হাঁটুতে এমন একটা চোট লাগল পাথরের উপর পড়ে যে, মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবো। অজ্ঞান যে কেন হলাম না জানি না, কিন্তু সীম্বিয়া বেঁচে গেল, আমার পাশ দিয়ে ভেসে যাবার সময় ওর হাত আমার হাতে লাগল, এবং আমি প্রায় শোওয়া অবস্থাতেই হাঁচকা টান দিয়ে একটা বড় পাথরে দু'পায়ে ভর রেখে, ওকে আমার কাছে টেনে আনলাম। ভয়ে বেচারীর মুখ চোখ শুকিয়ে গেলেও, ওর ঠোঁটে সেই আশ্চর্য হাসিটি লেগেই ছিল। কিছুটা অভাবনীয়তায়, কিছুটা প্রাণ প্রাপ্তির আনন্দে ও অস্ফুটে কী যেন বলে উঠল, বুঝলাম না।

সীম্বিয়াকে বাঁচাতে পেরে যে আনন্দ না হলো তা নয়, কিন্তু হাঁটুটাকে বোধহয় আর কোনোদিন সোজা করতে পারব না।

আমরা দু'জনে কোনোরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে কিনারে এসে পৌঁছলাম, তারপর সীম্বিয়া নিজে প্রথমে উঠে, আমাকে উঠতে সাহায্য করল। কোনোরকমে পাথরে পৌঁছে চিত হয়ে

শুয়ে পড়লাম। হাঁটুটার মাংস একেবারে থেঁতলে গেছিল। তার উপর রক্ত চোঁয়াতে শুরু করেছিল। সীম্বিয়া কী করবে বুঝতে পারছিল না। প্রথমে হাত দিয়ে রক্তটা মুছবার চেষ্টা করল, তারপর হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কপালে চুমু খেল। তারপর অনেকক্ষণ আমার ভিজে বুকে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওরকম চাপা মেয়ে যে কী করে এমন বেহিসাবী হল, ভাবতে পাচ্ছিলাম না। আমি কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে বললাম, তুমি কি পাগল হলে ! বোকা মেয়ে, আমার কিছু হয়নি।

সীম্বিয়া তবু শুনলো না, আমার পাশে অসহায়ের মতো বসে, আমার দিকে চেয়ে থাকলো। সোনালীচুলে মোড়া ওর জল-ভেজা শ্বেতা গ্রীবার দিকে তাকিয়ে একটি রাজহাঁসের কথা আমার মনে হল ! যাকে আমি গুলি করেছিলাম, তারপর বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারিনি।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। সকালের চা খাওয়া হয়ে গেছে। বারান্দায় ইজী চেয়ারে বসে আছি। হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বেঁধে। লোকজন জোগাড় করে বাঁশ দিয়ে স্ট্রেচার বানিয়ে সীম্বিয়া ঝর্ণার ওপর থেকে আমাকে কাল নামিয়ে নিয়ে এসেছিল। নিজে গাড়ি চালিয়ে পূর্ণাকোট থেকে ডাক্তার এনেছিল। ডাক্তার ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেছেন আর বলেছেন যে হাড় ভাঙ্গে নি তবে বিশ্রামের প্রয়োজন।

সমস্ত বন পাহাড় রোদে ঝলমল্ করছে। বারান্দার থামগুলোর ছায়ার সঙ্গে রোদটা কাটাকুটি খেলছে। সীম্বিয়া বাংলোর সামনের নুড়ি বিছানো ড্রাইভে পায়চারী করছে। প্রথম যেদিন আমরা ঝর্ণায় যাই মাছ ধরতে, সেদিনকার সেই পোশাকটি পরেছে সীম্বিয়া। ফিকে নীল স্কার্ট আধ ফিকে গোলাপী সোয়েটার।

সীম্বিয়াকে দেখছি চুপ করে বসে। যেতে আসতে চোখাচোখি হলেই ও চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। কী যেন ভাবছে ও। বোধহয় কালকের কথা। বোধহয় ভেবে লজ্জা পাচ্ছে। আমিও ভাবছি। ভাবছি ওকে দু'একদিনের মধ্যেই বলব সেই কথাটা—বুলবলি পাখির সঙ্গে বাসা বাঁধার কথা।

এমন সময় দুটো কুচিলা-খাঁই পাখি পাহাড় থেকে উড়ে এসে চেরী গাছটার ডালে বসে কুৎসিত গলায় ডাকতে লাগল হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ হ্যাঁক্। সীম্বিয়া যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। পাখিদুটো প্রকাণ্ড ঠোঁটদুটো দিয়ে ডালে ঘষতে লাগলো আর বিরাট বিরাট ডানাদুটো ঝাপটাতে লাগলো।

সীম্বিয়া দৌড়ে আমার ঘরে ঢুকে শট্গানটা নিয়ে এসে বলল, মারোতো গোটাম্, মারোতো। এগুলো সব সময় আমাকে ভয় দেখায়।

ইজীচেয়ারে বসে বসেই গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাখি গাছের ডালেই লট্কে রইল, মগডালে। অন্যটা হঁক হঁক করতে করতে উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ আগে থেকে জঙ্গলের মধ্যে একটা দূরাগত গাড়ির এঞ্জিনের গুন্গুনানি শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। একটা কালো গাড়ি। কাছে এলো গাড়িটা—পূর্ণাকোটের দিক থেকে আসছে—তারপর বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ল। দেখলাম, একটা কালো রোল্স্রয়েস গাড়ি—সামনে কোনো দেশীয় রাজ্যের পতাকা উড়ছে পত্পতিয়ে।

গাড়িটা এসে বাংলোর সামনে দাঁড়ালো। উর্দিপরা সোফার এসে পেছনের দরজা খুলে ধরলো। একজন মোটাসোটা ছোটোখাটো ভদ্রলোক নামলেন—পরনে দামী স্যুট, মাথায় স্ট্র হ্যাট—। বয়স কম করে পঞ্চাশ হবে।

হঠাৎ সীম্বিয়ার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

ওর চোখ দেখে মনে হল এ ওর চোখ নয়, ছুলোয়া শিকারে তাড়া খেয়ে শিকারীর সামনে পড়া কোনো চিতল হরিণীর চোখ!

যার বাঁচা হল না। হবে না।

লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে সীম্বিয়াকে বলল, what's all these about? Why Am I paying that old bitch for?

সীম্বিয়া চোখে আগুন ঝরিয়ে দু'হাত তুলে সমর্পণের ভঙ্গীতে বলল, All right! You have your way. Now for God's sake keep you bloody mouth shut.

আমি কিছু বোঝা বা বলার আগেই, সীম্বিয়া প্রায় আমার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিল, নিয়ে একবার লোকটার দিকে তুলল, তারপর আমার ঘরে রেখে এল।

রেখে এসে, আমার ইজীচেয়ারের পাশে আমার কাঁধে হাত রেখে, সীম্বিয়া বলল, গোটাম্ আমি যাচ্ছি।

ওর হাত চেপে ধরে আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

ও বলল, আমার অতীতে ফিরে যাচ্ছি। আমি খারাপ, আমি খারাপ, আমি মিথ্যাবাদী, আমি খারাপ।

ওকে কাছে টেনে আমি বললাম, তুমি ভালো, তুমি ভালো, তোমার অতীত নেই, তোমার কেবল ভবিষ্যৎ আছে।

সীম্বিয়া আমার মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত যেন কী ভাবল, তারপর লোকটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, এটা আর একটা কুচিলা-খাঁই।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সীম্বিয়া বলল, চল্লাম গোটাম্, তোমাকে মনে থাকবে। আমাকে ভুলে যেও।

বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে দৌড়ে গাড়িতে উঠল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, সীম্বিয়া, সীম্বিয়া।

কিন্তু উত্থান শক্তি রহিত আমার চীৎকার ডুবিয়ে দিয়ে মহারাজার গাড়ির আওয়াজ বাংলোর হাতা পেরিয়ে গেল।

পেছনে পেছনে সোফার সীম্বিয়ার স্টান্ডার্ড হেরাল্ড চালিয়ে নিয়ে গেল।

সেই ভাঙা সকালের রাঙা আলোয় আমি একা একা বসে রইলাম টুল্‌কার বাংলোর বারান্দায়। হাওয়ার দোলায় মরা কুচিলা-খাঁই পাখিটার পালকগুলো আন্দোলিত হচ্ছিল। একবারের জোর হাওয়ায় মরা পাখিটা ধপ্ করে নিচে পড়ল।

পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, আমার বড় কষ্ট হল সীম্বিয়ার জন্যে। ওর জীবনময়ই কুচিলা-খাঁই, ক'টা কুচিলা-খাঁই আর ও মারতে পারবে?



মাপ

এ কী। হাতল দুটো এরকম করলেন ?

কী যে সব সময় আঁজ্ঞে আঁজ্ঞে করেন নিলুবাবু। আপনাদের কি আক্কেল বলে কিছু নেই ?

আঁজ্ঞে ?

আবার আঁজ্ঞে ? দেখছেন যে, কী রকম মোটা হয়ে গেছি। পা দুটো জোড়া করে দিনে দশ ঘন্টা বসে থাকা যায় মশাই ?

না, আঁজ্ঞে।

কমোন সেন্স, যা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে আনকমোন ; তাইই নেই মশাই আপনাদের একটুও।

আঁজ্ঞে।

এই হাতল দুটো ছোট করতে হতো, যাতে পা দুটো একটু ছড়িয়ে বসতে পারি। কতবার বোঝালাম আপনাকে, তবুও আপনি বুঝলেন না ?

আঁজ্ঞে। কিন্তু কারিগরের স্ত্রীর মেয়েলি অসুখ হয়েছে। সে তো পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে ডায়মন্ড-হারবারাতে চলে গেছে।

জাহান্নামে যাক মশাই। আপনাদের মতো বুড়ো-হাবড়াদের দিয়ে আমার কাজ চলবে না। কাজের লোক তার অফিসে, তার চেয়ারে বসেই জীবনের তিন-চতুর্থাংশ সময় কাটিয়ে দেয়। সেই চেয়ারটাই যদি একটু আরামের না হয় তা হলে.......

আঁজ্ঞে। আমি পনেরো দিন পরে আবার আসব হাত দুটো ছোট করে কেটে দেব।

থ্যাঙ্ক য়্যু। আপনাকে আর আসতে হবে না। ততদিনে আমার দুটি উরুতে ফাংগাস গজিয়ে যাবে মশাই। আপনি এবারে আসুন।

আঁজ্ঞে।

হরিপদ। বলে, ডেকেই, বড়বাবু কলিং বেল টিপলেন।

হরিপদ এলো ঘরে।

কি ? তোমাদের ব্যাপারটি কি ?

কি স্যার ?

কি স্যার ? একটা চেয়ার নিয়ে আর কতদিন ধস্তাধস্তি করব বলতে পারো ? যে চেয়ারে বসে কাজ, যে চেয়ারটিই সব ; সেটিকেই ঠিক মতো করে দিতে পারছো না। এই দ্যাখো, এই যে ! বলেই, বড়বাবু যেই সজোরে বসতে গেলেন অমনি রিভলভিং চেয়ারের পায়ার নিচের একটি ক্রোমিয়াম-প্লেটেড লোহার বল গড়গড়িয়ে চলে গেল টেবিলের নিচে। বড়বাবু কাত হয়ে পড়লেন ডান পাশে। সামান্য হেলে গেল। ডানে। মাই গুডনেস !

বলেই, উনি লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হরিপদও লাফিয়ে উঠল।

অফিসের সবাই বলে যে, হরিপদ বড়বাবুর ছায়া। বড়বাবু লাফালে হরিপদও লাফায়, বড়বাবু রেগে গেলে হরিপদও রাগে ; বিষণ্ণ হলে বিষণ্ণ। হরিপদরই মতো অনেক সাফারি-স্যুট পরা বড় বড় অফিসারও আছেন এই মস্ত কোম্পানিতে। তাঁরাও বড়বাবুকে দেখে ঐ রকমই করেন অনেকটা। মোসাহেবির শিল্পে তবু হরিপদ এক দারুণ শিল্পী। বড়বাবু সেটা জানেন। এবং জেনেও পুলকিত হন। প্রত্যেক মূর্খ বড়বাবুই মোসাহেবির শিকার হয়ে থাকেন। স্বয়ং ভগবানই হন, বড়বাবুরা তো কোন্ ছার !

কিন্তু চেয়ারটা ?

বড়ই ব্যতিব্যস্ত বড়বাবু এক বছর হলো এই চেয়ার নিয়ে। মনের মতো, নিজের জন্য আরামসই একটা চেয়ার ; কিছুতেই যোগাড় করতে পারছেন না তিনি।

এসব নিলুবাবু ফিলুবাবুকে দিয়ে হবে না হরিপদ। বাঙালীর এই জন্যই ব্যবসা হয় না। সেলসম্যান যদি যে জিনিস বিক্রি করছেন নিজে সেই জিনিস সম্বন্ধে হাতে-কলমে জ্ঞান না রাখেন, তা হলে সেলসম্যান-শিপে আর প্রডাক্ট-এর মধ্যে একটা ফাঁক থাকতে বাধ্য। এই জন্যই বাঙালীর ব্যবসা হয় না। মালিক আর সেলসম্যানরা খালি কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছেন, আর কাজের বেলায় ডায়মন্ডহারবারার যদু ছুতোর। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

হরিপদ !

স্যার !

চিনে মিস্ত্রী নেই এ পাড়ায় ?

টেরিটিবাজারে আছে।

শোনো। মিস্ সেনকে বলো এক্ষুনি পার্ক স্ট্রীটে ফোন করবে। বেয়ারাদের কাউকে পাঠাও চেয়ারের লিটারেচার নিয়ে আসবে।

স্যার।

চিনে ছুতোরের কাছেও যাও। মাপমতো একটা চেয়ার এনে দিতে পারলে না তোমরা। ওয়ার্থলেস সব। যে কোম্পানির বড়সাহেবের চেয়ার ঠিক থাকে না, তা উঠে যেতে বাধ্য। লালবাতি জ্বলে যাবে।

বলেই, ঘরের লালবাতির সুইচ টিপে দিলেন। ঘরে এখন কারোই ঢোকা মানা। অত্যন্ত আপসেট তিনি। চেয়ারে বসলেই ডাইনে কাত হয়ে যাচ্ছে চেয়ারটা। ডিসগ্রেসফুল। মনে মনে তিনি একজন লেফটিস্ট। ইনটেলেকচুয়াল মানুষ তো ! ডাইনে এমন কেতরে বসে থাকতে দেখলে লোকে কি বলবে ? ছ্যাঃ।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে হরিপদ পার্ক স্ট্রীট থেকে ছবিটবি আঁকা লিটারেচার নিয়ে এল।

একজিক্যুটিভ চেয়ার। সিংহাসনের মতো। এতো উঁচু যে, তাতে বসে, তাঁর টেবিলের সামনে উল্টোদিকে যাঁরাই বসবেন, তাঁদেরই পিগমি বলে মনে হবে। মডার্ন ম্যানেজমেন্টের এও একটা ভাঁওতা। মানুষের ভিতরের জিনিস যতই কমছে তার চেয়ারের উচ্চতা ও প্রস্থ ততই বাড়ছে।

নাঃ। বড়সাহেবের চেয়ারটা বেঁটেখাটো গোলগাল। ঐ চেয়ারে বসলে তিনি নিজেই চেয়ারটার পটভূমিতে বেপাত্তা হয়ে যাবেন। চলবে না।

হরিপদ।

স্যার।

চিনে মিস্ত্রী।

স্যার।

চিনে মিস্ত্রী এল ঘন্টাখানেক পর। দর্জিকে যেমন করে ট্রাউজারের মাপ দেন তেমন করে তাঁর পশ্চাৎদেশ, উরু, কোমর, ঘাড ইত্যাদির মাপ দিলেন বড়বাবু। মিস্টার চুং ফিংকে বলে দিলেন যে, এমন একটা চেয়ার তিনি চান, যে চেয়ারে বসে চাকরি-জীবনের বাকি আটটা বছর নিশ্চিন্তে, আরামে কাটিয়ে দিতে পারেন।

থ্যাঙ্ক, য়্যু। বলে, চুং ফিং চলে গেলেন।

২

আজ চুং ফিং কোম্পানির চেয়ার আসবে। সকালে দাড়ি কামাতে কামাতেই উত্তেজিত বোধ করতে লাগলেন বড়বাবু। চাপা উত্তেজনা ; পরকীয়া প্রেমে যেমন হয়।

অফিসে যেতেই, সেক্রেটারি মিস সেন বললেন, গুড মর্নিং স্যার। বিহারের ডিলারদের সঙ্গে কনফারেন্স আছে এগারোটায়।

কনফারেন্স রুমে বসিয়ে কফিটফি খাওয়াতে বলবেন ওঁদের। আই মে বী আ লিটল লেট।

নিজের ঘরে ঢুকেই দেখলেন চেয়ারটাকে। বাঃ। ঝরাপাতার মতো ফিকে হলুদ রঙ। ফোম-লেদারের কুশান। ক্রোমিয়াম প্লেটেড পায়া, হাতল, পায়া. নিচের চারটে বল। রিভলভিং চেয়ার তো ? ঠেলে দেখলেন একটু পেছনে হেলিয়ে। বাঃ। বসে বসে স্বপ্নও দেখা যায়, এমন চেয়ারে।

ইনটারকম চিঁ চিঁ করে উঠল হঠাৎ।

শাট্ আপ্।

চেঁচিয়ে উঠলেন বড়বাবু। লালরঙা-রিসিভারটা তুলে মিস সেনকে বললেন, আধ ঘন্টা কোনও কল দেবেন না আমাকে। নট ইভিন ইন্টারনাল কলস।

ঠাক্ করে রিসিভারের গর্তে রিসিভারটাকে নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন চেয়ারটার দিকে। এমনভাবে, চেয়ারটা যেন ফুলশয্যার রাতের বউই।

চেয়ারটার সামনে অ্যাটেনশানে দাঁড়ালেন একবার, মনে মনে স্যালুট করলেন। তারপর ঘুরে আস্তে আলতো করে পশ্চাৎদেশ নামালেন ; হাঁস তার শরীরকে যেমন করে জলে নামায়।

আটকে গেছেন বড়বাবু। চেয়ারটায় একেবারেই আটকে পড়েছেন। অক্টোপাসের মতো চীনে চেয়ারটা একেবারে কামড়ে ধরেছে তাঁকে। নড়তে-চড়তে পারছেন না পর্যন্ত। এ কী চক্রান্ত মিস্টার চুং-ফিং-এর ? বেল টিপলেন পাগলের মতো। ঝড়ের মতো হরিপদ এসে ঢুকল।

স্যার !

আমাকে ওঠাও।

স্যার ?

আমাকে চেয়ার থেকে তোলো। চেয়ারের সঙ্গে আটকে গেছি আমি।

হ্-রি-প-দ।

স্যার।

বলেই, রোগা-সোগা হরিপদ আপ্রাণ চেষ্টা করল বড়বাবুকে চেয়ার থেকে ছাড়াতে। কিন্তু পারলো না। মনে হলো, জীবনের মতো আটকে গেছেন।

বড়বাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললেন, চেয়ারটা ঘুরিয়ে দাও তুমি। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাও আমার। হ্-রি-প-দ।

হরিপদ সামান্য গায়ের জোরের সমস্তটুকু খরচ করে ঘুরিয়ে দিল চেয়ারটাকে। সহজেই ঘুরে গেল সেটা।

যাও হরিপদ।

হরিপদ চলে যাচ্ছিল ঘর ছেড়ে। বড়বাবু ডাকলেন, বললেন, শোনো, কাউকে কিন্তু বোলো না।

স্যার।

কাউকেই বোলো না যে আমি আটকে গেছি আমার চেয়ারে।

না স্যার।

রুম-এয়ারকন্ডিশানারের ফিসফিস শব্দ আসছিল। অনেক নিচে ক্যামাক স্ট্রীট দেখা যাচ্ছে। গাড়ি যাচ্ছে সারি দিয়ে। লোহালক্কড়, শেয়ার, ফাউন্ড্রি, চা ও মার্বেলের এক্সপোর্ট। অনেকই ব্যবসা এই কোম্পানির। অনেক মাইনে বড়বাবুর। পারকুইজিটস। দালালি, কমিশন, খাতির, উপরি, ডানে এবং বাঁয়ে। বড়ই আঠা।

আকাশে চিল উড়ছে। এই ঘরে বসে চিলের কান্নাও শোনা যায় না।

কলকাতার আকাশে এখনও অনেক নীল। মানুষের দেখারই সময় নেই শুধু।

নিজেই তো মাপ দিয়ে বানালেন চেয়ারটাকে। এই চেয়ারের চেয়ে নিজের মাপটা বোধ হয় বড় বলে ভেবেছিলেন উনি।



গুমোর

সেরাইকেলা থেকে এসে টাটা শহর পেরিয়ে পড়েই হাইওয়েতে ওদের খেয়াল হল যে, তেল নেয়নি। কিছু পথ আসতেই পেট্রল পাম্প পড়ল সামনে। গাড়ী আস্তে করে পাম্পে ঢোকাল দীপ।

তাতা বলল, ব্যাটারীর জল, মবিল এসব চেক করেছিলি !

সব, সব। তুমি তো জমিদারবাবু। তখন ঘুমুচ্ছিলে। তাছাড়া মবিল তো দেখতে হয় গাড়ি স্টার্ট করার আগে। গাড়ি চললেই মবিল উপরে উঠে আসে।

তাতা বলল, আমি আর গাড়ির কি বুঝি ? আমার মিনিবাসই ভাল। তবে গাড়ি গণ্ডগোল করলে তখনই বোঝা যাবে তুমিও কতটুকু বোঝো না বোঝো ! ঠিকমত যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ তো থিওরীতে সকলেই ডক্টরেট।

একটি ছেলে দৌড়ে এল পাম্পের ভিতর থেকে। বলল, কিত্‌না সাহাব ?

গাড়িটা বন্ধ করে দিয়েছিল দীপ। আবার একবার চাবিটা ঘুরিয়ে তেল কতখানি আছে দেখে বলল, পঁচিশ।

যতক্ষণে ছেলেটি তেল দিচ্ছিল ততক্ষণে অন্য একটি ছেলে দৌড়ে এসে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনটা পরিষ্কার করে দিল।

তেল দেওয়া শেষ করে প্রথম ছেলেটি বলল, আউর কুছ চাইয়ে সাব ? মবিল, ব্যাটারিকা পানি ?

নেহী ভাই।

পানি পিজীয়েগা সাব ?

দ্বিতীয় ছেলেটি শুধোল।

নেহী। সুক্রিয়া।

হিন্দি ফিল্মের নায়কের মত বলল, তাতা।

টাকা দিয়ে চেঞ্জ নিয়ে গাড়ি যখন হাইওয়েতে পড়ল, তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতা দীপকে বলল, ডিফারেন্স্‌টা দেখলি ?

কিসের ?

গীয়ার বদলাতে বদলাতে দীপ জিগগেস্ করল।

সার্ভিসের।

৪।

এ যদি বাঙালীর পাম্প হত, তো দেখতিস দশবার হর্ন বাজানোর পর একজন লোক অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বেরিয়ে বলত, আমার দশটা হাত নেই মশাই! অত তাড়া কিসের?

যা বলেছিস।

দীপ বলল।

এমন লেথার্জিক জাত দুটো নেই। নো-ওয়ান্ডার, সমস্ত কোলকাতা শহরে এখন বাঙালীরা মাইনরিটী! মানে, দে ডু নট রীয়্যালী ম্যাটার এনি মোর!

দীপ নিজের মনেই হেসে উঠল। বলল, রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে একবার এক বাঙালী দোকানে জ্যাঠাইমার জন্যে শাড়ি কিনতে গেছি। গরমের দিন। দুপুরবেলা। লোডশেডিং ছিল। দেখি ক্যাশবাক্স সামনে নিয়ে গেঞ্জীটা গুটিয়ে বুক অবধি তুলে মালিক হাত পাখা হাতে, অদ্ভুত ভঙ্গীতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। আর যে-দোকানে মালিক ঘুমোয়, কর্মচারীতো নিশ্চয়ই ঘুমোবে। যাই হোক, প্রায় ঠেলেঠুলেই বলতে গেলে একজনকে তুলে বললুম, শাড়ি দেখান। ধনেখালি।

সেলস্‌ম্যান, ঘুমভাঙাতে বিরক্ত হয়ে লাল চোখ করে ধমকে বলল, কত দামের?

প্রথম প্রশ্ন শুনেই রক্ত চড়ে গেল মাথায়। আমার সাধ্য পঞ্চাশও হতে পারে পাঁচশও হতে পারে। শাড়ি না দেখিয়েই দাম?

যাই হোক। বললাম, শ'খানেকের মধ্যে।

একটা পুঁটলি খুলে গোটা কয় শাড়ি দেখালে। রঙ পছন্দ হলো না, পাড় পছন্দ হলো না; জমিও নয়।

বললুম, আর নেই?

কেন? এতগুলোর মধ্যে একটাও পছন্দ হলো না?

হলো না তো!

কী জানি বাবা!

নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল সেলস্‌ম্যান। তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল, নিত্যে-এ-এ। এই নিত্যে! শালারা দোতলাতে গাঁটরীর আড়ালে সবসময়ই ঘুমুচ্ছে।

নিত্যে সাড়া দিল না।

আমার দিকে চেয়ে সেলসম্যান বলল, আপনিও মশাই শাড়ি কিনতে আসার আর টাইম পেলেন না?

ইতিমধ্যে নিত্যে গাঁটরীর আড়াল থেকে বলল, বলতিচোকি গো গোবিন্দদা? যা বলবে বলো না, অত চেঁচাতিছ কেন?

ধনেখালি। মনোহারী, গাঁট্‌ ফেল্‌।

—এই ফেললুম্‌।

বলেই, ধপ্পাস করে একটা ইয়াব্বড় গাঁট সটান কাঠের দোতলা বারান্দা থেকে নিচে। একটু হলে আমার ঘাড়েই পড়ত।

সেলস্‌ম্যান বিরক্ত মুখে গাঁট্‌রী খুলে বলল, দেখুন; এর মধ্যে পছন্দ না হলে বুঝতে হবে শাড়ি-কেনার মতলবে আপনি আসেননি। আমাদের ঘুম-ভাঙাবার মতলবেই এয়েচেন।

জবাবে কী বলব ভেবে না পেয়ে মালিকের দিকে তাকালাম।

মালিক মাঝে একবার দয়া করে চোখ খুলেছিলেন ; আবার চোখ বুঁজে ফেললেন। শাড়ি কিনলে টাকা তো ওঁর কাছেই দিতে হবে আমাকে। তখন তো চোখ খুলতেই হবে। অনেকই কষ্ট হবে তাই একটু আরাম করে নিচ্ছেন।

তাতা বলল, তারপর ? ধনেখালি-মনোহারীর গাঁটরীতে মনোমত শাড়ি পেলি ?

দুস্‌স্‌। টেস্ট বলে কিস্‌সু নেই। গুচ্ছের ক্যাঁটকেঁটে রঙের দামী শাড়িতে ঠাসা। নেড়েচেড়ে বললাম, আর নেই ?

আরও ?

সেলস্‌ম্যান বলল, আমার আস্পর্ধা দেখে চোখ রাঙিয়ে।

তারপর কি বলল জানিস ? বলল, এত শাড়ি বাপের জন্মে কখনও একসঙ্গে দেখেছিলেন ?

আমি বললুম, কী করে দেখব ? আমার বাবার তাঁতের কাজ ছিলো না ; শাড়ির দোকানও নয়। অতএব....

দীপ হেসে উঠল।

বলল, টিপিক্যাল বাঙালী ব্যবসাদার !

তাতা বলল, শোন না। আরও কিছুদূর হেঁটে এসে দেখি এক সিন্ধীর দোকান। ছোট্ট দোকান। কিন্তু এয়ার-কন্ডিশানড্‌। দরজা ঠেলে ঢুকতেই মনে হল আমি যেন কোনো রাজা-মহারাজা ! কে মালিক, আর কে কর্মচারী কিছুই বোঝার উপায় নেই। যে ক'জন লোক ছিল সকলে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করল।

তাঁতের শাড়ি কথাটা আমার মুখ থেকে বেরুবার আগেই আমার সামনে বোধ হয় একটার পর একটা এবং কম করে গোটা বিশেক শাড়ি খুলে দেখানো হয়ে গেল। আর এক একটা শাড়ি ধরে, খুলে, পাড়ের প্রশস্তি করে, জমির গুণ গেয়ে এমন ভালোবেসে যত্নের সঙ্গে দেখাতে লাগল যে, মনে হল যেন শাড়ি তো দেখাচ্ছে না, মেয়ে-দেখতে আসা ভাবী-শ্বশুরবাড়ির লোকদের সামনে নিজের মেয়েকেই দেখাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে একটি উর্দি-পরা ছোকরা এসে হাতে একটা কাম্পাকোলার ঠাণ্ডা বোতল আর স্ট্র ধরিয়ে দিয়ে গেল।

তারপর ?

তাতা পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসে বলল, তারপর, তুই-ই বল ? মেয়েছেলে হলে আলাদা কথা ছিল। তাদের চক্ষুলজ্জা বলে কিছুই নেই এসব ব্যাপারে। কিন্তু যে-কোনো পুরুষমানুষের পক্ষেই এর পরেও সে-দোকান থেকে শাড়ি না কিনে বেরিয়ে আসা সম্ভব ?

পছন্দসই শাড়ি পেলি ?

পছন্দসই মানে কি ? প্রত্যেকটাই পছন্দসই। কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা নিই এ নিয়েই এক মহা-চিন্তায় পড়ে গেলুম। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্যাকেট-বগলে নিয়ে, কাম্পাকোলা খেয়ে, বেরিয়ে এলুম।

দাম ? দাম বেশী নিল না ?

কোনো সন্দেহ নেই। কম করে ঐ বাঙালী দোকান থেকে পাঁচ-দশ টাকা বেশীই নিলে, কিন্তু হোয়াট্ ডাজ্ ইট ম্যাটার ? থিঙ্ক অফ দ্যা সার্ভিস্। দ্যা ডিফারেন্স ইন অ্যাপ্রোচ। ওরা ব্যবসা করতে এসেছে। খদ্দের ওদের কাছে ভগবান। আর বাঙালী দোকানদার মাত্রই মনে করে, তারা খদ্দেরকে কৃতার্থ করছে।

সত্যি ! ভারী দুঃখ্ লাগে। ভাবলে, এত্তো খারাপ লাগে।

সিগারেটটা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দীপ বলল, হবে না। কিসসু হবে না। ভিখিরী হয়ে গিয়েও শিখলাম না কিছুই।

তাতা বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস ? আজকাল কিন্তু সাউথের পাড়ায় পাড়ায় শাড়ির দোকান হয়েছে অনেক।

তা হয়েছে। বেকার ছেলেরা করছে। অথবা তাদের বউরা। আজকাল সাধারণ চাকরিতে কি একজনের রোজগারে চলে ? তবে, এসব কি আর ব্যবসা ? আসল যা ব্যবসা সবই চলে গেছে মাড়োয়ারি, গুজরাটি, পাঞ্জাবীদের হাতে। ওরা চব্বিশ ঘন্টা খাটে। ব্যবহার ভাল। কোথা থেকে এসে কোথায় জুড়ে বসেছে। ফলে, আমরা এখন নিজের দেশেই নিজেরা পরদেশী। বাঙালীর ব্যবসা ক'টা আছে এই বাংলাতেই ? আর যা আছে, তা ক'পয়সার ব্যবসা ? বল ?

যা বলেছিস। আজ থেকে দশ-পনেরো বছর বাদে কোলকাতা শহরের চৌহদ্দীর মধ্যে ক'জন বাঙালী থাকে দেখিস। সকলকেই চলে যেতে হবে শহরতলীতে। ব্যাঙ্করাপ্ট্ হয়ে যাচ্ছি আমরা।

সবদিক দিয়েই।

দীপ বলল।

আজকাল প্রফেশনেও ওরা লীড করছে। কেন এরকম হচ্ছে বল্ তো ? আমাদের আসল দোষটা কি ?

পরশ্রীকাতরতা। শ্রমবিমুখতা। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, কামড়া-কামড়ি। নিজেদের কম্যুনিটিতে কেউ বড় হলে অন্য সকলে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা তো দূরে থাকুক, তাকে কিভাবে কাছা-ধরে টেনে নামাবে এই চক্রান্তেই সবটুকু সময় নষ্ট করছে। এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা, আলটিমেট্লী, নামাচ্ছেও। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করাতে এমন দক্ষ জাত আর এই দেশে নেই।

যা বলেছিস।

অবশ্য এর মধ্যে একটা কথা ভাবার আছে। একটা বড় কথা। বাঙালীর কাছে কোনোদিনও ম্যাটেরীয়াল ওয়েল-বীইংটা বড় ছিল না হয়ত। বাঙালী গান শোনে, বাজনা বাজায়, বই পড়ে বই লেখে, বাঙালীর রবীন্দ্রনাথ আছেন। রবিশঙ্কর, সত্যজিৎ আছেন। বাঙালী ফুটবল আর ক্রিকেট পাগল। ক্রিকেটের এমন সমঝদার আর কোন জাতে আছে বল ? খুব কম অন্য-প্রদেশীয়দেরই জীবনে এত বিভিন্ন দিক আছে, এত ওয়াইড-ইন্টারেস্ট আছে।

বুলশীট্।

দীপ উত্তেজিত গলায় বলল।

টোটাল বুলশীট্। লেম এক্সকিউজ্।

তারপর বলল, যাঃ যাঃ, আসল কথা হল "মুখেন মারিতেন জগৎ।" একটি ফাঁকিবাজ হুজুগে জাত আমরা। ক্রিকেট এতই যদি বুঝি তো টেস্ট-ক্রিকেটে ক'জন বাঙালীর নাম করতে পারি আমরা ? জানি আমরা সবই, কিন্তু করিনা কিছুই। কিস্সু না-করেই সবজান্তা ! সাধনা না-করেই সব-বোদ্ধা !

একটু চুপ করে থেকে দীপ আবার বলল, বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু কি বল্তো ?

সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

না। তার চেয়েও অনেক বড় শত্রু ? কি নয়, কে ? যে এই জাতটার সর্বনাশের গোড়া ? এই ফাল্তু সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সেরও মূল ?

—কে ?

—জোব্ চার্নক। সে ব্যাটা ইংরেজ যদি সুতানুটি, গোবিন্দপুরে এসে জাহাজ না ভেড়াত, তাহলে এ জাতটার হয়ত আজ এই দুর্দশা হত না। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে ইংরিজী শিখে, প্রথমে আই. সি. এস. জজ, ডাক্তার, উকীল, ব্যারিস্টার, সলিসিটর, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী সব হয়ে আমরা ভাবলাম, আমরা কী বুঝি হনু। ইংরিজী ভাষাকে আমরা শিক্ষার সঙ্গে গুঁলিয়ে ফেললাম। যেন ভারতবর্ষে তার আগে শিক্ষা-সভ্যতা বলে কিছুই ছিলো না। শুধু পা-চেটে আর ইংরিজীর জ্ঞান দিয়ে বৈতরণী যে পেরুনো যায় না এখন তা আমরা চোখের-জলে নাকের-জলে বুঝছি। কি বলিস ? বুঝছি না ?

বুঝলাম আর কই ! এখনও তো গুমোর যায়নি। আর সবই গেছে, কিন্তু গুমোর যায়নি। যে-কোনো জায়গায় তিনশ টাকা মাইনেতে চাকরি করতে পারি আমরা কিন্তু পারি না একটা পানের-দোকান করতে। বড়ই ইজ্জতে লাগে। ইজ্জৎ। বে-ইজ্জতের আর কি বাকি আছে ?

ছাড়্তো। অন্য কথা বল্। মন খারাপ হয়ে যায়। নিজেদের কথা আর বলিস না। এসব কথা যদি কাউকে বলতেও যাস, সে বলবে মেলা জ্ঞান দেবেন না মশায় ! চুপ কর্। যা হবার হোক্।

একটু চুপ করে থেকে দীপ বলল, যে কম্যুনিটি নিজেদেরই টেং. নামায়, যাদের কোনো ফিলিং নেই, একে অন্যের প্রতি ; কিছুমাত্রও যারা করে না অন্যের জন্যে, নিজেদের মধ্যে কারো ভালো হলে হিংসেয় যাদের বুক জ্বলে যায় ; তাদের কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে। এখনই কি ? তুই লিখে রাখ্।

আরও কত দুঃখ ? এখনও কি যথেষ্ট হয়নি ?

না। হয়নি।

২

বহড়াগড়ার কিছু আগে টায়ার পাংচার হল' ওদের গাড়ির। হতেই, দেখা গেল যে, গাড়ির প্যাসেঞ্জারের মত গাড়ির মালিকও গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কাঁদো-কাঁদো মুখে কবুল করল যে, জীবনে কখনও নিজে-হাতে টায়ার বদলায়নি দীপ। অতএব, দুজনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জামা-কাপড়ে ধুলোবালি মেখে, অনেক কসরত করে অনেকক্ষণ ধরে টায়ার চেঞ্জ- করল।

বহড়াগড়াতে পৌঁছতে পৌঁছতেই প্রায় সাতটা হয়ে গেল। টিউবটা সারাতে হবে। সেই ফাঁকে চা-টা খেয়ে নিল ওরা।

তাতা বলল, তোর বিদ্যেতো দেখলাম! এবার পথে রাতের অন্ধকারে কোনো মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল ট্রাবল্ হলে কি হবে?

অলক্ষুণে কথা বলিস না তো!

দীপ বিরক্তির গলায় বলল।

তারপর বলল, স্বগতোক্তির মত ; রাতের বেলা এসব রাস্তা আজকাল সেফ্ নয়। কোনো রাস্তাই সেফ্ নয়। গাড়ি তো দূরের কথা ; ট্রেন পর্যন্ত সেফ্ নয়। তাই-ই ওসব কথা একেবারেই বলিস না।

টিউব সারি'য় নিয়ে বেরোল যখন, তখন প্রায় পৌনে আটটা বাজে। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। কলাইকুণ্ডার আগে থেকে বৃষ্টিও পেলো। কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা। তারপর বিদ্যুৎ-চমকানি আর মেঘের গর্জন।

আন্দুল যখন পৌঁছল এসে, তখন ঠিক এগারোটা। বটানিকস্-এর পাশে এসে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। তারপর রামকেষ্টপুরে গাড়ি পৌঁছতেই গোঁ-গোঁ-গোঁ শব্দ করে গাড়ি থেমে গেল।

রাস্তা-ঘাট প্রায় জনশূন্য। কিছুক্ষণ গাড়িতে বসে ওরা একে-অন্যকে গালাগালি করল গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই না জানার জন্য।

তারপর তাতা নেমে ঠেলতে লাগল গাড়ি, বৃষ্টির মধ্যেই। দীপ স্টীয়ারিং-এ বসে কি করা যায় তাই ভাবতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, আব্রাকাডাব্রা ; আব্রাকাডাব্রা।

তাতা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে গাড়ির মালিক বন্ধু দীপকে যা-তা গালাগালি করতে লাগল মনে মনে। এমন বন্ধুর চেয়ে শত্রুও ভালো।

তেমাথাতে এসে পৌঁছল গাড়িটা। সামনে একটা পেট্রল-পাম্পও ছিল। বাঙালীর পাম্প। দীপ গাড়ি থামিয়ে পাম্পে গিয়ে মিস্ত্রীর খোঁজ করল।

মিস্ত্রী নেই। এত রাতে মিস্ত্রী কোথায়?

কী করা যায়?

কী বলব?

একটা ফোন করতে পারি?

ফোনের চাবি মালিক নিয়ে গেছেন। মালিক ঠিক আটটায় চলে যান। ফোন ধরা যাবে ; কিন্তু করা যাবে না।

গাড়িটা এখানে রাতের মত রেখে যেতে পারি? আরও তো ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি আছে দেখছি পাম্পে।

পারেন। গাড়ি চুরি হলে, আমরা কোনো দায়িত্ব নেবো না। আর রাতে রাখার জন্যে দশ টাকা নেবো।

তাহলে কী করা যায়?

কী বলব?

বলেই, ভদ্রলোক হাঁক ছাড়লেন, কি রে পেঁচো, দু' খিলি অখয়েরী-গুণ্ডী মোহিনী আনতে বললুম না তোকে!

দীপ ফিরে এল গাড়িতে। তারপর বনেটটা খুলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল পাশে।

যে কিছুই বোঝে না গাড়ির, সে বনেট বন্ধ থাকলেও বোঝে না, খোলা থাকলেও বোঝে না। তোর সঙ্গে আসাই অন্যায় হয়েছে। এই-ই শেষ, তুই একটা ইরেস্‌পন্‌সিবল্‌ চাইল্‌ড। এ যদি রামকেষ্টপুরে না হয়ে জঙ্গলের মধ্যে হত ?

তাতা রাগে ফেটে পড়ে বলল।

দীপ লজ্জিত ছিল ; অপদস্থও। এবার রেগে গিয়ে বলল, এ তো জঙ্গলের বাপ। আজকালকার জঙ্গলের বাঘ-ভাল্লুক, শহরের মানুষের চেয়ে অনেক ভালো।

তাতা একটা সিগারেট ধরিয়ে বিদ্রূপাত্মক গলায় বলল, গাড়িটা স্টার্ট কর—চল তাহলে জঙ্গলেই ফিরে যাই আবার।

দীপ কথাটা হজম করে গুম মেরে বসে রইল।

কয়েকজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সী বাঙালী ভদ্রলোক জটলা করে দাঁড়িয়েছিলেন গাড়িটার কাছেই, একটা পানের দোকানের ছাউনীর নীচে, বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে। বৃষ্টির জোর ততক্ষণে কমেছে কিন্তু টিপটিপ করে পড়ছে। মনে হচ্ছে, এমনই চলবে সারারাত।

দীপ বনেট বন্ধ করে এসে গাড়িতে বসল। ভিজে একেবারে চুপচুপে। তাতা তো আগেই ভিজেছিল গাড়ি ঠেলতে গিয়ে। কাঁচ-মোছা ন্যাকড়া দিয়ে দুজনেই ভালো করে মাথা মুছল।

তাতা বলে গেল, ঐ দ্যাখ বাঙালীদের। বঙ্গনন্দনরা সব গ্যাঁজাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। লোকগুলোর কখনও বয়স হবে না। কলেজ জীবনে যেমন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গ্যাঁজাত, এখনও তেমনিই গেঁজিয়ে যাচ্ছে। এক ব্যাটাও কি একটু সাহায্যের কথা বলবে ? তুই গিয়ে বল, দেখবি খেঁকিয়ে উঠবে। রাস্তাও তো ক্রমশ নির্জন হয়ে আসছে রে। এত রাতে এখান থেকে যে ট্যাক্সি করে ভবানীপুর যাব, তারও তো উপায়-নেই। গাড়িটাকে ফেলে রাখাও যায় না। নতুন গাড়ি। কী করি বলতো ?

গাড়ি তো আর আমার নয়। থাকলে, গাড়ি কেন এবং কী করে চলে আর কেনই বা হঠাৎ পথে থেমে যায় তা নিশ্চয়ই জেনে নিতাম গাড়ি নিয়ে শহর ছেড়ে বেরুবার আগে। আমি বরং এগোই তাহলে। হেঁটে অথবা রিকশা করেও হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে পারলে একটা গতি আমার হবেই। তোর গাড়ি তুই থাক।

চাপা অভিমানের গলায় দীপ বলল, তুই তাহলে তাই-ই চলে যা। আমার জন্যে কেন ঝামেলাতে পড়বি ?

ঝোড়োকাকের মত পাতলা হয়ে যাওয়া ক'গাছি ভেজা-চুল নাড়িয়ে তাতা প্রচণ্ড চটে উঠে বলল, ঝামেলার বাকি কি আর রেখেছো ? তারপরই তাতা পানের দোকানের দিকে চেয়ে একটু কান-খাড়া করে শুনে বলল, লোকগুলো কী নিয়ে আলোচনা করছে রে ?

ঘোড়া।

ঘোড়া ?

হ্যাঁ। কাল শনিবার না ? রেস্‌ আছে তো।

তারপর বলল, সকলেই টেনে আছে। মুখে গন্ধ পেলাম। শালা। কী আর হবে এদের। তুই এদের বলবি সাহায্যের জন্য ? ফুঃ।

—একবার গিয়ে বলই না, তবুও....।

দীপ অনুনয় করে বলল।

কী, বলবটা কি ? বলব, আমরা বুড়ো খোকারা গাড়ি চড়ে সাতশ' মাইল ঘুরে এলাম জঙ্গলে জঙ্গলে। আর বাড়ির দোরগোড়াতে রামকেষ্টপুরে এসে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কী যে খারাপ হল, কেন খারাপ হল আমরা জানি না, বুঝি না। কচিখোকা ! দুধের শিশু। দাদারা, আমাদের বাঁচান ? এই বলে কাঁদবো ?

দীপ এ অপমানটাও বেমালুম হজম করলো।

—লোকগুলো যে ভদ্রলোক, ছিনতাই পার্টি নয় ; তাই-ই বা কে জানে ? আমার হাতের ঘড়িটা আবার রোলেক্স। মানিব্যাগেও শ'পাঁচেক টাকা আছে।

—আমারটা এইচ-এম-টি। তোর গাড়িতে বেড়াতে এসে আমার ঘড়ি গেলে তুই-ই কিনে দিবি। মানিব্যাগে সাঁইত্রিশ টাকা আছে। গেলে, সেটাও দিবি। প্লাস মানিব্যাগের দাম, তেরো টাকা। মনে থাকে যেন।

দীপ তবুও চুপ করে রইল।

পথ আস্তে আস্তে একদম ফাঁকা হয়ে আসছে। লোকগুলোর আলোচনা কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয়রা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করত অবহেলায়। স্বয়ম্বর সভা থেকে সুন্দরী তুলে আনত। আর এই বাঙালীরা ? ঘোড়ায় চড়ে সর্বনাশের পথে যাচ্ছে। রেসের ঘোড়া ! তাও নিজে চড়ে নয়।

এবার বোধহয় আড্ডা ভাঙলো। একে একে দলছুট্ হতে লাগলো লোকগুলো। ডি-ফ্রস্ট হয়ে গড়িয়ে গেল বিভিন্ন দিকে।

দীপ গলা বাড়িয়ে ওদের কিছু বলবে বলবে করল, কিন্তু লজ্জা করল ; বলতে পারল না।

এই লজ্জাই বাঙালীকে খেল। এই লজ্জা, এই অদ্ভুত মানসিকতা। দীপ ভাবল।

এমন সময় ওঁদেরই মধ্যে একজন গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে থেমে গিয়ে বললেন, কি হল দাদা ? অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি দাঁড়িয়ে আছেন ঠায় এখানে। এ পাড়া কিন্তু ভাল নয়। রাতও হল। এবার এগোন।

তারপর বললেন, হলটা কী ? গাড়ি খারাপ হল না কি ?

হ্যাঁ। দীপ বলল।

হ্যাঁ-টা এমনভাবেই বলল যে, তাতার মনে হল, বলল ; ভ্যাঁ।

কী খারাপ হয়েছে ? তেল আসছে না ?

তাতা তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। জামা-কাপড় এমনিতেই ভিজেছে। তাই বাঁ-হাতটা জানালা দিয়ে বাইরে রেখেই বসেছিল। পিট্‌পিট্ করে বৃষ্টি পড়ছিল হাতে। পড়ুক। এখন শরীর-মনে সাড় নেই কোনো। ক্লান্ত বিরক্ত।

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, গাড়ির কমপ্লেইনটা কি দাদা, তা তো বলবেন ?

তাতা মুখটাকে এক হ্যাঁচকাতে আরো বাঁদিকে ঘোরালো। ঘাড়ে লাগলো।

দীপ হঠাৎ ফোঁড়া-ফাটার মত বলল : জানি না। গাড়ির কিছুই বুঝি না দাদা !

অ্যাইরে ! কি ঝামেলায় ফেললেন বলুন তো ! আমার তো গাড়ি নেই, আমি যে

সাইকেলের সওয়ারী। সাইকেল হলে, এক্ষুনি ঠিক করতে পারতুম। বলেই, হাঁক ছাড়লেন বন্ধুদের, অ্যাই, রমেশ, চাঁদু, মান্‌কে, চিনু যাসনি তোরা। এঁরা বিপদে পড়েছেন। ইদিকে আয়।

যাঁরা এলেন তাঁদের মনে হল, একজন গাড়ি সম্বন্ধে বোঝেন-টোঝেন।

যে-ভদ্রলোক প্রথমে এসেছিলেন, তিনি চিনিয়ে দিয়ে বললেন, অ্যাই যে, আমার বন্ধু মান্‌কে। মান্‌কে দাস। যৌবনে মহা-কাপ্তান ছেল। লাল-রঙা স্পোর্টস-মডেল বেন্‌ট্‌লী চেপে ঘোড়ার মাঠে যেত আমাদের নিয়ে। স্কচ্ ছাড়া খেতো না। বেনারসের সুরাতিয়া বাঈজী ছাড়া কারো গলার গজল-ঠুংরী ভালো লাগত না তখন। এখন পা-গাড়ির ওনার। তবে, এখনও কোনো গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ শুনেই আমার দোস্ত্ বলে দেবে কি ব্যামো গাড়ির।

—কিন্তু কোনো শব্দই করছে না যে এঞ্জিন।

দীপ হতাশার গলায় বলল।

সে কি মশাই। ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। আঁতুড়েই নুন গিলিয়েছেন?

মানিকবাবু, মানে মান্‌কে, দেখে-টেখে বললেন, হয় ব্যাটারী জ্বলে গেছে, নয় ডায়নামো চার্জ দিচ্ছে না। ব্যাটারীতে জল ছিলো তো? ফ্যানবেল্‌ট? ফ্যান্‌বেলট ঠিক আছে?

দীপ যেন ল্যাটিন্ কি হিব্রু শুনছে, এমনই মুখ করে তাকিয়ে রইল মানিকবাবুর মুখে নির্বাক হয়ে।

তাতা হঠাৎ বলল, আরে, এতক্ষণ আপনারা পানের দোকানের ছাউনির নীচে ছিলেন, এখন একেবারেই ভিজে গেলেন যে।

চাঁদু বলে যে ভদ্রলোক, তিনি বললেন, বাঙালী বিপদে পড়েছে একটু না হয় ভিজলুমই! রোজ তো আর বিপদে পড়বেন না আপনারা। তাছাড়া, এতো দেশেরই বৃষ্টি। এতে অসুখ ধরবে না।

তারপর ওঁরা সকলে মিলে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক উত্তেজিত আলোচনা করার পর মানিকবাবু বললেন, পটলের গ্যারেজেই নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া উপায় নেই কোনো।

পট্‌লা কি আর মানুষ আছে? বাঙলা টেনে খিচুড়ি সেঁটে লম্বা দিয়েছে এতক্ষণে। ঠাণ্ডার দিন।

লম্বা দিলে আমরা টেনে ওকে বেঁকিয়ে দেবো। রোজ তো আর করি না। দাদারা বিপদে পড়েছেন।

বলেই বললেন, থাকেন কোথায় দাদারা?

দীপ বলল, আমি ভবানীপুর। আর আমার বন্ধু টালীগঞ্জ।

হুঁ। বাবাঃ। এ পৃথিবীর একেবারে অন্যপ্রান্তে।

তাতা ও দীপ এতক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছিলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, ঠেলবার লোকও তো দেখছি না একজনও। কোনো কুলী, কি ঠেলাওয়ালা....

কেন? মানিকবাবু বললেন। আমরা কি লোক নই?

সে কি? আপনারা? তাতা বলল। গাড়ি ঠেলবেন?

দীপ অবাক হয়ে বলল, পটলবাবুর গ্যারাজ কত দূর?

তা আধমাইলটাক্ তো হবেই কম করে। পৌনে এক মাইলও হতে পারে।

বলেন কি ? দীপ আঁতকে উঠল।

এছাড়া উপায় কি ? এখন কোনো গ্যারাজ খোলা নেই। পট্‌লা আমাদের, মানে ; বন্ধুর মত।

চাঁদুবাবু বললেন, কথায় কথা বাড়ে। খামোখা দেরি করছিস কেন ?

তারপর দীপকে প্রায় ধমক দিয়েই বললেন, দাদা, আপনি স্টিয়ারিং-এ বসুন তো।

তাতা ওদের সঙ্গে হাত লাগাল। দীপ ওদের নির্দেশানুযায়ী স্টিয়ারিং ঘোরাতে লাগল। তরতর করে নৌকোর মতো চলতে লাগল গাড়ি।

একটু পরই গাড়িটা একটা ভাঙাচোরা কাঁচা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। লোডশেডিং হয়ে গেল ঝুপ করে। ঠিক সেই সময়ই।

দীপের তলপেট ভয়ে গুড় গুড় করতে লাগল। আজকে প্রাণটাই যাবে।

তাতা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতেই, দৌড়ে পালিয়ে যেতে হলে কোন্ দিক দিয়ে যাবে, তা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। ওরও ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছিল।

ক'টা বাজল রে ?

মানিকবাবু শুধোলেন।

দীপ বলল, পৌনে বারো।

রোলেক্স্—অটোম্যাটিক্-ডেডেট।

আমি দেখে নিয়েছি।

মৃন্ময়বাবু বললেন।

দীপের জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। কী ঘড়ি ? সেটা পর্যন্ত দেখে নিয়েছে। এরা নিশ্চয়ই ডাকাত-ফাকাত্।

কখন যে পটল মিস্ত্রীর গ্যারেজে পৌঁছল গাড়ি, অন্ধকারে পচা নর্দমার পাশ দিয়ে, দীপ বুঝতেই পারল না। ঘোরের মধ্যে ছিল যেন। মাটির-মেঝে, বাঁশের-চাঁচের ; মাত্র দুটি-গাড়ি-ধরে এমন সাইজের একটি টিনের শেড। অতি ছোট্ট কারখানা।

পটল মিস্ত্রী সত্যি সত্যিই লম্বা দিয়েছিল। একটা কাঠের বেঞ্চে আণ্ডারওয়্যার পরে শুয়ে, খালি গায়ে নাক ডাকছিল।

কথা মতই তাকে টেনে বেঁকা করলেন মানিকবাবু, চাঁদুবাবু আর মৃন্ময়বাবু মিলে।

মানিকবাবু ঠিকই ধরেছিলেন। কাট-আউটের গোলমাল ও আর্মেচারেরও সামান্য গোলমাল ছিল। সারাতে লাগল প্রায় একঘন্টা। যতক্ষণ না গাড়ি ঠিক হল ওঁদের মধ্যে মৃন্ময়বাবু আর মানিকবাবু বসে রইলেন। দীপ আর তাতাকে নমস্কার করে চাঁদুবাবু একটু আগে চলে গেছিলেন।

বাঃ বাঃ ! এঞ্জিন তো চমৎকার বলছে। হেড লাইট, হর্ন ; সব ঠিক।

দীপ উজ্জ্বল মুখে বলল, কত দেবো ?

পটল বলল, কাটুন তো আপনারা। এই মান্‌কেদাটার যত্ত থার্ড কেলাশ কাণ্ড। কাটুন। এবার একটু ঘুমুই। ঘুমুতে দিন। পয়সা নেবো না।

তা কি হয় ?

দীপ বলল।

মৃন্ময়বাবু বললেন, জোর করেই যদি দ্যান তো দিয়ে দিন পাঁচটা টাকা।

পাঁচ টাকা কি ? উনি কতবড় উপকার করলেন আমাদের, কতক্ষণ ধরে পরিশ্রম করলেন এত রাতে।

দীপ কুড়িটা টাকা বের করল।

পটল মিস্ত্রী মানিকবাবুকে রুক্ষস্বরে বলল, অ্যাই মান্‌কেদা, ভদ্রলোককে বলে দাও, আমি ভিখিরী নই যে, বকশিশ নেবো। নেহাৎ তোমার খাতিরেই মাঝ-রাত্তিরে করলুম। আমি শালা বাঙালীর বাচ্চা, পয়সাই আমার কাছে সব নয়। পয়সা চাইলে অনেক মালই এতদিনে জমাতে পারতুম।

মানিকবাবু ধমকে বললেন, মেলা ভ্যাচোর ভ্যাচোর করিসনি। নে, এই দশটা টাকা রাখ্। আমি দিচ্ছি। শালা, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী খুলে বসেছে এখানে। গাড়ল। বলে, বাকি দশ টাকা দীপকে ফেরত দিলেন। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে, এঞ্জিন স্টার্টে রেখেই দরজা খুলে দীপ গাড়ি থেকে নামল। তাতাও। বলল, আপনারাও উঠুন এগিয়ে দিই।

মৃন্ময়বাবু হাসলেন। বললেন, সে তো এগোনো হবে না দাদা, পেছোনো হবে। আমরা দুজনেই এদিকেই থাকি। বলেই, লোডশেডিং-হওয়া রাতের হাওড়ার কাঁচা নর্দমা ঘেরা ঐ অন্ধকার গলির গভীরতর অন্ধকারে আঙুল দেখালেন।

দীপ বলল, আপনাদের জন্যে আমি, মানে আমরা কি করতে পারি.... ? যদি বলেন, মানে....বলেই, ও কাউকেই জীবনে ঠকায়নি, ঠকাতে চায় না এমন ভাবমাখা গর্বগর্ব মুখ করে হিপ্ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল।

মানিব্যাগ বের করার পরও ওঁদের চুপ করে থাকতে দেখে, ঘাবড়ে গিয়ে ; তাড়াতাড়ি বলল, কালকে আবার আপনাদের রেস.....আপনারা বই দেখছিলেন.... রেস মানেই তো খরচা।

মানিকবাবু, বুক-ছেঁড়া একটা অতি সস্তা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি আর মোটা ধুতি পরে ছিলেন।

হেসে বললেন, বাঙালী হয়ে অন্য বাঙালীর বিপদে এতটুকুই না করলে, কী করলাম।

মৃন্ময়বাবু বললেন, আমার একটা ছোট্ট ঘড়ি-সারানোর দোকান আছে। রাধাবাজারে। দোকান মানে, একটা ঘড়ির দোকানের বারান্দাতে বসি। একদিন আসবেন। চা খেয়ে যাবেন দাদা এক কাপ। আপনার ঘড়িটা কিন্তু রাজা-ঘড়ি।

দীপ বোকা বোকা হাসল। কি বলবে, তা একেবারেই ভেবে পেল না। মানিব্যাগটা পকেটে রেখে বলল, আপনারা কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আমি কিন্তু আপনাদের অপমান করতে চাইনি।

মানিকবাবু হেসে বললেন, অপমান কে কাকে করে মশাই। আমরা গায়ে মাখলে তো ওসব কথা। আসল ব্যাপার কি জানেন ? টাকাকে যদি এতই দামী ভাবতুম, তবে অমন করে টাকা ওড়াতে পারতুম না। বাঙালীর কাছে টাকার চেয়েও বড় যে অনেক কিছুই ছেল। এবং আছে। টাকাওয়ালা মাড়োয়ারী-গুজরাতী-পাঞ্জাবীরা বাঙালীকে শুধু টাকা নেই, আর টাকার লোভ নেই, বলেই হেয় করে এল চিরদিন। আর বাঙালীও কান নিয়ে গেছে শুনে

ওদের কথা মত দৌড়ুতে শুরু করল নিজের কানে হাত না দিয়েই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু আপনি তো একজন বাঙালী। বাঙালী হয়েও, ব্যাঙালীকে ভুল বোঝা কি ঠিক ?

তাতা কথা ঘুরিয়ে বলল, রাত তো প্রায় দেড়টা। আপনাদের খাওয়া-দাওয়া...বাড়িতে চিন্তা....

মানিকবাবু জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, আমার তো বউ-ই নেই। যখন মাল ছেল, না-বিয়ে-করা অনেকেই ছেল। তবে, মৃন্ময়ের আছে। বিয়ে-করা বউ। পাড়ায় যখন যারই বিপদ হয়, মৃন্ময়ই সবচেয়ে আগে দৌড়ে যায়। ওর বউ নিশ্চিত ভাত নিয়ে জেগে বসে থাকবে ওর জন্যে। আপনাদের কোনোই চিন্তা নেই। মৃন্ময়কে সে ভাল করেই চেনে।

দীপ বলল, ছিঃ ছিঃ, এত রাতে। আমাদের জন্যে আপনাদের সকলের.... মানিকবাবু ধমক লাগালেন।

বললেন, যান্, পালান তো এবার। আপনাদের বউরা কি ওয়্যারলেসে খবর পেয়েছেন যে, আপনারা কেয়ার-অফ মৃন্ময় বাঁড়ুয্যে আছেন ? চিন্তা বুঝি তাঁদের নেই ?

মৃন্ময়বাবু বিনীত মুখে বললেন, আপনাদের তাড়া না-থাকলে গরীবের বাড়িতেই একটু খিচুড়ি খেয়ে যেতে পারতেন। আমার বউ খুব তাড়াতাড়ি রেঁধে দিত। দেরী হত না কিন্তু।

দীপ বলল, না, না। আমাদের রাত ন'টার মধ্যে পৌঁছনোর কথা ছিল।

তাহলে আর একটাও কথা নয়। এক্ষুণি রওয়ানা হোন্ ভালোয় ভালোয়।

তাতা নমস্কার করে বলল, যাচ্ছি, দাদা।

যাওয়া নেই ; আসুন।

বলে, ওঁরা দুজনেই হাত তুলে নমস্কার করলেন ওদের দুজনকে। তারপর ঝুপঝুপে অন্ধকার আর টিপ্‌টিপে বৃষ্টিতে কাঁচা গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গাড়ির হেডলাইটটা অন্ধকার গলিটাকে পুরোপুরি আলোয় ভরে দিয়েছিল। দীপ গাড়ি চালাচ্ছিল চুপ করে। তাতাও চুপ করে ছিল। কেউই কোনো কথা বলছিল না। তাতার চোখের সামনে মানিকবাবুর বুক-ছেঁড়া, মোটা, অতি সাধারণ কাপড়ের সস্তা পাঞ্জাবিটা ভেসে উঠছিল।

দীপের চোখের কোণ দুটো জ্বালা করছিল।

তাতা একটা সিগারেট নিজের মুখে দিয়ে, ধরিয়ে, দীপের মুখেও একটা গুঁজে দিল। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে, বিড়বিড় করে বলল ; বুঝলি, এই আমরা ; আমরা শালা একটা আশ্চর্য....

তাতার মুখ-নিঃসৃত বাক্যের শেষাংশটি ভেঙে গেল ওর জিভেরই মধ্যে।

দেশলাই-এর কাঠিটা জ্বলে উঠেই দপ্ করে নিবে গেল।



ব্যাঙডাকির মেয়ে

কি হলো অরোরা? আমার রেসিডেন্সের ফোনের লাইন পাওয়া গেলো না এখনও? একটু উষ্মার সঙ্গেই বললো শ্রাবণ।

অরোরা ঘাবড়ে গিয়ে টেলিফোন অপারেটর মিস মালপানিকে রাগের গলায় বললো, সঙ্গীতা, রায় সাহাবকো রেসিডেন্সকা লাইনে কি ক্যা হুয়া?

আই অ্যাম ট্রাইং স্যার।

হোয়াট ট্রাইং? গেট ইট বাই ওল মীনস্ গেট ইট অন ডিম্যান্ড অর লাইটনিং।

তুমহারা দেল্লী, কলকাত্তাকি বরাবর হো গায়ী। টেলিফোনকি বারেমে।

শ্রাবণ বললো।

নেহী সাব। মিল্ তো যাতা লাইন। ইয়ে সঙ্গীতাকি বদনসীবী।

এবারে ফোনটা বাজলো।

অরোরা রিসিভার তুলেই বললো, লিজিয়ে সাব। মিলা।

হ্যালো। কে?

আমি। ভ্যাত

বাড়িতে আর কেউ নেই?

বাড়িতে আর কেউই নেই!

শ্যাম কোথায়?

শ্যাম কাল চইল্যা গেছেগিয়া। বৌদি চইল্যা যাইতে কইছিলো।

কেন?

আমার সাথে খুবই ঝগড়া করতাছিলো। জলের বোতল নিয়া মারতে আইছিলো আমারে। ডাকাইত একডা! বুড়া, তায় আবার কলপ কইর‍্যা হিরো বনবার চায়!

থাক ও সব কথা। বৌদি কোথায়?

বৌদি বাইরাইছে। কইতাছিলো বুনের বাড়ি যাইবো।

বুনটা কে?

আঃ। বুইন।

কী যে বলিস তুই!

আরে! চাঁপাদিদি। বুন্‌না?

ও চাঁপা। বোন বলবিতো। কী বুন-বুইন করছিস! বৌদি এলে বলিস যে, ফোন করেছিলাম।

তুমি আসবা কবে দিল্লী থিক্যা?

শনিবার। বলে দিস। ছোট দাদাবাবু আর বৌদি কোথায়?

ও মা। অফিসে আর স্কুলে। জানো না য্যান্ তুমি?

জানি।

আর কি কইবা, কও।

তোরা সকলে ভালো আছিস তো?

হেঁ।

বৌদিকে বলিস। ওদেরও।

শনিবার কখন আসবা?

দুপুরে।

কী মাছ খাবা কও। বৌদির কম্যু। ভালো কইরা রাঁইধ্যা রাখুম্।

যা খুশি।

কও না। না জাইন্যা নিলে বৌদি আবার রাগ করবো। বাড়িতে তো খাওনা কত্তদিন।

ঠিক আছে। ছাড়ছি। বলে দিস। ফোন করেছিলাম।

বলেই, শ্রাবণ ফোনটা ছেড়ে দিলো।

ইজ ইট ওভার স্যার?

মিস মালপানি শুধোলেন।

ইয়েস। থ্যাঙ্ক উ্য ভেরী মাচ্।

ফোন ছেড়ে দিয়েই ওর চিন্তা হচ্ছিলো। ভাতি, ওদের বাড়ির রান্নার মেয়েটি ন'তলার মালহোত্রার ফ্ল্যাটের চাকর- পাঁচুর সঙ্গে প্রেম করছে। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে। সুযোগ পেলেই সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে চলে যায়। কখন যে কী ঘটে যাবে!

যূথী বলেছিলো, আজকাল অল্পবয়সী কাজের মেয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে রাখার অনেকই নাকি বিপদ। তাছাড়া, একদল নাকি বাবুদের ব্ল্যাকমেইল্ করতেই আসে। নিজের প্রেমিকের বা স্বামীর সঙ্গে শুয়ে, প্রেগন্যান্ট হয়ে, বাবুদের নামে দোষ চাপিয়ে টাকা আদায় করে; স্ক্যান্ডাল রটানোর ভয় দেখিয়ে।

বন্ধ জানলার কাঁচ দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলো শ্রাবণ। আঁধি বইছে দুপুরের দিল্লীর বুকে। ঘোড়াদৌড়ের দলবদ্ধ মেটে-লাল রঙা ঘোড়াদের মতো হুহু করে দৌড়ে যাচ্ছে মেটে-রঙা ধুলো তাড়িয়ে নিয়ে হাওয়াটা। তারপর আকাশ, গাছপালা সব লাল ধুলোর মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে।

ভাতি বাড়িতে একলা আছে এ কথাটা ভেবেই আতঙ্ক উপস্থিত হলো শ্রাবণের। শ্যামটা অনেকই পুরোনো লোক ছিলো। কিন্তু যতই পুরোনো হচ্ছে ততই ছিঁচকে চোর আর লোভী হচ্ছে। তাছাড়া প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচিও করে। চরম উত্ত্যক্ত হয়েই হয়তো ছাড়িয়ে দিয়েছে যূথী।

কিন্তু....

২

দিল্লী থেকে কোলকাতায় আসার সকালের ফ্লাইটটা দশটা দশ-এ। কিন্তু ছাড়লো এক ঘন্টা দেরীতে। দমদমে নামলো সাড়ে বারোটা নাগাদ।

লিফটে উঠে ফ্ল্যাটের দরজাতে পৌঁছেই কলিংবেল টিপে টিপে হাত ব্যথা হয়ে গেলো কিন্তু কেউই খুললো না। বিরক্ত, ক্রুদ্ধ এবং অবাক হয়ে পাশের ফ্ল্যাটে খোঁজ নেবে কিনা ভাবছে এমন সময় একমুখ হেসে দরজা খুললো ভাতি।

রাগের গলায় শ্রাবণ বললো, ছিলি কোথায় ?

আর কন্ ক্যান দাদা ? একটা পাগল কোকিল কাল রাত থিক্যা এমনই ডাকতাছে যে কী কমু।

কোকিল ?

আকাশ থেকে পড়ে বললো শ্রাবণ। এগারোতলার ফ্ল্যাটে কোকিল।

হ্যাঁ। কোকিলের ডাক, গাছে গাছে নতুন চিকন পাতা। রোদ পইড়্যা কী দারুণ চমকাইতেছে তারা। বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলাম আর ঐ বাঁ দিকের ভাঙা বাড়িটায় একটা কাঞ্চন গাছ আছে, দ্যাখছো দাদাবাবু ? কী ফুলই না ফুটছে। আইস্যো আইস্যো, দেইখ্যা যাও একবার।

হাতের ওভারনাইটারটা নামিয়ে রেখে শ্রাবণ ওর কথাতে ওর সঙ্গে হেঁটে গিয়ে বারান্দাতে দাঁড়ালো। ওরই ঘরের বারান্দাতে। কলকাতায় এগারোতলা ফ্ল্যাটবাড়িতে থেকে, সারাদিন কী কলকাতা, কী দিল্লী, কী বম্বে সবসময়ই এয়ারকন্ডিশনড্ অফিসে কাজ করে, কোকিল, গাছেদের নতুন কচি-কলাপাতা রঙা পাতা, আর কাঞ্চন ফুলের জগৎ যে এখনও আছে তা সে ভুলেই বসেছিলো। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ভাতিকে বকতেই ভুলে গেলো। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দুপুর একটার সময় আবহাওয়া বদলে-যাওয়া পৃথিবীর এক কোণে এগারোতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে ভাতির চোখ দিয়ে সে কলকাতার এই অঞ্চলকে সে একেবারে নতুন চোখে দেখলো।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সত্যিই তো ভেতরের কোনো শব্দই কানে আসে না! মনের বারান্দাতে দাঁড়ানোরই মতো। কলিংবেল-এর আওয়াজ না শোনাতে ভাতির কোনো দোষ ছিলো না সে কথাও বুঝলো।

ঐ দ্যাখো। দ্যাখছো ? কী ফুলই না আইছে কাঞ্চন গাছটায়।

হুঁ।

বললো শ্রাবণ।

তারপরই ভাবলো, ফুলের গাছ নিয়ে ভাতির সঙ্গে কাব্য করেছে জানলে যূথী ভীষণ রেগে যাবে। পুরুষ হয়ে জন্মেছে। ষোলো বছরের বেশি বয়সী নারীমাত্রকেই লোডেড রিভলভারের মতো হ্যান্ডল্ করতে হয় যে, তা ও শিখেছে। বড় বিপদ।

চান করবা না ?

করব। বৌদি কোথায় ?

নি মার্কেটে।

নিউ মার্কেট। বুঝলো শ্রাবণ।

কখন আসবে ?

আইস্যা যাইবোনে। খাবার কি গরম করুম ?

না। বৌদি আসুক। আমি চান করতে যাচ্ছি বৌদি বেল দিলে খুলিস যেন। আমি তো দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম।

খুলুম। খুলুম। বসন্তকাল আইলো তো ! সেই লগ্যে তো ! মনটা হুড়দুম্-দুরগুম্ করে।

চান করতে করতে শ্রাবণ ভাবছিলো ভাতি যে চোখ দিয়ে এই পৃথিবীকে দেখে বা শোনে সেই চোখ দিয়ে ও কেন দেখতে পারে না ! শহরে শহরে ঘুরে, জীবিকার ঘানিতে নিরুপায়ভাবে জুড়ে গিয়ে ওর মনের মধ্যের অনেক ভালো জিনিসই মরে গেছে। নষ্ট হয়েছে কিছু অঙ্কুর ; কিছু বীজ। যেসব বীজ আর কোনোদিনও অঙ্কুরিত হবে না।

ভাতিদের বাড়ি কুচবিহারে। শহরে নয়। গ্রামে। ওর নাকি মা বাবা কেউই নেই। দাদারা আছে। কিন্তু বৌদিরা একদিন খারাপ ব্যবহার করাতে ও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে। শ্রাবণের বেকার খুড়তুতো ভাই কমলের শ্বশুরবাড়ি কুচবিহারে। কাজের লোকজনের বড় অসুবিধা একথা যূথীর কাছে শুনেছিল কমল। শ্বশুর বাড়ির থেকে আসবার সময় সেজে স্টেশন থেকে নেমে ভাতিকে এক রবিবারের দুপুরে শ্রাবণদের বাড়িতে তুলে দিয়ে চলে যায়। তারপরই কমল চাকরি পেয়ে চলে যায় পারাদ্বীপে।

শ্রাবণ খুব রাগ করেছিলো, কমলের কাছ থেকে যূথী ভাতির দেশের বাড়ির ঠিকানাটাও রাখেনি বলে। কমলকে চিঠি লেখা হয়েছে পারাদ্বীপে। কিন্তু উত্তর আসেনি। কমলের বউ, ধানি বলেছে, তেমন কিছু হলে ওকে জানালেই হবে। কুচবিহারে ভাতিকে পৌঁছে দেবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু শ্রাবণ চিন্তায় মরে যায়। যদি কিছু ঘটে যায়।

যূথীর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে, টিভি দেখতে না দিলে, ভাতি এমন জংলী পশুর মতো রেগে ওঠে যে, ভয় হয় কোনোদিন না দশতলার বারান্দা থেকে লাফিয়েই পড়ে। পাঁচুর সঙ্গে প্রেমটাও ওর পাশবিক্। তোর্ষা নদীর গন্ধ এখনও ভাতির গায়ে লেগে আছে। তোর্ষারই মতো ওর চালচলন। ব্যাঙডাকি জঙ্গলের কটুগন্ধী ফুলেরা ওর মস্তিষ্ক প্রভাবিত করে রেখেছে। পুরোপুরিই জংলী মেয়ে এই ভাতি। এই মালটি-স্টোরিড বাড়ির ছোট্ট ফ্ল্যাটের সীমার মধ্যে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। বুঝতে পারে শ্রাবণ। গ্রাম বাংলার ছেলে ও। ওরও প্রথম প্রথম দম বন্ধ হয়ে আসতো। শ্রাবণ কি আছে ছোট্ট ফ্ল্যাটে। কিন্তু যূথী কলকাতার মেয়ে। এসব কথা ও বোঝে না। যারা গ্রাম দেখেনি, গ্রামে থাকেনি তাদের এসব কথা বলাও মিছিমিছি। দিগন্তমেলা আকাশ, তোর্ষার বান, ব্যাঙডাকি জঙ্গলের আলোছায়ার, গাছপালার গভীর রহস্য ভাতির চোখের মণিতে যেন মালটি-কালারড বৈদ্যুতিক বাল্ব্-এর মতো খেলা করে। বুঝতে পারে শ্রাবণ। কিন্তু ও একা। ঐ প্রবল-যৌবনা বাড়ন্ত গড়নের জংলী মেয়েকে তার চাপল্য ও দুঃখকে বোঝে এমন আর কেউ এই ফ্ল্যাটে ছিলো না।

তাই, ভারী ভয় করে ভাতির জন্যে।

যূথী অনেকদিন বুঝিয়েছে ওকে। ফ্ল্যাটবাড়িতে পঞ্চাশটি ফ্ল্যাট। কতরকম লোক বাস করে এই ফ্ল্যাটে। তোর মতো অল্পবয়সী মেয়েদের পক্ষে নষ্ট হয়ে যাওয়াটা কোনো ব্যাপারই নয়। তারপর কোনো নরকে নিয়ে গিয়ে তুলবে তোকে। তখন আমাদের দোষ দিস না।

ভাতি রাগে বেড়ালনীর মতো ফুলে ওঠে এসব কথা শুনলে। বলে ঈসস্। অত্ত সোজা।

চুল ছিঁইড়া দিমু না। নাক কামড়াইয়া দিমু।

যূথী হতাশ হয়ে দু হাতের পাতা উপরে তুলে, মেলে, কিছু বলতে চায় ওকে, এই মহানগরীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে বোঝাতে চায় ; কিন্তু নিরুপায়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

চান সেরে উঠে শ্রাবণ বললো, খাবার লাগা ভাতি। দিতে দিতে বৌদি এসে যাবে।

ওমা ! দাঁড়াও। আমি চান কইর‍্যা লই। এক মিনিট।

এই চান করা নিয়েও অনেকই সমস্যা।

সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টারের যে বাথরুম, তার দরজাতে অনেক ফুটো। নীচটাও ফাঁকা। বিহারী, উত্তরপ্রদেশীয় হিন্দু, কাজের লোকেরা ও দক্ষিণ বাংলার কিছু নানা-পেশার মুসলমানের বাস এই সব সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে। অনেকের আত্মীয়-স্বজনও এসে থাকে। প্রতি তলার মেজানিন্ ফ্লোরে ওদের কোয়ার্টার। প্রথম দিন ভাতি চান করতে গিয়ে কেঁদে ফিরে এসে বলেছিলো, মেলা চোখ। দরজার ফুটার মধ্যে দিয়ে চক্ষুগুলান আমারে গিইল্যা ফ্যালাইতে চায়। বাঁদর কতগুলান্।

তারপর থেকে যূথী বলেছিলো, রান্নাঘরের লাগোয়া কাভারড্ বারান্দাতে চান করতে।

প্রথম দিনই ভাতি রান্নাঘরের লাগোয়া বারান্দা ভেতর থেকে বন্ধ করে চান করে এসে বললো, সামনের আর পাশের বাড়ির দারোয়ানগুলা আমাকে হাতছানি দিয়া ডাক্‌তাছিলো বৌদি। আমিও লাথি দেখাইয়া দিছি ?

করিস কি ভাতি ?

যূথী বলেছিলো ! আতঙ্কিত গলায়।

তা, এতোদূর থিক্যা আর কি করুম ? কাছে পাইলে তো কান কামড়াইয়া ছিঁড়্যা থুইতামানে।

যূথী বারান্দাটা এখন কাঁচ দিয়ে পুরো ঢেকে দিয়েছে ওর চানের জন্যে। যাতে আব্রু রক্ষা হয়।

কিছুক্ষণ পর ভাতি চান করে এলো। শ্রাবণ "দেশ"-এর পাতা উল্টোচ্ছিলো বসবার ঘরে বসে বসে।

একটা কচি-কলাপাতারঙা সস্তা, পুরোনো, তাঁতের শাড়ি পরেছে ভাতি। তেল দিয়েছে মাথায়। যত্ন করে চুল আঁচড়েছে। মুগ্ধ চোখে তাকালো শ্রাবণ। এ মুগ্ধতা প্রেমের মুগ্ধতা নয়, কামের মুগ্ধতাও নয়। মুগ্ধতার অনেক রকম হয়।

ভাতি বললো, শ্রাবণের চোখ পড়ে বললো, কি ? বল্‌বা কিছু বুঝি আমারে ?

নাঃ।

তবে ? তাকাইয়া আছো ক্যান্ ?

শ্রাবণ হেসে বললো, এমনিই !

এই হীন, কুচক্রী, নীচ, কংক্রিটের জঙ্গলের মধ্যে ভাতি, শ্রাবণদের জন্যে এক দারুণ পৃথিবী নিয়ে এসে এই এগারোতলার ছোট্ট ফ্ল্যাটে ছেড়ে দিয়েছে। ফ্ল্যাটের মধ্যে দিয়ে তোর্ষা বয়ে যাচ্ছে। দূরের রায়ডাক আর তিস্তার গন্ধ আসছে নাকে। কাঞ্চন ফুলের নরম বেগুনি আলো আর কোকিলের ডাক, ব্যাঙডাকি জঙ্গলের অপার সব রঙ-বেরঙা-রহস্য বন্দী হয়েছে এখানে ভাতিরই কল্যাণে। শ্রাবণ একথা জেনে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করে। তাই....

দিমু খাবার ?

দাঁড়া।

তাইলে আমি বারান্দায় যাই ? কোকিলের ডাক শুনি গিয়া ?

যা।

দরজাটা খুইল্যা দিও বৌদি আইলে, নইলে আমি বকা খামু।

দেবো।

ভাতি বসবার ঘরে কচি-কলাপাতা রঙ ছড়িয়ে ওর চুলের তেলের গন্ধ উড়িয়ে বারান্দায় চলে গেলো।

যূথী এবং শ্রাবণের ছোট ভাই ভাদ্রর স্ত্রী জিনি, মাথায় কখনোই কোনো তেল দেয় না। শ্যাম্পু করার দিন ছাড়া। সিঁদুর পরে না সিঁথিতে। ভাতি এই ফ্ল্যাটের জীবনে এক অন্য জীবনকে মিশিয়ে দিয়েছে। সেই মিশ্রণ ক্রমশই ঘন হচ্ছে। শ্রাবণ বুঝতে পারে। শ্রাবণ ভাবে, কোনোদিন একটি কাঞ্চন ফুলের গাছের জন্য, কাঞ্চন ফুলের জন্যে ; ওদের এই মেকী অভ্যেসের জীবনে, ক্লান্তিকর জীবনে, ভাঙন না ধরে যায় ! আস্ত ব্যাঙডাকি জঙ্গলটাই উঠে এসে বসতে পারে ফ্ল্যাটের মধ্যে কোনোদিন। তোর্ষা নদীর জলও বয়ে যেতে পারে।

শ্রাবণ এ কথাটা মনে করেই ভীত হয়ে ওঠে।

যূথী আর জিনি ভাতিকে 'বাঙাল' বলে ক্ষ্যাপায়।

ভাতিকে ওরা আন্ডারএস্টিমেট করছে। ভাতিকে এখান থেকে তাড়াতে হবে এমন কথা যূথী আর জিনি প্রায়ই বলে।

মেয়েরা তাদের ঘরের মধ্যে তাদের মনোনীত গন্ধ ছাড়া অন্য কোনো গন্ধই পছন্দ করে না। তাদের যুক্তি মানে না শ্রাবণ। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলেও না। ভাতি সত্যিই হয়তো চলে যাবে কোনোদিন। যূথী আর জিনিই ছাড়িয়ে দেবে। তাড়িয়ে দেবে। তখন এই ফ্ল্যাটে কোকিলের ডাক, কাঞ্চন ফুলের শোভা, তোর্ষার জলের গন্ধ আর ব্যাঙডাকি জঙ্গলের মিশ্র শব্দ ; বনজ্যোৎস্নার আর সবুজ অন্ধকারের আভাস কিছুই আর থাকবে না।

শ্রাবণ জানে, ভাতিকে ওরা শিগগিরিই ছাড়িয়ে দেবে। পঞ্চুর সঙ্গে প্রেম করছে বলে নয়। সম্পূর্ণ অন্য এক মেয়েলি কারণে।

ভাতি বললো ; খাবা, আঁইস্যো।

শ্রাবণ বললো, হুঁ।



অবসর

সুরমা এই শীতেও ঘেমে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি করে জায়গা করে গরম গরম ভাত পেঁয়াজ-রসুন-কাঁচালঙ্কা—ফোড়নদেওয়া মুসুরীর ডাল আর একটু আলু ভাজা করেই খাবার দিলেন।

আজ খেতে বসে পেটের মধ্যে কেমন গুড়গুড় করছিল মৃগেনবাবুর।

যদিও এই তাড়াহুড়ো করে সকাল আটটার মধ্যে শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কাক-চান করে খেয়ে দৌড়ে স্টেশনে এসে লোকাল ধরে কোলকাতা পৌঁছানোর অভ্যাস তাঁর মজ্জায় মজ্জায় গেঁথে গেছিল। কিন্তু আজই শেষ তাড়াহুড়ো। কাল থেকে আর কোনো তাড়া থাকবে না। সাড়া থাকবে না তাঁর অকিঞ্চিৎকর জীবনে। একটা স্তব্ধ, কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন শান্তি বিরাজ করবে কাল থেকে।

সেই স্তব্ধতার ভারে চাপা পড়ে যাবেন না তো তিনি?

গরম গরম ডাল ভাত মুখে পুরতে পুরতে ভাবছিলেন মৃগেনবাবু।

খাওয়া সেরে মুখ ধুয়ে তিনদিন পরা ড্রিলের প্যান্ট ও খদ্দরের হাওয়াইন শার্টটা দেওয়ালের পেরেকে-ঝোলানো হ্যাঙ্গার থেকে নামিয়ে পরে নিলেন, লুঙি খুলে ফেলে। সরমা এক গ্লাস জল ও এক খিলি পান নিয়ে এসে দাঁড়ালেন দরজার পাশে। পানটা হাতে নিতে নিতে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন মৃগেনবাবু যে, সুরমার মুখে কী এক দারুণ ভয়ের ছায়া পড়েছে।

ফিফটি পারসেনট পেনশান পাবেন যদিও কিন্তু আয় রাতারাতি অর্ধেক হয়ে গেলে আতঙ্কিত হবারই কথা। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ধার কেটে হাতে যেটুকু পাবেন, তার সবটাই খরচ হয়ে যাবে মিনুর বিয়েতে।

তারপর..... ?

তারপর আপাতত ভাবার সময় নেই। আটটা পাঁচের গাড়ি ধরতে না-পারলে লেট হয়ে যাবেন। তাঁর নিজের আয়ত্তাধীন কারণে যখন কখনই লেট হননি অফিসে, আজ শেষ দিনেও লেট হতে চান না তিনি।

মানুষের ভূমিকা সংসারে যতই সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন সেই জীবনেও গর্ব করার মতো কিছু কিছু জিনিস প্রত্যেক মানুষেরই থাকে। মগেনবাবুর প্রায় কখনোই লেট না-হওয়ার গর্বটা সেই জাতীয় গর্ব।

[illegible] কেউই তখনও আসেনি তাঁদের সেকশানে। ড্রয়ারটা খুললেন। একটা বল-[illegible] পেন। কাচের ভিতর থেকে উঁকিমারা লাল নীল হলদে রঙের আভাসিত গোল গোল পেপারওয়েট দুটো। একটা নীল ফাউনটেন পেন। বিয়ের সময় পাওয়া শেফার্সটা। একটা ছুঁচ। কাগজ ফুটো করার। মালটি-ভিটামিন ট্যাবলেট-এর খালি শিশি একটা। চারটে পোস্ট কার্ড। অডিট অবজেক্শানের কিছু কাগজ। অ্যাপীল এফেক্টের তিনটে অর্ডার টাইপ করা।

এসবের মধ্যে তাঁর নিজের সম্পত্তি বলতে ঐ বল-পেন, খালি ওষুধের শিশি আর শেফার্স কলমটা। অন্য সবকিছুই অফিসের। চাকরি জীবনে যেখানে-যেখানে বদলি হয়েছেন পেপারওযেট দুটো সবসময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। নীচের দিক ঘষে ঘষে ক্ষয়ে গেছে। কোনো কিছু জটিল বিষয় চিন্তা করতে হলেই টেবলের উপর একটা পেপারওযেট নিয়ে দু আঙুলে ঘোরাতেন মৃগেনবাবু। দুরূহ সব ক্যাল্কুলেশন। আজকালকার ছেলেরা কী জানে। আগে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন কত কঠিন ছিল। আজকাল ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে কাজ যত না হয় তার চেয়ে বেশী হয় রিপোর্ট-রিটার্ন-এর খেলা। খাজনার চেয়ে বাজনাই বেশী। হিল্লী-দিল্লীতে হাজার হাজার রিপোর্ট যাচ্ছে। টেলেক্স-টেলিফোনের ঠেলায় অস্থির। কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে স্টেশনারী এবং ম্যান-আওয়ারে। কিন্তু মৃগেনবাবুর মনে হয় যে আজ অবধি যে সব রিটার্ন-রিপোর্ট গেছে অফিস থেকে তার শতকরা নব্বই ভাগই ভুল। অথবা অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি। পুরো ব্যাপারটাই একটা ফার্স।

কিন্তু এসব কথা বলা তাঁর শোভা পায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের কোটি কোটি নগণ্য কর্মচারীর মধ্যে তিনি একজন মাত্র। একটা বিরাট মেশিনের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। তাঁর সাধ্য কি এই ভণ্ডামির মুখোশ খোলেন? এই গরীব-গুরবাদের দেশেও এই আশ্চর্য ও ক্ষমাহীন অপচযের অপরাধের প্রতিবাদ করেন? যেন-তেন প্রকারেণ উপরওয়ালার চোখ-রাঙানী ও ধমক, চাপ ও ঔদাসীন্যে অভ্যস্ত হতে হতে রিপোর্ট-রিটার্ন-এর গোলোক-ধাম খেলতে খেলতে কোনক্রমে সসম্মানে সুপার-অ্যানুয়েটেড হয়ে যাওয়াটাই সরকারী চাকুরের মোক্ষ।

অনেক কথা মনে আসছিল তাঁর একা অফিসে বসে। নানারকম কথা। কত বছরের স্মৃতি।

মৃগেনবাবু ভাবছিলেন যে এই পেপারওয়েট দুটোই রেখে যেতে হবে আজ। বহু দিনের সঙ্গী। রেখে যাবেন আরও অনেক কিছু। বুকের মধ্যের অনেক বোধ। সহকর্মীদের ছোট ছোট ঈর্ষা, পরশ্রী-কাতরতা; অবিবেচনা। এবং মহত্ত্ব ভালোবাসা, সহমর্মিতাও।

বুক খালি করে চলে যাবেন আজ বিকেলে। কী করে যে সকাল থেকে এত খানি সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলেন না। সকলেই নিজের নিজের কাজ এবং অকাজ নিয়ে ব্যস্ত। উনি যে আজ রিটায়ার করবেন এই মর্মান্তিক খবর নিয়ে অন্য কারোই কোনো চাঞ্চল্য নেই মনে হলো। অভিমানে লাগল বড় মৃগেনবাবুর। গলার কাছে কী যেন দলা-পাকিয়ে উঠে আসতে লাগল।

টিফিনের সময় ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ চা খেলেন মৃগেনবাবু। ক্যান্টিনে যে ছেলেটি কাজ করে সে তাঁর বিশেষ পরিচিত। সে জানে না যে মৃগেনবাবু আর কখনও আয়কর ভবনের ক্যান্টিনে চা খেতে আসবেন না। ছেলেটিকে কিছু বললেন না মৃগেনবাবু। তাঁর রিটায়ারমেন্টটা তাঁর নিজের কাছে হয়ত একটা বিরাট ব্যাপার কিন্তু এই ছেলেটির কাছে এবং অন্য সকলের কাছে নয়।

চায়ে চিনি প্রায় দেয়ইনি বলতে গেলে। দুধও কম। তবুও কিছুই বললেন না মৃগেনবাবু। আজকের দিনটিতে কারো কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিতে চান না তিনি। যে যা দেয় ভালোবেসে, যতটুকু দেয় শেষ দিনে; তাতেই খুশী তিনি।

লিফটে উঠে নিজের সেকশানে চলে এলেন তিনি চা খেয়ে। কেঁদে টেঁদে ফেলবেন না তো। দুপুর থেকেই মনে মনে নিজেকে শক্ত করতে লাগলেন।

হেমেনের সঙ্গে একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল কয়েক মাস আগে। এ নিয়ে তিনি দুঃখিত ছিলেন। অন্যায়টা হেমেনেরই, তাঁর নয়। এ-অফিসের হাকিমরা কখনই নিজের চেম্বার ছেড়ে সেকশানে আসেন না। তাই কে কাজ করে এবং কে করে না, তা তাঁদের জানার কথা নয়। ফলে যে বোকারা কাজ করে তারা কাজ করেই মরে এবং যে চালাকরা ফাঁকি মারে তারা সারাজীবন ফাঁকিই মেরে যায়। যেহেতু এটা সরকারী অফিস, যেহেতু এখানে বেশি কাজ করলেও মাইনে বাড়ে না, ফাঁকি মারলেও মাইনে কমে না, চাকরী যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না সেখানে কতিপয় বোকা লোক পুরো দপ্তরটাকে বছরের পর বছর গন্ধমাদনের মতো নিজের ঘাড়ে বয়ে বেড়ায়। ছোট বড় চাকুরে, ঐ মুষ্টিমেয় মানুষগুলি কোনোদিন হাত থামালে হুড়মুড় করে প্রশাসন ভেঙে পড়বে। সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হবে সেদিন।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন মৃগেনবাবু। কত কমিশনার দেখলেন। নারগোলওয়ালা, জনসন, অহীন্দ্র চৌধুরী.....। ভালো ভালো উপরওয়ালাও ছিল। চাকরির শেষ দিনে চাকরি সংক্রান্ত অনেক মূল ও গভীর কথা আজ মনে আসছে। আবর্তের মধ্যে থাকলে আবর্তকে দেখা যায় না। আজ এই আবর্ত থেকে বাইরে বেরোচ্ছেন বলেই তাঁর সমস্ত চাকরি-জীবনটাকে একটা সম্পূর্ণ নতুন পারসপেকটিভে দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে বলল, মৃগেনদা।

মৃগেনবাবু চেয়ে দেখলেন। হেমেন।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বোসো বোসো।

হেমেন ঝগড়ার কথা কিছুমাত্র উল্লেখ না করে বলল, আপনি চলে গেলে আপনার দাম বুঝতে পারবো আমরা।

মৃগেনবাবু বললেন, তাই?

হেমেন মুখে আর কিছু বলল না। মৃগেনবাবুর সামনে বসে রইল কিছুক্ষণ ওঁর চোখে চেয়ে।

প্রকৃত বাঙালীরা মুখে ভালো কথা বলতে পারে না। তারা চোখ দিয়ে কথা বলে। হেমেনও তাই বলল।

শীতের বেলা আজ বড় তাড়াতাড়ি পড়ে গেল। জীবনের বেলার মতন ; প্রেমের বেলার মতন।

প্যারাডাইস সিনেমার অ্যাসবেস্টসের ছাদে এবং কার্নিশে কতগুলো পায়রা উড়ে উড়ে বসছিল। আকাশটা ম্লান হয়ে গেছে। কোনো রঙ নেই। আকাশে এবং মৃগেনবাবুর বুকে একটা দমবন্ধ ভাব।

ঘড়ির দিকে তাকালেন মৃগেনবাবু। চারটে বেজে গেল।

রাজেন, অনুপ, শ্যামল, সুনীল সকলে হঠাৎ একসঙ্গে হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকল। একটা মালা, হাঁড়ি ও চাঙাড়িতে সন্দেশ, রসগোল্লা, সিঙাড়া সব নিয়ে এসেছে ওরা। ওদের দেখে ঘরের অন্যান্য সকলেই চেয়ার ছেড়ে মৃগেনবাবুর টেবলের সামনে এসে ভীড় করল।

মৃণালিনী এই ডিস্ট্রিকটে সবচেয়ে কম বয়সী মেয়ে, এল ডি সি হয়ে সবে ঢুকেছে দু মাস হলো। মৃণালিনীর উপর ভার পড়ল মৃগেনবাবুকে মালা পরানোর। দেখতে শুনতেও ফুটফুটে মৃণালিনী খুব সপ্রতিভও বটে।

মৃণালিনী এসে মালা পরালো! হাততালি পড়ল। অন্যান্যরা হাতে হাতে ক্যান্টিন থেকে চেয়ে আনা প্লেটে খাবারগুলো সাজিয়ে ফেলল। হরিপদকে ক্যান্টিনে পাঠানো হলো বড় কেটলী করে চা আনতে।

মৃগেনবাবুর সামনে চেয়ার জড়ো করে সকলে বসল।

মৃণালিনী বললো, কী মৃগেনদা, আর তো আপনাকে জ্বালাব না।

ঠিক। বললেন মৃগেনবাবু।

নলিনীবাবু এক কোণে চুপচাপ বসে ছিলেন। নলিনীবাবুর রিটায়ারমেণ্ট আর দু মাস পরেই। কোম্পানীজ ডিস্ট্রিক্ট-এর এই অফিসে মৃগেনবাবুর পরই নলিনীবাবুর বিদায়ের পালা। মধ্যবিত্তর জীবনে এই দিনটি জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের দিনের মতোই একটি বিশেষ দিন। নলিনীবাবুর বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাবা বিধবা বোন এবং বিবাহযোগ্য বোনঝি। নিজে ব্যাচেলর তিনি। সারাজীবন অন্যের জন্যে অন্যের কারণে খেটে গেলেন। রিটায়ারমেণ্টের পর কী হবে, কী করে চলবে এসব কথা মনে আনতে চান না তিনি। মনে এলেই হাত-পা ঠাণ্ডা অবশ হয়ে আসে।

অনুপ ডাকল, ও নলিনীদা। এদিকে আসুন।

হ্যাঁ। বললেন নলিনীবাবু। কিন্তু গলার স্বরটা কেমন ঘড়ঘড় করে উঠল।

অনুপ বলল, আসুন। হ্যাঁ কি? মৃগেনদা কি আর কাল আসবেন?

সুনীল মৃগেনবাবুর টেবিলটা নেবে কাল থেকে। টেবিলটা জানলার পাশে। একটু আকাশ দেখা যায়, ওয়াটারলু স্ট্রীট এবং ক্রুকেড লেন-এর কিছু পুরোনো ধূসর বাড়ি, চিলতে আকাশে কয়েকটা নূতন মালটিস্টোরিড স্কাইস্ক্র্যাপার প্যারাডাইস সিনেমার এ্যাসবেস্টসের ছাদ এসব চোখে পড়ে। তবু তো আকাশ। মুক্তির উপায় না হলেও আভাস। এইই কম কি?

সুনীল নেবে টেবিলটা। কিন্তু রাজেনেরও লোভ ছিল। বলেই ফেলল রাজেন। মৃগেনদা, বড় টেবিলটা কিন্তু সিনিয়রিটি হিসেবে আমারই প্রাপ্য ছিল। চলে যাবার দিনে আপনি একটি অন্যায় কাজ করলেন ভুল করলেন একটা।

মৃগেনবাবু স্বগতোক্তির মতো বললেন, রাজেন, কেরানীরা কী কখনও ঠিক কাজ করে?

ন্যায় কী কখনও করে তারা ? চলে যাবার দিন আর আমার মন খারাপ করে দিস না এসব কথা বলে।

হঠাৎ সুনীল দৌড়ে এসে মৃগেনবাবুর চেয়ারে বসে থাকাকালীনই ড্রয়ারের চাবির গোছাটা একটানে মৃগেনবাবুর টেবিল থেকে তুলে নিল।

নলিনীবাবু এতক্ষণ মৃগেনবাবুর এই রিটায়ারমেন্টের দিনের ফেয়ারওয়েলে একেবারেই বিযুক্ত ছিলেন, যদিও চাঁদাটা ঠিকই দিয়েছিলেন সকলের অনুরোধে। কিন্তু সুনীল ঐ রকমভাবে মৃগেনবাবুর সামনে থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ টিভির অ্যান্টেনার মতো ঝাঁকরা এবং কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, হচ্ছে কি ? অ্যাঁ ? হচ্ছেটা কি ?

সকলে নলিনীবাবুর এমন আচমকা উত্তেজনায় অবাক হয়ে ওদিকে তাকাতেই নলিনীবাবু বললেন, তোমাদের তর সইছিল না ? মৃগেনের তো আজও পাঁচটা অবধি চাকরি আছে। না কি নেই ? ওই টেবিলের মালিক তো পাঁচটা অবধি ও-ই ! তোমরা পাঁচটার পরও তো চাবি নিয়ে মারামারি করতে পারতে। সত্যি। তোমাদের.....

মৃগেনবাবুর দু চোখে মরণোন্মুখ মানুষের শংকা ফুটে উঠল। ফুটে উঠেই নিভে গেল। অন্ধকার মুখে একটা জোর করা হাসি ফুটিয়ে নলিনীবাবুকে বললেন, আহা ! ঠিক আছে নলিনী। উত্তেজিত হয়ো না ! এক ঘণ্টা আগে আর পরে। এই টেবিলের উপর আর দাবী রেখে লাভ কী ?

শ্যামল পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যে বলল, কত বছর ব্যাটিং করলেন দাদা এই ডিপার্টমেন্টে ?

মৃগেনবাবু হাসলেন। বললেন, তা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। যে মানুষটা তখন চাকরিতে ঢুকেছিল এবং আজ যে বেরিয়ে যাবে তাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

অনুপটা কেবল ছেলেমানুষই না, বুঝও একটু কম ওর। হঠাৎ বলল, মৃগেনদা, এত বছর চাকরি করে আজ আপনি চলে যাচ্ছেন আর আমার মোট চার বছর হলো ! যাওয়ার আগে আমাদের কী কোনো অ্যাডভাইস্..... ?

কী অ্যাডভাইস্ দেবো ?

মৃগেনবাবু ধরা গলায় বললেন।

বলেই, সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি কী বা ছাতার লোক। আমার আবার অ্যাডভাইস্। তবে হ্যাঁ। একটা কথা বলব—

লাই লো। আমরা বনতুলসীর ঝাড়। বাড়াবাড়ি আমাদের মানায় না, বুঝলে।

বাঃ তাহলেও আমরা সকলেই কী ছাতার লোক ? আমরাই তো সংখ্যায় বেশী ? অফিসার ক'জন ? আমাদের কী কোনো কন্ট্রিবিউশান নেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশানে ?

মৃগেনবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। প্যাকেটের শেষ। জীবনেরও শেষ সিগারেট ? সুরমাকে কথা দিয়েছেন যে রিটায়ার করার পর সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেবেন। কথা দেওয়া ব্যাপরাটা, একটা নগ্ন সত্যকে সম্ভ্রান্ত করার জন্যে। রিটায়ারমেন্টের পর সবচেয়ে সস্তা দামের সিগারেট খাওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন মৃগেনবাবু ! চুপ করে রইলেন।

অনুপ আবার বলল, কই ? চুপ করে রইলেন যে ?

মৃগেনবাবু যেন অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। দূর থেকে চোখের ক্লান্ত লেন্স দুটোকে জুম্ করে অনুপের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, কিসের কন্ট্রিবিউশান? আমাদের কোনো কন্ট্রিবিউশান নেই। আমরা নন্-এণ্টিটি।

নলিনীবাবু হঠাৎ ঘরের কোণা থেকে উঠে এসে মৃগেনবাবুর সামনে দাঁড়ালেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ঠিকই বলেছিল মৃগেন। আমরা উপর ওয়ালাদের চোখে নন্-এণ্টিটি। কিন্তু আমরাই এই নাটকে উইংসের পেছনে থাকি সবসময়। উইংস ওঠাই-নামাই, আলো ফেলি নায়কদের মুখে। আমরা প্রমাণ করি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ভূমিকা—কিন্তু আমরা ফালতু.....।

ছেলেরা সকলে চাঁদা করে একটা সোয়েটার কিনেছিল মৃগেনবাবুর জন্যে। প্যাকেটে মোড়া অবস্থায় সেটা দিল ওরা। মৃগেনবাবু অভিভূত বোধ করলেন। কিছু বলতে পারলেন না।

ফেয়ারওয়েলের শান্ত অনুষ্ঠানটা বক্তৃতা মঞ্চের মতো হয়ে যাচ্ছে দেখে যখন হেমেনবাবু ও সুনীলরা সকলেই বিব্রত বোধ করেছিলেন তখন স্নেহলতা এলেন।

ভীড় ঠেলে এসে মৃগেনবাবুর সামনে দাঁড়ালেন।

মৃগেনবাবু চোখ তুললেন। স্নেহলতা এখন পোদ্দার কোর্টের অফিসে। দেখা হয় খুব কম। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে যুবতী স্নেহলতাকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন মৃগেনবাবু। বিয়েও করতে চেয়েছিলেন। স্নেহলতা তখন একজন ইনসপেকটরকে ভালোবাসতেন। এখন তিনি অফিসার। জানতেন না মৃগেনবাবু। বোকামী করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে দুঃখ না দিয়ে বুদ্ধিমতীর মতো স্নেহলতা বলেছিলেন, যাকে মানুষ ভালোবাসে তাকে কখনও বিয়ে করতে নেই।

স্নেহলতার বাড়ি ছিল বরিশালে। হ্যান্ড ব্যাগ থেকে একট ছোট্ট প্যাকেট বের করে বলল, খান মৃগেনদা, আপনার জন্যে নয়ানজুলি বানিয়ে এনেছি।

মৃগেনবাবু হঠাৎ লক্ষ করলেন স্নেহলতারও কপালের চুল পেকে গেছে। গড়ন ঢিলে-ঢালা হয়ে গেছে। বয়স বড় নির্লজ্জ, নির্দয়, কারোই রেহাই নেই এর হাত থেকে।

স্নেহলতা বসেই রইলেন। বললেন, চলুন একসঙ্গেই বেরোব।

তারপর অনেক এলোমেলো কথা। চেঁচামেচি।

তারও পর ছেলেরা একে একে চলে গেল।

প্রায়ই কেউ না কেউ রিটায়ার করে কোনো-না-কোনো সেক্শানে। ফেয়ারওয়েল দেওয়াটা ভদ্রতা। কিন্তু তা নিয়ে বেশী সময় নষ্ট করলে চলে না। প্রত্যেককেই ট্রাম, বাস, ট্রেন ধরতে হবে। ওঁদের জীবনে আনন্দ অথবা বিষণ্ণতারও সময় নেই।

শুধু হেমেন আর নলিনীবাবু ছিলেন। আর স্নেহলতা। মৃগেনবাবু উঠলেন। হাঁটুটা কেমন যেন কেঁপে উঠল।

লিফটে নেমে আয়কর ভবনের সদর দরজায় এসে হেমেন আর নলিনীবাবু চলি, বলে দুদিকে চলে গেলেন। বললো, মাঝে মাঝে আসবেন।

বড্ড ভীড়। সিনেমার লাইনের চিৎকার। ট্রাম বাস গাড়ি আর মানুষের আওয়াজ। দূর থেকে শুনলে মনে হয় একটা গোঙানী। বড় যন্ত্রণার, বেদনার নৈর্ব্যক্তিক গোঙানী।

স্নেহলতা বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে কিছুটা মৃগেনবাবুর সঙ্গে হেঁটে এলেন। মুখে কোনো কথা

হলো না। দুজনের হৃদয়ে হয়ত পঁচিশ বছর আগের অনেক কথা ফিরে আসছিল। তখন কোলকাতার যৌবন ছিল। তাঁদের দুজনেরও।

স্নেহলতা দাঁড়ালেন। বললেন, আমি পঁচিশ নম্বর ধরব মৃগেনদা।

তারপর বললেন, মিলির বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করব, আসবেন কিন্তু।

মিলি। অবাক হলেন মৃগেনবাবু। বললেন, মিলিরও বিয়ের বয়স হয়ে গেল ? এই তো সেদিন হল ও। পি-জিতে হয়েছিল না ?

স্নেহলতা হাসলেন। বললেন, তেইশ বছর বয়স হয়েছে ওর।

মৃগেনবাবু যেন ধাক্কা খেলেন একটা। কথা ঘুরিয়ে বললেন, তোমার কর্তা কেমন আছেন ? এখন তো যেন কোথায় পোস্টেড ? স্ট্র্যান্ড রোড, মিডলটন রোড, না না তিন নম্বরে ? তাই না ?

ভালোই আছে। স্নেহলতা বললেন।

তারপর বললেন, মিলির বিয়েতে না এলে খুব রাগ করব।

বলেই, হঠাৎই বললেন : মিলি তো আপনারও মেয়ে হতে পারত।

মৃগেনবাবুর চোখের সামনে হঠাৎ একঝাঁক সাদা নরম পাখি উড়ে এসে বসল। নাকে রাশ রাশ কামিনী ফুলের গন্ধ এল ভীড় করে।

মৃগেনবাবু যখন ভালো করে চোখ তুলে তাকালেন তখন আলিয়া হোটেলের সামনে ভীড়ের মধ্যে স্নেহলতার ফিকে নীল রঙা শাড়িটা এক ঝলক দেখা গেল শুধু।

মৃগেনবাবু কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন ওখানে। তখনই শিয়ালদার দিকে গেলেন না।

বিকেলে অফিস ছুটি হয়েছে এর আগে বহু হাজার দিন কিন্তু আজকের ছুটিটা বড়ই অন্যরকম। কী রকম, তা একটু ভালো করে বুঝতে চান মৃগেনবাবু।

অনেকক্ষণ পর পা বাড়ালেন। এ-পথে ও-পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরলেন। যে-মুহূর্তে অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন সেই মুহূর্ত থেকে হাতঘড়িটা একটা অনাবশ্যক গয়না হয়ে গেল তাঁর কাছে। পানের দোকানে দাঁড়িয়ে একশ বিশ জর্দা দিয়ে একটা পান খেলেন। একটা সিগারেটও। শেষ বিলাসিতা...।

তারপর গয়না-ঘড়ি পরে অনেক ঘুরে-টুরে ভাবনার আকাশে উড়ে-উড়ে একটি ক্লান্ত হোমিং-পিজিয়নের মতো নিজের অজ্ঞাতেই আবার ফিরে এলেন অফিসের কাছেই। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন উঁচু ন-তলা আলো-নিবোনো বাড়িটার দিকে।

বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'ইনকামট্যাক্স বিল্ডিং'। "আয়কর ভবন"।

এই বাড়িটা তৈরি হওয়ার পর থেকে এখানেই পোস্টেড তিনি। তা প্রায় বছর কুড়ি হতে চলল। এত বছর শেয়ালদায় নেমে অফিসের দিকে হেঁটে আসতে আসতে প্রতিদিনই দূর থেকে এই বাড়িটাকে দেখেই ঘৃণায়, বিরক্তিতে তাঁর ভুরু কুঁচকে উঠত। গোলামির জায়গা !

কিন্তু আজ এই প্রথমবার, এখন অন্ধকার, নিষ্প্রাণ অফিস বাড়িটাকে বড় সুন্দর বলে মনে হলো তাঁর। অনেকক্ষণ অফিস বাড়িটার দিকে অপলকে চেয়ে রইলেন মৃগেনবাবু।

অদ্ভুত লোক



সোমেশের দশ বছরের ছেলে বুন্ মুখ গোমড়া করে তার বাবাকে বলল, অদ্ভুত লোক।

কেন ? অদ্ভুত কেন ?

তিনদিন হল ড্রাইভার আসছে না তুমিও কিছুই বলছ না। আমার পিয়ানোর স্কুলে যাওয়া হল না। সাঁতারে যাওয়া হল না। দাদা টলীক্লাবে রাইডিং ক্লাসে যেতে পারল না। মা পেডিকিউর আর ম্যানিকিউর করতেও যেতে পারল না গ্রান্ডে।

মালতী বলল, তাহলেই হয়েছে। তোমার বাবা ড্রাইভারের বাড়ি গিয়ে তাকে ধরে আনবে ভেবেছ। ড্রাইভারের নামটা কি তাইই জানে না। আটারলী ইউস্‌লেস্।

আজকাল একটুতেই মালতী রেগে যাচ্ছে। সোমেশ বলেছে, সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে নিয়ে যাবে শীগগিরি।

সোমেশ বলল, ড্রাইভারের নাম জানি। তবে বাড়ি চিনি না। তাছাড়া আমি তো মিনিবাসে আর হেঁটেই ঘোরাফেরা করি। গাড়ি তো তোমাদের জন্যেই। এ সব খবর আমার রাখার কথাও না।...কেন কি হয়েছে তার ?

কি আবার হবে ? এত ইরেস্‌পন্সিবল্ আর অশিক্ষিত এই লোকগুলো। সেই শুক্রবার থেকে ডুব মেরেছে তো মেরেছেই, একটা ফোন করে দে। কাউকে দিয়ে খবর পাঠা একটা। তা না। অদ্ভুত লোক।

এই ড্রাইভারকে স্যাক্ করো।

টেলিফোনের কাছ থেকে সোমেশের সতেরো বছরের ছেলে পুমা বলল। বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে।

ড্রাইভার ড্রাইভার করো না। ওর কি নাম নেই ?

সোমেশ বলল।

হু বদার্স ? নিশ্চয়ই আছে একটা। সে ওর মা-বাবারই ব্যাপার।

পুমা বলল।

ওর নাম মুনেশ্বর। ও বন্দেল গেটের কাছাকাছি কোনো জায়গাতে থাকে। অফিসে ঠিকানাটা নিশ্চয়ই রাখা আছে। কিন্তু মানুষটা তিন দিন হল আসছে না সে সম্বন্ধে একটা খবর তো তোমরাও নিতে পারতে। ওর নিজেরও যে অসুখ-বিসুখ করতে পারে সে কথা তো একবার মনে হওয়া উচিত ছিল তোমাদের। অন্য কোনো বিপদ-আপদ !

অদ্ভুত লোক! মালতী বলল, নিজেদের ঝামেলায় নিজেরাই মরি, আবার চাকর ড্রাইভারের খবর নিতে যাবে কে?

কেন? পুমাকে পাঠালেই পারতে।

পুমা...? মালতী প্রচণ্ড বিস্ময়ে চোখ বড় করে বলল। গড়িয়াহাটার বাজারেই ও যেতে চায় না, বলে, স্টিংকিং গন্ধ লাগে। ও যাবে বস্তিতে ড্রাইভারের খোঁজ করতে?

ড্রাইভার নয়, বল মুনেশ্বর।

এখন আর ওসব আমাকে শিখিও না। ছোটবেলা থেকেই বাবার মুখে "বয়", "বাবুর্চি" "ড্রাইভার" শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

মালতী বলল।

কুঅভ্যেস ত্যাগ করা উচিত। বেটার লেট দ্যান নেভার।

তুমি আমার বাবাকেও টানছ?

অন্যায়টা অন্যায়ই।

মালতী এবার সোমেশের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ইনভার্টার খারাপ। সকাল থেকেই লোডশেডিং। মেজাজ খুবই গরম।

সোমেশ ঝগড়া এড়াতে অন্য দিকে চেয়ে বলল, অদ্ভুত লোক। বুন্, ! ও কি? তুমি আবার এনিড ব্লাইটন পড়ছ?

সোমেশ ধমক দিল বুন্‌কে।

হ্যাঁ—এ। পড়ছি! সো-হোয়াট! বাংলা বই আমার ভালো লাগে না। সেদিন কি একটা দাদার না মামার, কার কীর্তি এনে দিয়েছিলে, পুরো পড়তেই পারলাম না। নট অ্যাজ গুড অ্যাজ এনিড ব্লাইটন। দাদা বলছিল যে, এনিড ব্লাইটন উনি এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার অ্যাডভাইসরী কমিটিতেও ছিলেন। তোমাদের বাংলা লেখকেরা তো ট্র্যাশ লেখে। উ্য কান্ট ফোর্স মী টু রিড হোয়াট আই ডোন্ট লাইক টু রিড। ক্যান উ্য? অদ্ভুত লোক!

সোমেশ ভাবছিল, এ সবই সোমেশের অথবা সোমেশদের প্রজন্মরই কৃতকর্ম। তারা ছোটবেলায় ভালো স্কুলে পড়বার সুযোগ পায়নি। ইংরেজি-মিডিয়াম স্কুলে তো নয়ই। ছেলেমেয়েদের ভালো শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজেদের ক্ষমতার শেষ সীমান্তে পৌঁছেও যে শিক্ষা এদের দিচ্ছে, তাতে এরা প্রায় সকলেই এক একজন বোতল-ছাড়া দৈত্য হয়ে উঠছে। ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের শিকড়হীন সংস্কৃতি দিয়ে ওদের নিজেদের সুন্দর সংস্কৃতিকে নিজেরাই মুছে দিচ্ছে নিজেদেরই হাতে। ইংরিজি জানা আর শিক্ষা যে সমার্থক নয়, ঔদ্ধত্য আর সপ্রতিভতা যে সমতুল নয় এ কথা আজ ও বোঝাবে কাকে? এ সব বলতে গেলেই লোকে বলবে, অদ্ভুত লোক!

দরজার বেল বাজল।

মালতীর সোনাকাকা এসে পড়াতে যে গৃহযুদ্ধটা একটা সাংঘাতিক মোড় নিতে পারত, সেটা থিতিয়ে গেল। থলিতে করে আম নিয়ে এসেছেন উনি পুমা আর বুন্-এর জন্য।

সাদা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, সাদা ধবধবে চুল-দাড়ি, রবীন্দ্রনাথের মত পায়ে তালতলার চটি। সদাহাস্যময়। বয়স প্রায় সত্তর। মালতীর বাবার সাহেবীয়ানার কারণে, তাঁর সঙ্গে যৌবনে সোনাকাকার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না।

দেশ যখন স্বাধীন হল, সোনাকাকা নাকি বলেছিলেন, এ কি স্বাধীনতা... ?

পূর্ব আর পশ্চিমবাংলা যেদিন এক হবে সেদিনই নাকি দাঁড়ি-গোঁফ কাটব। তার আগে নয়। দাঁড়ি-গোঁফ রেখেছিলেন পুলিশের অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। মালতীকে তিনি বাক্স-বাক্স ডিনামাইট দেখিয়েছিলেন একবার। চুরুটের মত দেখতে। মালতীর কাছেই গল্প শুনেছে সোমেশ। বিদেশী সবকিছুই বর্জন করেছিলেন। মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করেছিলেন অথচ আজকের সোনাকাকার চার ছেলেই পাঁড়-মাতাল। বিলিতি সিগারেট ছাড়া মুখেই দেয় না তাঁর কোন ছেলে।

অদ্ভুত লোক ! সোনাকাকা !

আবার ফোনটা বাজল। মালতী ধরল। বীথিন !

সোমেশ ধরতে, বীথিন বলল, চলে আয়। এখানে নরক গুলজার।

প্রতি রবিবার বীথিনের বাড়িতে আড্ডা দেয় ওরা। কেউ কেউ বীয়ার-টিয়ারও খায়। যারা খায় না, তারা চা, কফি...

মালতীকে বলল, যাব ?

এ বাড়িতে মালতীই সব। পুরোপুরি মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

কখন ফেরা হবে ?

এখনই তো সাড়ে এগারটা। ফিরতে ফিরতে প্রায় দেড়টা তো হবেই।

দেড়টা ! চাকরটার অসুখ। কুক একা। সত্যি ! তুমি অদ্ভুত লোক !

সোনাকাকা হেসে বললেন, ওরে মালু, পুরুষ মানুষকে বেশীক্ষণ নারী সঙ্গে থাকতে নেই। তাতে তার পৌরুষের হানি হয়।

অদ্ভুত লোক। মালতী বলল। কাকীমাকে বলব নাকি ফোন করে ?

২

বীথিনের বাড়িতে আজ সত্যিই নরক গুলজার। নির্মলেন্দু, শ্যামানাথ, শেষাদ্রি, যোগব্রত, ঋদ্ধি, প্রদ্যোত ও আরও অনেকেই এসেছে।

গদ্য লেখক শ্যামানাথ বলল, অ্যাই যে সোমেশদা। আজকের কাগজে এক বৃদ্ধ ভামের ইন্টারভিউ পড়েছ ?

কোন্ কাগজে ? না তো !

পড়নি ? তবে শোনো। 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গদ্য দুর্গন্ধময়। উপন্যাসে অবক্ষয় চলছে। কিস্‌সুই লেখা হস্‌সে না।' কি বুঝলে ?

সাহিত্যিক ঋদ্ধি বলল, অদ্ভুত লোক !

ননী বলল, ভেরী স্যাড। তোমাদের বইয়ের মলাটের খোমা দেখেই খারিজ করে দেন ওঁরা। যত কিছু ভালো লেখা সবই আগে হয়ে গেছে বাংলা সাহিত্যে। এবং ভবিষ্যতে হলেও হতে পারে। বর্তমানে শুধু ইংরিজিতেই ভালো লেখা হচ্ছে। যাচাই করতে হলে পড়তে হয় যে। তার চেয়ে স্মার্টলি না পড়েই বাতিল করে দেওয়া অনেকই সহজ। আমরা যদি বৃদ্ধ ভামদের একবার ইনসাইড-আউট করে সমালোচনা করতে বসি, তো কি হাল হবে... ?

অদ্ভুত লোক ! যোগব্রত বলল। রেগে লাভ কি ? মহাকাল আছে।

বলিস কী রে ! ঘোর কলি। আগামী বছরই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তেত্রিশশো ছাপা হল নতুন বইটা। শেষ হওয়ার আগেই.....

এমন সময় রমেন এলো। ক্যাজুয়ালী। ওর চরিত্রে তাড়াহুড়ো, টেনসান—এ সব কোন ব্যাপারই নেই।

নির্মলেন্দু বলল, অ্যাই তো রমেন ! কাকে ভোট দিলি ?

ভোট কাউকেই দিইনি।

কেন ? কেন... ? লেখাপড়া জানা লোক হয়ে ফ্রাঞ্চাইজ এক্সারসাইজ করলি না ? অদ্ভুত লোক।

কাকে দেব। বাদল মিত্রকেই দিতাম। রবীন্দ্রসদনে একদিন এক অনুষ্ঠানে গেছি। বুঝলি, স্বয়ং কবি বামন মজুমদারের পাশে মন্ত্রী বাদল মিত্র। একজন আলাপও করিয়ে দিলেন। কিন্তু, নো-কগনিজেন্স ! ময়দার মত ফর্সা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা কালো ভদ্রলোক দু'হাতের দশ-আঙুল বুকের কাছে জড়ো করে নমস্কার করলেন ! ঠাণ্ডা ! ওয়ার্মথলেস্। ব্যস্‌স্। অদ্ভুত লোক !

কেন ? অদ্ভুত কেন ?

যে লোক বামন মজুমদারের কবিতাই পড়েনি, তার নামই শোনেনি, তাকে ভোট দিতে যাবে অফ ওল পার্সন্স রমেন মজুমদার ? কোন দুঃখে ?

অদ্ভুত লোক।

ঋদ্ধি বলল।

যোগব্রত বলল, বাদল মিত্রের ওপর এত রাগ তো ভগা সেনকে ভোট দিয়ে প্রতিশোধ নিলি না কেন ?

রমেন বলল, দ্যাখ্ যোগা, ওসব প্রতিশোধ-টতিশোধ ইন্‌ফিরিয়ার লোকেরা নেয়। তোদের মত অবক্ষয়ী গদ্য-লেখকরা। কবিরা অত ছোট কাজ করে না। ছোট করতে পারেও না নিজেদের। ভগা সেনকে ভোট দিলাম না নিতান্ত কাব্যিক কারণেই।

অদ্ভুত লোক। কে যেন বলল।

হ্যাঁ, একেবারেই কাব্যিক কারণে। তাঁর ছবি ছাপা হয়েছিল কাগজে। দেখছিলি ? খালি গায়ের ছবি। চেহারাটি মোটেই কাব্যময় নয়।

ওঁর স্বাস্থ্যের গড়নটা আধুনিক কবিদের চেয়ে অনেকই ভাল বলছিস ?

অত জানি না। কিন্তু একেবারেই কাব্যময় নয়। তাছাড়া খালি গায়ে থাকলেই আমার নিজের সুড়সুড়ি লাগে। সুন্দর স্তনসম্পন্না মহিলা ব্যতীত খালি গায়ে কোন মানুষকেই আমি সহ্য করতে পারি না। সুড়সুড়ি দেওয়া মানুষকে ভোট দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঐ ছবিটা মুদ্রিত না হলে উনি আরও বেশী ভোটে জয়ী হতে পারতেন।

ঋদ্ধি বলল, সত্যি রমেন, তুই অদ্ভুত লোক !

এমন সময় দীনেশ চৌধুরী এলো। ও একটা মাইকা মাইনে কাজ করে। বিহারেই পড়ে থাকে, জঙ্গলে। অনেক দিন পর পর ধূমকেতুর মত হাজির হয় এসে। ঢুকেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলল, একটা বড় জিন দিতে বল বীথিন। অপমান করেছে। বড্ডই অপমান করেছে আমাকে।

কে... ? সমীর বলল।

আমার বস্। এক্ষুনি তার বাড়ি থেকেই আসছি। আমাকে শালা কি বলল জানিস? বলল, আই ফাইন্ড, ট্যু হ্যাভ ইমপ্রুভড্ ইওর ইংলিশ।

বস্ তো তোর প্রশংসাই করেছে! অপমানের কি আছে?

দীনেশ বলল, প্রশংসা? ন্যাকা। ইংরেজী ইম্প্রুভ করেছি। ইয়ার্কি করার জায়গা পায়নি। আমিও বলে দিলাম—আই শ্যাল বী ফিফ্‌টি নেক্সট জুন। হিঃ। হিঃ। জিন দিতে বল। উইথ লাইম।

নির্মলেন্দু বলল, অদ্ভুত লোক।

৩

বাড়িতে যখন পৌঁছল সোমেশ, তখনও কারেন্ট আসেনি। পাশের বাড়ির জেনারেটারের ভট্‌ভটানিতে পাগ‍ল পাগল লাগে। কোন কথা বলা বা শোনা যায় না। দরজায় দুম্ দুম্ করাতে দরজা খুলল। ঘামে-ভিজে, প্রচণ্ড বিরক্ত মালতী দরজা খুলেই বলল, অদ্ভুত লোক।

বেশী দেরী তো হয়নি।

দেরী হয়েছে। তবে, সেটা ইম্মেটেরীয়াল। তোমার পেয়ারের ড্রাইভার আধঘণ্টা হল এসে ছাদে বসে আছে। কাঁদছে আর বলছে, তোমার সঙ্গে দরকার আছে। ডিউটিতে ও তিন দিন কেন আসেনি, তা পুমা ওকে ধমকে জিগ্যেস করেছিল। তাতে বলেছে, যা বলার তা নাকি তোমাকেই বলবে। তাতে পুমা খুবই ইন্‌সাল্টেড ফিল করেছে। আফটার অল হি ইজ গ্রোন আপ নাউ। অদ্ভুত লোক।

কে...? সোমেশ বলল।

তোমার ড্রাইভার।

তাহলে ওর সঙ্গে কথাটা বলেই আসি।

দয়া করে আগে খাওয়াটা সেরে নাও।

কথাটা সেরেই আসি। খাবার লাগাতে বল।

ছাদে গিয়ে সোমেশ দেখল মুনেশ্বর এক কোণায় বসে আছে হাঁটুতে মুখ গুঁজে। ওকে দেখেই চমকে দাঁড়িয়ে উঠল।

বলল, কসুর হো গ্যায়া সাব। তিন রোজ ডিউটিমে আনে নেহী সেকা।

কিন্তু কি হয়েছিল? কাঁদছ কেন?

মুনেশ্বর দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, আমার ছেলেটা সকাল দশটাতে মরে গেল।

বীয়ারে সোমেশের যেটুকু নেশা হয়েছিল, তা উবে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা সাপ নেমে গেল। বলল, মরেই গেল? কত বড় ছেলে?

বুন্‌বাবার মত।

বুন্-এর মত। সোমেশ চোখে অন্ধকার দেখল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, কি হয়েছিল?

তা কি করে বলব সাহেব। অসুখ হয়েছিল। আমাদের শুধু দু'রকমের অসুখ হয়। মরার অসুখ। আর বেঁচে ওঠার অসুখ।

চিকিৎসা করিয়েছিলে?

দাবাই তো দিয়েছিলাম। পাড়ার হোমিপ্যাথ ডাগ্‌দারের। বাঁচাতে পারলাম না।

সোমেশের শরীর খারাপ লাগতে লাগল।

কি করব বল, আমি তোমার জন্যে ? কি করতে পারি... ?

মুনেশ্বর সোমেশের মুখে বীয়ারের গন্ধ পেয়ে থাকবে। বলল, আপনার খুশি আমি খারাব করে দিলাম। আমাকে মাফ করবেন সাব।

আঃ ! বল, মুনেশ্বর, কত টাকা চাই তোমার ?

পঞ্চাশ টাকা সাহেব। সৎকার করতে হবে ছেলেটাকে। ওতেই হয়ে যাবে।

তোমার ছেলেকে ভাল করে চিকিৎসা করালে না কেন ? ইস্-স্ আমাকে বললে না কেন একবারও মুনেশ্বর ?

সাব, আপনার ডিউটি তো করি না। আমি মেমসাবকে বলতে পারিনি। বলিনি। তাছাড়া আমার মা বলেছিল, নিজের যতই অসুবিধা থাক, অন্যের অসুবিধা আগে বিচার করবি। মাসের শেষ। আপনিও তো চাকরি করেন সাহেব। হয়তো মাইনে বেশী পান। কিন্তু চাকরি তো চাকরিই। সেই জন্যেই চাইনি। অসুবিধা সকলেরই থাকে।

পার্স খুলে মুনেশ্বরকে একশো টাকা দিল সোমেশ !

মুনেশ্বর বলল, আপ্‌কি দোয়া—বড়া মেহেরবানী। ভগবান ভালা করেগা আপকো।

উঃ ! কারেন্ট এসে গেছে।

মালতী যখন [illegible] দরজা খুলল, ও বলল কী প্রেমের কথা হচ্ছিল এতক্ষণ ড্রাইভারের সঙ্গে ? অদ্ভুত লোক !

রুন্ ড্রয়িংরুমের সোফায় শুয়ে এনিড ব্লাইটন পড়ছিল। আর পুমা, 'দ্যা পোলিস্'-এর রেকর্ড শুনছিল।

সোমেশ ঘরে ঢুকতেই রুন্ বলল, কি হয়েছে বাবা ? ড্রাইভারের ? কাঁদছিল কেন ?

ঠিক তোমারই মত বয়সী একটি ছেলে ছিল মুনেশ্বরের। তিনদিন ভুগে সে আজ সকালেই মারা গেছে। দাহ করার জন্যে টাকা চাইতে এসেছিল। সোমেশ বলল।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রুন্ তার মুখের দিকে। ডিম ফুটে বেরুনোর পর পাতিহাঁসের বড় হতে সময় লাগে একটু। এখনও পাতি-বুর্জোয়ার বয়সে পৌঁছয়নি রুন্। ওর মুখে, মুনেশ্বরের জন্যে গভীর এক সমবেদনাও লক্ষ্য করল সোমেশ।

মালতী অভিভাবকসুলভ গলায় বলল, কত টাকা দিলে ? তিরিশ-চল্লিশ দিলেই যথেষ্ট। বেশী দাওনি তো ? নিয়ে তো যাবে চটে—মুড়ে। এরা সব নিমক্‌হারাম। যতই কর, গুণ গাইবে না। কিন্তু ডিউটি তো করে আমার আর ছেলেদেরই বেশী। আমার কাছে চাইল না কেন সে ? এটা তো আমাকেও ইন্‌সালট করা।

সোমেশের মন বলছিল, পুমাকে মুনেশ্বরের সঙ্গে পাঠায়। তার পরই ভেবেছিল, কি লাভ ? জিনের প্যান্টের দু' পকেটে হাত দিয়ে দু' পা ফাঁক করে হীরোর মত দাঁড়িয়ে থাকবে বস্তির উঠোনে। তেলে-জলে মিশ খায় না। খাবে না।

পুমা অন্য এক গার্ল-ফ্রেন্ডের ফোন ধরতে উঠেছিল।

বাঈঈঈ ! বলে রিসিভার নামিয়ে রেখেই বলল, বেলেভ্যু বা উডল্যান্ডস-এ ভর্তি করে দিলেই পারত ইডিয়টটা। তাহলে হয়তো ছেলেটা মরত না।

সত্যিই অদ্ভুত লোক !

বাবা হওয়া



ডাকবাংলোটা থেকে নদীটা দেখা যাচ্ছিল। সামনে একটা খোয়ার পথ এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। পথের দুপাশে সারি করে লাগানো আকাশমণি গাছ। মার্চের প্রথমে অগ্নিশিখার মত ফুটেছে ফুলগুলো। আকাশপানে মুখ তুলে আছে। বাংলোর হাতায় পনসাটিয়ার ঝাড়। লাল পাতিয়া বলে মালি। পাতাগুলোর লালে এক পশলা বৃষ্টির পর জেল্লা ঠিকরোচ্ছে। কয়েকজন আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ খোয়ার রাস্তাটা মেরামত করছে সামনেই।

আমার ছেলে রাকেশ আর মেয়ে রাই নদীর সবুজ মাঠটুকুতে দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে। রাকেশ যথেষ্ট বড় হয়েছে। ক্লাস এইটে পড়ে সে। তাছাড়া বয়স অনুপাতে সে অনেক বেশী জানে। বোঝে। কত বিষয়ে সে যে পড়াশুনা করে, তা বলার নয়। পড়াশুনাতে খুব ভাল সে তো বটেই, কিন্তু শুধু স্কুলের পড়াশুনাতেই নয়।

নিজের ছেলে বলে নয়, তার ভালোত্বে আমি মাঝে মাঝেই গর্ব বোধ করে থাকি।

এই গর্বের কোনো সঙ্গত কারণ আমার থাকার কথা নয়। কারণ ছেলে ও মেয়ের যা কিছু ভালো তা আমার স্ত্রী শ্রীমতীরই জন্যে। বাবার কর্তব্য হিসেবে একমাত্র টাকা রোজগার ছাড়া আর কিছুই প্রায় করার সময় পাইনি আমি। আমি আমার দোষ স্বীকার করি। আমি অত্যন্ত উদার মানুষ বলেই আমার বিশ্বাস। তবুও খারাপটুকুর দায় শ্রীমতীর উপর অবহেলায় চাপিয়ে আমার ছেলেমেয়ের ভালোত্বের আনন্দটুকু আমি এই মুহূর্তে এই বাংলোর চওড়া বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করছি।

শ্রীমতী ঘরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। ড্রাইভে আমার কালোরঙা ডব্লু-এম-ডি নম্বরের ঝকঝকে গাড়িটা শাদা সীটকভার পরে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি একজন সেল্‌ফ-মেড মানুষ। লেখাপড়া বিশেষ করিনি, মানে ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছিলাম। ইংরিজীতে বেশ কাঁচা ছিলাম। পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয় আর্থিক কারণেই। কিন্তু নানা রকম চাকরি এবং ফিরিওয়ালা থেকে জীবন শুরু করে আমি এখন একটা কারখানার মালিক। স্মলস্কেল ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে রেজিস্টার্ড। লোহার ঢালাই করা জিনিস নানা দেশে এক্সপোর্টও করি। আমার ব্যবসা যে ভালো সে সম্পর্কেও ছেলে-সম্পর্কিত গর্বের মতো গর্ব আছে আমার।

হাওড়াতে আমার কারখানা। সল্ট-লেকে হাল-ফিল ডিজাইনের বাড়ি। সুন্দরী স্ত্রী। আর

স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। বেশ কিছু লোক আমাকে স্যার স্যার করে। ভালো লাগে। কোলকাতার একটি বড় ক্লাবে আমি বছরখানেক হল মেম্বার হয়েছি। ইদানিং ক্লাবে এবং ব্যবসার জগতে আমি আকছার ইংরিজী বলে থাকি। আমি এখন জানি যে এ-সংসারে টাকা থাকলে ইংরিজী বাংলা কিছুই না জানলেও চলে যায়। টাকার মত ভালো ও এফেক্টিভ ভাষা আর কিছুই নেই। তাছাড়া টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বিদ্যাই আপনা আপনিই বাড়ে।

লক্ষ্মীর মত সরস্বতী আর দুটি নেই।

ক্লাবে আমাকে লোকে "ম্যাক্ চ্যাটার্জী" বলে জানে। আমার আসল নাম মকরক্রান্তি। ছোটবেলায় পাড়ার ছেলেদের কাছে, আমার বাবার কাছে, চাকরি-জীবনের বিভিন্ন মালিকদের কাছে আমার নাম ছিল "মক্‌রা"। সে ডাকটা এখন ভুলেই গেছি। কেউই ডাকেনা সে নামে। ডাকলে আমি রেগেও যাব।

এই মুহূর্তে আমি একজন সুখী লোক। সংসারে সুখী হতে হলে যা-যা থাকতে হয়, থাকা উচিত, আমার তার প্রায় সবই আছে। আমি একজন কপিবুক সুখী লোক। কিন্তু নদীর সামনে, দূরে খেলে-বেড়ানো আমার ছেলে রাকেশ এবং মেয়ে রাই-এর কারণে আমি ঠিক যতটা সুখী তেমন সুখী অন্য কিছুর জন্যেই নই।

ছেলে-মেয়ে ভালো হওয়ার সুখ, কৃতী হওয়ার সুখ বাবাকে যে কৃতিত্ব এনে দেয়, তা তার ব্যবসা, অর্থ, মান-সম্মান কিছুই এনে দিতে পারে না। অবশ্য ছেলে-মেয়েকে তাদের জীবনে অনেক কিছুই দিয়েছি আমি, আমাকে যা আমার মা-বাবা দিতে পারেন নি।

আমি একজন কৃতী কেউ-কেটা, যোগ্য বাবা। ভাবছিলাম আমি। বড়লোক হওয়া সোজা। পন্ডিত হওয়া সোজা, সব কিছু হওয়াই সোজা, কিন্তু ভালো বাবা হওয়া বড় কঠিন। এই শান্ত দুপুরে, আলসের কবুতরের ডাকের একটানা ঘুমপাড়ানী শব্দে, ছায়ায় স্নিগ্ধ হাওয়াতে, আদিবাসী কুলি-কামিনদের রাস্তা সারানো ছন্দোবদ্ধ খট্‌খট্ আওয়াজে বসে আমি ভাবছিলাম আমি একজন সার্থক বাবা।

২

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। চোখের পাতা বুঁজে গেছিল। এমন সময় একটা গাড়ির শব্দে আচমকা তন্দ্রা ভেঙে গেল।

চোখ মেলে দেখি, আমার কারখানার ওভারড্রাফ্‌ট অ্যাকাউন্ট যে ব্যাঙ্কে, সেই ব্যাঙ্কেরই এজেন্ট এসে হাজির। মিঃ রায়। হঠাৎ ? এখানে ?

উনি বললেন।

ওঁকে দেখেই আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম।

বললাম, আরে ? আপনি কোত্থেকে স্যার ?

সব স্যারেরই স্যার বলার লোক থাকে ? বাবারও বাবা থাকে। লিমিট বাড়ানো নিয়ে গত তিন মাস ধরে বড় রমদা-রমদি চলছে। কানাঘুষোয় শুনেছি, সোজা রাস্তায় হবে না। কিন্তু তেমন জানাশোনা হয় এমন সুযোগও হয় নি। এ একেবারে গড্-সেণ্ট ব্যাপার !

রায়সাহেব তাঁর বিরাট এয়ার-কন্ডিশানড অফিসে বসে এমন একটা 'এয়ার' নিয়ে থাকেন

যে মন খুলে কথাই বলা যায় না।

আমি রায়সাহেবকে ইমপ্রেস করবার জন্যে ইংরিজীতেই কথাবার্তা চালু করলাম। আমি যে হাওড়ার একজন সামান্য ঢালাইওয়ালা নই, ডাবু ধরাই যে আমার শেষ গন্তব্য নয়, টাকা যে নোংরা আর পাঁকের মধ্যেই জন্মায় না, পদ্মফুলের মধ্যেও জন্মায় এ-কথাটা এ-হেন আপন-গন্ধে কস্তুরিমৃগসম পাগল ব্যাঙ্কারকে বোঝানো দরকার।

এমন সময় রাকেশ ও রাই ফিরে এলো।

আমি আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে রায়সাহেবের আলাপ করিয়ে দিয়ে রায়সাহেবদের সবাইকে মহাসমারোহে বসালাম। রাইকে বললাম শ্রীমতীকে দিবানিদ্রা থেকে তুলতে। টিফিন-ক্যারিয়ারে কিছু খাবার আছে কী নেই কে জানে? চৌকিদারকে ডেকে চা করতে বললাম।

রায়সাহেব বললেন, রাঁচী যাচ্ছি। বাংলোটা দেখে ভাবলাম একটু রেষ্ট করে যাই। আমার স্ত্রী ও শালী সঙ্গে আছেন। ওঁরা একটু...যাবেন।

নিশ্চয়। নিশ্চয়ই! বলে আমি রাইকে বললাম, রাই, মাসিমাদের বাথরুমে নিয়ে যাও।

রায়সাহেব ইম্‌পোর্টেড সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেটে ধরালেন। আমাকেও একটা দিলেন। আমি কৃতার্থ হলাম। কিন্তু ওভারড্রাফট-এর লিমিটটা বাড়লে আরো বেশী কৃতার্থ হতাম।

তারপর বাংলোর সামনে কাজ-করা কুলি-কামিনদের দিকে আঙুল তুলে বললেন, দীজ্ পিপল আর ভেরী অনেস্ট অ্যান্ড নাইস ইন্ডীড। আই মীন দীজ জাংগলী লেবারার্স্।

তারপরেই বললেন, বাট দে আর রিয়্যালি নেভ্।

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ইয়েস্। রাইট ঊ্য আর। দে আর রিয়্যালি নেভ।

রাকেশ সিঁড়িতে বসেছিল। হঠাৎ উঠে এসে বলল, কাদের কথা বলছ বাবা?

আমি একটু হেসে, বিদগ্ধ কৃতী বাবার মত মুখ করে ঐ কুলি কামিনদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইংরিজীতেই বললাম, উই আর টকিং অ্যাবাউট দেম। দে আর নেভ্।

রাকেশ তার ক্লাসের সেরা ছাত্র। তার স্কুলও শহরের সেরা স্কুল।

সে অবাক গলায় বলল, নেভ্?

রায়সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কৌতুকের স্বরে বললেন, হোয়াই, সান?

রাকেশ বলল, ওরা অনেষ্ট কিন্তু নেভ্ দুটোই একসঙ্গে কী করে হবে? তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাকে বলল, আই ডোন্নো হোয়াই ঊ্য কল দেম নেভ।

রায়সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, নেভ বানান জানো?

রাকেশ অপমানিত হল।

আমি, মানে রাকেশের বাবা, নেভ বানান এবং মানে দুটোর একটাও জানতাম না। রায়সাহেব বলেছিলেন বলে ওঁর কথায় সায় দিয়েই বলেছিলাম! তাই রাকেশের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে বাবার সম্মান্ রাখতে পারে কী না দেখার জন্যে।

রাকেশ কেটে কেটে বলল, K n a v e। আপনি আর বাবা এই Knave-এর কথাই বলছিলেন তো?

একজ্যাক্টলি! বললেন মিঃ রায়।

রাকেশ বলল, আমি তো তাই-ই ভাবছি। তাহলে আমি ঠিকই বলেছি, Knave-এর মানে তো অন্য।

মিঃ রায় আমার দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে আমিই ভুল বলেছি, কী বলেন মিঃ চ্যাটার্জী ?

আমি বললাম, কী যে বলেন স্যার ? আপনি কখনও ভুল বলতে পারেন। আজকালকার ছেলেদের কথা ছেড়ে দিন। সব অসভ্য। অভদ্র।

রাকেশ হঠাৎ আমার দিকে একবার তাকাল। এমন চোখে ? আমার ছেলে ? যে নবজাত ছেলেকে আমি নার্সিং হোমে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছি। দু'পা একসঙ্গে করে ধরে গামলায় চান করিয়ে নার্স যাকে তুলে ধরে বলেছিলেন, এই যে মকরবাবু, দ্যাখেন আপনার ছাওযাল। বাবা হইলেন গিয়া আপনে।

সেই ছেলে এমন ঘৃণা ও হতাশা-মেশা অবাক হওয়া চোখে কখনও আমার দিকে তাকায়নি। কখনও তাকাবে বলে ভাবিওনি।

একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাকেশ। তারপর মিঃ রায়ের দিকে মাথা নিচু করে বলল, আই অ্যাম স্যরি।

আমি বললাম, স্যরি নয় শুধু রাকেশ, ইনি কে জানো ? কত বড় পণ্ডিত তা তুমি জানো ?

বলেই [illegible], ও কী করে জানবে ? স্টুপিড, ইনোসেন্ট, ইডিয়ট। স্কুলের পরীক্ষাই তো পাশ করেছে। জীবনের পরীক্ষায় তো বসতে হয়নি। ও জানবে কী করে ? ব্যাঙ্কের লিমিট না বাড়লে যে ব্যবসা বাড়ে না, গাড়ি চড়া যায় না, আরো ভালো থাকা যায় না, ভালো স্কুলে পড়ানো যায় না ছেলেমেয়েকে ; তা ও কী করে জানবে। গাধা।

আমি বললাম, স্বীকার করো ওঁর কাছে যে তুমি অন্যায় করেছ। বলো যে, তুমি ভুল বলেছ। ক্ষমা চাও, তর্ক করেছ বলে।

আমি...

বলেই, রাকেশ আমার দিকে চেয়ে রইল।

ইতিমধ্যে রায়সাহেবের স্ত্রী ও শালী বারান্দায় চলে এলেন।

আমি আবহাওযা লঘু করে বললাম, বসুন বসুন, এক্ষুনি চা আসছে।

ওঁরা বসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রায়সাহেব রুক্ষ গলাতেই বললেন, চায়ের ঝামেলার দরকার নেই, রাস্তায় অনেক পাঞ্জাবী ধাবা আছে। সেখানেই খেয়ে নেবো।

বলেই অত্যন্ত অভদ্রভাবে বললেন, চলি মিঃ চ্যাটার্জী।

শ্রীমতীও ঘর থেকে বাইরে এসেছিল। ওর সঙ্গে মহিলারা ভালোই ব্যবহার করেছিলেন। তাই মিঃ রাযের এই রকম হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ ও বুঝতে পারল না।

আমি তাকিয়ে দেখলাম রাকেশ নেই। কখন সরে গেছে বারান্দা থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি গিয়ে মিঃ রায়ের গাড়ির দরজা খুলে দিলাম। মিঃ রায সামনের সীটে উঠতে উঠতে বললেন, আপনার ছেলেটি ভাল। কিন্তু ওকে ভাল করে ম্যানারস শেখান। এখনই যদি সব কিছু জেনে ফেলে তবে পরে কী জানবে আর ?

আমি হাত জোড় করে বললাম, ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। অপরাধ নেবেন না।

মিঃ রায় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, অপরাধের কী আছে।

তারপর একটু থেমে, আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, অপরাধ ক্ষমা করাই তো আমাদের কাজ।

গাড়িটা চলে গেল।

আমি ডাকলাম রাকেশ। রাকেশ।

আমার ম্যাক চ্যাটার্জীর মধ্যে থেকে মুন্ডিতলা বাই-লেনের মক্‌রা বেরিয়ে এলো বহুদিন পর। আমি হুংকার দিলাম; কোথায় তুই ছোক্‌রা! তোর পিঠের চামড়া তুলব আজ।

রাকেশ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল। একটুও উত্তেজনা নেই। শান্ত ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার চোখে চোখ রাখল।

ওকে দেখে আমার মনে হল, এ আমার ছেলে নয়। এ আমার শত্রু। আমার ধ্বংসকারী। বিষবৃক্ষ।

আমি বললাম, তুমি ভেবেছটা কি?'

রেগে গেলে ছেলেমেয়েদের আমি তুমি করে বলি।

রাকেশ শান্ত গলায় বলল, কি বাবা?

আবার কি বাবা? বলে আমি চটাস্‌ করে এক চড় মারলাম ওকে।

বললাম, বাবার মুখে কথা বলা, তুমি বাবার চেয়েও বেশী জানো? তুমি জানো মিঃ রায় কত বড় অফিসার? আমাদের ব্যবসার ভাগ্যবিধাতা উনি। আর তুমি তাঁর চেয়েও বেশী জানো? বড়দের মুখের উপর কথা! মুখে-মুখে কথা।

শ্রীমতী দৌড়ে এল।

আমি বললাম, তুমি সরে যাও। আমি ওকে আজ মেরেই ফেলবো। আমার আজ মাথার ঠিক নেই।

শ্রীমতী রাকেশকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু রাকেশ নড়ল না। দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মুখের ভাব শান্ত; নিরুত্তাপ।

আমি কী করে ওর মনের দৃঢ়তা ভাঙব বুঝতে না-পেরে ওর নরম গালে আরেক চড় মারলাম।

ওর গাল বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল।

ওর চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ এই প্রথমবার আমার মনে হল এ ছেলে সাংঘাতিক ছেলে। বড় হলে এ বোধ হয় নক্‌শাল হবে। অথবা ঐ রকমই কিছু। নিজের বাবাকেই খুন করবে। এক সময়ে রাকেশের মত পড়াশোনায় ভালো ছেলেরাই তো ঐ সব করেছিল!

আমি ভাবলাম, ওকে চণ্ডীমাতা প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা করালেই ভালো করতাম। ঢালাইওয়ালা মক্‌রার ছেলেকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট করার স্বপ্ন দেখতে গিয়েই এই বিপত্তি!

শ্রীমতী নিরুত্তাপ, উদাসীন গলায় বলল, অনেক বেড়ানো হয়েছে, পিক্‌নিক হয়েছে; এবার ফিরে চলো। রাতটা মামাবাড়িতে খড়্‌গপুরে কাটিয়ে কালই কোলকাতা যাব।

৩

বাইরে থেকে ফিরে এসেছি দিন দশেক হল। এসে অবধি ভারী খাটুনী যাচ্ছে। লোড-শেডিং এর জন্যে রাতে ঢালাই প্রায় বন্ধ। একটা জেনারেটর কেনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে

করতে হয়রান হয়ে গেলাম।

সল্ট লেকে বড় মশা। শুয়েছি মশারির মধ্যেই তবু এখনও ঘুম আসছে না। কেন জানি না, বারে বারে রাকেশের কথাই মনে হচ্ছে।

রাকেশ যখন ছোট ছিল, যখন আমার অবস্থা এত ভালো ছিলো না ; তখন আমাদের আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে শ্রীমতীর সঙ্গে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে ও পড়ত। আমি অফিস থেকে ফিরলেই, বাবা বাবা বলে দৌড়ে এসে আমার কোলে উঠত। ঐ বয়সটাই ভালো ছিলো।

নিচের তলায় রাকেশের পড়ার ঘর। আমরা কী ছোটবেলায় এত সুযোগ সুবিধা পেয়েছি ? কত কষ্ট করে পড়েছি, বাজে স্কুলে ; বইপত্র ছাড়া। এরা এত কিছু পেয়েই কী এত উদ্ধত হয়ে গেল ? অমানুষ হয়ে উঠল কী ?

ঘুম আসছিলো না।

বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ার পর আমি আলাদা ঘরে শুই। শ্রীমতী রাইকে নিয়ে অন্য ঘরে। রাকেশ আলাদা ঘরে। সারা বাড়ির আলো নিবোনো। নীচের পর্চে শুধু একটা আলো জ্বলছে, গ্যারেজের সামনে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলাম। পায়চারি করতে করতে কখন যে আমি দরজা খুলে, সিঁড়ি ভেঙে রাকেশের পড়ার ঘরে চলে গেছি, আলো জ্বালিয়েছি, জানিও না।

ঘরেব এ-পাশ ও-পাশ সব ঘুরে বেড়ালাম। ড্রয়ারে চাবি দেওয়া। ড্রয়ারে কি আছে কে জানে ? ড্রয়ার খুলে আবার কী নতুন আতঙ্ক হবে তা তো জানা নেই ? ড্রয়ার বন্ধ থাকাই ভালো।

রাকেশের লেখার টেবিলে একটা খাতা। বুক-র‍্যাকে অনেক বই। মাস্টার মশাইয়ের বসার জন্যে টেবলের উল্টো দিকে একটা চেয়ার। দেওয়ালে ব্রুস-লীর বড় পোষ্টার।

যা খুঁজছিলাম, দেখলাম আছে। দুটি ডিকশনারী আছে।

প্রথমটি কনাসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারী। পাতা উল্টে উল্টে Knave কথাটা বের কবলাম। লেখা আছে আনপ্রিন্সিপলড ম্যান, রোগ, সারভেণ্ট।

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ওই লেবারারদের যদি মিঃ রায় ভেরী নাইস বলে থাকেন এবং ভাল চাকর-বাকর বলে থাকেন তাহলে ভুল কি বলেছেন ?

অন্য ডিকশনারীটা টেনে নিলাম। জুনিয়র স্কুল ডিকশনারী, ফার্ষ্ট এডিশন, ১৯৬৯। তাতে শুধুই লেখা এ পার্সন হু লিভস বাই চিটিং, আ ডিসঅনেস্ট ক্যারাকটার।

এছাড়া আর কিছুই লেখা নেই।

আমি রাকেশের চেয়ারে বসলাম। দুহাতের পাতায় মুখ রেখে ভাবতে লাগলাম।

ভেরী নাইস-এর সঙ্গে এই মানেটা খাপ খায় না। কিন্তু মিঃ রায় এত বড় একজন অফিসার ও লেখাপড়া জানা লোক হয়ে কখনও ভুল করতে পারেন না।

বড্ড মশা কামড়াতে লাগল। গিয়ে ফ্যানটা খুলে দিলাম অন্ করে। হঠাৎ রাকেশের টেবলে রাখা খাতাটার উপর চোখ পড়ল আমার। মলাটে রাকেশের নাম, ক্লাস, রোল নাম্বার সব লেখা। এটা পুরানো ক্লাসের খাতা। আজেবাজে লেখার জন্যে ব্যবহার করে নিশ্চয়ই।

প্রথম পাতাটা ওল্টাতেই দেখি রাকেশ লিখেছে, 'নেভার স্টপ লার্নিং'। এই কথাটাই বার বার লিখেছে। লিখে, নিচে আন্ডার লাইন করেছে। আর সেই পাতারই নীচের দিকে লিখেছে, 'ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্যা কারেজ অফ ইওর কনভিক্‌শান।'

এর নীচে যে লাইন টেনেছে বার বার তা এত জোরে চাপ দিয়ে টেনেছে যে, কাগজ নিবের চাপে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে।

খাতাটার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমার মাথায় কার হাতের স্পর্শে, চমকে উঠলাম ভয় পেয়ে। এত রাতে? কে? রাকেশ?

কে? বলে উঠলাম আমি।

আমি। বলল, শ্রীমতী।

আমি শুধোলাম, রাকেশ ঘুমোচ্ছে?

হ্যাঁ।

আমি বললাম, আমাকে তুমি কিছু বলবে?

শ্রীমতী বলল, না।

বলেই, ঘরে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনই নিঃশব্দে চলে গেল।

একটু পর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে আমি অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম আমার ব্যবসা, আমার টাকা-পয়সা, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আমার বাড়ি গাড়ি সবই তো রাকেশ আর রাই-এরই জন্যে। যদি ওরাই...। যদি আমি...। ওরাই যদি...।

কী লাভ? কেন এত খাটুনি, এত দৌড়াদৌড়ি, হাওড়ার বাঁশবনে শেয়াল রাজা হবার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার? কেন? কাদের জন্যে?

আমার একার জন্যেই কি?

৪

সকালবেলাটা যে কী করে কেটে যায় বুঝতেই পারি না। মোল্ড নিয়ে আজ মহা গোলমাল হল। লয়েডস ইনসপেকশনের একজন লোক কেবলই পাসিং-এর সময় বায়নাক্কা লাগাচ্ছে। এই রেটে রিজেকশান হলে আর ব্যবসা করতে হবে না। ঘোষালের নতুন-হওয়া বাচ্চাটা নার্সিং হোম থেকে আসতে না আসতেই মারা গেছে। কারখানায় আসতেই পারছে না সে। সব ঝক্কি আমার একারই সামলাতে হচ্ছে ক'দিন থেকে।

দুপুরের দিকে একবার কোলকাতা আসি রোজই। কোনোদিন ক্লাবে খাই, কোনোদিন বা শ্রীমতী বাড়ি থেকে হট-বক্সে কিছু দিয়ে দেয়।

ক্লাবে গেলাম, কিন্তু খেতে ইচ্ছে করল না। শরীরটা ভাল লাগছে না। সুগারটা চেক করতে হবে। বেড়েছে বোধ হয়। একটা ই সি জি-ও করা দরকার। এই বয়সে ইস্‌কিমিয়া হতেই পারে। বাঁদিকের বুকেও মাঝে মাঝে ব্যথা করে।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, কলেজ স্ট্রীট যেতে। রাকেশের খাতায় লেখা কথাগুলো কাল থেকে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কী বলতে চেয়েছে ও? রাকেশের বাবা

কী আমি ? না, আমিও ওর শত্রু ?

সেইদিন দুপুর থেকে ছেলেটা স্তব্ধ হয়ে আছে। ছেলের মুখের দিকে তাকাবার সময় গত কয়েক বছরে বেশী পাইনি আমি। কিন্তু যে মুখে তাকিয়েছি সে মুখ এ মুখ নয়।

একটা বড় বইয়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বললাম ড্রাইভারকে।

ঢুকে বললাম, ভালো ডিকশনারী কি আছে ?

দোকানদার দুটি বের দিলেন। ওয়েবষ্টারস্ নিউ ওয়ার্লড ডিকশনারী, সেকেন্ড এডিশান, রিপ্রিন্ট ১৯৭৬।

তাড়াতাড়ি পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ৪১৪ পাতা—Knave মানে আর্কেয়িক, (ক) এ মেল সারভেন্ট, (খ) এ ম্যান অফ হামবল ষ্ট্যাটাস (২) এ ট্রিকী রাসকাল, রোগ, (৩) এ জ্যাক (প্লেইং কার্ড)।

আমার মনে হল রাকেশকে শাসন করে ঠিকই করেছি। মিঃ রায় নিশ্চয়ই ১(খ) বুঝিয়েছিলেন। ওখানকার সরল ভালো লোকেরা তো men of humble status-এরই। কিন্তু মিঃ রায় মধ্যে একটা but ব্যবহার করেছিলেন। এই but-টাই সমস্ত গুলিয়ে দিচ্ছে।

অন্য ডিকশনারী দেখলাম। শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী ১৯৭০, ১০৮৯ পাতা। (ক) এ মেল চাইল্ড বয়। ১৪৬০ (খ) এ বয় এমপ্লয়েড অ্যাজ সারভেন্ট ; মিনিয়াল, ওয়ান অফ লো কন্ডিশন ; (গ) অ্যান আনপ্রিন্সিপলড ম্যান, এ বেজ অ্যান্ড ক্রাফটি রোগ (I) JOC-১৫৬৩ (খ) কার্ডস।

One of low condition-এর অর্থে মিঃ রায় কথাটাকে নিশ্চয়ই ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হল আমার।

আমি তবুও পাশের দোকানে গেলাম। সেখানে লিটল অক্সফোর্ড ডিকশনারি, ফোর্থ এডিশান, ১৯৬৯, ২৯৪ পাতাতে বলেছে—আনপ্রিন্সিপলড ম্যান, রোগ লোয়েষ্ট কোর্ট (অরিজিনালি নয়—সারভেন্ট)।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। কফি হাউসে উঠে গিয়ে এক কাপ কফি আর একপ্লেট পাকাড়ো নিয়ে বসলাম। বহু বছর পর কফি হাউসে এলাম। কফিতে চুমুক দিয়েছি, দেখি শরৎ এসে হাজির। শরৎ আমার ছোটবেলার বন্ধু হেমন্তের একেবারে ছোট্ট ভাই। শুনেছি পড়াশোনায় খুব ভাল হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে।

আমাকে দেখে বলল, কি মকরদা ? কেমন আছেন ?

আমি অন্যমনস্কর মতো বললাম, ভালো ?

তারপর বললাম, Knave মানে জানো ?

ও চমকে উঠল, বলল, আমাকে বললেন ?

আমি বললাম, না। না কফি খাবে ?

ও বলল, কফি, খাবো না। কিন্তু আমি তো ফিজিক্সের ছাত্র। ইংরিজিতে ত অত ভালো নই।

আমি বললাম, এখানে তোমার ইংরিজির বন্ধুবান্ধব কেউ আছে। সামওয়ান হু ইজ রিয়্যালী গুড।

শরৎ বলল, উ্যানিভার্সিটির বেষ্ট ছেলেকে নিয়ে আসছি। ও নির্ঘাৎ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে এবার ইংরিজীতে।

বলেই, শরৎ চলে গেল।

একটু পরে লাজুক লাজুক দেখতে ফর্সা রোগা একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল শরৎ। বলল এই যে।

আমি কোনো ভূমিকা না করেই বললাম, আমাকে Knave কথাটার মানে বলতে পারেন? বানান করে শব্দটা বললাম।

ছেলেটি বসে পড়ে আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, কী খাবেন?

ছেলেটি বলল, বিষ ছাড়া যা খাওয়াবেন। খিদেও পেয়েছে।

ছেলেটি বেশ পাকা। ভালো ছেলেরা আজকাল বুঝি পাকাই হয়। রাকেশেরই মতো?

আমি ওদের দু'জনের জন্যেই খাওয়ার অর্ডার করলাম।

ছেলেটি হাসল, একটা কথার তো অনেক মানে হয়।

না, যে মানেটা সব চেয়ে বেশী মানে। আমি বললাম। সেটাই বলুন।

ছেলেটি হেসে বলল।

বলল, তার মানে?

বললাম, যদি কথাটার একটাই মানে হত আজকে, তবে সেই মানেটা কী হত?

ছেলেটি হাসল, এক ফালি। ওর কপালে স্কাইলাইট দিয়ে রোদ এসে পড়েছিল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "চিটিংবাজ"। এক কথায় বললাম।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বললাম। আপনি শিওর?

ছেলেটি সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, অ্যাবসলুটলি।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে দ্বিধা বড় কম।

'শিওর' কথাটি ছেলেটি যেমন করে বলল, তাতে ভালো লাগলো আমার খুব। ওদের চরিত্রে একটি সোজা ব্যাপার আছে। ভালো হোক, মন্দ হোক, ওদের মধ্যে সংশয়, দ্বিধা ব্যাপারটা কম। আমাদের ছোটবেলায়, ছাত্রাবস্থায় আমরা ঐ রকম ছিলাম না।

তারপর বলল, অন্য অনেক মানে আছে—কিন্তু সব চেয়ে বেশী প্রচলিত ও প্রযোজ্য মানে এই।

আমি উঠে পড়লাম। শরৎ-এর হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, তুই দামটা দিয়ে দিস শরৎ। আমার বিশেষ তাড়া আছে। কিছু মনে করিস না।

যাওয়ার সময় ছেলেটিকে বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য।

যেতে যেতে শুনলাম, ছেলেটি শরৎকে বলছে, কিরে? এ যে মেন্টাল কেস।

আমি তাড়াতাড়ি কারখানাতে ফিরে এলাম। এসেই অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ডেকে পাঠালাম। বিমলবাবু আমার বহু পুরানো অ্যাকাউন্ট্যান্ট। চার্টার্ড-অ্যাকাউন্ট্যান্সী পরীক্ষার একটা গ্রুপ ফেল। কিন্তু কাজে অনেক পাশ করা অ্যাকাউন্ট্যান্টের চেয়েই ভালো।

বিমলবাবু এসে বললেন, বলুন স্যার। বিমলবাবুর চোখ দুটো চিরদিনই স্বপ্নময়। এ রকম

কবি-কবিভাবের মানুষ অথচ এফিসিয়েন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট খুব কমই দেখা যায়।

বললাম, বিমলবাবু এক্ষুনি একটা ক্যাশ—ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করুন। আমাদের ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট আমি এক্ষুনি শোধ করতে চাই। কী অবস্থা জানান আমাকে। ইমিডিয়েট্‌লি। সব কাজ ফেলে রেখে।

বিমলবাবু হাতের বল পেনটা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, স্যারের মাথার গণ্ডগোল হল ? অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার কথা ছেড়েই দিন। এক্ষুনি লাখখানেক টাকার বিল ডিসকাউন্টিং ফেসিলিটি বাড়িয়ে আনতে না পারলেই নয়।

আমি দৃঢ়গলায় বললাম, যা বলছি, তাই করুন বিমলবাবু।

বিমলবাবু বললেন, কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে স্যার তা হলে।

হলে হবে। আমি বললাম।

আমিই কী বললাম ?

মকরা বলল ? না ম্যাক চ্যাটার্জি ? না রাকেশের বাবা ?

জানি না, কে বলল।

বিমলবাবু চলে যাওয়ার আগে আমি আবারও বললাম যে, কত স্টক আছে দেখুন। সমস্ত স্টক ক্যাশ-সেল করবো।

কি হয়েছে স্যার ?

বিমলবাবুর চোখে মুখে ভয়ের ছায়া নেমে এল।

বললেন, ব্যবসা কী সত্যিই বন্ধ করে দেবেন ? আমরা এতগুলো লোক কোথায় যাবো এই বয়েসে। কি হল, একটু জানতে পেতাম ? বড়ই চিন্তা হচ্ছে আপনার কথা শুনে।

আমি হাসলাম।

আমি বোধ হয় অনেক বছর পরে হাসলাম। এমন নির্মল হাসি।

বললাম, না বন্ধ করব না। শুধু ব্যাঙ্ক বদলাবো। তাতে যা ক্ষতি হয় হবে। অন্য ব্যাঙ্কে চলে যাবো লক-স্টক-অ্যান্ড-ব্যারেল। এই চেঞ্জওভার পিরিয়ডে যা ক্ষতি হবার হবেই। কিছুই করার নেই।

ক্যাপিটালই লস্ট হয়ে যাবে স্যার অনেক। এমন তাড়াহুড়ো করলে।

আমি এবার শক্ত হয়ে বললাম, হলে হবে। বললামই তো।

তারপর বললাম যে, আমি চলে যাচ্ছি এখন। আজই সব কিছু কমপ্লিট করে রাখবেন। রাজেন আর রামকেও ডেকে নিন। কাল আমি সকাল ন'টায় এসে কাগজপত্র নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবো মিঃ রায়ের কাছে। কাগজপত্র সব রেডি করে টাইপ করে রাখুন। দরকার হলে রাতেও থেকে যান। বাড়িতে খবর পাঠাবেন তাহলে। ভালো করে খাওয়া দাওয়া করবেন সকলে।

কাগজ রেডি করলেও সব শোধ করবেন কী করে ? স্টক ক্যাশ-সেল করলেও হবে না।

বিমলবাবু চিন্তান্বিত গলায় বললেন।

আমি বললাম, অন্য সম্পত্তি, এক বসতবাড়িটা ছাড়া বিক্রী বা মর্টগেজ করে দেবো। যা হোক করে হয়ে যাবে। আর কথা বলার সময় নেই আমার আজকে।

বহু বহুদিন, বহু বছর পর আমি দিনের আলো থাকতে থাকতে কারখানা থেকে বেরোলাম। এত সময় হাতে নিয়ে আজ কী করব জানি না। নিউ মার্কেটে গিয়ে কেক কিনলাম। রাকেশ কেক খেতে ভালোবাসে। চকোলেট কেক।

তারপর কলেজ স্ট্রিটের দিকে গাড়ি চালাতে বললাম। পথে যে নার্সিং হোমে রাকেশ হয়েছিল সেই নার্সিং হোমটা পড়ল। এখন কত বদলে গেছে সব। রাকেশ, আমার সেই ছোট্ট উলঙ্গ, দুগ্ধপোষ্য ছেলেও কত বদলে গেছে।

কত বদলে গেছি আমি।

কলেজ স্ট্রিটে নেমে অক্সফোর্ডের সব চেয়ে ভালো যে ডিকশনারী, যা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মাইক্রোস্কোপিক অক্ষর দেখতে হয়; তা কিনলাম একটা। তারপর বাড়ির দিকে চললাম।

গাড়িতে বসে বসে ভাবছিলাম যে, কালকে মিঃ রায়কে কী বলব। বাবা হয়ে অন্যায়ভাবে চড় মেরেছিলাম রাকেশকে, সেই চড় দুটো ওঁর গালে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। ছোটবেলায় বহু মারামারি করেছি পাড়ায়। 'মকরা গুণ্ডা' বলতো অনেকে। কিন্তু আজকে তা আর হয় না। আজকে রাকেশের বাবা আমি। আমার নিজের পরিচয়টাই আমার একমাত্র পরিচয় নয়।

কাল কেমন করে ধীরে সুস্থে মিঃ রায়কে বলব যে, মিঃ রায় আপনি ইংরিজীটা আমার ছেলের চেয়ে খারাপই জানেন। যেই উনি ভুরু কুঁচকে আমার অ্যাকাউণ্ট সম্বন্ধে কথা বলতে যাবেন আমি সঙ্গের টাইপ করা, সই করা চিঠিটা এগিয়ে দেবো। আর.....

বাড়িতে যখন পৌঁছলাম, তখন লোডশেডিং। শ্রীমতী রাইকে নিয়ে পাশের বাড়িতে গেছিল। পর্চ-এর সামনে ল্যাণ্ডিংয়ে একটা মোমবাতি জ্বলছে। তাতেই সিঁড়িটা আলো হয়েছে একটু।

দেখলাম, রাকেশের ঘরেও মোমবাতি জ্বলছে।

আমার হাত থেকে নগেন বইয়ের আর কেকের প্যাকেটটা নিতে যাচ্ছিল। আমিই বাধা দিলাম। বললাম, থাক।

রাকেশ দরজার দিকে পিছন ফিরে চেয়ারে বসে পড়ছিল। মোমবাতির আলোতে। এপ্রিলে ওর পরীক্ষা। এর আগে কখনও আমি জানি নি বা জিজ্ঞেস করি নি লোডশেডিং-এর মধ্যে আমার ছেলেমেয়েরা কী ভাবে পড়াশুনা করে। কারখানায় দেড়লক্ষ টাকা খরচ করে জেনারেটর লাগিয়ে ফেললাম, কিন্তু বাড়িতে পেট্রোম্যাক্সও কিনি নি একটা ওদের জন্যে।

টেবলের পাশের দেওয়ালে সেই বড় পোস্টারটা। ব্রুস্-লীর। মোমবাতির আলোটা নাচছে পোস্টারটার ওপরে। কুং-ফুর রাজা এই হতভাগা দেশের হতভাগা মানুষদের প্রতিভূ হয়ে যেন এদেশীয় ন্যক্কারজনক রাজনীতিকদের নির্লজ্জ আরশুলাসুলভ অস্তিত্বকে জুডোর প্যাঁচে গুঁড়িয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। আমি দেখলাম, আমার রক্তজাত, আমার যৌবনের স্বপ্নের, আমার বার্ধক্যের অভিভাবক রাকেশ, হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা

করছে। মোমের সঙ্গে ওর চোখও জ্বলছে এবং গলছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে বই বগলে করে আমি ভাবছিলাম, কী হবে ? এত পড়াশুনা করে, ভালো হয়ে, সত্যবাদী হয়ে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে কী হবে এই দেশে ?

মনে মনে বলছিলাম, তুই যে ধনে-প্রাণে মরবি রে বাবা।

চমকে উঠে, রাকেশ মুখ ফেরালো। দেওয়ালে ওর সুন্দর গ্রীবা আর মাথাভরা চুলের ছায়া পড়ল।

রাকেশ বলল, কে ?

আমি। বললাম আমি।

রাকেশ উঠে দাঁড়াল।

বলল, বাবা ; কিন্তু মুখ নিচু করে রইল।

আমি বইয়ের দুটি খণ্ড ওর টেবলে নামিয়ে রাখলাম। বললাম, তোর জন্যে এনেছি রে।

—কেন বাবা ?

রাকেশ অবাক হয়ে শুধোলো। মাথা নিচু করেই।

আমার হঠাৎ মনে পড়ল এ পর্যন্ত হাতে করে আমি নিজে আমার ছেলের জন্যে কিছুই আনি নি। সময় হয় নি। মনেও হয়নি।

আমি অস্ফুটে বললাম, তুই......

তারপর গলা পরিষ্কার করে বললাম, রাকেশ, তুই-ই ঠিক বলেছিলি।

কী বাবা ? রাকেশ আবারও বলল, অস্ফুটে।

—সেদিন মিস্টার রায় ও আমি দুজনেই তোর প্রতি অন্যায় করেছিলাম।

তারপর হঠাৎ, আমিই বললাম কী না কি জানি, কিন্তু নিশ্চয়ই বললাম ; তুই আমাকে ক্ষমা করিস। আমার অন্যায় হয়েছিল রে।

রাকেশ আবারও বলল, বাবা।

আমি রাকেশের দু'কাঁধে আমার দুটি হাত রাখলাম।

ভাগ্যিস লোডশেডিং ছিল। নইলে রাকেশ দেখতো আমার দু'চোখের দু'কোণায় জল চিকচিক করছে।

রাকেশ কিছু বলার আগেই বললাম, ওপরে আয়। তোর জন্যে কেক এনেছি। চকোলেট-কেক। তোর মা একদিন বলেছিলো, তুই ভালোবাসিস। তোর মা ও রাই আসার আগেই চল আমরা দুজনেই এটাকে শেষ করে দিই।

রাকেশের মুখে সেদিন ডাকবাংলোর যে হঠাৎ অপরিচিতর রঙ লেগেছিল, তা আস্তে আস্তে ধুয়ে এল। ওর সুন্দর মুখটা মিষ্টি, সপ্রতিভ বুদ্ধিদীপ্ত হাসিতে ভরে এল। ও বলল, তোমার না ডায়াবেটিস্।

—তাতে কী ? একদিন খেলে কিছু হবে না। চান করে নিচ্ছি আমি। তুই ওপরে আয়।

—আসলে মা আর রাইও চকোলেট কেক খুব ভালোবাসে বাবা। মা আর রাই ফিরুক, তারপর একসঙ্গে খাবো।

ওপরে চলে এলাম। জামাকাপড় ছাড়লাম মোমের আলোয়। নগেনকে বললাম, মোমবাতিটা নিয়ে যেতে। মোমবাতিটা নগেন নিয়ে গেলে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

এদিকটা বেশ ফাঁকা। সল্ট লেকে এখনও সব জমিতে বাড়ি হয় নি। দুদিন বাদে দোল। তাই চাঁদ উঠেছে সন্ধে হতে না হতেই। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে চারিদিক। আমি বারান্দার ইজি-চেয়ারে বসে বাইরে চেয়ে রইলাম। গেটের দু'পাশে লাগানো হাস্‌নুহানার ঝোপ থেকে গন্ধ উড়ছে। হু-হু করে ঝড়ের মত হাওয়া আসছিল দক্ষিণ থেকে। মনে হচ্ছিল, ধ্রুব-তারাটা কাঁপছে বুঝি হাওয়ায়।

বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে বাইরের আলো-ছায়ার রাতের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, যেদিন নার্সিং হোমে রাকেশ জন্মেছিল ; সেদিন আমি শুধু ওর জন্মদাতাই ছিলাম। এতদিন, এত বছর পরে ; আজ এক দেবদুর্লভ ধ্রুব সত্যর সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমি ওর বাবা হয়ে উঠলাম।

বাবা।

ম্যানেজার



সম্‌রা বলল, যান বাবু, সাহেব ডাকছেন।

কোন্ সাহেব?

বড় সাহেব।

লম্বা করিডর দিয়ে হেঁটে, বড় সাহেবের পাশে, টুলে বসা রণাক্ সিং-এর কাছে আর্জি পেশ করলাম। রণাক্ সিং হুকুম দিল ভিতরে যাবার। ভিতরে ঢুকেই প্রকাণ্ড ঘর। পুরু গালিচা পাতা। ঘরের মধ্যে নানা রঙের টেলিফোন। টেলেক্স্ মেশিন। কম্প্যুটার। সাহেবদের পার্সোনাল নানারকম ডাটা তাতে স্টোর করা থাকে। বড় সাহেবের দুজন পি-এ। একজন বাঙালী। অকাজের। অল্পবয়সী, সুন্দরী। অন্যজন বয়স্কা। গোয়ানীজ। কাজের। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টের ফাজিল ছোকরা অধীর বাগচী বলে, বাঙালী পি-এ ছোট সাহেবের ডানলো-পিলো। এবং গোয়ানীজ পি-এ বড় সাহেবের সন্দর্শনে যাঁরা আসেন তাদের ঝাড়ু। অর্থাৎ ঝ্যাঁটা।

মিসেস্ মিনেজিস্ বললেন, প্লিজ গো ইন্‌সাইড। তুমি কি ঘরে ছিলে না?

বাথরুমে গেছিলাম।

তুমি তো সব সময় বাথরুমেই থাকো। ইণ্টারকমে ডেকেছিলাম পাইনি। তারপর সম্‌রাকে পাঠাতে হল।

না বলে বললাম, দেবী। কী করে জানবে ডায়াবেটিস্ কি জিনিস? যার হয়, সেই-ই জানে। হাঁটু চড়চড় করে, বুক ধড়ফড় আর দিনের এবং রাতের এক-চতুর্থাংশ বাথরুমেই।

ডাক্তার সেন বলেছিলেন, গত বুধবারে; আপনি নোটিস করেননি?

কি? ঘাবড়ে গিয়ে শুধিয়েছিলাম।

তাহলে, করেননি।

মহা ফ্যাসাদ।

কি? বলবেন তো?

সেক্স্ আর্জ কমে যায়নি?

মিসেস্ মিনেজিস্ হেসে ফেললেন।

বললাম, তখন আমারও হাসি পেয়েছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালীর সেক্স আর্জ তো তিরিশেই কমে যায়। যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য হয়, তখন প্রত্যঙ্গ বিশেষের শোবার সময়

হয়ে আসে। এক-দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েই সংসার পালনের কর্তব্যে হিমসিম খেতে হয়। তখন একমাত্র আর্জ বেঁচে-থাকার। বড়ি দিয়ে একটু কচুর শাক অথবা থোড়ের তরকারি অথবা কুঁচো চিংড়ি দিয়ে লাউ খাওয়ার আর্জই সবচেয়ে শৌখিন আর্জ হয়ে দাঁড়ায়। অন্য কোনো আর্জ আর থাকেই না। শুধু আর্জি পেশ করার জন্যই তখন বেঁচে থাকা। সেটাই একমাত্র আর্জ।

মিসেস্ মিনেজিস্ বললেন, তুমি আর না বকে এবার ভিতরে যাও। মেয়েদের সামনে তুমি খুব অসভ্য কথা বল।

আমি হেসে বললাম, তোমরাই সবচেয়ে বেশী এ সব অ্যাপ্রিসিয়েট করো যে!

আমাদের বড়সাহেব নিজগুণে বড়সাহেব হননি। তাঁর বাবা এই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী করে গেছিলেন। তিনি মহান ব্যক্তি ছিলেন। স্যার পি সি রায়ের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক কষ্ট করে এই কোম্পানী গড়েছিলেন। পি সি রায় বড়সাহেবের ঠাকুরদার বন্ধু ছিলেন।

অনেকানেক বড়লোকের অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেদের পদাঙ্কানুসরণ করে বড়সাহেব, সাহেবী আমলের চা-বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়েছিলেন। নেপালী মেয়ে, স্কচ্ হুইস্কী এবং শুয়োরও শিকার করতেন হাফ-প্যান্ট পরে। চমৎকার ইংরিজি গালাগালি শিখেছিলেন। সিগারও খেতেন। কারণ, সাহেবরা সিগার খেয়ে থাকেন। এই দেশে জীবনে উন্নতি করতে হলে যা যা দরকার তার প্রায় সব গুণই রপ্ত করেছিলেন।

বাবা গত হবার পর শেয়ারহোল্ডিং-এর জোরেই কোম্পানীতে এলেন। একেই বলে কপালের লিখন! আড়াই-পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ডিং-এর জোরেই এবং আই-ডি-বি-আই এবং ন্যাশানালাইজড্ ব্যাঙ্কসমূহের মহান ঔদার্যর কল্যাণে বছরে আড়াই লাখ মাইনে ও পার্কস নিয়ে এখন এই কোম্পানীর বড়সাহেব। বড়সাহেব প্রথম দেড় মিনিট অক্সোনিয়ান অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন। দেড় মিনিট অতিক্রান্ত হলেই গোয়ালন্দ অক্সফোর্ডের জবর দখল নেয়। ছোটসাহেবেরও তাই। হরিয়ানার মোষের খাটালের মালিক ছিলেন তাঁর বাবা। তিনি প্রচণ্ড কষ্ট করে আড়াই মিনিট ইংরেজদের বোঝার মত ইংরিজি বলতে পারেন! তারপরই হরিয়ানা ওয়াকওভার পায়। তবে, ছোটসাহেব প্রফেশানাল লোক। তিনিই কোম্পানী মন্থন করেন আর বড়সাহেব মাখন মারেন।

কাম ইন্।

সিগারের বিরতির ফাঁক দিয়ে ধুঁয়োমিশ্রিত ইঞ্জিরি বেরুল।

ঢুকলাম।

প্লীজ প্লেস ইওর ব্লাডি আঁস্ অন্ দ্যা সোফা। লেট মী ফিনিশ। অর্থাৎ কাজ শেষ করবেন আর কী!

মনোযোগ সহকারে চুপ করে বসে অমনোযোগী হবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমার বড়ই অনটন, অনেকই কষ্ট আমার। ডায়াবেটিস, মিনিমাম সেক্স আর্জ; কিন্তু সে-সবের চেয়েও অনেক বড় কষ্ট ভুল ইংরিজি শোনার ও পড়ার। যে গান জানে, সেই-ই জানে; তার সামনে বেসুরে যদি কেউ গান গায় তার কত কষ্ট হয়। যাঁরা জানেন, একমাত্র সেই মুষ্টিমেয় লাস্ট-অফ-দ্যা-মোহিকানস্‌রাই বুঝবেন আমার কষ্টের কথা।

বড়সাহেবের ঘরটা বেজায় ঠাণ্ডা। সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনিং আছে। তারও উপরে দুটি দেড় টনের ভলটাস্ ক্রিস্টাল ঘরটিকে একেবারে শীতের পাহেলগাঁও করে দিয়েছে। বিয়ের পর সেখানে গেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে নতুন বৌ এবং গরম রক্ত ছিল। আজ আমার পরনে ছিটের হাওয়াই শার্ট। রক্তও ব্যাঙের মত ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

বড়সাহেব ইম্পোর্টেড্ সাফারী স্যুট পরেছেন। উঠে গিয়ে সেলার খুলে স্কচ্ হুইস্কী ঢাললেন। সার সার বোতল সাজানো। একেই বলে, কোম্পানীকা মাল।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, অ্যাত্তো হামেলা, অ্যাত্তো হামেলা, আর সজ্জো হয় না, বুইজ্‌লেন মিঃ রায়।

আমি গদগদ মুখে চেয়ে বললাম, বুঝি স্যার। বুঝি কি আর না?

বোঝেন?

পুরো কি আর বুঝি স্যার?

বুঝি, আবার বুঝিও না?

বুঝছি। চুপ কইর‍্যা রহেন।

ফ্যাক্টরীর হেড-দারোয়ান পাহ্‌লান্ সিং বসেছিল বড়সাহেবের সামনের চেয়ারে। সামনেই পুজো আসছে। পুজোর সময় কোন্ কোন্ দারোয়ান ফ্যাক্টরীর পাহারায় থাকবে এবং কারা নাইট-ডিউটি দেবে এই হাইলি কমপ্লিকেটেড সমস্যার সমাধান করতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বড়সাহেব যিনি সুযোগ পেলেই টাইম ম্যানেজমেন্টের উপরে বক্তৃতা ঝাড়েন। একেবারে হিম্‌সিম্ অবস্থা।

এমন সময় ফোনটা বাজল।

ইয়েস্। কে? লাল্‌ওয়ানী?

লাল্‌ওয়ানী আমাদের মাড্রাস ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার। নিশ্চয়ই ট্রাঙ্ককল করেছে।

আজকাল ট্রাঙ্ককল কেউই করেন না ব্যস্ত মানুষেরা। হয়, এস-টি-ডি, না পেলে ডিম্যান্ড, তাও না পেলে লাইটনিং কল। তাছাড়া টেলেক্স আছে, ফ্যাক্স আছে। দাদা মারা যাওয়ার খবরটা সামুকে বম্বেতে দিতে পারলাম না লাইটনিং কল করার পয়সা না থাকায়। ডিম্যান্ড টেলিফোনের লাইন কোনো অপারেটর ওঠায়ই না। আমাদের কোম্পানীর সাহেবরা এবং ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারেরা লাইটনিং কল ছাড়া কথাই বলেন না। কন্‌ফিডেন্সিয়াল কথাবার্তা ছাড়াও, অথবা টেলেক্স খারাপ থাকলেও; লাইটনিং কলের বন্যা হয়ে যায়। কার গেল এল? লাগে টাকা : দেবে গৌরী সেন। লস্ হলে শেয়ারহোল্ডাররা বুঝবে। মাইনে, পার্কস, ইম্পোর্টেড গাড়ি, আলিপুরে লন্-ওয়ালা বাড়ি, প্লাস লন্দ-ফন্দ্ করে রাজার হালে দিন কাটে সাহেবদের। এবং ম্যানেজারদেরও। মালিক চোর হলে কর্মচারীও চোর হয়। চোরঃ, চোরৌ, চোরাঃ।

মিসেস্ মিনেজিস্, প্লীজ টেল লাল্‌ওয়ানী, দ্যাট আই অ্যাম ইন দ্যা মিডস্ট্ অফ্ আ কন্‌ফারেন্স। টেল হিম টু টক টু মী অ্যাট থ্রী পি-এম।

ফোন অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে নামিয়ে রাখলেন বড়সাহেব।

বললেন, কও হে পাহ্‌লান্, খবর কও।

আপ জো বলিয়ে গা ঐসাহি হোগা।

তব্ যেইসা বোলা, ঐসা করো। বোঝ্‌লা কি না?

জী, হুজৌর্।

আর খবর টবর সব ঠিক-ঠাক দিওরে ভাই। আইজকাল গোয়েন্দা না লাগাইয়া উপায় নাই।

পাহ্লান্ কি বুঝল, জানি না। বলল, ঠিক্কে বাত্।

ভাবছিলাম, আজকাল বোঝাবুঝি, জানাজানি এসব সেকেন্ডারী ইম্পর্ট্যান্সের ব্যাপার। তেল লাগানোই প্রাইমারী। তবে ফুটো চেনা চাই। যদি ভুল করে পেট্রোলের ফুটোয় মবিল, আর মবিলের ফুটোয় পেট্রোল পড়ে যায় তাহলেই চিত্তির। পাহ্লান্ ফুটো চেনে। তেলও চেনে।

তব্ ঠিক হ্যায়। ঠিক্ সে কাম করনা। হাম নেহী রহে গা ছুট্টিমে। জারা ব্যাঙ্কক যা রাহা হায়।

পাহ্লান্ হাঁ ক'রে চেয়ে থাকল। ব্যাঙ্ক কথাটা ওর শোনা, ব্যাঙ্কক শোনে নি। ভাবল, ব্যাঙ্কক নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের বাবা অথবা ছেলে হবে। বড়সাহেবকে না-ঘাঁটিয়ে ও বললো, কাম আপ জেরা কম্তি কিজিয়ে। ইত্না কাম করনেসে তবিয়ত গড়্বড়া যায়েগা হুজৌর।

বড়সাহেব হুইস্কীর গ্লাস-ধরা হাতটা কাঁধ সমান তুলে বললেন, কেয়া করেগা পাহ্লান্? দিস ইজ মাই লট্। হাম ঘোড়াকা মাফিক হ্যায়। সম্‌ঝা? কাম করতে করতেই একরোজ ধপ্পাস্।

ঐসা মত্ বোলিয়ে হুজৌর। হুজৌর মাঈ-বাপ। আপ্‌কো কুছ্ হোনেসে হামলোগ বাল-বাচ্চা লেকে ভুখা রহে গা।

ব্যাটা একেবারে ওম পুরীর মত অ্যাকটিং করছে।

সাহেব বললেন, কুছ্ নেহি হোগা।

বলে, আরেকটা হুইস্কী ঢাললেন বড় করে। তোম্ প্রোফেশনাল ম্যানেজমেন্ট কিস্‌কো কহ্তা, জানতা হায়?

হাঁ হুজৌর।

হেড দারোয়ান পাহ্লান্ বললো।

জান্‌তা?

বড়সাহেব আমার দিকে খুশী খুশী মুখে তাকালেন। ভাবটা, দ্যাখো রায়, একবার দ্যাখো, যে কোম্পানীর মূর্খ গুন্ডা দারোয়ান পর্যন্ত প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট কাকে বলে তা জানে; সে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ মারে কে? হোয়াট অ্যান অ্যাচিভমেন্ট।

জানতা? তা বোলো কিস্‌কা কহ্তা?

পাহ্লান্ হেসে ফেলল! পরক্ষণেই মুখটা দুঃখী-দুঃখী দেখাল।

বলল, জানতা, জানতা। হামারা চাচেরা ভাই রামদীন্‌কো হুয়া থা। বিচারী গুজর্ গায়া।

বড়সাহেব প্রচণ্ড শক্‌ড্ হলেন।

বললেন, কেয়া বোল্‌তা তোম্। প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্টসে গুজর গায়া?

হাঁ হুজৌর। ঝুট নেহী বোল্‌তা! মেফেলীয়া ম্যালিগনান্ট হুয়া থা উস্‌কো। চারঠো লেড়্কী। সত্যনাশ হো গায়া।

ই-ই-ইটা কয় কি? মিঃ রায়? পাগলা হইয়া গেল গিয়া নাকি হালায়? আমি কই

প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট্ আর হালায় কয় মেফেলীয়া ম্যালিগন্যান্ট ? হইতেছোটা কি ই-ই-কম্পানীতে ? কন্ তো দেহি ?

বললাম, স্যার, ও ভেবেছে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার কথা বলছেন আপনি।

অ্যাঁ ! কয় কি ? আজই ওরে স্যাক্ করুম আমি।

পাহ্লান গোলমাল হয়েছে বুঝল। তাই মুখের অভিব্যক্তি দুঃখের কি সুখের করবে ঠিক বুঝতে না পেরে গড়ের মাঠের কান-পরিষ্কার করানো দেহাতীর মত উন্মুখ, উৎকর্ণ এবং যাবতীয় উঃ অথচ উদাস মুখ করে এবং হয়ে বড়সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল।

বড়সাহেব বললেন, আপ্ যাও।

পাহ্লান চলে গেলে বড়সাহেব আর একটা হুইস্কী ঢাললেন।

বললেন, এত বড় কোম্পানী চালানো কি চাট্টিখানি কথা। কী স্ট্রেইন, কী স্ট্রেইন ! ইমপোর্ট লাইসেন্স, এক্সপোর্ট ফর্ম্যালিটিজ, এক্সাইজ, ইনকামট্যাক্স, সেলস-ট্যাক্স, ইউনিয়ন, তায় আবার একটায় শানায় না, দুইড্যা ! একেবারে ভীষ্মের শরশয্যার মত অবস্থা মোশয়। যে জানে, সেই-ই জানে। কমু কারে ?

এবারে হতাশ হয়ে রিভলভিং চেয়ারে বসে, আমাকে সামনে এসে বসতে বলে, দুটি পা আমার নাকের সামনে তুলে দিলেন। দেখলাম, ডান পায়ের জুতোর তলায় দলা-পাকানো চ্যুয়িংগাম লেগে আছে একটা। বড় আঠা !

আমার খারাপ লাগলো।

আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নই। হলে, আমিও তালতলার চটিসুদ্ধু পা তুলে দিতাম ওর মুখের সামনে। তখন দিনকাল এত খারাপ ছিলো না। থাকলে, বিদ্যাসাগরের এত নাম-ডাক হত কী না সন্দেহ ! ছেলেটা পার্ট টু দেবে। মেয়ে মাধ্যমিক। পড়াশুনায় অ্যাভারেজ। মেয়েটা দেখতে মায়েরই মত হয়েছে। মানুষ হিসেবে অতি ভালো, কিন্তু দারিদ্র্য, মুখশ্রী ও ফিগারের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে মনুষ্যত্বের কাছে পৌঁছতে কোনো বিবাহযোগ্য ছেলেই চায় না আজকাল। তাই বাধ্য হয়েই বিদ্যাসাগরী প্রতিশোধ নেওয়া থেকে নিবৃত্ত হলাম।

বড়সাহেব হুইস্কীতে চুমুক দিলেন।

ফোনটা আবার বাজল।

ইয়েস। হু ? মালহোত্রা ফ্রম দিল্লী ? প্লীজ টেল হিম্ টু রিং আপ্ ল্যাটার। আই অ্যাম ইন্ দ্যা মিডস্ট্ অফ আ কনফারেন্স্।

ফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন, শালারে আমি স্যাক্ করুম্।

মালহোত্রা আমাদের দিল্লী ব্র্যাঞ্চের সেলস ম্যানেজার। কি হল আবার তার কে জানে ? দারুণ হ্যান্ডসাম ; স্মার্ট ছেলে, দিল্লীর সেন্ট্রাল সেক্রেটারীয়াটের নর্থ ব্লক, সাউথ ব্লকে দারুণ কানেক্শান্। ওই কোম্পানীর লিঁয়াজো ম্যান।

বললাম, কি হল ? বেশী কিছু বলাও যায় না। কালই যে মালহোত্রা আমার ডিপার্টমেন্টের বস্ হয়ে কোলকাতায় পোস্টেড হবে না, কে বলতে পারে ?

সেল্এর উপর অরে ওয়ান পার্সেন্ট কমিশন দিম্যু কইছিলাম। আমারে এক্কেরে পথে বসাইয়া থুইছে।

কেন ?

ষাট লক্ষ টাকার মাল, বাইছা-বাইছা দিল্লীর নোটোরীয়াস সব ঘুঘু-ঘাঘু পার্টিরে দিছে। তাদের থিক্যা দশ পার্সেন্টি ক্যাশ ডিসকাউন্ট নিছে ; কোম্পানী থিক্যাও এক পার্সেন্টি কমিশন। এখন দেখতাছি, সব বোগাস্ পার্টি। এক পয়সাও আদায় অইব না।

সে কি ? কেস করুন স্যার। কেস করে দিন।

কেস ? আরে আমার সলিসিটরের কথা আর কইয়েন না ?

কেন স্যার ?

গোদের উপর দ্যাখেন বিষফোঁড়া। আরেক বিপদ হইছে।

কি স্যার ?

ব্যাড-ডেট ক্লেইম্ করুম তাও নাকি করন্ যাইব না।

কেন স্যার ?

ইনকাম ট্যাক্সের পার্টিকুলার সেকশান নাকি ভীষণ টাইট। আরে, ইনকাম-ট্যাক্সের কোন সেকশান্ডা ঢিলা, তাই আমারে কন দেহি। অডিটরে কইতাছে, তিন বছর পর না অইলে, লিগ্যাল স্টেপস লওয়া যাইবোনা, ইদিকে যে বছরে ব্যাড ডেট হইলো সি বছরে ক্লেম না হইলে ইনক্যামট্যাক্স অ্যালাও করবনা।

ঈসস্। তবে তো অত টাকার উপর ট্যাক্স দিতে হবে।

অইব না তো কি ? ইবারে সারচার্জ আবার বাড়াইয়া থুইল। হালার কোন্ দিকে যে যামু। পাগলা কুত্তা, পাগলা কুত্তা লাগে হময় হময়। এই গভর্নমেন্টরে কিছু কওনের নাই। হক্কলডাই লইয়া লইল।

তাহলে স্যার অন্তত প্রভিশান ফর ব্যাড ডেটস্, করে রাখুন।

হঃ। তাইলে তো অইতই ! সে পথও মাইর্যা রাখছে। ইনকাম ট্যাক্সে প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট্সও অ্যালাও অইব না। আর কয়েন ক্যান ? কইলাম না। এই বাঙালী অডিটররে লইয়াও আর চল্তাছে না। এত্ব পিটির-পিটির ! এত্ব পিটির-পিটির ! আরে মশোয়, সবই যদি ঐ কাঙ্গা-পাল্কিওয়ালার বইয়েতেই লিখা থাকব, তবে আর দুঃখটা আছিল কি ? বইয়ের বাইরেও কি কোনোই প্রভিশান নাই ? হোপলেস্ মশোয় ; হোপলেস্। এক্কেরে হোপলেস্। বাঙালীরা ইক্কেরেই প্র্যাকটিক্যাল, প্র্যাগমাটিক অইল না। নো ওয়াভার ! নিজের দ্যাশের রাজধানীতে নিজেরাই ভিখারি। কুয়ালিটীই নাই। হঃ।

বড়সাহেব আরও একটা হুইস্কী ঢাললেন।

এখন বেশ দ্রবীভূত দেখাচ্ছে সাহেবকে।

বললাম, আমাকে ডেকেছিলেন কেন স্যার, তা তো বললেন না।

তাইই তো। দ্যাখেন। এক্কেরেই মনে পড়তাছে না অখন। আসলে ব্রেইনেরও দোষ নাই। এত্তো ওভারট্যাক্সড্ অইলে সে বিচারাই বা করেটা কি ?

দ্যাখেন তো। এক্কেরেই.......

তাহলে আমি কি চলে যাব ?

না, না, যাইবেন ক্যান ! মনে আইসতা আছে। ধীরে ধীরে, আইসতাছে। খুউবই ধীরে ধীরে। আইব। আইস্যা যাইব গিয়া। বোজলেন, এই পাহ্লানরে স্পাই লাগাইছি। ও রোজ আমারে রাত্রে টেলিফোন কইরা কারখানার খবরা-খবর....। বোজলেন না, ব্যাটা ইংরেজরাই

শিখাইয়া গেল গিয়া....

কি স্যার ?

কি ? ডিভাইড্ অ্যান্ড রুল। দুইডা ইউনিয়ন। এরে টাইট্ কইর‍্যা অরে ঢিলা লাগাই ; আর এরে ঢিলা দিয়া অরে টাইট্।

আপনারে ডাকছিলাম ক্যান ? ক্যান যেন ? আউক্। আইসা যাইব অনে, মনে ঠিকই....এট্টু বহেন না। আপনি কি আইজকার লোক ...ভেরী ওল্ড এমপ্লয়ী—আপনাগো হক্কলের সহযোগিতাতেই তো....।

বলেই বললেন, মিঃ রায়, আপনার পোলাপান কি ?

এক ছেলে এক মেয়ে স্যার।

আপনে কি ইদিশী ?

মানে ?

মানে ক্যালকেশিয়ান ? হঃ। হঃ। আই মীন্ ওয়েস্ট বেঙ্গলেই কি....

না স্যার। আপনাদের দেশেই আমার বাড়ি।

কয়েন কি ? কোথায় ? বড়সাহেব নড়েচড়ে বসলেন।

ঢাকা জেলা, বিক্রমপুর। গ্রাম-মালখাঁনগর।

আপনে বাঙাল ভাষায় কথা কন্ না ক্যান ? যে-বাঙালেরা খেলুম, গেলুম, হালুম-হুলুম, নুন, নেবু, নঙ্কা, নুচি কয়, আমি মশোয় সেগুলারে হেইট্ করি। হে হালারা একের নম্বরের হিপোক্রিট্।

সে কথা সত্যি স্যার। কিন্তু আমার মামাবাড়ি ছিল বর্ধমানে। জানেন তো স্যার কথায় বলে, মাদার-টাঙ। মা ইদিশী কথাই বলতেন, তাইই ছোটবেলা থেকেই....যদিও বাবার বাড়ি....

বুঝছি। বুঝছি। তাহলে তো মশোয় আপনে আমার খুবই ক্লোজ্।

খুবই স্যার। বলতে গেলে, আপনি হলেন গিয়ে আমার ফারস্ট্-কাজিন্। অপরাধ নেবেন না স্যার।

ফারস্ট-কাজিন ? ব্যাপারটা ঠিক বোঝন্ গেল না তো মিস্টার রায়।

স্যার। তাহলে খুলেই বলি। দুজনের এক ঠাকুর্দা হলে ফারস্ট-কাজিনই হয়। হয় তো ?

হয়ই তো। অইব না ক্যান্ ?

মাই গ্রান্ড ফাদার অ্যান্ড ইওর গ্রান্ড ফাদার ওয়্যার ঈটন্-আপ বাই দা সেম্ ম্যান-ইটিং টাইগার ইন বাঙ্গলাদেশ। সুতরাং, স্যার, আপনি আমার ফারস্ট-কাজিন।

হঃ। হঃ। হঃ। হঃ। হঃ ও ও ও ও.....বলে বড়সাহেব টেবল চাপড়াতে চাপড়াতে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, মাই গুডনেস্ হোয়াট অ্যান্ অ্যানালজী। হোয়াট্ আ টেল্ ! হঃ হঃ হঃ।

তারপরেই থেমে বললেন, আমার ঠাকুর্দা যে গ্রেট শিকারি ছিলেন তা আপনে জানলেন ক্যাম্নে ?

সে আমি জানি বলেই না বললাম স্যার। আমার ঠাকুর্দা আপনারই ঠাকুর্দার জমিদারীর সেরেস্তাতে কাজ করতেন। আপনার ঠাকুর্দার সঙ্গে বাখরগঞ্জ সাব-ডিভিশানের সুন্দরবনে

শিকারে গিয়ে দুজনেই একই বাঘের খাদ্য হন।

একি সত্য ? ও এ কি শুনি আমি ?

আলবত সত্যি স্যার ! হান্ড্রেড পারসেন্ট সত্যি। আপনার বাবা এবং কাকা দুজনেই এ ঘটনার কথা জানতেন এবং আমার এখানে চাকরি হবার এও একটা কারণ। আপনাদের বাঙালী প্রীতি এবং বাঘ-প্রীতি।

বাবাই কন্ আর কাকাই কন্ কেউই তো আর নাই।

আমরা তো আছি স্যার। আমি আর আপনি।

ইয়েস্। রাইট উ্য আর। ফারস্ট্ কাজি্ন। মাই গুডনেস্।

বড়সাহেবের চোখের কোণায় জল চিক্‌চিক্ করতে লাগল।

এই বোতলের লাল জলটা বড় ভালো সৃষ্টি সাহেবদের। যখন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা বোতল ছিল হোয়াইট-লেবেলের, তখন রাটনজী অ্যান্ড কোম্পানী থেকে নিয়ে মাঝে মধ্যে আমিও.... দু এক দিন....

বড়সাহেব খুবই দ্রব অবস্থায় উঠে এসে বললেন, মিস্টার রায়।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, বলুন স্যার।

স্যার নয়, স্যার নয়, বলেন জগা। আহা, হেই সব দিন ! বাখরগঞ্জ সাব-ডিভিশান। সেই সব ইস্টিমার ? গারো আর বাদা আর ফ্লোরিকানের কথা মনে নাই ? মনে নাই আপনার ?

খেয়েছে ! মিথ্যাচারিতায় এবারে চাকরিটাই না চলে যায়। ভগবান রক্কা করো ! পথে বসবো ছেলেমেয়ে নিয়ে। যা-পাই তা পাই, এই প্রফেশনালী ম্যানেজড্ কোম্পানীতে কাজ না-করেই তো মাইনে পেয়ে যাচ্ছি। কী ভূতই চাপল যে আমার মাথায়। কেন মরতে এত বড় গুল মারলাম ?

মনে নাই ? খুলনা থিক্যা যেসব ইস্টিমার যাইত ঝালকাঠি, বরিশাল, ভোলা, গোয়ালন্দ, ঢাকা। অঃ, সেই ইল্‌শা মাছের ঝোল আর মুরগি। আমাগো সারেঙ্গদের মত রান্না, যাইই কন্ আর তাইই কন্, পিরথীবির কোথাওই কিন্তু খাই নাই !

আরও একটু চুপ করে থেকে বললেন, আর উ্য হ্যাপী ইন্ মাই কোম্পানী ? মিঃ রায় ?

ইয়েস্ স্যার।

কত পাইতেছেন আপনে ? এত্ত লোক। হক্কলের খবর তো রাখন্ যায় না।

বারোশ স্যার।

বারোশ ? সব পার্কস্ লইয়া ?

হ্যাঁ স্যার।

কত্ব বছর চাকরি অইল ?

বাইশ বছর স্যার।

হোয়াট্ আ শেম্। টপ্-হেভী। টপ্-হেভী। দিস্ মাস্ট বী স্টপড্।

বলেই ইন্টারকম্ তুললেন। বললেন, মিসেস মিনেজিস্, প্লীজ কাম ইন ফর আ সেকেন্ড।

মিসেস মিনেজিস্ এসে দাঁড়ালেন ডিক্‌টেশানের খাতা নিয়ে।

বড়সাহেব বললেন, মিঃ রায়ের মাইনে এইরকম হবে। উইথ ইমীডিয়েট্ এফেক্ট। বেসিক

থ্রী থাউজ্যান্ড। সমস্ত পার্কস এবং পি-এফ-কনট্রিব্যুশন ইত্যাদি প্রোপরশানেটলী বাড়বে। তাছাড়া ভাউচারে আলাদা করে দুশো টাকা কনভেয়্যান্স বলে দেওয়া হবে। আর পুজোর সময়ও দু' হাজার টাকার ক্যাশ-প্যাকেট। চিফ-অ্যাকাউন্ট্যান্টকে বলে দিন পরশু অফিস বন্ধ হবার আগেই যেন এটা দেওয়া হয়। পুজো এসে গেল। শেষের ব্যাপারটা টাইপ করবেন না। বাকিটা টাইপ করে পুট-আপ করুন। এক্ষুনি সই করে দিচ্ছি। ফিনান্স কন্ট্রোলারকে বলবেন, যেন আমার সঙ্গে কথা বলে নেন শেষের ব্যাপারটা নিয়ে।

মিসেস্ মিনেজিস্ চলে গেলে বড়সাহেব বললেন, আর উ্য হ্যাপী মিঃ রায়, মাই ফারস্ট-কাজিন ?

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, কী বলবো জানি না স্যার, আই অ্যাম সো গ্রেটফুল টু উ্য। ইটস্ সো কাইন্ড অফ উ্য !

নট অ্যাট অল্। নট অ্যাট অল্। উ্য শুড ওনলী বী গ্রেটফুল টু গড—টু নান এল্স।

আমাকে কি জন্যে ডেকেছিলেন স্যার ?

আজ আর মনে পড়বে না। পরেই হবে আনে। হয়ত কাল।

ওঁর ঘর থেকে বেরুতে না বেরুতেই মিসেস মিনেজিস বললেন, হোয়াট ট্রিক্ ডিড উ্য প্লে ? মিঃ রায় ? কনগ্রাচুলেশানস্।

আমি হাসলাম।

বললাম, নাথিং। ইটস্ আ গিফ্‌ট অফ গড। রিওয়ার্ড্ অফ এফীসিয়েন্সী।

২

মিনিবাসের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি আজ বাড়ি না ফিরলেও চলত। কারণ রমা বাপী এবং খুকু বর্ধমানে গেছে আজ সকালেই। কাল ফিরবে। তবু মনে হল, বাড়ি গিয়ে একটু একা থাকা দরকার। একা ভাবার। তাইই একই সময়ে বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালাম।

আমার বড়সাহেব মানুষটাকে এতদিন মানুষ বলেই গণ্য করিনি। টা সত্যি কথা যে মানুষটার জীবনে যোগ্যতার তুলনাতে প্রাপ্তি অনেকই বেশি। কিন্তু আজ যা ঘটল, তাতে আমিও তো কাজ না করে অযোগ্যতম মানুষ হয়েও অনেক বেশী প্রাপ্তির শরিক হলাম।

মিনিবাসের লাইনটা ছোট হয়ে আসছে। এর পরের বাসেই হয়ত আমার জায়গা হবে। যার ভাগ্য ভাল, সে সামনের দিকে জানালার পাশের সীট পাবে। যার ভাল না, সে পিছনের দিকে। ঘামের গন্ধে আর ঘামে গা বমি-বমি করবে তার। ভাগ্যকে মানতেই হয়। যোগ্যতা ছাড়াও আমার বা আমার বড়সাহেবের হয়ত চলে যায়, কিন্তু ভাগ্য ছাড়া যোগ্য মানুষদেরও চলে না। কোনো কিছুই জোটে না কপালে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ডাকল।

এই যে দাদা ! খবর ভাল ? সেদিন 'গান্ধী'র টিকিট পেলেন ?

পিছন ফিরে তাকালাম। সেই লোকটা !

এর নাম জানি না আমি। কিন্তু অফিস থেকে ফেরার সময় প্রায় রোজই.... হয় একই মিনিবাসে বা আগে পরের বাসে আসি আমরা। লোকটা এ-জি-বেঙ্গলে কাজ করে।

লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। তাকে প্রায়ই দেখেছি, বৃদ্ধ, এমনকি মহিলা সহযাত্রীকেও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সীটে বসে পড়তে। এতদিনই দেখেছি, এতবার যে, লোকটা আমার কাছে ক্ষুদ্রতা, ইতরামির, আত্মসম্মান-জ্ঞানহীনতার প্রতীক হয়ে গেছে।

পাশ থেকে দৌড়ে এসে ব্রতীন ডাকল, এই যে, রায়দা। বড়দাকে একটু খবর দিয়ে দেবেন না রাণুর জ্বরটা খুবই বেড়েছে। ডাক্তার সন্দেহ করছেন এন্‌কেফেলাইটিস। আজই বোধহয় হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে।

তারপর চলে যেতে গিয়েও ও ফিরে দাঁড়াল। আমার হাতটা হাতে নিল, বলল, কন্‌গ্রাচুলেশানস্‌। আপনার ইনক্রীমেন্টের খবরটা অফিস থেকে বেরুবার ঠিক আগেই পেলাম।

বলতে গেলাম, থ্যাঙ্ক উ্য।

কিন্তু বলতে পারলাম না।

আসলে, ব্রতীনেরই বাড়ি মালখাঁনগরে, বিক্রমপুরে, ঢাকা জেলায়। ওর দাদুই ছিলেন আমাদের বড়সাহেবের দাদুর কর্মচারী। এবং মারাও যান বাঘেরই পেটে দুজনে একসঙ্গে বাঘ শিকারে গিয়ে। ব্রতীনরা উদ্বাস্তু হয়ে এসে চাকদহে কোনক্রমে মাথা-গোঁজার মত আশ্রয় করেছে একটু। ওর ছোটভাই সেদিনই হাওড়ার কাছে ট্রেন অ্যাক্‌সিডেন্টে মারা গেছে। সিঙ্গুরের এক বিড়ি কোম্পানীতে কাজ করত। রাণু সেই ভাইয়েরই মেয়ে। ভাইয়ের যুবতী স্ত্রী ও নাবালিকা দুই ছেলেমেয়েও এখন ওরই দায়িত্বে। ব্রতীন আমার ডিপার্টমেন্টেই আছে। খুবই পরিশ্রমী ছেলে। দোষের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ রেগে যায়। বাঙালদের যা দোষ! কিন্তু এরকম বিবেকবান সৎ ছেলে আজকাল দেখা যায় না।

ব্রতীন দৌড়ে দৌড়ে চলে গেল। সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু দিয়ে গিয়ে, গলি দিয়ে শর্টকাট করে ও বউবাজার স্ট্রীট ধরে শেয়ালদাতে গিয়ে ট্রেন ধরবে। মিনিবাসের ভাড়া দেবার সামর্থ্য, ভাই মারা যাবার পর ওর আর নেই।

পেছন থেকে লোকটা আবার ডাকল, এই যে দাদা, আসছে এবারে। একটু গুঁতো-গুঁতি করে এগোন। আপনি যেন জমিদারী স্টাইলে হাঁটেন, চলেন। জমিদারী ছিলো না কি?

উত্তর দিলাম না কোনো।

না। জমিদারী ছিলো না। তবে বর্ধমানে এখনও জমিজমা আছে বেশ কিছু। মামাবাড়ি কাটোয়াতে। দেশ ভাগের আঁচ আমাদের গায়ে লাগেনি। এখনও লাগে না; যতটা ব্রতীনদের লাগে। তবে জনসংখ্যার চাপ আর ইনফ্লেশানের আঁচ কারই বা না লেগেছে! উত্তর না দিয়ে মনে মনে বললাম।

লোকটা বলল, চলুন, চলুন, এগোন। মিনিবাসে উঠতে উঠতে নিজের উপরই বড় ঘেন্না হল নিজের। ভাবলাম, কাল সকালেই গিয়ে বড়সাহেবকে সত্যি কথা বলে এই ইনক্রিমেন্টটা ব্রতীনকে পাইয়ে দেব।

লোকটা নেমে গেল ভবানীপুর। রোজ যেখানে নামে। টালীগঞ্জে আমার স্টপে নেমে, কিছুটা হেঁটে; বাড়ি পৌঁছলাম। পচার মাকে চা করতে বলে, ...নে গেলাম। চা করে দিয়ে পচার মা চলে গেল। বলে গেল, খাবার টেব্‌লে ঢাকা আছে। জনতাতে যেন গরম করে নিই খাবার আগে।

জানলার পাশে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম, ব্রতীন হেরে গেছে। হেরে রয়েছে। এবং হেরে থাকবে ভাগ্যের দুর্বলতায়। অযোগ্য যে, সে অনেক সময়ই হেরে যায় যোগ্যের কাছে। স্বাভাবিক নিয়মে সেটাই হওয়ার কথা। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটে যখন যোগ্যের হাতে ভাগ্য হাত রাখেন না। সেখানে ব্রতীনের মত যোগ্য হেরে যায় অনেক অযোগ্যের কাছেই।

কিন্তু আমি ? আমি তো যোগ্য নই ? আমি তো ভালোও নই। বড়সাহেব অযোগ্য নিশ্চয়ই ; কিন্তু মানুষটা ভালো। আমি যে না-যোগ্যতা না-সততার হাত ধরে পুরস্কৃত হলাম আজকে। আমি তো সেই এ-জি-বেঙ্গলে চাকরি করা মিনিবাসের লোকটারই মতো।

আমি এও জানি যে, কাল আমি গিয়ে বড়সাহেবকে কিছুই বলব না। কারণ জীবনের দাবার ছকে মিথ্যের দান একবার দেওয়া হয়ে গেলে জীবনে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

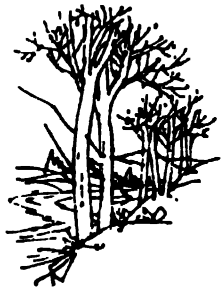
রমা কাল ফিরে যখন আমার সুখবরের কথা শুনবে, তখন চোখ নাচিয়ে বলবে, "ম্যানেজ করলে কি করে ?"

ওর চোখে-মুখেও একজন খল, ইতর মানুষের স্ত্রীর মতই যেন-তেন-প্রকারেণ সুখে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ঝিলিক্ মেরে যাবে। নারীরাও, পুরুষদের মতই বড় লোভী হয়ে গেছে আজকাল। মনে হলো আমার।

ঠিক করলাম, রমাকে আমি উত্তরে ধমক দেব।

বলব, ও কী কথা ! তোমার কাছে এরকম এক্সপেক্ট করিনি। "ম্যানেজ করা"র কি আছে ? আমি ডিসার্ভ করি ; যোগ্য বলেই....

সাইকেল



তুমুল বর্ষা। চারা বুইবার সময় আসতে না আসতেই যেন ভাদ্রর শেষের মত এক হাঁটু জল মাঠে। গত বছর খরা গেল। এবারে অতিবর্ষণ। মানুষকে আর বাঁচতে দেবে না।

শালোপাড়া গ্রামটা ছোটই। বেশ বেশিই ছোট। কাছেই অবশ্য আছে, হুকলিঝাড়। বিরাট ব্যাপার সেখানে। বড় বড় আড়তদার। চারদিকে শয়ে শয়ে মাইল ধানক্ষেত আর রাইস মিল। এফ সি আই-এর গোডাউন। ট্রেনের স্টেশন। ঐ হুকলিঝাড়ের সঙ্গেই শালোপাড়ার নাড়ি বাঁধা। এখানের লাউটা, কুমড়োটা, মাগুরটা-সিংগিটা, সেই সবই গিয়ে জড়ো হয় শনিবারের হুকলিঝাড়ের হাটে। বদ্দমানের বড়মানষিরা ছুটি-ছাটার দিন হলেই গাড়ি নে চলে আসে ফিসটি করতে, ঘুরতে ফিরতে, মালোপাড়ার নির্জনে। এঁটেল মাটির বর্ডার দেওয়া পিচ-এর রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সন্ধের মুখে জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকে বড়লোকের ব্যাটা-বিটিরা, ছিন-ছিনারি দেকে। কেউ কেউ বোতল খুলে ঢুকুঢুকু খায়।

রাত আটটা হয়ে গেলো। এখনও যমুনা ঘরে এলো না।

কেতো বালিশের তলাতে-রাখা ঘড়িটা দেখলো। তার বিয়ের সময় সেনবাবুদের খামারের ম্যানেজারবাবু এটা দেছলেন। এইচ. এম. টি. ঘড়ি একটা। কেতোর জীবনের সব চেয়ে দামী সম্পত্তি। যখের ধনের মত আগলে রাখে ও সব সময় এই ঘড়িটাকে।

যমুনা গেসলো তার বাপের বাড়িতে নবীনপুর-এ। গেসলো, পড়শু। আজ বিকেল বিকেল যমুনার দাদা তাকে পোঁছে দে গেছে। এতক্ষণে তো কাজকম্মি সেরে খাওয়াদাওয়া করে ঘরে আসা উচিত। বাইশ বছরের কেতোর ধৈর্য ধরে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট ছটফট করে। নতুন জল-পাওয়া মাঠে ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। গাছে গাছে সবুজ তারার টায়রার মত জোনাকির ফুল দোলে। মাটির ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে এসব দেকে-টেকে সময় কাটাবার উপায় খোঁজে কেতো। দুসস্ শালা! তবু, সময় কি কাটে? নতুন বউকে দিয়ে এত কী কাজ করায় বাবা আর পুঁটিদি তা তারাই জানে। মোটে ছ' মাস বিয়ে হয়েছে কেতোর।

কেতোর মনে পড়ে, হাবা বলেছিলো এক দিন। পাঠশালা তো আজকাল নেই। প্রাইমারি স্কুলে যখন পড়ত ওরা, তখন হাবাকে একদিন মাস্টের জিগগেস করেছিলো, বলতো বাবা হাবা, 'বিহ্বলতা' শব্দের মানে কী?

হাবা অনেকক্ষণ হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরই মাস্টের বলেছিলো, যাঃ বাবা। এ যে দেখছি বিবিই পালিয়ে যাবে। গা গরম করতে করতে, বিবিই পালাবে।

বিহ্বলতা-টিহ্বলতা শেখবার জন্যে হাবা কি কেতোরা স্কুলে যায়নি। আমন-বোরোর সোজা হিসেব। তাই-চুং, আই. আর. এইট-এর কিলো কষা। ফলিডল, ইউরিয়া, খোল এসব কিছুর হিসেব-নিকেশ করতে পারা। পাইকার যাতে না ঠকিয়ে দেয় তাই গুণ ভাগ যোগ বিয়োগটা জানা। স্কুলে, আসলে যাওয়া ; নিজের নামটা ভালো করে সই করতে জানতে। পঞ্চায়েতে গিয়ে খপরের কাগজও পড়ে আসতে পারে। আজকাল অবশ্যি রেডিওর খপর শুনলেই সব জানা যায়। ঘরে ঘরে টানজিস্টার, তবু টি.ভি.ও হোয়েছেন হেথা হোথা। কেতো তো পারেই, শ্রীবাবু কার্তিকচন্দ্র পোড়েল বলে নাম সই করতে। এমনকি হাবাও পারে। শ্রীল শ্রীযুক্ত হাবা সাপুই। হাবা তো যেখানেই পারে, সেখানেই একটা করে সই মেরে দেয়। ডিসটিকট বোরডের কাঁচা রাস্তায়, পদ্মদীঘির জলে, এমনকি সনাতন মাঝির বাড়ির উঠোন যখন পাকা করতেছিলো বদ্দমানের রাজমিস্তিরা তখন সেই থকথকে সিমেন্টের মধ্যেও আঙুল চালিয়ে লিকে রেকেছিল শ্রীল শ্রীযুক্ত হাবা সাপুই। সিমেন্ট জমাট বেঁধে যেতেই চিত্তির ! সনাতন মাঝির মাথায় হাত ! উঠোনে ঢুকতেই বড় বড় করে সিমেন্টের মধ্যে লেখা শ্রীল শ্রীযুক্ত হাবা সাপুই। সনাতন মাঝি রেগে গিয়ে বলেছিলো, শালা ! এই ছোটলোক ইনইডুকেটিডদের গেরামে আর লয়। জান কইলা হয়ে গেলো গো !

এমন সময় ঝুনঝুন করে চুড়ির শব্দ হলো। সোনার নয়। লোহা, শাঁখা আর গিল্‌টি করা কেমিক্যাল গয়না তার বৌ-এর গায়ে। যমুনার বাবা মা নেই। দাদা বৌদি যা না দিয়ে পারেনি তাই-ই দিয়েছে। আর কেতোর বাবা হাড় কেপ্পন। তিনিও কিছুই দেননি। খাইয়েছিলেন পঁচিশ জনাকে। তাও অতি সাদামাটা।

কেতো উঠে বসল বিছানাতে। যমুনা একটা কালো আর হলুদ ডুরে শাড়ি পড়েছে। এইটেই তার সব চেয়ে ভালোবাসার শাড়ি। আর যা আছে, সবই আটপৌরে। আজ বাপের বাড়ি গেসলো বলে শায়া আর বেলাউজও পরে গেছিলো। অন্য দিন শুধু গায়েই শাড়ি জড়িয়ে থাকে। ঘরে ঢুকেই, তাড়াতাড়ি, দরজা বন্ধ করলো। হ্যারিক্যানের আলোটা পড়েছে যমুনার কালো মস্ত বড় খোঁপাটাতে আর শাড়ির পেছনে। ছ' মাসের পুরনো বউ, তবু শালা যেন রোজ রাতেই মনে হয় আনকোরা নতুন। যমুনার গায়ে পদ্মদীঘির শাপলার গন্ধ। তার বুকের মধ্যে যখন ওর নিজের ঠোঁট চেপে ধরে কেতো, তখন মনে হয় ডাগর ডাগর পদ্ম দুটির মধ্যে থেকে পদ্মবীজই কুড়িয়ে খাচ্ছে যেন। কত সব গন্ধ, দৃশ্য ; বার বার দেকে-শুঁকেও ফুরোয় না। আলো জ্বালায়ে দেকেছে, আলো নিভায়ে দেকেছে, দিনের আলোয়, চাঁদের আলোয়, কনে-দেখা আলোয় সব রকম করে দেকেও দেকা ফুরোয়নি কেতোর। আশ মেটেনি। কে জানে ! নতুন বউ পুরনো হতে কত দিন লাগে ? যমুনাকে বড় ভালোবাসে কেতো। যমুনা ছাড়া তার আর কেউই নেই। কেউই তাকে এত ভালোবাসেনি।

যমুনাকে কি ? নাকি যমুনার শরীরটাকেই ? ঐ হলো ! অতশত ভাবে না কেতো। ভাবার সময় কুথায় ?

যমুনা ঘুরে দাঁড়ালো। দরজাতে পিঠ দিয়ে।

কী ? হল কেমন ? বাপেরবাড়ি গিয়ে মন ভরল ?

উত্তর না দিয়ে যমুনা বলল, গলা নামিয়ে ; বাতিটা নিবোবে ? শাড়ি জামা ছাড়তাম।

না, না। ধমক দিয়ে বললো কেতো, চিতি সাপ আছে গো ! কাল তুই ছিলি না যমুনে,

ঘরে ঢুকেই দেখি, চিতি সাপ। চেঁদো দাদাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নে দুজনে মিলে তাকে মারি।

সত্যি? ঘরের মধ্যে চিতি! বল কী গো?

অবিশ্বাসী গলায় ষোল বছরের যমুনা বললো, কালো ভ্রমরের মত দুটি উজ্জ্বল চোখ তুলে।

না তো কী? আমি কি তোর ইয়ার্কির পাত্র?

মুখ নামিয়ে যমুনা বললো, না। তুমি আমার পতিদেব। আমার দেবতা, সর্বস্ব আমার।

খোল শাড়ি জামা। আলো আরো তুলে ধরছি আমি। দেখবো। দেখে দেখে আশ মেটে না। কী দিয়ে গড়েছে তোকে রে বিধি? ভাবি আমি।

লজ্জা পেয়ে যমুনা বললো, কেন? না। আলো নামাও।

না।

না, না। লক্ষ্মী নামাও।

না কেন রে? কেন না?

কেতে বললো, তোকে দেখবো। ভালো করে দেখবো। আজ তোকে শাড়ি জামা জড়ির ফিতে বেণীতে জড়িয়েই এত ভালো দেখাচ্ছে, সব ছেড়ে ফেললে না জানি আরও কত ভালো দেখাবে। না রে।

ধ্যাত্...।

লজ্জা পেয়ে বললো যমুনা।

বলেই, যমুনা ঘরের এক কোণাতে, যেখানে দুটি ছেঁড়া শাড়ির পাড়ের চাদর-ঢাকা তোরঙ্গ পর পর সাজানো আছে, সেখানের আবছা অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে চকিতে অনাবৃত করেই বাড়িতে পরার চাঁপা রঙা একটি শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিলো। উদলা গায়ে। বাদলা-রাতে গা-শিরশির করে উঠলো ওর। শিরশির করে নানা কারণে।

কেতো, মনে মনে বললো, বাঃ রে। এ যে দেখি বহুরূপী। কালো আর হলুদ শাড়িতে ছিল বসন্ত-বৌরি আর এখন হয়ে গেলো সাঁঝবেলাকার ফিনফিনে চাঁপারঙা জল-ফড়িং। মস্ত ফড়িং। যাঃ মাইরী!

যমুনা খাটে আসতে গড়িমসি করছিল। বিনুনি থেকে রুপোলি জরির ফিতে খুলছিল। আস্তে আস্তে। ডানদিকের বেণী থেকে খোলা হয়েছে সবে, কেতো একলাফে খাট থেকে নেমে ঝড়ের মত গিয়ে পড়ল তার উপর। পাঁজাকোলা করে যমুনাকে তুলে নে এসে খাটের উপর ফেলল দড়াম করে। মাটির ঘর কেঁপে উঠল যেন।

তারপর? তারপর, যাহয় তাইই...

মাটির ঘর সোহাগে কাঁপতে লাগল।

বাইরে আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। এখন ওরা পাশাপাশি শুয়ে আছে। কাত হয়ে, যমুনাকে জড়িয়ে আছে কেতো, পেছন থেকে।

কেতো বললো, সাইকেল? কথা হলো কি কিছু?

উঁ?

সাইকেলটার কথা তোর বড়দাদা কী বলল?

জানি না।

তার মানে "না" বলেছে। কী?

ঠিক তাও না। ঝুলিয়ে রেখেছে। বুঝছে না আমার ভাগ্য, আমার সুখ, সব ঝুলছে সেই সঙ্গে। জোর তো নেই। সৎ দাদা।

না তো কী ? গত ছ' মাস ধরে এমনই ঘুরোচ্ছে তারা। এদিকে বাবা কিন্তু রেগে যাচ্ছে রোজ রোজ। এক দিন সত্যি করে চটে উঠলেই, কম্মো শেষ।

যমুনার ডান বুকের উপর ডান হাত কেতোর। চাষার হাত। রুক্ষ, কর্কশ, মোটা চামড়ার তেলো। কিন্তু যমুনার শরীরে তো এর আগে অন্য কেউই হাত দেয়নি। যমুনার এইই খুব ভালো লাগে। কেতো তাকে খুব ভালোবাসে। অন্তত তার শরীরটাকে। ঐ হলো ! ওতেই খুব খুশী যমুনা। ছোটবেলায় মা-বাবা মরা মেয়ে আদর কাকে বলে তাইই জানেনি কখনও। কোনোরকম আদরই নয়। তার কাছে শরীরের আদরও অনেক আদর। কাজকর্ম খাটাখাটুনির মধ্যে ডুবে গিয়ে কখন কেতোর সোহাগ খাবে ঘরে গিয়ে, সেই আশায় প্রদীপের সলতের মত কাঁপে যমুনা।

মাঝে মাঝেই কেতো তাকে ভয় দেখায়। "বাবা যেদিন সত্যিকারের চটে উঠবে" সেদিনই "কম্মো শেষ" বলতে ঠিক কী যে বোঝায় কেতো, তা জানে না যমুনা। কিন্তু কেতোর বাবার মিথ্যা রাগ দেখেই তার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় ভয়ে। পাখির মত টিপ টিপ করে তার বুক। জানে না, সত্যিকারের রাগের দিন কী হবে ?

আজ বাবা কি কিছু বলল ? তোমার দাদাকে ? এসেছিল কোন্ দাদা ? মেজদা ? আমি তো ছিলাম না। যত্ন-আত্তি করা হল কি কিছু ?

যত্ন-আত্তির কথা ছাড়ো। গরিব বৌ-এর বাড়ির লোককে কে যত্ন-আত্তি করে ? তবে বাবা মেজদাকে বললেন, যা বলেন। বিয়ের দিন থেকেই যা বলছেন। কথার খেলাপ তো হয়েইছে। তোমাকে সাইকেল দেবে বলেছিলো, দিতে পারেনি।

ছাড়ো তো ! আমার লাগবে না। আরে পাম্পটা বসুকই না, তিনচার বছরের মধ্যে ধান করে, গম করে, এমনকি আলুও করে আমি নিজেই একটা ভট্‌ভটি কিনে নেব।

সত্যি ? ভট্‌ভটি সাইকেল ? হলুদ কালো ডোরা ডোরা।

বিছানাতে উঠে বসার চেষ্টা করলো যমুনা, উত্তেজনায়।

কেতো তাকে কোলবালিশ করে উরু দিয়ে চেপে বলল, শোনোই না।

কী রঙের ? হলুদ-কালো তো ?

যে রঙের চাইবি। কেনার আগে তোকে শুধিয়ে নেব :

পেচনে আমি বসতে পারবো ? কী গো ? ছিট থাকবে তো ?

নিশ্চয়ই !

আমাকে পেচনে বসিয়ে আমাদের গেরামে যেতে পারবে ?

নিশ্চয়ই। পারবো না কেন ? কত জায়গায় যাবো। তোকে ডি. ভি. সি.'র ক্যানাল দেখিয়ে আনবো। দুগগাপুর। কত বড় শহর গো ! আগে যেইতে পথে মস্ত বড় বন পড়তো। ডাকাইতি হত সিখানে। কেঁদো বাঘ ছিলো। দাদুর কাছে শুনেছি।

আচ্ছা ! যমুনা ফিসফিস করে বলল, একটা কথা বলবো, রাগ করবে না বলো ?

কী ?

তোমার দাদু কি ঐ দুগগাপুরের বনে ডাকাতি কইরেই সব জমি-জমা ডাল-ভাঙাই কল,

ইসব কইরেছেন ?

তোকে কে বইলেচে ?

আমাদের গেরামের লোকেরা বলে। আরও বলে, তোমার বাবা নাকি এখন চাষ-বাস ছেইড়ে দে ওয়াগন-ভাঙাদের দলে নাম নিকিয়েছে। খুব নাকি লাভ সিখানে। কাঁচা টাকা। ইসব কাজ কারবার নাকি খুবই ডিঞ্জারাস। সবাই বলে। সত্যি ?

এমন সময় হঠাৎ ওদের মাথার কাছের জানালার একেবারে পাশেই শব্দ হল একটা।

কেরে ?

বলেই, উঠলো কেতো। খাট ছেড়ে, বৌ-এর গায়ের গন্ধ ছেড়ে দরজার খিল খুলল, হাতে বর্শাটা তুলে নিয়েই। যমুনাও দৌড়ে গেছিলো পেছন পেছন। তারপরই সে উদোম এ কথা মনে পড়াতেই খাটের বাজুতে ঝুলিয়ে রাখা শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে বললো, কেতোকে জড়িয়ে ধরে, তুম্মি যিও না গো।

একটা টর্চ থাকলি।

এটাই লাও।

বলেই, যমুনা তাড়াতাড়ি তার ঝুলি থেকে টর্চটা দিল।

দরজা খুলে চারধারে আলো ফেলে কাউকেই দেখতে পেলো না কেতো। শুধু দেখল, দুবার কেশে, তার বাবা উঠোন থেকে ঘরের দিকে যাচ্ছেন খুব আস্তে আস্তে। কেতোর মনে হল, একটা মস্ত খরিশ গোখরো যেন ঢুকছে তার গর্তে গিয়ে।

দরজা খোলার শব্দ হওয়াতে ও পিঠে আলো পড়াতে ঘুরে দাঁড়িয়ে কেতোর বাপ গণশা পোড়েল বলল, কে ? ও কেতো। কী হল ? এত রাতে ? বউমার শরীর কি খারাপ ?

নাঃ।

কেতো বলল। শব্দ হয়েছিলো একটা।

তুই কি শহুরে হয়ে গেলি বাপ ? গ্রামের রাতে কত শব্দই তো হয়। শব্দ হলেই রাত-বিরেতে ছেলেমানুষ জোয়ান বউকে একা ঘরে ফেলে কেউ এমন বেরোয় রাতে ? তুই কীরে ? তোর কি আক্কেল হবে না ? কোন দিন দেখবি বউই তুলে নিয়ে গেছে ডাকাতে। তোর বয়স হল দেদার, বুদ্ধি হল না এক ফোঁটা।

না। শব্দ শুনলাম। একেবারে জানলার পাশেই। তাই।

শ্যাল-ট্যাল হবে।

নাঃ। শ্যাল না।

তবে ?

তবে...

তবে কি বাঘ ?

বাঘ !

হ্যাঁ শ্যাল না হলে নিশ্চয়ই বাঘ। এত ভয় যখন পেয়েছিস।

কেতো কোন জবাব দিতে পারলো না। চুপ করে রইলো।

ফিরে আসছিলো, এমন সময় বাপ গণশা বললো, কাল বদ্দমানে যেতে হবে। মনে আছে তো ?

হ্যাঁ।

সকালে দুটি খেয়েই বেরিয়ে যাস। এস. ডি. ও. সাবের জন্যে এক হাঁড়ি কই মাছ রেখে দেচি। মালোকে বলেছিলাম দে যেতে। নে যাস, যাবার সময়।

ঠিক আচে।

বলল, কেতো।

ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করেই খাটে এলো। যমুনা উঠে বসেছিলো। বললো, আমার ভয় করে। খুব ভয় করে গো।

আমারও।

কেতো বললো।

তোমারও ? কেন ? বাঘ-এর জন্যে ?

না।

শ্যালকে ভয় ?

নাঃ।

তবে ?

আছে।

আমার ভয় করে গো।

সাবধানে থেকো। কাল আমার বদ্দমানে যেতে হবে। বাবার অডডার।

পরদিন ভোরে উঠে কেতোকে ডেকে গণশা বললো, সাইকেল-এর কথা কিছু জানিস ?

চমকে উঠল কেতো ? বললো, কেন ? যমুনার দাদা কিছু বলেনি ?

সে তো গত ছ'মাস ধরে যা বলার বলেই চলেছে। কথাতে তো আর চিঁড়ে ভিজবে না। যমুনের বড়দাদা শুনেছি খুবই ফেরেববাজ নোক। গণশা-পোড়েল-এর ছেলের বে কি ঐ হাভাতে ঘর ছাড়া আমি দিতে পারতাম না ? দ্যাখ কেতো, আমার এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্কেরম হতিচে। ইর পর, কিছু হলে আমাদিগের দোষ নাই। কো দোষই নাই।

তারপরই বললো, তোর সোজা আর বদ্দমান যেয়ে কাজ নাই। তুই যমুনের বাপেরবাড়ি যা আগে তারচে। সিখান থেকে বদ্দমানে চইলে যাস বাসে। একটো চিঠি দে দেবো। ছোট দারোগার বাড়িতে ওলাচণ্ডিপুরে রাতটা থেকে দুজনে একই সঙ্গে ভোর ভোর চইলে আসিস। ছোট দারোগার তো ভটভটিও আছে। হাওয়ার মত পৌঁছে যাবি।

কেতো ব্যাপার কিছুই বুঝলো না। তবে কোনো একটা ব্যাপার যে ঘটতে যাচ্ছে, তা অনুমান করতে পারলো। তার মায়ের মৃত্যুর আগের দিন এমন নানা রহস্য ঘটিয়েছিল তার বাবা। এই শালা বাবাকে ভক্তি ছেরেদ্দা তো করেই না, ঘেন্না করে কেতো। পেচণ্ড ঘেন্না। মাকে খুন করেছিলো বাপ।

যমুনা গত সপ্তাহে একদিন বলেছিলো, পুঁটিদিটা না থাকলে, এ বাড়িতে থাকাই যেতো না। তোমার বাবার স্বভাব-চরিত্তর যেন কী রকম।

কেতো জানে সবই। তবু মুখে অবাক হওয়ার ভান করে বলেছিলো হেসে, পাগল নাকি। বউ হয়ে শ্বশুরের চরিত্তর খুঁত ধরছিস ? হয়েছেটা কী ? তোর সাহস তো কম নয়।

না গো ! হয়নি কিছুই। কিন্তুক হতে পারে।

কী ?

কিছু। যকন-তকন হতে পারে।

সাইকেল, বাবা নিজে চড়ে না। আসলে ঝিলের পাশে যে বাগদী দিদির ঘর আছে সেইখানেই যাবে এ সাইকেল। পণের সাইকেল। ঝুমকি বাগদীর বড় ছেলে চড়বে সে সাইকেলে। কানাঘুষোয় শুনেছে কেতো যে, সেই ছেলে, তার নাম লালচাঁদ, নাকি তারই বাপের ছেলে।

শোনে। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেয়। এখনও স্বাবলম্বী হয়নি কেতো। বাবা যদি সত্যিকারের রেগে ওঠে, তখন কেস কেচাইন্ হয়ে যাবে। কী করবে ? কেতো নিরুপায়। ব''পর বেগার খাটা দিনমজুর। দুটি খেতে পায়, মাথায় ছাদ আছে ; এই যা।

যমুনা কাতর গলায় বলল, আমাকেও নিয়ে চলো। তোমার সঙ্গে।

কী করে ? বাবা যদি "সত্যিকারের রেগে যায়" ? থাক তুই ? তা ছাড়া আমি কত কত জায়গায় যাবো। রাতে কোতা থাকব তারই ঠিক লাই।

যমুনার চোখে ভীষণ ভয় দেখল কেতো।

একা ঘরে শুতে পারবি ?

ভাবছি, পুঁটিদিদিকে ডেকে নেব।

বাবা বলছিলো, তোর একা হয়তো ভয় করতে পারে, রাতটা তুই বাবার ঘরেই কাট্যাস। মস্ত ঘর। মস্ত বিছানা। নইলে, বাবাও এসে থাকতে পারে তোর ঘরে। বাবার কাছে যন্তর আছে।

কী যন্তর ?

চোখ বড় বড় করে যমুনা শুধোয়।

যন্তর। হিঃ। হিঃ। কোমরে গোঁজা থাকে। তবে লাইসেন্স লাই। আর কেউই জানে না। আমি একদিন দেখে ফেলেছিলাম। যখনই বদ্দমান যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় বাপ আমার।

আমি শোবো না।

কোথায় ?

তোমার বাবার ঘরে।

তাহলে, বাবাই আসবে তোর ঘরে।

একদম না। মানা করে দিয়ে যাও।

কেন ? সে কী ?

না, বলেছি না। তোমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়নি।

হুঁ। আমাকে অমন বউয়ের আঁচল ধরা মরদ পাওনি যে বউ যা বলবে, তাইই শুনব। আমি নিজের বুদ্ধিতে চলি। হুঁ।

কথাটা, তার বাবা গণশা পোড়েল মাকে উঠতে-বসতে শোনাতো। এই বাড়িতে মেয়েরা খেজুরের রস, জিয়োনো মাগুর অথবা তালক্ষীরেরই মত এক ধরনের খাদ্য-পানীয়-ভোগ্য ব্যাপার ছিল। ছোটবেলা থেকেই দেকেছে। মেয়েদের কতা শুনে চলা, এ বাড়িতে

পুরুষত্বহীনতারই সামিল।

যমুনা কিছু না বলে, চেয়ে থাকলো অনেকক্ষণ কেতোর মুখে।

বিড়বিড় করে বললো, আমার চেয়ে একটা সাইকেলের দাম বেশি হলো?

কেতো বিজ্ঞের মত বললো, সে কতা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে কথার খেলাপ। তোর বড়দাদা সব জেনেশুনেই, আমার বাবা লোক খারাপ জেনেও তার সঙ্গে মিথ্যাচার কেন করতে গেল, বলতো? এতে তোর বা আমার কোন উপগারটা হলো? গণশা পোড়েল এক কথার নোক। সে যদি বলে কোথাও যাবে, তাহলে সে না যেতে পারলে তার ডেডবডিও সেখানে যাবে। অন্যায় তার তো নয়। তোর বড়দাদা এমন কতা দিয়ে আজ ছ'মাস ঘোরাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে বাবার জিদ চেপে গেছে। কালও যদি সাইকেল না আসে তো বাবা সত্যিকারের নেগে যাবে। বড় জিদ্দি লোক সে। আর সত্যিকারের নেগে...

কাল কেন, কোনোদিনও সাইকেল দেবে না বড়দা।

মুখ নিচু করে যমুনা বললো।

সে কী? কত্ত কথা আমার সঙ্গে। কোনটা নেবে বলো কেতোবাবু? হীরো, না হারকুলিস? এই মত ব্যবহার ভদ্রমানুষের? ছিঃ ছিঃ।

দাদা দেবে কেন? বোনকে যখন তোমাদের গছিয়ে দিয়েছে তখন আর খরচ কেউ করে? বৌদিরা তোমাকে একদিন খাওয়ালো না পর্যন্ত বিয়ের পর। তুমি কি ভাবো আমি অন্ধ? সাইকেল ওরা দেবে না। তুমি মিছিমিছি যেও না। তোমাকে অপমান করলে, আমারই অপমান।

তুই বকিস না যমুনা সারা গাঁয়ের সকলে জানে যে, আমার বিয়েতে আমি সাইকেল পাবো। বাপ আমার চণ্ডীমণ্ডপে, পঞ্চায়েতে, সব জায়গায় বলেছে বড় মুখ করে। আমার মনে হয়, দশজনে দশ কথা বলছে। বাপের দিকটাও ভাব। তার ইজ্জৎ।

তুমি আমাকে মেরে ফেলে দাও। আবার একটা বিয়ে করো। এবার সাইকেল-আগে হাতে পেয়ে তারপর বউ আনবে ঘরে। এমন ভুল দ্বিতীয় বার কোরো না। হ্যাঁ গো। পেটে যে এসেছে, তার তো এখনও সাত মাস দেরি আছে আলো দেখতে। এই বেলা আমাকে তোমরা শেষ করে দাও। বাপ-ব্যাটাতে মিলে। তোমাদের ইজ্জৎ কত বড়। ছিঃ ছিঃ দাদার কথাও ভাবি। মানুষ এত ছোটও করে নিজেকে? আমাকে বললে, আমি ফলিডল খেয়ে মরে যেতাম বিয়ে দিতে হতো না গিলটি করা গয়না আর শাঁখা দিয়ে।

কেতো ঘাবড়ে গেল যমুনাকে দেখে। এ যমুনাকে সে চেনে না।

তাড়াতাড়ি তার ভেজা চোখের নিচে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, দেখো বাবা। এখানে ওসব কিছু কোরো না। আমাদের বদনাম হবে। বাবার ইজ্জৎ-এর কথাটাও ভেবো। এ গেরামে আমাদের সকলে ছেরেদ্দা করে।

২

ওলাচণ্ডীপুরে ছোট দারোগার বাড়ির বাইরের ঘরের তক্তাপোশে শুয়েছিল রাতে কেতো। ছারপোকা ছিল খুব। ঘুম হয়নি। তার উপর সারা রাত বেড়াল কেঁদেছে। তবে, ছোট দারোগা, রাতে খেতে দিয়েছিলো ভালোই। কচি পাঁঠার ঝোল আর রূপশালী

ধানের ভাত। তালক্ষীরও।

ছোট দারোগা বলেছিলো, ভোর-ভোর রওয়ানা হবো হে কেতো। আমার আবার ফিরতে হবে তোমার বাপকে নিয়ে। জরুরী কাজ আছে বদ্দমানে।

অন্ধকার থাকতে থাকতেই তৈরি হয়ে ছোট দারোগার লাল মোটরবাইকের পিছনে বসে পড়েচিল কেতো। তারপর লাফাতে-লাফাতে এবড়ো-খেবড়ো পথে কিছুটা এসে পিচ রাস্তাতে পড়েচিল। তাদের গ্রামের কাছে এসে আবার ছ' মাইল কাঁচা রাস্তা। গরু-বাছুর চলে। কাদা শুকিয়ে এমন হয়ে আছে যে, হাঁটলেই গোড়ালি আর পায়ের পাতা ভেঙে যাবে বলে মনে হয়, যে কোন সময়ই।

মনটা ভালো ছিলো না কেতোর। বাপ একটা পত্র দেচিলো ছোট দারোগাকে। সেই মোতাবেকই তিনি চলেচেন। দারোগার সঙ্গে কী মামলাতে যেতে হবে তার বাপকে বদ্দমানে ? এ সব ওর ভালো লাগে না। যমুনা বলছিল ই সব ডিঞ্জারাস্। কানাঘুষো। যা ক্ষেত-জমি আছে তাতেই সৎভাবে চাষ-বাস করলে তো খাওয়া-পরা চলে যায় বাবুয়ানী করে। এই সব ঘোঁজ-ঘোঁজ-এর পথের বড়লোক হতে যাওয়াই বা কেন ? কেতো ভাবে, তার ডাকাত দাদুর রক্ত বোধহয় বইছে তার বাপের শরীরে। বাগদীর মেয়ে ছাড়া শুয়ে আরাম পায় না, ডাকাতি না করলে ভাত মিঠে লাগে না। এ কেমন রোগ হে!

শেষ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেচিল কেতো। সবে যখন দুচোখের পাতা বুজে এলো ঠিক তখনই। দেখেচিলো, যমুনা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব হাসছে। আর বলছে, তোমার বউ দেখতে নিয়ে যাবে তো আমায় ? আমি কিন্তু বরযাত্রী যাবো। যাব্বোই। ফেলে যেও না যেন।

ঠিক সেই সময়ই স্বপ্নটা ভেঙে গেল। ছোট দারোগার চাকর গঙ্গা এক ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল কেতোকে।

পিচ রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তাতে এসে পড়তেই মোটরবাইক সাংঘাতিক লাফাতে লাগল। আর প্রায় তারই সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে সূর্যটাও উঠল মালোডাঙ্গার জল-ভরা মাঠ লাল করে। বানের জল এখনও নামেনি মাঠ থেকে। পশ্চিমাকাশে মেঘ করে আছে রোদ কালো করে। শালিখ আর চড়াই ডাকছে ক্রমাগত। পথের পাশে আকন্দর ঝাড়ে রোদ লেগেছে। কন্টিকারি, কয়েতবেলের গাছ। বুড়ো ছাতিমের গোল গোল পাতাকে ছোটো ছোটো হাতের পাতার মত দেখাচ্ছে। রোদ লেগে, মনে হচ্ছে লাল লাল ফুল ধরেছে ছাতার তলায়। বাঁদিকে একজোড়া শামুকখোল বসে আছে মাঠে। এক পা এক পা গুনে গুনে ফেলছে পা। অতি সাবধানে।

আর একটু গেলেই ওদের গেরাম। মোড়ের বুড়ো বটগাছটার কাছে ডান দিকে ঘুরলেই কেতোদের বাড়িও দেখা যায়। যমুনা কী করছে কে জানে ? বাবা কি তাকে রাতে পাহারা দিয়েছিলো ? সত্যিই ? না ওইই গেছিল বাবার ঘরে শুতে ? বাচ্চা মেয়ে তো। ভয় পায় বড়।

মোড়টাতে এসেই গতি কমল মোটরবাইকের। ডানদিকে মোড় নিল একটা বিরাট ঝাঁকুনি দিয়ে। এবং মোড় নিতেই, কেতোর গলার মধ্যে কিসের একটা শক্ত দলা উঠল। টাগরা শুকিয়ে গেলো।

কেতো দেখলো, ওদের শোবার ঘরের পেছনের আমড়া গাছটা থেকে হলুদ আর কালো

ডুরে শাড়িতে ফাঁস লাগানো যমুনা ঝুলছে।

ছোট দারোগাও দেকেচে।

দেকে, মোটরসাইকেল থামিয়ে, ওদিকে তাকিয়ে বললো, এ কী অঘটন হে! হায় হায়! ঐ কে?

আমার বৌ।

কেতোর গভীর থেকে কেউ বলে উঠলো।

ছোট দারোগা বললো, তাহলে ভগমানই আমাকে এখানে পাইটেচেন। আমি না এইলে, কী বিপদেই না পড়তে বলো তোমরা। লাশ-কাটা ঘরে কতদিন পড়ে থাকতে হতো মেয়েটাকে। ভগমান যাইই করেন, তাইই মঙ্গলের জন্যে।

কেতোর কানে এতসব কথা ঢুকছিলো না। কেতো আবারও তাকালো উপরে। বর্ষার জল পাওয়াতে অনেকই সবুজ পুরুষ্ট সব পাতা ছেড়েছে আমড়া গাছটা। নরম নরম পাতার মধ্যে নরম যমুনা দুলছে অল্প অল্প, পশ্চিমের হাওয়া লাগা ডালের দোলায়। শাড়িটা তার দু পায়ের মধ্যে এমন আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে গেছে যে তার লজ্জাস্থান ঢেকে রয়েছে তা। তার দুপায়ের দু পাশে শাড়ির প্রান্ত ফুলে ফুলে উঠছে ভোরের ভেজা হাওয়ায়।

যমুনা যেন হলুদ-কালো একটা সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছে চাপ চাপ নরম মেঘের ঘাসের মাঠ পেরিয়ে...দূরে...দূরের কোনো দেশে... যে দেশে মেয়েরা জিয়োনো-মাগুর বা খেজুরের রস; বা তালক্ষীর নয়...

কম্পাস



কুকু-র সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেদিন আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে। কুকু এসেছিলো, পরিচালক এবং প্রযোজকের সঙ্গে একটি উপন্যাস নিয়ে ছবি করার বিষয়ে আলোচনা করতে।

কুকুকে শেষ দেখেছিলাম আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। তখন আমি সবে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে ঢুকেছি। আর কুকু তখন বোধ হয় সিক্স-সেভেনে পড়ে। খুব ফর্সা, একটু মেয়েলী। এবং খুবই সুন্দর দেখতে। অবস্থাপন্ন বাবা-মায়ের চোখের মণি। আদরে, যত্নে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ; চোখ-কাড়া। একমাত্র সন্তান।

কুকুরা পুজোর ছুটিতে এসেছিল উত্তরপ্রদেশের বিন্ধ্যাচলের কাছে শিউপুরা নামে একটি ছোট্ট গ্রামে। আমি গেছিলাম আমার বাবা-মা ভাই-বোনেদের সঙ্গে। সকলে একত্রিত হয়ে মাছিন্দার পথে চড়ুইভাতি, গঙ্গার ঘাটে "ড্যাম-চিপ্" নানা রকম মাছ কেনা এবং পরিশেষে বিজয়া-সম্মিলনীও।

পথের এবং প্রবাসের আলাপ সাধারণত পথে প্রবাসেই হারিয়ে যায়। যাঁরা ব্যস্ত মানুষ, তাঁদের কারো পক্ষেই কলকাতার কর্মব্যস্ততার ঘূর্ণীর মধ্যে ফিরে এসে আর সেই অবসরের সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

কুকুর বাবা-মা কাকা-কাকী আমার মা-বাবাকে বলতেন, কলকাতা ফিরে যেন এই সম্পর্ক বজায় থাকে। বাবা বলতেন, দেখা যাবে। কলকাতায় ফিরেই প্রমাণ হবে হৃদয়ের টান খাঁটি না ঠুন্‌কো।

কুকুর বাবা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যস্ত উকীল। কাকা সলিসিটর। ওঁদের নিবাস ছিল উত্তর কলকাতায়। শ্যামবাজারে।

আশ্চর্য ! সেবার ছুটির পর কলকাতায় ফিরে প্রবাসের সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিলো মুখ্যত কুকুদের পরিবারের আন্তরিকতাতেই। এমন একটি শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন পরিবার আমি খুব কমই দেখেছি। বাড়ির প্রত্যেক মহিলাই সুন্দরী। বিভিন্নরঙা তাঁতের ডুরেশাড়ি পরা তাঁদের সুন্দর চেহারা এখনও আমার চোখে ভাসে। রান্না-বান্না, সেলাই-ফোঁড়াই ; গান-বাজনা সব কিছুতেই সমান উৎসাহ ছিল দত্ত পরিবারের। সেই পুজোর পরও অনেক বছর কুকুদের ও আমাদের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ আশ্চর্যভাবে বজায় ছিল।

কুকু বড় হবে, এই নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করতেন তখন থেকেই ওর অভিভাবকেরা।

কারো ইচ্ছ' ছিলো কুকু ডাক্তার হোক। কেউ চাইতেন কুকু বড় হয়ে তার বাবার ওকালতীর পসারকে আরো বাড়িয়ে তুলুক। মেসোমশাই-এর চেম্বার খুবই ভাল জায়গায়। অনেক মক্কেল। ওঁদের কারোরই সন্দেহ ছিল না যে, পড়াশোনাতে ভাল ছাত্র কুকু তার সুন্দর সপ্রতিভ ব্যবহারে এবং চোখ-কাড়া চেহারাতে একদিন তার বাবার চেয়েও বেশী সুনাম করবে হাইকোর্টে। স্বচ্ছল পরিবারের স্বাচ্ছল্য আরো বাড়াবে। বনেদী, কোনো পড়তি-অবস্থার পরিবার থেকে কুকুর জন্যে সুন্দরী শান্তস্বভাবা বিনয়ী পাত্রী পছন্দ করে আনবেন তাঁরা, যাতে তাঁদের পারিবারিক সুখ এবং ঐতিহ্য স্বাচ্ছল্যর হাতে হাত রেখে আরও উজ্জ্বল হয়।

আমার ইচ্ছে ছিলো সাহিত্যিক হবার। কিন্তু আমার প্র্যাকটিক্যাল, কৃতি বাবা বলতেন, বাঙালী সাহিত্যিকেরা না-খেয়েই থাকেন। যাঁরা সাহিত্যর সঙ্গে প্রকাশনের ব্যবসাতেও জড়িয়েছেন সফলভাবে নিজেদের, সেই মুষ্টিমেয় দু-একজন ছাড়া, স্বচ্ছলতার মুখ কেউই দেখেননি। বাবার আদেশ ছিলো যে, তাঁরই মতো ডাক্তার হতে হবে।

সাহিত্য নিয়ে পড়া পর্যন্ত হলো না বলেই আমার যে বাল্যবন্ধু আজ যশস্বী সাহিত্যিক, তাকে মনে মনে খুবই ঈর্ষা করতাম। সেই কারণেই আমার বন্ধুর মধ্যে আমি যা হতে চেয়েছিলাম, সেই না-হওয়া সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে প্রত্যক্ষ করে প্রতি ছুটির দিনে চেম্বার এবং এমন কি কল্-এ যাওয়া যথাসাধ্য স্থগিত রেখে তার বাড়িতেই সাহিত্য আলোচনা করে কাটাতাম। তার মাধ্যমেই নামী-দামী সব সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপও হতো। যাঁদের সম্বন্ধে অগণিত পাঠকমহলে অতীব কৌতূহল, তাঁদের খুব কাছ থেকে দেখতাম।

বাঙালী মানসিকতায় যাদের "সফলতম" বলে, আমি এখন সেই শ্রেণীর লোক। বাবা ছিলেন শুধুই এম-বি ডাক্তার। আমি এম-বি-এস করার পর এম-এস-ও করেছিলাম। সপ্তাহে বারো থেকে কুড়িটি পর্যন্ত অপারেশন করতাম বড় বড় নার্সিং হোমে। টাকার অভাব ছিলো না আমার। নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছি। শোফার-ড্রিভন গাড়ি আছে। কলকাতার একাধিক নামী ক্লাবের মেম্বার হয়েছি। এক কথায় অন্য মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত যে-কোনো বাঙালী যেসব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যর স্বপ্ন দেখেন ছোটবেলা থেকে, বাবার বাধ্য ও যোগ্য সন্তান হয়ে সেই সমস্ত প্রাপ্তিই ঘটেছে আমার।

কিন্তু তারই সঙ্গে বাঙালী জাতির সবচেয়ে বড় যে পাস্ট-টা ম, সেই ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার নিত্য শিকার আজ আমি। কোন বাঙালী কত বড়, তা প্রমাণিত হয় তাঁর প্রতি ঈর্ষাকাতর বাঙালীদের সংখ্যা কতো, তার উপর। এই পরীক্ষাতে আমি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। ছেলে-মেয়ে, নিউ আলিপুরের বাড়ি, স্ত্রী, সল্ট লেকের শ্বশুরবাড়ি, আমার মধ্যমগ্রামের ছোট্ট সুন্দর বাগানবাড়ি ও আমার পেশার খ্যাতি নিয়ে আমি একজন আদর্শ বাঙালী। আত্মীয়স্বজনরা বলে থাকেন মানুষের মতন মানুষ হয়েছি আমি। এমন মানুষ নাকি আমাদের তিনকূলে কেউ কখনও হয়নি। আমাকে এক নামে সকলে চেনে। পেটের অপারেশান ? ডাঃ মুৎসুদ্দীর কাছে যাও। ধন্বন্তরি। অপারেশান থিয়েটারে আমি গাউন পরে গ্লাভস্ হাতে নিলে নতুন অল্পবয়সী নার্সরা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে। পরম বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধাতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কুকু সম্বন্ধে ওর অনেক আত্মীয় স্বজনের কাছেই শুনতাম যে, ছেলেটা মানুষ হলো না। বয়েই গেলো একেবারে। কিছুই হলো না। ফিল্ম লাইনে ভীড়ে গেছে। নেশা ভাঙ করে।

ড্রাগ খায়। রোজগার-পাতি নেই। বিয়ে করলো না। করবেই বা কি করে? বৌকে খাওয়াবে কি? মা-বাবাকেও দেখে না। দেখবে কি করে? মানি-শূন্য মানি-ব্যাগ পকেটে নিয়ে বাবা-মায়ের পায়ে হাত বুলোলেই কি ছেলের কর্তব্য করা হয়? টাকাই হচ্ছে সার কথা। কিছুই করলো না জীবনে।

এতদিন পরে দেখে, কুকুকে আমি চিনতেই পারিনি। সাহেবের মত ফর্সা রঙে একবারে কালি ঢেলে দিয়েছে। কুচকুচে কালো হয়ে গেছে ও। কোঁকড়া নরম কালো চুলের জায়গায় মাথা ভর্তি টাক। মুখে একগাল দাড়ি। আধময়লা একটা ট্রাউজার এবং হাওয়াই শার্ট পরনে।

ও-ই আমাকে বললো, নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারছো না টুটুদাদা?

অবাক হয়ে বলেছিলাম, না তো।

আমি কুকু।

কুকু।

হ্যাঁ, মনে পড়ে না? শিউপুরার কুকু। বিন্ধ্যাচল, মাছিন্দা?

কুকু। বিস্ময়ে, হতাশায় আমি বলেছিলাম। মাই গুডনেস।

ওদের কাজ শেষ হতে হতে বেলা হলো অনেক। ফিল্ম লাইনের লোকেরা বড় বেশী কথা বলেন। যে-কাজ পাঁচ মিনিটে হয়, সে কাজ ওঁরা তিন ঘণ্টায় করতে ভালোবাসেন। এক কাপ চা-খাওয়া শুট্ করতে যাঁদের দেড়ঘণ্টা লেগে যায় তাঁদের অভ্যেসটাই বোধ হয় খারাপ হয়ে যায়।

কুকু বলল, উঠবে নাকি টুটুদাদা? বাড়ি যাবে না?

বাড়িতে না গেলেও হতো। কারণ, আমার সম্বন্ধীদের সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পুত্র বাগানবাড়িতে গেছে। এ রবিবার সকালে একজন ধনী ব্যবসাদারের স্ত্রীর অপারেশন ছিল। প্রথমে 'না' করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এমন একটা টাকার অঙ্ক বলে বসলো যে, লোভ আর সামলাতে পারলাম না। ভগবানেরও একটা দাম ধার্য করেছে ওরা। টাকা দিয়েও কেনা যায় না এমন মানুষ সংসারে বোধ হয় আর বেশী নেই।

ভাবলাম, যে-ছোকরার কিছুই হলো না জীবনে, তাকে নিয়ে একটু ক্লাবে যাই। ওকে বোঝাই যে, এ ওর পরম দুর্ভাগ্য যে চোখের সামনে ওর চেয়ে সামান্যই কয়েক বছরের বড় আমি মানুষটা জলজ্যান্ত থাকা সত্ত্বেও ও সে দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হতে পারলো না। নিঃশেষে নষ্ট করলো এমন করে নিজেকে। নিজের সব সম্ভাবনা।

বললাম, চলো, ক্লাবে যাই। বীয়ার-টিয়ার খাও তো।

কুকু বলল, সবই খাই।

তাহলে চলো।

বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো। সাদা সীট-কভার লাগানো এয়ার-কণ্ডিশান্ড কালো ঝকঝকে গাড়ি। টুপি-পরা ড্রাইভার।

আশ্চর্য! কুকু ইম্প্রেসড্ হল না। একটুও।

বোধ হয় বম্বে-টম্বে যায় প্রায়ই। ফিল্ম আর্টিস্টদের দেখেছে নিশ্চয়ই। ও পিছনের সীটে আমার পাশে এসে বসল।

রবিবারের দিন। ক্লাবে লোক গিস্‌গিস্ করছে। সামনেই ইলেক্শান। কে কে কমিটিতে

ইলেকটেড হবেন আর কে কে হবেন না তাই নিয়ে জোর ফিসফিসানি চলছে। আমাকে ক্লাবের অনেকেই চেনে। চেনে বলেই তো কুকুকে নিয়ে আসা ! ও দেখুক, জানুক আমি কী হয়েছি আর ও কি... কলকাতার সব গণ্যমান্য মানুষই এই ক্লাবের মেম্বার।

বীয়ারের অর্ডার দিলাম। ছুটির দিনে আমি এক বোতল করে বীয়ার খাই। জাস্ট এক বোতলই। কুকুকে সে কথা বললামও।

কুকু বললো, মেজার গ্লাসে করে ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ের সারিবাদি-সালসা খেলেই পারো। শরীর এবং চরিত্র দুইই ভাল থাকবে। মদ এবং জীবন যারা মেপে মেপে খায় এবং খরচ করে তারা মানুষ ভালো কখনওই হয় না।

আমি কিছু বললাম না।

ও বললো, মদ ; মানুষের ইন্‌হিবিশান কাটিয়ে দেয়। কিছু মানুষ আছে, যাদের ইন্‌হিবিশান্ কেটে গেলে সবই কাটাকুটি হয়ে যায়। বাকি থাকে না কিছুই। সেই মানুষগুলোই মদ খেয়ে মাতাল হতে ভয় পায়।

মাতাল হলে, এই ক্লাব থেকে বের করে দেবে।

বিরক্তস্বরে আমি অন্য দিকে মুখ করে বললাম।

মাতাল হওয়া আর মত্ত হওয়াটা এক নয়। মত্ত হওয়ার কথা বলিনি আমি। যাক্‌গে। বললেও হয়তো তুমি বুঝবে না। তারচেয়ে বলো টুটুদাদা ! লেখা-টেখা কি ছেড়েই দিলে একেবারে ? কী সুন্দর লিখতে তুমি—

আমি চাপা গর্বের সঙ্গে বললাম, সময় পেলাম কোথায় ? প্রফেশানেই তো...

কুকু বললো, খুবই ব্যস্ত থাকো বুঝি ? তারপরই চারিদিকে তাকিয়ে বললো, এই সব মানুষেরা কারা ?

ক্লাবের মেম্বার, মেম্বারদের গেস্টস আর কারা।

কি করেন এঁরা ?

কেউ অ্যাকাউন্টেন্ট, কেউ ডাক্তার, কেউ এঞ্জিনীয়ার। কত্ব প্রফেশান। ইন্টিরীয়র ডেকরেটর, ম্যানেজমেন্ট কন্সালট্যান্ট, আর্কিটেক্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস এক্জিকিউটিভস। আজে-বাজে লোক তো এ ক্লাবের মেম্বার হতে পারে না।

কুকু বীয়ারে চুমুক দিয়ে চশমার আড়ালের গভীরে কালো চোখে প্রচ্ছন্ন হাসির ঝিলিক তুলে বললো, স্বাভাবিক। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা সকলেই তোমারই মত কৃতী পুরুষ জীবনে। তবে টুটুদা ব্যাপারটা কি জানো ? এঁদের বেশীর ভাগেরই কোন গন্তব্য নেই মনে হয়। শ্যালো, মেগালোম্যানিয়াক্ মানুষ এঁরা। আমি একেবারেই স্ট্যান্ড করতে পারি না।

কুকুর ধৃষ্টতা আমাকে মর্মাহত করলো। আমার সঙ্গে না এলে এখানে কোনোদিন ও ঢুকতেই হয়তো পারতো না। আন্‌গ্রেটফুল সিলি চ্যাপ। এমনিতেই, ঐ পোশাকের অদ্ভুত জীবটির দিকে সকলেই তাকাচ্ছে। আমারই পয়সায় বীয়ার খেতে খেতে আমাকেই ঘুরিয়ে যা-তা বলছে। একেবারেই অমানুষ হয়ে গেছে ছোকরা।

গন্তব্য নেই মানে কি ? সকলকেই কি হরিদ্বারে গিয়ে সাধু হতে হবে নাকি ?

আমি শ্লেষের সঙ্গে বললাম।

কুকু হাসলো। বললো, তা নয় ! আমি জিগ্যেস করছিলাম, এঁদের সাক্‌সেস এবং টাকাকে

বিযুক্ত করে ফেললে মানুষগুলির জীবনে বাঁচার মতো কিছু কি বাকি থাকবে? লোকে কি কেবল বাড়ি, গাড়ি, টাকা, নামী-ক্লাবের মেম্বার হওয়ার জন্যেই বেঁচে থাকে? ওঁরা নিজের যা করেন, তা কি এনজয় করেন? ওঁরা কি বেঁচে আছেন? ওঁদের মধ্যে ক'জন সত্যিই বেঁচে আছেন?

এতো সব কথার উত্তর আমার কাছে নেই।

কুকু এবার হাসলো। বললো, আছে, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তুমি জবাব দিতে চাও না। নিজেকেও কখনও এ সব প্রশ্ন ভুলেও করতে চাও না। কারণ তুমি ভালো করেই জানো যে, আমি কী বলছি। যা-করে, মানুষ আনন্দ পায় না, তা মানুষ করবে কেন? তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? কখনও ভেবেছো এ নিয়ে টুটুদা?

শ্লেষের সঙ্গে আমি বললাম, তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটাই বা কি?

আমার উদ্দেশ্য, আমি যা-করে আনন্দ পাই, তাই-ই করি। শুনলেই তো! ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখি। ছবি ডাইরেক্ট করারও ইচ্ছা আছে।

পড়াশুনাই তো শেষ করলে না। য়্যুনিভার্সিটির ডিগ্রী থাকলে কত্তো সুবিধা হত বল তো?

কুকু আবার হাসল। বলল, বিদ্যার সঙ্গে ডিগ্রীর সম্পর্ক কি? 'দা পারপাস অফ অ্যান উ্যনিভার্সিটি ইজ টু টেক দি হর্স নিয়ার দা ওয়াটার অ্যান্ড টু মেক ইট থার্সটি।' জিগীষার উন্মেষ ঘটানোই য়্যুনিভার্সিটির কাজ। ডিগ্রী তো একটা পাকানো কাগজ। এক কাপ চায়ের জলও করা যায় না তা পুড়িয়ে।

অনেক বড় বড় কথা শিখেছো যা হোক কুকু। নাও, বীয়ার খাও। সঙ্গে কিছু খাবে?

নাঃ।

কোন্ কোন্ ছবির স্ক্রিপ্ট করেছো তুমি? কোনো নাম করা ছবির?

একটা খুব নাম-করা উপন্যাসের স্ক্রিপ্ট করেছিলাম। কিন্তু প্রডিউসার তাঁর স্ত্রীর নামেই চালিয়ে দিলেন। যাক, আনন্দটা আমারই আছে। আমার একার। নামটা অন্যর। আর একটা ছবির স্ক্রিপ্ট এখন করছি। মানে, গত পনেরো বছর ধরেই করছি। কবে শেষ হবে জানি না। আদৌ শেষ হবে কি না তাও জানি না। কখনও ভালো প্রডিউসার পেলে কিন্তু দেখিয়ে দেবো। একটাই ছবি করবো জীবনে। ছবির মতো ছবি।

সত্যজিৎ রায় হয়ে যাবে বলছো? রাতারাতি।

আমি বললাম। ঠাট্টার গলায়।

তা, কে বলতে পারে? মাণিকদা যখন কফি-হাউসে বসে লাঞ্চের সময় কাপের পর কাপ কফি নিয়ে দূরে তাকিয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেতেন তখন অত লোকের মধ্যে থেকেও তিনি নিশ্চিন্দিপুরেই থাকতেন। 'পথের পাঁচালী' তো একদিনে হয়নি। আমি স্ক্রিপ্ট-এর কথাই বলছি। কোন বড় কিছুই একদিনে হয় না টুটুদা। জীবনে দামী কিছু পেতে হলে যোগ্য দাম দিয়েই তা পেতে হয়।

বললাম, সে কথা আমাকে না বললেও চলবে। কারণ, আমিও যা পেয়েছি, তা যোগ্য দাম দিয়েই পেয়েছি। কিন্তু তুমি যদি নাম না করতে পারো, তাহলে কি তুমি স্বীকার করবে-যে জীবনটাকে নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেললে!

কুকু এবার খুব জোরে হাসলো।

বললো, জীবনের মত, ছিনিমিনি খেলার দারুণ জিনিস তো আর একটিও দেখলাম না। একমাত্র তোমার নিজের জীবনটাই তোমার হাতে। তুমি জীবনে যা দামী বলে মনে করেছো, হয়তো তার পিছনেই ছুটছো। আমি ছুটছি আমি যা দামী বলে মনে করি, তারই পিছনে। নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার নিশ্চয়ই সকলেরই আছে। একটা কথা আমার মনে হয় প্রায়ই। জানো টুটুদা। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমরা খুব ভয় পাই বলেই আমাদের কিসসু হলো না। ছিনিমিনি খেলার মধ্যেই ক্রিয়েটিভিটি নিহিত থাকে।

আমি বললাম, প্রতিভা থাকলেই হয় না। প্রতিভারও গৃহিণীপনার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলছি।

তুমি হাসালে। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথই। তুমি কি বলতে চাও প্রতিভার গৃহিণীপনা না থাকলে 'রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রনাথ হতেন না ? আর প্রতিভার গৃহিণীপনা থাকলেই তোমার বন্ধুর মত আজকালকার ঢক্কা-নিনাদিত পোষা-পাখি সাহিত্যিকেরা সব রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতেন ?

তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

হ্যাঁ। লাভ নেই। কারণ, তোমার যুক্তি নেই টুটুদা। তুমি যখন কলেজ জীবনে লিখতে, তখন একটা ভালো গল্প লিখে তুমি যে আনন্দ পেতে, আজ তুমি জীবনে যা কিছুই পেয়েছো, তার যোগফল কি সেই আনন্দের সমান ? একটি ভালো গল্প লেখার আনন্দই কি এই সাফল্যের চেয়ে দামী মনে হয় না তোমার কাছে ? সত্যি করে বলো তো ?

ভাবিনি কখনও। তবে, কমই বা কি পেয়েছি ? এত লোকের জীবন বাঁচাই। এতে আনন্দ নেই ? এত স্তুতি, এত যশ, এত টাকা, খাতির, প্রতিপত্তি। কম কি ?

আনন্দ আছে কি ? আসলে, তেমন করে ভাবোনি তুমি। তাছাড়া তুলনাও চলে না অসম জিনিসে। আনন্দ হয়তো থাকতো, যদি স্বার্থহীনভাবে অন্যর জীবনটা বাঁচাবার জন্যেই তা করতে। তুমি ম্যাড্রাসের ডাঃ বদ্রীনাথের নাম শুনেছ ? ভেলোরে গেছ কখনও ? ওঁরাও ডাক্তার। কিন্তু ওঁরা জানেন, আনন্দ কি জিনিস। তোমার অধীত-বিদ্যা সব তো নিজের কারণে, নিজের হিতেই প্রয়োগ করলে সারাজীবন। তোমার মত পেশার লোকমাত্রই তো পয়সাওয়ালা লোকেদের চাকর। সবাই চাকর। ওরা তোমাদের "স্যার" বলুক আর যা-ই বলুক। তুমিও যেমন চাকর, তোমার সাহিত্যিক বন্ধুও চাকর। পশ্চিমবঙ্গে আজ যে কারণে ডাক্তারের মত ডাক্তার বিরল, ঠিক সে কারণেই সাহিত্যিকের মত সাহিত্যিকও বিরল। আমার মনে হয়, পেশার মধ্যে ; একমাত্র বেশ্যাবৃত্তিই বোধ হয় সবচেয়ে স্বাধীন পেশা এখন। এবং সৎ।

আমি চুপ করে রইলাম। একজন পরিচিত মেম্বার কানের কাছে এসে বললেন, মুৎসুদ্দি, আমাদের টাই-আপের কথাটা মনে আছে তো ? ওরা কিন্তু ওদিকে সব কিছুই করছে। ঢালাও ড্রিঙ্কস—গার্ডেন পার্টি.....বুঝেছ। ইলেকশান, কিন্তু এসে গেছে।

কুকু চারদিকে চেয়ে বললো, তোমাদের ক্লাবে আজ এত উত্তেজনা কিসের ?

উত্তেজনা ? ইলেকশানের জন্যে। ক্লাবের অফিস-বেয়ারাদের ইলেকশান আছে সামনে।

এই ইলেকশানে কেউ জিতলে কি হবে ? তাঁর নতুন হাত-পা গজাবে ?

কি আবার হবে ? ম্যান অফ ইম্পর্ট্যান্স হবে। আল্টিমেট্লি প্রেসিডেন্ট হতে পারলে ক্লাবের

মিটি রুমের দেওয়ালে ছবিও ঝুলবে।

কুকু আবারও হাসলো। এবারে শ্লেষের হাসি।

বললো, সত্যি টুটুদা ! তুমি আমাকে ঝুলিয়ে দিলে ! আরও বীয়ার আনাও। তোমাদের ই ক্লাবে না এলে অনেক কিছুই অজানা থাকত তোমাদের জগৎ সম্বন্ধে। এই-ই তোমাদের ্যামবিশান্ ? ব্যস্-স্-স্ ? এইটুকুই ? ক্লাবের দেওয়ালে ছবি ঝোলানোই গন্তব্য তোমাদের ীবনের ? এত সামান্য অ্যাম্‌বিশান সমাজের শিরোমণিদের ? তোমাদের এমন এলিটিস্ট ়লক্‌টোরেটের যদি এই স্ট্যাণ্ডার্ড, তবে দেশের গরীব, অশিক্ষিত, অনাহারী ভোটারদের াষ দিয়ে লাভ কি ?

আমি বললাম, আস্তে, আস্তে। কেউ শুনতে পাবে।

কুকু হাসলো।

বললো, তুমি কেন এক বোতলের বেশি বীয়ার খাও না এবারে বুঝলাম। পাছে, সত্যি ়থা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পাছে, তুমি এই সমাজে, এই ভীড়ে, অপাংক্তেয় হয়ে পড়ো। াই না ?

বললাম, অন্য কথা বলো কুকু। অন্য কথা বলো।

আহা ! টুটুদা, তুমি তো অনেকই টাকা রোজগার করলে। বাকি জীবনটা বিনা পয়সায় ়পারেশন করো না ? গন্তব্য মানে, শুধু হরিদ্বারে গিয়ে সাধু হওয়াই নয়। আমি এই গন্তব্যর ়থাই বলছিলাম। নয়তো সব ছেড়ে দিয়ে এবার লেখো। যা কিছু লিখতে চেয়েছিলে, ়জেকে উজাড় করে লেখো। বেটার লেট, দ্যান নেভার।

স্বগতোক্তির মত বললাম আমি, তুমি তো বলেই খালাস কুকু। ছেলেটার পায়ে দাঁড়াতে ়খনও অনেক দেরী।

হাঃ। জোক্ অফ দ্যা ইয়ার। পুওর ফাদার। আমার বাবার কথাই মনে পড়ে গেল। ়মামার বাবাও ঠিক এই কথাই বলতেন। আর দেখছো তো আমাকে। এখনও ল্যাংচাচ্ছি। ়ায়ে আর দাঁড়ানো হলো না। টুটুদা। তোমার ছেলেটাকে মুক্তি দাও না। ও যা হতে চায় ়ালোবেসে, যা করে ও আনন্দ পায় ; তাই-ই করুক না হয়। একটাই তো জীবন। বাপের ়থামত নাই-ই বা বাঁচল। ওকে নিজের মতই বাঁচতে দাও। জীবন মানে কি শুধুই ভালো- ়াকা, ভালো-খাওয়া ? জীবনের মানেটাই তো একেকজনের কাছে এক এক-রকম। তাই ়া ?

দেড়টা তো বাজে। এখানেই লাঞ্চ খেয়ে যাও কুকু। ওহো ভুলেই গেছিলাম। তোমাকে ়তা ডাইনীং রুমে ঢুকতেই দেবে না।

আমি বললাম।

কেন ? কুকু মুখ লাল করে বলল, দেবে না কেন ?

তুমি যে স্যুট পরে নেই।

স্যুট পরে নেই মানে ? আমার তো স্যুট একটিও নেইও। কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

না। ব্যাপার কিছু নয়। শীতকালে স্যুট ছাড়া এই ক্লাবের ডাইনীং হলে ঢোকা বারণ।

কুকু, হোঃ হোঃ করে ফুলে ফুলে হাসতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বললো, আমাদের বাবারা সব অসহযোগ করে, খদ্দর পরে

আর চরকা কেটে ইংরেজ তাড়ালো পঁয়ত্রিশ বছর আগে দেশ থেকে। আর আজকেও স্যুট ছাড়া দিশি লোকদেরও তোমরা খাওয়ার ঘরে ঢুকতে দাও না ? জয়। ভারতের জয় ! তোমাদের জয়। এই ভারতবর্ষ স্বাধীন করার জন্যেই আমার ন'কাকা পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছিলো। সত্যই সেলুকাস ! বিচিত্র এই দেশ।

অনেকেই আমাদের টেবলের দিকে দেখছিলো। পরে জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়ই, কাকে নিয়ে এসেছিলাম আমি ? ইজ্জৎ একেবারে গলিয়ে দিল কুকুটা। আসলে, দোষ আমারই। এ সব লোককে নিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটের বারে-টারেই যাওয়া উচিৎ ছিল।

কুকু বটমস্-আপ করে বলল, এবার উঠবো। আমার দম-বন্ধ দম-বন্ধ লাগছে এখানে। থ্যাঙ্ক য়্যু ভেরী মাচ্। নট সো মাচ ফর দ্যা বীয়ার। বাট, আমাকে এক নতুন জগতের সঙ্গে আলাপিত করালে বলে। এখানে আজ না এলে, আমি হয়তো বোকার মত পুরনো বিশ্বাসই পোষণ করতাম যে, পৃথিবীতে ডাইনোসররা আর বেঁচে নেই।

বাইরে বেরিয়ে কুকু আর গাড়িতে উঠল না।

বললো, আমি বাসেই চলে যাব। তুমি তো যাবে উল্টোদিকে। কেন ঘুরবে মিছিমিছি আমার জন্যে ?

খাবে না ? চল অন্য কোথাও গিয়ে খাই।

খেয়ে নেব কোথাও। খাওয়াটা তো এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিছু জুটলেই হল খিদের সময়। চলি, টুটুদা।

কুকু আমার সঙ্গে এলেই ভালো হতো। বাড়িতেই খিচুড়ি বা ভাতে-ভাত খেতাম। একবার ভাবলাম, কুকুকে জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে যাই। গিয়ে, অনেকগুলো বীয়াব খাই, খেয়ে ; যে-সব কথা আজকে অনেক বছর আমার বুকের মধ্যে পাথরের মত চেপে বসে আছে, যে-সব কথা আমার স্ত্রী, আমার পরিচিত মানুষেরা, আমার সমাজে যাদের যাতায়াত তারা কেউই কখনও শুনতে চায়নি এবং বলতেও দেয়নি আমাকে, যে সব কথা শুনলেও কানে আঙুল দিয়ে আমাকে বলেছে, "সাইকোলজিকাল কেস", "কনফিউজড্" বলেছে, "ইডিয়ট", সেই কথা কুকু-র হাতে হাত রেখে, চোখের জলে বলতাম.....

কিন্তু কুকু ততক্ষণে মোড়ের ভিড়ে মিলিয়ে গেছে বড় বড় পা ফেলে।

কী সুন্দর ওর হাঁটার ভঙ্গী। ইসস্ ! কত্তো দিন আমি ভিড়ের মধ্যে, আমার এই ফালতু, মেকী সত্তাকে হারিয়ে দিয়ে, দশজনের একজন হয়ে হাঁটি না। কত্তো দিন ছোটবেলার মত ফুচ্‌কা খাই না। আলুকাবলী। রাধুর দোকানের চিকেন-রোস্ট, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বসন্ত কেবিনের মোগলাই পরোটা !

ড্রাইভার বললো, কাঁহা চলেগা সাব ?

আমি দরজা খুলে নেমে পড়ে বললাম, তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি চলে আসব।

ও একটুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আমার মুখের দিকে।

তারপর কিছু না বলে চলে গেলো।

ভীড়ের মধ্যে শীতের মিষ্টি রোদে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল আমার। হাঁটতে হাঁটতে, নিজের কাছ থেকে দূরে এসে আমার কাঁচের ঘরের জীবনটাকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। যে-সমাজে আমার মেলা-মেশা, চলা-ফেরা, সেখানে ড্রাইভারেরা রোবোট। নিজে

াকে কথা বলা বারণ তাদের। তারা মানুষ নয়।

হয়তো সেখানে প্রত্যেকটা মানুষই রোবোট। সেখানে নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে কেউই ভাবে া। নিজের চোখ দিয়ে দেখে না। নিজের ইচ্ছেতে কেউই চলে না। সারাজীবন, সেখানে াত্যেকটি মানুষ, অন্য কোন মানুষের ভূমিকাতে রং মেখে, স্যুট-পরে, উদ্দেশ্যহীন, উৎকট াভিনয় করে চলে। প্রতিদিন। আমৃত্যু।

কুকু গড্ডালিকায় গা-ভাসানো, পথ-হারানো আমাকে এইমাত্র সঠিক পথের হদিশ দিয়ে গল।

ম্যাথ্‌স

বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশে চড়ার অঙ্কই হোক, কি চৌবাচ্চার জল ফুরনোর হিসেবের অঙ্কই হোক, কোনও অঙ্কই আমার ঠিক হত না। এমনকি, সামান্য যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগেও ভুল হত।

অক্ষয়-স্যার আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই তো ছিলেনই, ম্যাথ্‌স-এ কাঁচা বলে বাবা ওঁকে বাড়িতেও পড়াতে বলেছিলেন আমাকে। টকটকে ফর্সা রং ছিল ওঁর। খোঁচা-খোঁচা কালো গোঁফ। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন। গায়ে একটি এণ্ডির চাদর থাকত। পায়ে পামপ্‌-শ্যু।

টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে বসে আমার খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে অঙ্কের ফল দেখতে-দেখতে ওঁর মুখ বিরক্তিতে ভরে উঠত। ভুরু কুঁচকে যেত। বলতেন, 'ই-ইটা কী ?' কখনও বা গম্ভীর গলায় বলতেন, যেন টেবল-চেয়ারকেই বলছেন, 'আর কতবার বলতে হবে তোমাকে যে, সংখ্যাকে না বদলে তা কেটে পাশে পরিষ্কার করে লিখবে ?'

আমি মুখ নিচু করে থাকতাম। ভীষণ কষ্ট হত বুকের মধ্যে। অক্ষয়-স্যার যখন আমাকে বকতেন, মারতেনও কখনও, তখন আমার অত কষ্ট হত না। কিন্তু ওঁর মুখে যখনই বিচ্ছিরি বিরক্তির ভাব ফুটে উঠত, সেই মুখে আমি স্পষ্টই পড়তে পারতাম, আমি একটি গাধা। এবং উনি আমাকে নিয়ে রীতিমতই নাজেহাল। অথচ ট্যুইশানিরও দরকার নিশ্চয়ই ছিল তখন ওঁর। তাই বলতেও পারতেন না বাবাকে যে, আমাকে আর পড়াবেন না। ওঁর একমাত্র ছেলে গোপেনদা ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। ওঁর জন্যে অক্ষয়-স্যারের গর্বের অন্ত ছিল না।

উনি চলে গেলে অনেকক্ষণ একা ঘরে আমি বসে থাকতাম। নিজের উপর বড়ই রাগ হত। অথচ কী করব ? অঙ্ক আমার একেবারেই ভালো লাগত না। কবিতা লিখতে, ছবি আঁকতে, গান গাইতে ভালো লাগত। কিন্তু ওইসব তো কোনও গুণের মধ্যে পড়ত না। যে-গুণ ভাঙিয়ে টাকা রোজগার না করা যায়, তা কি আর গুণের মধ্যে পড়ে ?

বাবা অফিস থেকে ফিরলেই শব্দ পেতাম। গ্যারাজ ছিল একতলাতেই, আমার পড়ার ঘরের পাশেই। অফিস থেকে ফিরেই বাবা একবার আমার ঘরে ঢুকতেনই। বলতেন, 'খোকন, কেমন হচ্ছে পড়াশোনা ? পরীক্ষা তো এসে গেল।' কোনওদিন বলতেন, 'আমি তো জানিই, তুই স্কলারশিপ পাবিই। তবে স্ট্যাণ্ড করলে আরও খুশি হব।'

বাবাকে আমি ভালোবাসতাম খুবই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে বাবার এমন উঁচু ধারণায় কুঁকড়ে

যেতাম। আপত্তিও করতে পারতাম না। বলতে পারতাম না যে, আমি হয়তো ফার্স্ট ডিভিশনই পাব না।

নিজের ছুঁড়ে-দেওয়া কথাতে নিজেই খুশি হয়ে দোতলায় উঠে যেতেন বাবা আমাদের ফক্স-টেরিয়ার কুকুর 'ম্যাডা'কে আদর করতে-করতে। বাবার গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ পর্যন্ত চিনত ম্যাডা। গাড়ি যখন রাস্তায় এবং আর কেউই যখন বুঝতে পর্যন্ত পারত না, ম্যাডা তখন উত্তেজিত গলায় ডাকতে-ডাকতে দোতলা থেকে তার পায়ের নখে খচর্-খচর্ আওয়াজ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে তড়িৎগতিতে নেমে এসে গ্যারাজের সামনে ছুটোছুটি করত। বিহারের মধুবনী জেলার এক রং-রুট ড্রাইভার সুরজনারায়ণ ঝা, অতি-উত্তেজিত ম্যাডার একটা পায়ের উপর চাকা তুলে দিয়ে সামনের বাঁ পা'টাকে একবার প্রায় ভেঙেই দিয়েছিল।

বাবা উপরে চলে যাওয়ার পর আরও খারাপ লাগত। অক্ষয়-স্যার পড়ালে গোরু-গাধাও নাকি ফার্স্ট ডিভিশন পায়। আমি অন্য সব বিষয়ে খুব ভালো না হলেও অঙ্কের মত অতটা খারাপ ছিলাম না। তাই অঙ্কের দায়িত্ব অক্ষয়-স্যারের হাতে তুলে দিয়ে বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে যা খুশি তাই ভাবছিলেন।

বন্ধুদের কাছেও শুনতাম যে, তাদের সকলের বাবাও নাকি ওইরকমই বলতেন। প্রত্যেকের মায়েরাই বলতেন, 'তোর বাবা কোনওদিন ক্লাসে সেকেন্ড হননি। আর তুই?'

আমার বন্ধু প্রণব একদিন দুঃখ করে বলেছিল, 'ভেবে দ্যাখ, সকলের বাবাই যদি ক্লাসে ফার্স্ট হতেন, তা হলে ওঁদের সময়ে ক্লাসে সেকেন্ড হতেন কে বল তো?'

প্রীতি বলেছিল, 'আর ফেলই বা করতেন কারা? আমি তো ভেবেই পাই না।'

২

অক্ষয়-স্যার সপ্তাহে তিনদিন আসতেন। তাঁর বিরক্তি আর আমার হতাশা ও অপরাধবোধ ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। একদিন এক টিপ নস্যি নিয়েই উনি আমাকে বললেন, "খারাপ-ভালোর অনেকরকম হয়, বুঝেছ? তোমার মতো ছেলে আমি আর দেখিনি। তোমার বাবা মিছেই তোমার পেছনে পয়সা খরচ করছেন। আমি এবার তোমার বাবাকে বলব। তোমার মত দু-চারটি ছাত্র পেলেই আমার এতদিনের সুনাম ডুববে। এত সোজা অঙ্ক, তাও তুমি......"

আমি মাথা নিচু করেই ছিলাম। অনেক ছেলে বাবা-মায়ের কাছে রিপোর্ট লুকোয়, পাছে তাঁরা মারেন, বকেন। আমি কখনওই লুকোইনি। অক্ষয়-স্যার আমার কথা বাবাকে বলে দিলেও বাবা আমাকে কিছুই বলতেন না, কিন্তু বড় দুঃখ পেতেন নিশ্চয়ই। বাবাকে ভালোবাসতাম বলে বাবা দুঃখ পান, তাও চাইতাম না। অথচ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেও তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠার অঙ্ক বা চৌবাচ্চার জল ফুরনোর অঙ্ক কিছুতেই করতে পারতাম না। সেই সময় কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি কানের পাশে ঘুরঘুর করত। চোখের সামনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর রাজা দোবরুপান্না বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র হুসেন মিঞার মুখ ভেসে উঠত। অ্যালজেব্রাও একদম ভালো লাগত না। জিওমেট্রি একটু ভালো লাগত। মনে হত ছবি আঁকছি। কিন্তু থিওরি এলেই মাথা

একেবারে গোলমাল হয়ে যেত। আমি পরীক্ষায় ভালো ফল না করলে যে বাবা আরও দুঃখ পাবেন—এই কথাটা ভেবেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত। বাবার দুঃখ পাবার ভয়ে নিজে আগেভাগেই এত দুঃখ পেতাম যে, তা বলবার নয়। বাবার মস্ত কারখানার ভার তাঁর একমাত্র ছেলে নেবে এই-ই ছিল বাবার ইচ্ছে।

ভালো ছাত্র ছিলাম না বলেই স্কুলের কোনও মাস্টারমশাই বিশেষ চোখে দেখতেন না আমাকে। যদিও ব্যবহার এবং স্বভাবটা পড়াশুনোর তুলনায় একটু ভালো ছিল বলে কেউ খারাপ বলতেন এমনও নয়। আমি জানতাম যে, শিশির অথবা অনিমেষ অথবা কেউ ছাত্র হিসেবে আমার চেয়ে অনেকই ভালো ছিল। কাটু, বাণ্টা, এরা সব পড়াশুনোতে শিশিরদের মতো ভালো না হলেও খেলাধুলোর জন্যে আলাদা এক ধরনের সম্মান পেত স্যারদের কাছ থেকে। পুরো স্কুলের ছেলেরাও তাদের হিরো-জ্ঞানে দেখত। কাটুর তো তখন এতই কদর ফুটবলে যে, চার ফুট দশ ইঞ্চি হাইটের ম্যাচ হলেই এক বিকেলে চার-পাঁচ জায়গায় ওকে ভাড়া করে নিয়ে যেত বিভিন্ন ক্লাব। ওর নিন্দুকেরা বলত, ও নাকি এককাপ চা ও একটা বিস্কুট পেলেই ভাড়ায় খেলে দেয়। কাটু বিকেলের প্রথম খেলাতে নেমেই গোটা ছয়েক গোল দিয়ে তাদের এগিয়ে রেখে অন্য সব ম্যাচে গিয়ে পটাপট্ গোল দিয়ে আবার প্রথম ম্যাচের জায়গায় গিয়ে দেখত, প্রতিপক্ষের স্ট্রাইকাররা গোল শোধ করে দিয়েছে কি না। যদি ছ'টার বেশি গোল তারাও দিত, তবে কাটু তক্ষুনি গোটা দু-তিন গোল দিয়ে সেই ম্যাচের ইতি টানত।

প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের দিন শিশির এত বই পেত প্রাইজ হিসেবে যে, একা বয়েই নিয়ে যেতে পারত না। তিন-চারজনের সাহায্য লাগত। স্পোর্টস-এর প্রাইজের দিনও অন্যান্য ছেলেরা কত মেডেল, কাপ সব পেত। জীবনে কি পড়াশুনোতে, কি স্পোর্টসে, কোনওদিন একটিও প্রাইজ পাইনি। রেজাল্ট বেরোবার দিন, প্রাইজের দিন, বড় মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরতাম। এই ভেবে সান্ত্বনা দিতাম নিজেকে যে, আমরাই তো দলে ভারী। যারা প্রাইজ পেল, তারা আর ক'জন? তবুও বড় ছোট, সাধারণ, ভিড়ের মধ্যের একজন বলে মনে হত নিজেকে। কোনও-কোনওবার প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলা হত আমাকে। সে-গান আমার মা'ই শিখিয়ে দিতেন। গানও কিছু আহামরি গাইতাম না। অমন গান সকলেই গাইতে পারত।

কেবলই ভাবতাম, আমি খারাপ। আমি কোনও কিছুতেই ভালো নই। ফার্স্ট বয়দের মত লাস্ট বয়দেরও একটা আলাদা পরিচয় থাকে, বৈশিষ্ট্য থাকে। আমার তাও ছিল না। যে বয়সে প্রত্যেকেই ইমপর্ট্যান্ট হতে চায়, সেই বয়সে তখন আন-ইমপর্ট্যান্ট হয়ে থেকে মরমে মরে যেতাম।

আমাদের ক্লাসের লাস্ট বয় ছিল গজু। বয়সে সে আমার চেয়ে অন্ততঃ চার-পাঁচ বছরের বড় ছিল। একই ক্লাসে ছিল পাঁচ বছর। গতবার ফাইনাল পরীক্ষায় বাংলা পরীক্ষার দিনে আমার পাশেই সিট পড়েছিল গজুর। ও ঘাড় নিচু করে আমার কানে মুখ ঠেকিয়ে গরম নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'বিপ্রকর্ষ কী রে?'

গার্ড ছিলেন নরু-স্যার। দুষ্টু ছেলেরা তাঁকে ডাকত 'ঘাড়-ছোট নরু-স্যার' বলে। গজুর কথাতেই আমার দিকে তাকিয়েছিলেন উনি। ওঁর অভ্যাস ছিল ক্লাসের এ-প্রান্ত থেকে ও-

প্রান্ত অবধি পায়চারি করে বেড়ানো। ক্লাসে পড়াবার সময়ও অমনই করতেন। গার্ড দেওয়ার সময়ও তাই করছিলেন। উনি যেই দূরে চলে গেলেন, গজু ফিসফিস করে বলল, "তোর পেট যদি আজ ছুরি দিয়ে না ফাঁসাই, তো আমার নাম গজশোভা রায় নয়।"

সেকথা শুনেই আমার পিলে চমকে গেল। গলা শুকিয়ে এল। কানাঘুষোয় আমি শুনেছিলাম যে, গিরিশ পার্কের পাশে ও একটি মরচে-পড়া ছুরি দিয়ে একটি ছেলেকে খুন করেছিল। মরচে-পড়া ছিল বলে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারেনি ওর মা-বাবা অনেক চেষ্টা করেও। কিন্তু গজুর বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। তাই কিছুই হয়নি ওর।

ঘাড়-ছোট নরু-স্যার কথাটা শুনে ফেললেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "গজু, কেন ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ? বিপ্রকর্ষর মানে জানতে চাও তো আমিই বলে দিচ্ছি। কিন্তু এই একটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক লিখলেই কি তুমি পাশ করে যাবে এবারে?"

গজু নরু-স্যারকে ধমকে বলল, "স্যার, আমি অলরেডি চটে আছি। আমাকে আর চটালে কার পেট যে ফাঁসবে তার ঠিক নেই।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটু নস্যি নেবে?" বলেই ঘাড়-ছোট নরু-স্যার গজুর কাছে গিয়ে ওকে নস্যি অফার করলেন। গজু রেগুলার নস্যি নিত। স্যারের ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে কিছুটা আমার নাকে উড়িয়ে একটি নোংরা রুমাল বার করে নাক ঝাড়ল।

সেই মুহূর্তে ভালো ছাত্র শিশির সম্পর্কে যেরকম সম্ভ্রম ছিল আমার মনে, খুনি এবং ওঁচা ছাত্র গজু সম্পর্কেও, তার দুর্দান্ত প্রতাপ দেখে, ঠিক সেরকম নয়, তবে অন্য একরকম সম্ভ্রম জাগল। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, জীবনে বিশেষ কেউ হতে হলে খুবই ভালো হতে হবে। এখানে মাঝামাঝিদের কোনও পরিচয় নেই, দামও নেই। খুব ভালো যদি না হওয়া যায়, তা হলে খুব খারাপ, গজুর মত হওয়াও বোধহয় ভালো। কিছু-না-হয়ে-থাকার চেয়ে তবু কিছু একটা হওয়া হল। আমাদের বন্ধু রাজেন যেমন 'কিছু' হল সেদিন রাস্টিকেটেড্ হয়ে। বাবার আলমারি ভেঙে টাকা নিয়ে সে বোম্বে যেতে চেয়েছিল সিনেমায় নামবে বলে। খড়্গপুরেই পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে আসে তাকে। বোম্বেও যাওয়া হল না, রাস্টিকেটেডও হল।

৩

যেদিন স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরোল, সেদিন বাথরুমে গিয়ে খুব কাঁদলাম। আমার চেয়ে বেশি কাঁদলেন মা। এবং মা'কে অপদার্থ ছেলের জন্য কাঁদতে দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল।

সন্ধের পর অক্ষয়-স্যার এলেন। আমি পড়ার ঘরেই ছিলাম। ট্যাবুলেটরের কাছ থেকে উনি মার্কস জেনে এসেছিলেন। যেহেতু অঙ্কই পড়াতেন, অঙ্কের মার্কসই শুধু জেনেছিলেন। ওঁর মুখে আমার প্রতি সেই ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর অধৈর্য চিরদিনই ছিল। সেইসব আবারও তীব্র ঝলকে ফুটে উঠল। পথের ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে যেমন নাকে রুমাল চাপা দেন, তেমন করে আমার খারাপত্বর গন্ধও যেন ওঁর নাকে লেগে ওঁকে ভীষণ পীড়িত করছিল। নস্যি-মাখা রুমাল দিয়ে নাক চাপা দিলেন উনি।

মুখটি নিচু করেই রইলাম আমি। এ-মুখ কাউকেই দেখানোর নয়।

অক্ষয়-স্যার বললেন, "তুমি আমার লজ্জা। তোমার মতো গোটা-দুই ছেলে যদি আমার লিস্টে থাকে, তবে আমার প্রাইভেট টিউটর হিসেবে যে সুনাম, তা একেবারেই উবে যাবে। তোমার বাবাকে বোলো, অন্য টিউটরের খোঁজ করতে। তুমি পঁয়তাল্লিশ পেয়েছ। বুঝেছ? ইয়েস! পঁয়তাল্লিশ! আর অ্যাডিশনাল ম্যাথ্‌স-এ পেয়েছ পঁচিশ। ছোঃ, ছোঃ। অ্যাডিশনাল ম্যাথ্‌স! শখ কত্ত! কী স্পর্ধা! আর শোনো, ফার্স্ট ডিভিশনও জোটেনি কপালে। দশ নম্বর কম আছে।"

আমি মুখ নিচু করেই রইলাম।

অক্ষয়-স্যার হঠাৎ একটিপ নস্যি নিয়ে উঠে পড়েই বললেন, "তোমার বাবাকে কোন্ মুখে ফেস্ করব? উনি আসার আগেই আমি উঠছি। বাবাকে বোলো, তোমার ব্রিলিয়ান্ট মার্কসের কথা। ছিঃ, ছিঃ! কী বাবার কী ছেলে। লজ্জা, লজ্জা। তুমি আমার ছেলে হলে......।"

হলে যে কী করতেন, সেটা না বলেই এগোলেন। গোপেনদা যে আমার চেয়ে কত ভালো তা আমি জানতামই। ও-কথা ওঁর বলার দরকার ছিল না। চলে যেতে গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, "তোমার বাবা আমাকে যদি কিছু বলেন, তা হলে আমি কিন্তু ওঁকে ভালো করেই শুনিয়ে দেব, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু তু-তু-তুমি তো......।"

চলে গেলেন উনি।

টেবিল-লাইটটা জ্বলছিল। আমি টেবিলের উপরেই দু'হাতের মধ্যে মাথা পেতে শুয়ে ছিলাম। একটু পরই হঠাৎ ম্যাডার ঘনঘন চিৎকারে চমকে উঠলাম। শুনতে পেলাম বাবার গাড়িটা গ্যারাজে ঢুকল। ড্রাইভার বাহাদুর জিজ্ঞেস করল বাবাকে, কাল সকালে কখন আসবে? তারপর চাবি দিয়ে 'সেলাম সাহাব,' বলে চলে গেল।

ম্যাডা লাফাতে-লাফাতে বাবার পায়ে-পায়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। বাবা আমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝলেন। বললেন, "কী খোকন? মনটা খারাপ মনে হচ্ছে। হলটা কী?"

আজ যে স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরোবে তা বাবা জানতেন। কিন্তু আমি যে স্কলারশিপ পাবই, তা যেন উনি ধরেই নিয়েছিলেন। সামান্য অবাক হয়ে বললেন, "কী? ভাল হয়নি ফল?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোনওরকমে আমি বললাম, "সেকেন্ড ডিভিশান।"

বলতে চাইলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না যে "অঙ্ক আমার কোনওদিন ভালো লাগেনি বাবা। তুমি মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করলে অক্ষয়-স্যারকে রেখে।"

"ও!" বাবা বললেন।

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকেই বললেন, "ম্যাথ্‌স কীরকম হল?"

"ম্যাথ্‌স-এ পঁয়তাল্লিশ। আর অ্যাডিশনাল ম্যাথ্‌স-এ পঁচিশ।" বলেই আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। বাবা আমার কাছে এসে পিঠে হাত রাখলেন।

একটুক্ষণ পর গলা তুলে জগুকে ডাকলেন।

জগু গেট ছেড়ে ভেতরে আসতেই বাবা বললেন, "মাকে বল্, আমি নিউমার্কেটে যাচ্ছি। মাটন্ আনব আর গলদা চিংড়ি। পোলাও রাঁধতে বল্। তোরা কী রে? খোকন আজ পাশ

করেছে পরীক্ষায়, তোরা জানিস না? এই নে জগু, তুই এই একশোটা টাকা রাখ। আজ খুশির দিন।"

বলেই বললেন, "চল্ খোকন। জগু, তুই ম্যাডাকে ধর। নইলে ঝামেলা করবে।"

বাবা নিজেই গাড়ি বের করলেন গ্যারাজ থেকে। সামনের বাঁ দিকের দরজা খুলে দিলেন। *ওই সিটে মা বসেন। আমি বসে পড়েই দরজা বন্ধ করে দিলাম।*

জগুদা গেট খুলে দিল। বাবা গাড়ি চালিয়ে চললেন নিউ মার্কেটের দিকে। বললেন, "*এই রে! চিংড়ি মাছ তো তোর মা ভালোবাসেন। তুই তো ভালোবাসিস ভেটকি মাছের* ফ্রাই। চল্, দেখি। পেয়ে যাব ঠিকই। এখন ফ্রাই পিস করে কাটার লোক পাব কি না সেই হচ্ছে কথা!"

আমি চুপ করে ছিলাম। আমার ভীষণ জোরে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চলন্ত গাড়ির মধ্যে কাঁদলে লোকে কী ভাববে?

পার্ক স্ট্রীটে পড়েই বাবা বললেন, "তোর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত আমার। উচিত কেন, চাইছিই ক্ষমা। বুঝলি খোকন!"

"কী বলছ বাবা?" আমি হতভম্ব হয়ে বললাম।

"হ্যাঁ, তোর ইনক্লিনেশান ছিল আসলে আর্টসেরই দিকে। প্রথম থেকেই লিটারেচারে তুই তো ভালোই। আসলে লিটারেচার হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষদের সাবজেক্ট। আমরা তো হলাম গিয়ে মিস্তিরি। সে ইঞ্জিনিয়ারই বল, আর ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টই বল। জজ বল, ব্যারিস্টার বল, ডাক্তার বল—যিনি সাহিত্য না পড়েছেন বা পড়েন বা সাহিত্যের খোঁজ না রাখেন, তিনি আসলে অশিক্ষিতই। সাহিত্যই হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের মনের সবচেয়ে বড় এক্সপ্রেশান।"

একটু থেমে বললেন, "এত বড় ফ্যাক্টরিটা করেছিলাম। তুই ছাড়া আমার আর তো কেউই নেই। একমাত্র সম্বল তুইই। আজকাল কত সব কথা শুনছি। বিদেশে কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে সব ব্যাপারেই। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি প্রতিদিন কোথায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে, মানে, মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ডে। ভেবেছিলাম, সায়েন্স নিয়ে পড়লে তোর পক্ষে.....। যাক গে, মাই লাইফ ইজ মাই লাইফ, অ্যান্ড ইওর লাইফ ইজ ইওরস্। তুই যা হতে চাস খোকন, তাই-ই হয়ে ওঠ জীবনে। আমি তোকে আর ভুল পথে চালাব না। আই অ্যাম সরি। রিয়েলি আই অ্যাম।'

নিউ মার্কেটের সামনেটা তখন ফাঁকা। আলো প্রায় সব নিবে গেছে। ফুলের দোকানগুলো খোলা আছে শুধু। তাও বাইরের ঝাঁপ নামানো। গ্লোব সিনেমার সামনে একটা বিরাট হোর্ডিং। সিনেমার বিজ্ঞাপন। ছবির নাম 'আই উইল ক্রাই টুমরো'।

বাবা একটু পরেই মুটের মাথায় বাজার নিয়ে ফিরে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি নেমে বাবার হাত থেকে চাবি নিয়ে গাড়ির বুটটা খুললাম। মাল সব রেখে, বাবা মুটেকে পাঁচ টাকা দিলেন। মানুষটি বলল, "ফুটা নেহি সাহাব।"

বাবা বললেন, "আমার ছেলে আজ পরীক্ষায় পাশ করেছে। কলেজে যাবে। তোমাকে বকশিশ দিলাম।"

মানুষটি একটু অবাক হয়ে মাথায় হাত ঠেকাল।

গাড়িটা ময়দানের দিকে নিয়ে চললেন বাবা। ময়দানে পৌঁছে বললেন, "পোলাও হতে-হতে আমরা পৌঁছে যাব, কী বল ? তোর মা আছেন, নগেন আছে, জগু আছে, রাঁধতে আর কত সময় লাগবে ? চল্, একটু পায়চারি করি।"

বাবা গাড়িটার পাশেই সামনে-পিছনে হাঁটবেন বলে মনে হল। একটু হেঁটে বললেন, "নাঃ, চল, তোর মা ভাববেন। যেতে-যেতেই তোকে একটা গল্প বল্ব।" একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তুই মেন্ডহেল্সনের নাম শুনেছিস ?"

"না তো।"

"সে কী রে ? একটি বই আছে ওঁর জীবনী নিয়ে লেখা, নাম 'বিয়ন্ড ডিজায়ার'। পিয়ের ল্যা মূর-এর লেখা। তোকে কিনে দেব। পড়িস। সেদিন তুই মোৎজার্ট-এর রেকর্ড নিয়ে এসেছিলি সম্বিৎদার বাড়ি থেকে। বিটোভেন শুনিস প্রায়ই, আর মেন্ডহেলসনের নামই শুনিসনি ?"

"শুনিনি।" আমি বললাম, নির্লজ্জের মতো। পরীক্ষাতে এত বাজে রেজাল্ট করার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েই।

"ফেলিক্স। নাম ছিল তাঁর ফেলিক্স মেন্ডহেলসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের ইউনাইটেড জার্মানির সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কার ছিলেন ওঁর বাবা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়লোকদের মধ্যে একজন। ফেলিক্সের বাবার নাম কিন্তু ভুলে গেছি। ফেলিক্সও ছিলেন তোরই মতো, তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান। ফেলিক্স খুব আর্টিস্টিক ছিলেন। দারুণ পিয়ানো বাজাতেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল যে, উনি কম্পোজার হবেন। পিয়ানোতে নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করবেন। সে ব্যবসা দেখবে না এই কথা শুনে বাবার মাথায় তো আকাশই ভেঙে পড়ল। ছেলেও নাছোড়াবান্দা। মায়ের কিন্তু খুবই ইচ্ছে ছিল যে, ছেলে কম্পোজার হোক। আসলে মায়েরা সন্তানদের যতখানি বোঝেন, বাবারা কখনওই ততখানি বোঝেন না। তোর মা'রও কিন্তু উচিত ছিল, তোর আসল ভালোলাগা কোনদিকে, তা আমাকে জানানো। জানালে, তোর মন আজ খারাপ হত না। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষাতে ফল খারাপ করতিস না।

"যাই হোক, ফেলিক্সের মায়ের ইচ্ছে যেরকমই হোক, তাঁর বাবার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য ? শেষে বাবা তো ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করার ভয়ও দেখালেন। বললেন, "তোমাকে সম্পত্তির এক কণাও দেব না, যদি আমার ব্যবসাতে না আসো। সাবধান।"

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এসে ট্র্যাফিক লাইটে গাড়িটা দাঁড়াতে বাবা বললেন, "ফেলিক্স কিন্তু শুনলেন না। যে একবার গান-বাজনার জগতের ঐশ্বর্যের স্বাদ পেয়েছে, সাহিত্যের রসের আস্বাদ পেয়েছে, তার কাছে টাকাপয়সা কী ? চলে গেলেন সব ছেড়ে। যা হতে চেয়েছিলেন, তাইই হতে। রাজার চেয়েও বড়লোক বাবার ছেলে, অতি অল্প বয়সেই যক্ষ্মা হয়ে মারা গেলেন একটি আন-হিটেড ঘরে। ইউরোপের সব জায়গায় তো হিটিং ছিলও না তখন ঘরে-ঘরে। যক্ষ্মারও চিকিৎসা ছিল না বিশেষ। কিন্তু ওই বয়সেই ফেলিক্স যা করে গেলেন, টাকা রোজগার করে নয়, ক্ষমতা একীভূত করে নয়, কিছু করার মতো করে যে, আজ পৃথিবীর মানুষ যদিও ফেলিক্স মেন্ডহেল্সনের বাবাকে বেমালুম ভুলে গেছে, আর যদি-বা মনেও রেখেছে, তাও ফেলিক্সের বাবা হিসেবেই। প্রচন্ড পয়সাওয়ালা মস্ত ব্যবসাদার, দারুণ

ক্ষমতাবান তো কত মানুষই আসে যায় এই পৃথিবীতে। কিন্তু তাদের মনে রাখে কে? মনে যদি-বা কেউ রাখেও, ভালোবেসে মনে রাখে, তাদের মধ্যে খুব কম মানুষকেই মনে রাখে ঘৃণায়। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে, বুঝলি না!"

"আমি যে কোনও কিছুতেই তত ভাল নই বাবা। আমি যে মাঝামাঝি, মিডিওকার।" অসহায়ের মতো বললাম আমি।

বাবা আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাই তো জীবনের একমাত্র পরীক্ষা নয়, খোকন। যতদিন মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, ততদিন, প্রত্যেকদিনই তাঁকে অনবরত পরীক্ষায় বসতে হয়। যতই দিন যাবে, ততই এই কথা বুঝতে পারবি। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় যারা ফার্স্ট হয় এবং লাস্টও, তাদের মধ্যে বেশির ভাগকেই কিন্তু জীবনের মঞ্চে খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনের বড়-বড় পরীক্ষাতেও ওপরে উঠে আসে এই মাঝামাঝিদের ভিড়ের ভেতর থেকেই কেউ-কেউ। যারা ননডেস্ক্রিপ্ট, 'জনতা' বলি আমরা যাদের।" বলেই বললেন, "চল্, ফিরি এবার।"

বাবা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করবার পর আমি বললাম, "আমি যে এত খারাপ করলাম, তুমি দুঃখ পাওনি? মা খুব কেঁদেছে।"

বাবা হেসে বললেন, "তোর মা একটুতেই কাঁদেন। কাঁদলে চোখের মণি উজ্জ্বল হয় কিনা। তাই তোর মা কথায়-কথায় কাঁদেন। যাঁরা সুন্দর মানুষ, তাঁরাও ওরকম অনেক কিছু করেন আরও সুন্দর হওয়ার জন্যে।"

"আমার কথার উত্তর দিলে না তুমি বাবা?"

"আমি? না না, দুঃখ পাইনি। তবে অবাক হয়েছি। রেগে গেছি, সেটা তোর ওপরে নয়, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে। তোর মাস্টারমশাই অক্ষয়বাবুর ওপরে। আমার নিজেরও ওপরে। আমার উচিত্ ছিল, তোকে একটা ভালো ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া। আমার পক্ষে মোটেই তা অসুবিধের ছিল না। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে, আমার দেশের লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়ে যে শিক্ষার সুযোগ পায়, আমার ছেলেই বা তাদের থেকে বেশি সুযোগ পাবে কেন? তা ছাড়া বাংলা তো আমাদের মাতৃভাষাই। বেশির ভাগ ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলেই বাঙালিদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, গানবাজনা পরোক্ষে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তুইও তেমন হয়ে উঠিস তা আমি চাইনি......চেয়েছিলাম বাঙালি হবি।"

"আমি আসলে বাজে ছেলে। আমার কিছুই হবে না। স্কুল ফাইনালেই যে খারাপ করল, তার কাছে তো জীবনের সব দরজাই বন্ধ। এই পরীক্ষাই তো প্রবেশিকা।"

হাঃ-হাঃ করে হাসলেন বাবা। বললেন, "তোর নিজের কাছেও কি বন্ধ? আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা তোতাপাখির শিক্ষা। এখানের অধিকাংশ পন্ডিতদেরই শিক্ষার গুমোর আছে শুধু, দম্ভ আছে, প্রকৃত শিক্ষা নেই। তা ছাড়া শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে গেছে টাকা রোজগার। টাকা যাতে রোজগার করতে পারে, যেসব লাইনে বেশি টাকা আছে, সেইসব লাইনেই ভিড়। আমি চাই না তুই তেমন শিক্ষিত হোস, চাই না যে তুই টাকার অঙ্কের সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে শিক্ষাকে গুলিয়ে ফেলিস। সত্যিই আমি চাই না। আমাদের দেশে টাকাওয়ালারা কোনওদিন সম্মান পায়নি। পাওয়া উচিতও ছিল না। আজ যে পাচ্ছে, তা এই ফালতু শিক্ষার ভুল চাহিদার দোষেই। সরস্বতীর সাঁকো বেয়ে লক্ষ্মীর দরজায় পৌঁছতে

চাইছে প্রত্যেকেই। আর লক্ষ্মী যেখানে থাকেন, সরস্বতী সেখান থেকে অভিমানে সরে আসেন। আমি কিছু মনে করিনি রে খোকন। তুই আমার ভারি ভালো ছেলে। জীবনে ভালো হোস। মানুষ হোস। সত্যিকারের শিক্ষিত হোস, ডিগ্রি অনেক নাই-ই বা পেলি। আমি তো আর চিরদিন বাঁচব না। তোকে এই আশীর্বাদই করে গেলাম। তা ছাড়া আমি নিজে তো কখনও তেমন মেধাবী ছিলাম না। তোর কাছ থেকে আমার প্রত্যাশাটা অন্যায়। এক জেনারেশানে হয় না। মেধাবী যারা, তাদের মা-বাবা ঠাকুর্দা-দাদু তাঁরাও বোধহয় মেধাবীই হন।"

৪

কলকাতায় এসেছিলাম পুজোর সময়। পরশু দিল্লি ফিরে যাব। আমার একমাত্র ছেলে খোকা এবার দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষা দিল। আমি তো ভালো ছাত্র ছিলাম না। খোকাও পড়াশুনোতে মাঝামাঝিই হয়েছে। ও অভিনেতা হতে চায়। গ্রুপ-থিয়েটারের দলে ঢুকেছে। টিভি-ফিল্ম নিয়ে পড়াশুনো করবার ইচ্ছে আছে। আস্ত পাগল।

অনেকগুলো বছর চলে গেছে। সত্যি অনেকই বছর। আজ মা নেই, বাবাও নেই। দক্ষিণ কলকাতার বাড়িও রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে দিয়েছি আমি। দিল্লিতে থাকি এখন। আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। আমার স্টুডিও করেছি ভাড়া বাড়িতে, দিল্লির বাঙালিপাড়া চিত্তরঞ্জন পার্কে। ছবি আঁকি, মূর্তি গড়ি। প্রদর্শনী এবং এমনিতে কিছু-কিছু বিক্রি হয়। বড়লোক হতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু বাঙালিরা আমাকে চেনেন। দিল্লির বাঙালিরা তো বটেই, ভারতবর্ষ এবং বিদেশের বাঙালিরাও। তাতে আমার কোনও গর্ব নেই। আনন্দ আছে। পয়সার লোভে সকলেই যা করে চারপাশে, যা চায় ; তাদের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে নিজস্বতাকে এখনও খুইয়ে বসিনি যে, এইটেই আনন্দের। বাবার শিক্ষার অমর্যাদা করিনি আমি। আজকের দিনে এটা সম্ভব হত না, যদি-না শ্রাবণী আমাকে সাপোর্ট করত। স্ত্রীদের উপরে স্বামীদের জীবন, জীবনের গন্তব্য অনেকখানিই নির্ভর করে। বাড়িটার দাম পেয়েছিলাম পাঁচ লাখ। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকেই বলেছিল যে, নিজের সংসার চলে না, অত দাতাগিরিতে কাজ নেই। শ্রাবণী কিন্তু বলেছিল, মা-বাবাই যখন নেই, তখন যা আমাদের স্বোপার্জিত নয়, তা দিয়ে সহজ সুখ চাই না আমি। বড়লোকের ছেলে হলে খোকাও মানুষ হবে না। অত্যন্ত কষ্টকর হলেও বাংলাসাহিত্য, বাংলা গান, বাংলার যা কিছু ভালো তার সঙ্গে যোগাযোগ প্রবাসে বসে আমরা এখনও রেখে চলি। এই মাঝামাঝি, মিডিওকার, মধ্যবিত্ত বাঙালিরাই এখনও বাঙালির যা-কিছু ভালো তা প্রাণান্তকর কষ্টেই ধরে রেখেছেন বলে মনে হয় আমার। বিত্তবান বাঙালিদের অধিকাংশই বাঙালিত্বকে অসম্মান করেন, ছোট চোখে দ্যাখেন।

কলকাতায় এসে এবারে উঠেছি আমার শ্যালকের বাড়িতে। খোকা আর শ্রাবণী কলকাতার পুজো দেখতে চেয়েছিল, তাই। ভাইফোঁটার পরই ফিরে যাব আবার দিল্লিতে।

আমাদের স্কুলের উলটো দিকের পার্কে ছেলেবেলায় কত ফুটবল-ক্রিকেট খেলেছি। বন্ধুদের সঙ্গে কত গল্প মজা। আজ তাই প্রথম বিকেলে একটা মিনিবাস ধরে এসেছি এখানে। একজন কিশোরের চোখে এই পার্কটিকেই কত্ত বড় বলে মনে হত। ছোট-ছোট পায়ে এটি পার হতে-হতে মনে করতাম, তেপান্তরের মাঠই পেরোলাম বুঝি। আজ পার্কে ঢুকেই মনে হল, পার্কটি

খুবই ছোট। গাছগুলি উধাও হয়ে গেছে। ভিড়, বড় ভিড়। ধুলো। ছেলেবেলার সেই চোখ দুটিও তো হারিয়ে গেছে!

মন যদিও খারাপ হয়ে গেল, তবু ভাবলাম, কয়েক পাক হেঁটেই যাই পার্কের চারপাশের পিচ-বাঁধানো রাস্তায়।

আধ পাক যেতেই মনে হল যেন একটা বেঞ্চে লাঠি-হাতে অক্ষয়-স্যার বসে আছেন। ঠিক দেখলাম কি? তাঁর সামনে দিয়েই চলে গেলাম। ঠিকই চিনেছি। অক্ষয়-স্যারই। গোঁফ-চুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। মাথায় বাঁদুরে-টুপি, হাতে লাঠি। মুখে পৃথিবীর সব বিতৃষ্ণা, কষ্ট। খারাপ ছাত্র পড়ানোর কষ্ট নয়, বার্ধক্যের জরার কষ্ট। গায়ে একটি নস্যি-রঙা ছেঁড়া আলোয়ান। আমাকে চিনতেও পারলেন না। না পারারই কথা। আমার মতো কত খারাপ ছাত্রকেই তো তিনি পড়িয়েছেন। খুব ভালো আর খুব খারাপ ছাত্রদেরই স্যারেরা শুধু মনে রাখেন। মাঝামাঝিরা হারিয়েই যায় তাঁদের স্মৃতিতে। 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে, চলে যায়, তারা কলরবে, কৈশোরের কিশলয়, পর্ণে পরিণত হয়, যৌবনের শ্যামল গৌরবে।' কালিদাস রায়ের বিখ্যাত কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল অক্ষয়-স্যারের চোখের ঝাপসা দৃষ্টি দেখে। ওঁকে পেরিয়ে এসেই নতুন করে মনে পড়ল যে, অক্ষয়-স্যারের মতো এতখানি অপমান আমাকে জীবনে আর কেউই করেননি। তাঁর প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু বুঝলাম গভীর এক উদাসীনতা জন্মে গেছে এক ধরনের। বহু বছরের দূরত্ব তা গাঢ় করেছে আরও।

আরও এক পাক ঘুরে আসার পর ওঁর সামনে দাঁড়ালাম আমি। অক্ষয়-স্যারের মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটল না। প্রণাম করে বললাম, "কেমন আছেন স্যার?"

"ভালো নয়, ভালো নয়। কিন্তু চিনতে পারলাম না তো তোমাকে? কে?"

"আমি সিদ্ধার্থ স্যার। দক্ষিণ কলকাতায় থাকতাম। অঙ্ক.......।"

"ও, বুঝেছি, বুঝেছি। তা, কী করছ এখন তুমি সিদ্ধার্থ?"

"ছবি আঁকি স্যার। মূর্তি গড়ি।"

"পেট চলে তাতে? আর্টিস্টরা তো না খেয়েই থাকে শুনি।"

"কোনওক্রমে চলে যায় স্যার।"

"তা ভালোই করেছ। অঙ্ক তোমার লাইন ছিল না। অঙ্কে মাথা লাগে। অঙ্ক......"

"জানি।" একটু চুপ করে থেকে বললাম, "গোপেনদা কী করছেন স্যার?"

"মানে, আমার ছেলে গোপেনের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"ও?" অক্ষয়-স্যারের ম্লান করুণ কাতর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "গোপেন তো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। জানো তো? ম্যাথমেটিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিল। তারপর চলে গেল নতুন করে ফিজিক্সের লাইনে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। এখন আমেরিকার হিউস্টনে আছে। আরে, নেভাদার মরুভূমিতে যে বোমা ফাটাল সেদিন আমেরিকা, সে তো তার একারই হাতে গড়া!"

এমন করে বললেন, অক্ষয়-স্যার, যেন উড়নতুবড়ি বানানোর কথাই বলছেন। গোপেনদা যেন একা হাতে মশলা আর লোহাচুর ভরে উড়নতুবড়িই বানিয়েছেন একটা। আলোর ছটার

জন্যে নয়, পৃথিবীর যা-কিছু ভালো, সব ফুল, পাখি, প্রজাপতি, অরণ্য, মানুষ সব-কিছুকেই ধ্বংস করার জন্যে।

"দারুণ আছে বুঝলে হে। বিরাট বাড়ি। ক্যাডিলাক লিমুজিন গাড়ি। আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছে। কী ফুটফুটে মেমসাহেব। নাতি-নাতনিরাও সব ফুটফুটে। পাক্কা সাহেব। বাংলা বলতেই পারে না।"

গর্ব ঝরল অক্ষয়-স্যারের কথায় বসানতুবড়ির মতো, ঝরনার মতো।

"আপনি যাননি ? ওঁরা আসেন না ?"

"কী যে বলো ! আমার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে ইন্ডিয়ান বাথরুম। পায়রার খোপের মতো দু'খানা ঘর। জঞ্জালে ভরা। ওখানে ওরা থাকবে কী করে ? তুমি যেমন অঙ্কে গবেট ছিলে, ও ছিল তেমনই সত্যিই ব্রিলিয়ান্ট। জানো তো, স্কুল ফাইনালে স্টার পেয়েছিল। অঙ্ক, সংস্কৃত আর ভূগোলে লেটার পেয়েছিল। ইতিহাসেও।"

"আপনি এখনও কি পড়ান স্যার ? আর মাসিমা মানে, গোপেনদার মা কেমন আছেন ?"

"উনি গত হয়েছেন পাঁচ বছর হল।"

একমাত্র ছেলের প্রশংসাতে উজ্জ্বল মুখ হঠাৎই নিভে গেল অক্ষয়-স্যারের। বললেন, "বড় কষ্ট পেয়ে, বিনা শুশ্রূষাতে, বিনা চিকিৎসাতেই প্রায় চলে গেলেন। আমিও তো পা বাড়িয়েই আছি, বুঝলে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। শুধু বার্থটিই রিজার্ভেশন হয়নি। বাত, হাঁপানি, দুটো হার্ট অ্যাটাক। আছি কোনওরকমে। একে থাকা বলে না।"

"তা হলে এখন আর ট্যুইশানি করেন না ? স্কুল থেকে তো নিশ্চয়ই বহু বছর রিটায়ার করেছেন ?"

"পঁচিশ বছর। ট্যুইশানি, তা করি। নিশ্চয়ই করি। নইলে চালাচ্ছি কী করে ? কেন, তোমার ছেলে বুঝি তোমারই মতো অঙ্কে কাঁচা ?"

আমি হাসলাম। কষ্ট হল অক্ষয়-স্যারের জন্যে।

উনি বললেন, "এখন থাকো কোথায় ? ওই বাড়িতে তো অন্যরা থাকেন। ওই পাড়াতে আমার একটি ট্যুইশানি ছিল। তাই জানি। তুমিই বলো, সকালে অথবা দুপুরে আমি নিশ্চয়ই গিয়ে পড়াব যত্ন করে। রাতে আর কোথাও যাই না। চোখে তো দেখি না। ছেলের যেমন নাতি আদরের, ছাত্রর চেয়ে ছাত্রর ছেলেও তেমনই !"

"তা এই বয়সেও এত কষ্ট করেন কেন, গোপেনদা এত বড় এবং বড়লোক হয়েছেন। আপনাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠান তো নিশ্চয়ই। এসব তো ছেড়ে দিলেই পারেন এই শরীরে। আর কতদিন কষ্ট করবেন ?"

একটু চুপ করে থেকে অক্ষয়-স্যার গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "অভাব আমার কিছুই নেই। তবে একেবারে বসে গেলে শরীরটা আর চলবে না। তাই-ই চালিয়ে যাচ্ছি টুকটুক করে।"

"আচ্ছা, চলি স্যার।"

"তোমার ছেলে ? পড়বে না সে আমার কাছে ?"

"অঙ্ক ও পড়বে-না স্যার। অভিনয় করবে বলছে।"

অক্ষয়-স্যারের মুখটি, আমার অঙ্ক দেখে যেমন বিকৃত হয়ে যেত তিরিশ বছর আগে,

তেমনই বিকৃত হয়ে গেল। বললেন, "লাইক ফাদার লাইক সান। ও তো তোমারই মত গাধা হয়েছে তা হলে, অঙ্কে গবেট?"

হেসে বললাম, "তাই।"

সন্ধে হয়ে এল। আলো জ্বলে উঠেছে। পার্ক থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় আমার স্কুলের বন্ধু রাজেনের সঙ্গে দেখা। চিনতেই পারিনি। বুড়ো হয়ে গেছে। সিনেমায় নামবে বলে বাবার আলমারি ভেঙে টাকা নিয়ে এই রাজেনই বোম্বে যাচ্ছিল। পুলিশ ধরে আনার পর স্কুল থেকে রাস্টিকেট করে দিয়েছিল ওকে। ওর নাম ধরে ডাকতেই, আমার নাম বলতেই, বুকে জড়িয়ে ধরল রাজেন। বলল, "কী রে সিদু? কীরকম বুড়ো মেরে গেছিস তুই।"

"আর তুই কি কচি আছিস নাকি? টেকো-বুড়ো।" আমি বললাম।

হেসে ও বলল, "চল্, চল্ আমার দোকানে। বিকেলে একটু হাঁটতে বলেছেন ডাক্তার। দোকানে বসে-বসে ডায়াবিটিসে ধরেছে বুঝলি। চল, চল, দোকানের পর আমার বাড়িতে। সীমা কত্ত খুশি হবে। বাড়ির একতলাতেই তো দোকান।"

"কিসের দোকান?"

"আবার কিসের? স্টেশনারি দোকান দিয়েছি বাড়ির একতলাতে। আমি আর কী করব? সংসার তো চালাতে হবে।"

"মেসোমশাই কেমন আছেন?"

"বাবা নেই। অনেক চেষ্টা করলাম রে। সব সঞ্চয়, মায়ের, এমনকী সীমারও সব গয়না, আমার স্কুটারটা পর্যন্ত বিক্রি করেও তবুও বাঁচাতে পারলাম না।"

"কী হয়েছিল?"

"ক্যান্সার।"

"মাসিমা কেমন আছেন?"

"বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু ভালোই আছেন। চল্, চল, তোকে দেখে কত্ত খুশি হবেন। তুই বিজয়ার পর মায়ের হাতের কুচোনিমকি আর নারকোলের নাড়ু খেতে ভালোবাসতিস। চল্, এখনও কিছু আছে। আজকাল বিজয়াটিজয়া তো উঠেই গেছে। আমেরিকান হয়ে গেছি আমরা। কী বলব তোকে, এই শ্রীমান রাজেন দাসের একমাত্র ছেলেও ইংরেজি গান আর ইংরেজি বই ছাড়া পড়ে না। ইংরেজি নাচ নাচে।"

"কী করছে ও?"

"চোরের ছেলে আর কী করবে? ডাকাত-টাকাত হবে হয়তো। এখন কবিতা লিখছে। বাবা তো লক্ষপতি। লিটল-ম্যাগ্ আন্দোলনে সামিল হয়েছে ছেলে।"

"আরে হোক হোক। ওর জীবন ওর। বাধা দিস না।" আমি বললাম।

দোকানেই আগে নিয়ে গেল রাজেন। খুব মজা লাগল দেখে যে, বোম্বের বৈজয়ন্তীমালার বিরাট একটি ছবি টাঙানো আছে দোকানের দেওয়ালে। তাতে চন্দন-টন্দনের ফোঁটা দেওয়া।

বললাম, "এ কী রে? যাকে বিয়ে করবি বলে পালিয়েছিলি।"

রাজেন হেসে বলল, "কী বলিস তুই? যার জন্যে পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়ে বুকের হাড় ভাঙল, চোর বদনাম হল, তাকে কি ফেলে দিতে পারি? বাবা-মাকে যেমন ফেলে দেওয়া

যায় না, একেও তেমনই।" বলে নিজেই হো হো করে হেসে উঠল।

রাজেনের মা খুবই খুশি হলেন। রাজেনের বউ সীমা বলল, "আপনাকে আজ না-খেয়ে যেতেই দেব না। যা রান্না হয়েছে গরিবের বাড়ি, তাই খেয়ে যেতে হবে। এত বড় আর্টিস্ট আমাদের বাড়ি এসেছেন। আপনাকে কখনও চোখে না দেখলেও আমার স্বামীর বন্ধু বলেই কত্ত মানুষের কাছে গর্ব করি। আপনার গর্বে আপনার বন্ধুর তো মাটিতে পা'ই পড়ে না।" বলেই বললেন, "দোকানঘরের দেওয়ালগুলো দেখে এসেছেন তো?"

হেসে বললাম, "দেখিনি আবার।"

সীমা হেসে গড়িয়ে বলল, "ফোটোর সতীনকে নিয়ে কোনওই ঝামেলা নেই। আমিও ফুলটুল দিই মাঝেমধ্যে।"

"অক্ষয়-স্যারের সঙ্গে দেখা হল রে, বুঝলি রাজেন।" আমি বললাম রাজেনকে।

"তাই? আমার সঙ্গে তো রোজই হয়। দোকানেও বলে রেখেছি যে, রোজকার পাঁউরুটি যেন বিনে পয়সায় দিয়ে দেয় ওঁকে। গুরু-ঋণ বলে কথা। রাস্টিকেটেড ছাত্রই হই আর যাইই হই, কী কানমলাই না দিতেন। মনে আছে? ও, তুই তো আমার চেয়ে অনেক ভালো ছিলি অঙ্কে। বাঁ কানটা চিরদিনের মতো হাফ-কালা হয়ে গেছে রে। একেবারে রগে রগে ঘষাঘষি করতেন অক্ষয় স্যার।"

"গোপেনদা কিন্তু অঙ্কে দারুণ ভালো ছিল। স্যারের কাছে শুনলাম যে, বিরাট নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হয়েছেন আমেরিকায়..." আমি বললাম।

"তা তো হয়েছেন। কিন্তু মা মারা গেলেন বিনা চিকিৎসায়। বিনা ওষুধে। অঙ্কে দারুণ খারাপ ছেলে পাঁউরুটি দান করে বুড়ো বাবাকে তার বাঁচিয়ে রেখেছে। অমন ভালোর দাম কী বলতে পারিস? একটা টাকা পাঠায়নি বিদেশ যাওয়ার পর থেকে। একবারও আসেনি।"

"অক্ষয়-স্যারের ট্যুইশানি তো আছে এখনও কয়েকটা?"

"ছাড় তো। ট্যুইশানি। এখনকার দিনে কি আর তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠার অঙ্ক কষতে হয়? না শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ করতে হয়, কে পড়বে ওঁর কাছে? এখন অঙ্ককে অঙ্ক বলে না। বলে, 'ম্যাথ্স'। সীমাকেই জিজ্ঞেস কর না। স্যার পট্‌কে যখনই যান, তখন শুশ্রূষা করে সীমাই, ফ্লাস্কে করে পথ্য নিয়ে গিয়ে। যত ঝামেলা এই রাস্টিকেটেড ছাত্ররই। সত্যি। যাক্‌গে, আমি যেমন ছাত্র ছিলাম আমার ছেলেমেয়ে তার তুলনায় অনেকই ভালো। এইই স্যাটিসফ্যাকশান।"

মাসিমার হাতে বানানো কুচোনিমকি আর নাড়কোল-নাড়ু, সীমার রান্না লুচি-বেগুনভাজা, কুমড়োর ছেঁচকি, আর ডিমের ঝোল খেয়ে যখন প্রায় দশটা নাগাদ রাজেনের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে এলাম, তখন ভারি ভালো লাগছিল। অঙ্কে আমরা কেউই যে ভালো ছিলাম না, এটা মনে করে সত্যিই আনন্দ হচ্ছিল।

রাজেনকেও বললাম, সীমাকেও বলেই এসেছিলাম, "আগামী শীতে সব্বাইকে নিয়ে দিল্লি আয়। মাসিমাকেও নিয়ে আসিস। একটু অসুবিধে হলেও তোদের আনন্দ হবে খুব।"

রাজেন বলল, "খুব চেষ্টা করব। কী বলব তোকে, বিয়ের পর সীমাকে একবার দীঘা ছাড়া আর কোথাওই নিয়ে যেতে পারিনি। কত্ত যে ঝামেলা। আর রোজগার তো লবডঙ্কা।"

বললাম, "থ্রি টায়ারে করে চলে আয়। স্টেশনে তোদের রিসিভ করার পর থেকে সব

দায়িত্ব আমার।"

বাস এসে গেল। বললাম, "চলি রে।"

শীত কিছুই পড়েনি। তবে কলকাতার মানুষেরা তো ক্যালেন্ডার দেখে গরম জামা পরেন। তা ছাড়া ধোঁয়াশা আর ডিজেলের ধোঁয়ার কলকাতাকে এখন মনে হচ্ছে শীতের লন্ডন। দু'বছর আগে এগজিবিশন নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। তাই জানি।

পরের স্টপে ঠিক অক্ষয়-স্যারের মতো এক ভদ্রলোক উঠলেন। মাথায় বাঁদুরে টুপি। হাতে লাঠি। তবে বয়স অত হয়নি। বাস হঠাৎ ছেড়ে দিতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। উঠে দাঁড়িয়ে ওঁকে আমার সিটে বসালাম। উনি মুখে কিছু বললেন না। কৃতজ্ঞতা'ব চোখে তাকালেন।

তোতাপাখির 'থ্যাঙ্ক ইউ' আমার দেশের ঐতিহ্য নয়। আমরা চোখ দিয়েই অনেক জরুরি কথা অনেক বেশি গভীরভাবে চিরদিনই বলে এসেছি। ওই বৃদ্ধও তাই করলেন।

আমি বেঁটে লোক। মিনিবাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কলকাতার পাবলিক বাসে দিল্লির পাবলিক বাসের চেয়ে অনেক কম ভিড়। দিল্লি হচ্ছে বড়লোক-ব্যবসাদারদের সুখের জায়গা। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের বিস্তরই অসুবিধে সেখানে। ভাবছিলাম, বাড়িটা দান করে দেওয়া বোধহয় ঠিক হয়নি। কলকাতাতে থাকলেই হত। বাঙালি মধ্যবিত্তের পক্ষে এখনও কলকাতার মতো নিরাপদ ও সুখের জায়গা আর নেই।

কন্ডাকটারকে একজন যাত্রী বললেন, "এটা কী হল দাদা? অঙ্কটা কীরকম হল? দিলুম পাঁচ টাকার নোট, যাব শ্যাল্‌দা, আর ফেরত দিলেন এই? অঙ্কের জ্ঞানটা একটু ভালো করুন।"

অক্ষয়-স্যারের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার। নস্যি নিয়ে, অঙ্ক-কষিয়ে ছাত্রদের কান মলে, গালাগালি করে প্রত্যেককে অঙ্ক-বিশারদ করতেই কাটিয়ে দিলেন সারাটা জীবন মানুষটি।

কিন্তু নিজের জীবনের অঙ্কটাই, একটা মাত্র অঙ্ক, অতি সাদামাটা অঙ্ক ; তাও মিলল না।

বাবা, মা, আমি এবং পরমা



মিনিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় অবেলাতে ঘুমোলো।

বিষ্ণুপুরে আসার পর থেকেই খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটির দিনে বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিটুকুতে বসি একটু। এখনও গরম পড়েনি। বসন্ত এখন। চারপাশে অনেকগুলো কৃষ্ণচূড় গাছ। লালে লাল হয়ে আছে। সারা দুপুরে এবং রাতভর কোকিল ডাকে।

বই-টইও এখানে বিশেষ পাই না। রবিবারের কাগজের লেখাগুলো খুঁটিয়ে পড়ি। অফিস থেকে শনিবার আসার সময়ে কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে আসি। শনি-রবিবারে পড়ে আবার সোমবারে ফেরৎ নিয়ে যাই অফিসে।

দূরে ছিন্নমস্তার মন্দির, রাঠীর বাগানের দিকের ঝুপড়ি-ঝুপড়ি গাছগুলো চোখে পড়ে লালবাঁধের জল চিক্‌চিক্ করে দুপুরের রোদে। তার পাশে বনবিভাগের উক্যালিপট প্ল্যানটেশান। ভারী সুন্দর দেখায় ওদিকটা। কোনো কোনো রবিবার পরমা আর মিনিকে নিয়ে হাঁটতেও যাই ওদিকে। অবশ্য এখানে আমাদের সকলেরই প্রচুর হাঁটাহাঁটি হয়। সকালে বাজার যাওয়া-আসাই তো প্রায় মাইল তিনেক। ফিরেই, মিনিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে চাট্টি করে খেয়ে নিয়ে অফিসে যাই। পরমাই স্কুল থেকে নিয়ে আসে মিনিকে। হেঁটে যায় হেঁটে আসে। সাইকেল রিকশা নিয়েও যেতে-আসতে পারতো, কিন্তু তাতে রোজ এক টাকা করে খরচ। আমার আয়ে এতো বড় বিলাসিতা পোষায় না। তাও তো এখন গরম পড়েনি গরম ও বর্ষার দিনে পরমা আর মিনির দুর্যোগের একশেষ হবে। কিন্তু করার কিছুই নেই

হঠাৎ পরমা একটা পান হাতে করে এসে বললো, খাবে নাকি?

হঠাৎ পান? বললাম আমি।

পরমা বিরক্ত গলায় বললো, অত জেরার উত্তর দিতে পারবো না। খেলে খাও।

পানটা মুখে দিয়ে বললাম, বসবে? চেয়ার আনব ঘর থেকে?

পরমা বলল, না।

তারপর বলল, সময় মতো বাস স্ট্যান্ডে যেও কিন্তু।

বাস স্ট্যান্ডে কেন? আমি শুধোলাম।

তারপর বললাম, রবিদা-বৌদি তো গাড়িতেই আসবেন লিখেছেন।

পরমা বিরক্তির স্বরে বলল, লিখেছেন; কিন্তু যদি বাসেই এসে পড়েন।

বাঃ তা কেন করবেন? আমি বললাম।

পরমা বলল, অত তর্ক কোরো না।

তারপরই বলল, আমার দাদা বৌদি তো! তোমার গা থাকবে কেন? তোমার বাড়ির কেউ হলে তো সকাল থেকে কতবার গিয়ে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে খোঁজ-খবর করে আসতে।

আমি এবার বিরক্ত হয়ে বললাম, তা হয়ত করতাম। কারণ আমার আত্মীয়স্বজনদের তো গাড়িতে করে আসার কথা থাকত না।

পরমা চলে গেল।

বলে গেল, ইচ্ছে হলে যেও; নইলে যেও না। আমার আর কিছু বলার নেই।

পরমা কারো সঙ্গেই মানিয়ে থাকতে পারল না বলেই কলকাতা ছেড়ে বিষ্ণুপুরে আসতে হয়েছিল। আমাদের বসু-পরিবারতন্ত্রে আমার স্থানটা সবদিক দিয়েই এত নিচুতে ছিল যে ঐ ব্যাপারে অশান্তি পাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। বন্ধু-বান্ধবরা বলত, জয়েন্ট-ফ্যামিলির দিন চলে গেছে। শুনতাম, কিন্তু যার একা থাকার সামর্থ্য নেই, তার সকলের সঙ্গে না থেকে উপায়ই বা কি?

একসঙ্গে থাকতে হলে, "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই" একমাত্র উপায়।

পুতুল খেলার দিন থেকেই প্রত্যেক মেয়েই মনে মনে একটি নিজের নিজস্ব সংসার চায়। যেখানে সে-ই সম্রাজ্ঞী। সে সাম্রাজ্য যতই সামান্য ও দারিদ্র্যময় হোক না কেন। তার স্বাদই আলাদা। অন্তত আমার স্ত্রী এবং অন্যান্য পরিচিতা ও আত্মীয়াদের দেখে আমার এ-কথাই বার বার মনে হয়েছে।

আমি সাধারণ। অতি সাধারণ সরকারী চাকুরে। কোলকাতার বাড়িতে মা-বাবা, নিঃসন্তান কাকা-কাকীমা; দুই দাদা। সকলের ও আমার রোজগারে মিলেমিশে রীতিমত সচ্ছলভাবেই দিন কেটেছে। কিন্তু সচ্ছলতাই সংসারের একমাত্র কাম্য বস্তু নয়। বিশেষত পরমাদের মতো মেয়েদের কাছে। সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে, পুজোর খরচ নিয়ে, মায়ের ঠাকুর ঘরে বাতি দেওয়া নিয়ে, ছোট্ট বোনের বাচ্চা হওয়ার সময়ে বোন-ভগ্নীপতির আমাদের অপরিসর বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকা নিয়ে অনেকই অশান্তি, মধ্যবিত্ত পরিবারের পারিবারিক রাজনীতির অনেক স্রোত, উল্টোস্রোত, সব মিলে-মিশে এবং বিশেষ করে কাকার গর্ব ও কাকীমার দেমাক নিয়ে পরমার মনের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ও টেনসান ক্রমশই এমনভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল যে বদলীর অর্ডারটা আসায় হাতে যেন চাঁদই পেয়েছিলাম আমরা।

পরমা এই প্রথম আলাদা সংসার পেল বিষ্ণুপুরে এসে। আমাদের একমাত্র মেয়ে মিনিকে নিয়ে আমাদের দু'ঘরের আড়াইজনের সংসার পেয়ে সত্যিই খুশী হয়েছিল পরমা।

অফিস যাওয়ার আগে যখন থলে-হাতে বাজারে যেতাম, পরমা তাড়াতাড়ি চা করে দিয়ে বলতো, আজ একটু সজনে খাড়া এনো। সঙ্গে এক ফালি কুমড়ো। কুচো মাছ পেলেও এনো।

ওর ছেলেমানুষ, স্টোভের-আঁচে লাল মুখে এসব গিন্নিবান্নি কথা শুনে অবাক লাগত আমার।

এখানে কুচো মাছ বড় একটা পাওয়া যায় না। বেশীই ছোট পোনা কিন্তু টাট্‌কা। যা মাইনে পাই তাতে রোজ মাছ খাওয়া অসম্ভব। কিন্তু পরমার গিন্নিপনাতে ধোঁকার বা ছানার ডাল্‌না, ধনেপাতা দিয়ে লাউবড়ির তরকারি, চবু নারকোল-ভাত এসব নতুন নতুন নিরামিষ

পদ খেয়ে মাছের শোক প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম।

কোলকাতার এজমালী সংসার ছেড়ে এসে নিজের সংসার পাততেই মায়ের হাতের রান্নার কথা বড় মনে পড়ত। পরমা একে একে তাদের বাড়ির সমস্ত স্পেশ্যালিটি রেঁধে এবং খাইয়ে আমাকে দত্তবাড়ির রন্ধন-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী করে তুলল। বোস-বাড়ির রান্নার স্বাদ প্রায় ভুলেই যেতে বসেছি এখন আমি।

মাঝে মাঝে আমার মন কেমন করত। মায়ের পেটে একটা টিউমার আছে। এক্স-রে করার কথা ছিল। হলো কিনা কে জানে। দাদারা যেহেতু কৃতী, এসব কাজ ছিল আমার। দাদাদের সময়ই হতো না মাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় বা হাসপাতালে যাওয়ার। বড়দা অফিস থেকে গাড়ি পেত। কিন্তু এসব ব্যক্তিগত কাজে সেই গাড়ি ব্যবহার করতে বড়দার সততায় বাধত অথচ শালা-শালীদের নিয়ে সেই গাড়ি চড়েই পিকনিকে বা মেসাঞ্জোরে যেতে সেই সততা বিঘ্নিত হতো না।

বাবার ব্লাড-সুগারটা খুব বেড়েছিল। আসার আগে দেখে এসেছিলাম খাওয়ার পরে রক্ত নিয়ে, দুশো কুড়ি। গুড় খেতে খুব ভালবাসেন বাবা। মায়ের কথা কানেই নেন না। এখনও গুড় খেয়ে যাচ্ছেন কি না, তা দেখবার লোক কেউ নেই এ-কথা ভেবেও চিন্তা হতো।

নিজের পরিবার ছেড়ে এসে প্রায়ই মনে হতো যে সুখ আর আরাম বোধহয় এক নয়। আরো মনে হতো যে আমরা যতই ইংরিজি শিখে থাকি না কেন, স্বতন্ত্র সংসারে বিশ্বাস করি না কেন ; আমাদের অস্তিত্ব, যৌথ-পরিবারের অনেকই গভীরে প্রোথিত আছে। নিজের সংসারের সব সুখ-স্বাধীনতা দিয়েও বোধহয় সেই দুঃখমিশ্রিত আনন্দের সমান হয় না নিক্তি। কিন্তু কিছুই বলতে পারতাম না মুখে, পরমার খুশি সুখোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে। মিনিটা তার দাদু-দিদাকে বড়ই মিস্ করত। বাবা প্রত্যেকদিন, ও যতদিন না স্কুলে ভর্তি হয় ; ওকে নিয়ে সকালে বসতেন। বাবাই ওকে অক্ষর পরিচয় করান। ইংরিজী ও বাংলা। অঙ্ক করাও শেখাতেন। সে-যুগের প্রেসিডেন্সীর অঙ্কের ছাত্র ছিলেন বাবা। মা, ভক্ত প্রহ্লাদের কথা বলতেন মিনিকে, ঠাকুমার ঝুলি থেকে গল্প পড়ে শোনাতেন। কখনও বা অবন ঠাকুরের 'রাজকাহিনী', রবি ঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ'।

বর্ষার রাতে রান্নাঘর থেকে ভেসে-আসা খিচুড়ির ফোড়নের গন্ধ, কাকার সিগারের ধুঁয়োর উগ্র গন্ধ, চান করে আসা পরমার গায়ের সাবানের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে কড়কড়ে করে আলুভাজা ও শুকনো লংকা ভাজার নাক-সুড়সুড় করা গন্ধের মধ্যে আমার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমাদের সেই যৌথ পরিবারের যৌথ গন্ধগুলো আমার সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত। সেঁধিয়ে থাকত।

মিনি যখন আরও ছোট ছিল, একদিন সন্ধ্যাবেলায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেছিল। আজও মনে আছে, দাদা অফিস থেকে ফিরছিলেন তখন। দারুণ ইস্ত্রি-করা একটা দামী বাদামী-রঙা স্যুট পরে। দাদা দৌড়ে এসে, ছাদের ফুলের টবের জন্য শুকোতে দেওয়া গোবর-মাখা জুতো সুদ্ধু মিনিকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন ভয়ার্ত চিৎকার করে। আমি সিঁড়ির মুখে দৌড়ে গিয়েই দেখেছিলাম বাবা-মা কাকা-কাকীমা দাদা-বৌদিরা সকলে ভিড় করে আছেন। কাকা, পায়জামা আর হাতকাটা গেঞ্জী পরে বারান্দার লম্বা হাতলওয়ালা ইজিচেয়ারে বসে সিগার খাচ্ছিলেন। ঐ অবস্থাতেই মিনিকে দাদার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ট্যাক্সি করে

ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছিলেন। কাকার সঙ্গে মেজদা ও পরমাও গেছিল। তখন সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎই মনে হয়েছিল যে, আমার মাত্র পাঁচ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স থাকলেও আসলে আমার এবং আমার স্ত্রী ও কন্যার জীবন দারুণভাবে সুরক্ষিত। সে রাতে একা ঘরে বসে বড় অপারগ মনে হয়েছিল নিজেকে। আমাদের বাসস্থানের মালিক যেই কাকাকে দাম্ভিক, যে-বড়দাকে হৃদয়হীন চালিয়াৎ, যে-মেজদাকে স্বার্থপর বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম, তাদেরও চরিত্রের যে অন্য বহুদিক আছে, কোনো মানুষকেই যে আমরা প্রাত্যহিকতার বিচারে সঠিক বিচার করতে পারি না ; এ-কথা ভেবেই বার বার নিজেকে একদিকে কৃতজ্ঞ, অন্যদিকে ছোট বলে মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, বড়দার ছোট ছেলে তুমু ; যে মিনির বয়সী, সে সিঁড়িতে পড়ে গেলে আমি কি করতে পারতাম ? আমি কি আমার অফিস-যাওয়ার সবচেয়ে দামী পোশাকে গোবরলাগা জুতোসুদ্ধু তুমুকে কোলে তুলতাম ? তুমুর জন্যে সে রাতে কি ওষুধ ইনজেকশান করে একশো টাকা খরচ করে ফেলতে পারতাম ?

তারপরই মনে হয়েছিল যে, না, তা পারতাম না সত্যি কিন্তু আমি সারা রাত জেগে তুমুকে সেবা করতে পারতাম। আমার শরীর দিয়ে সামর্থ্যের অভাব পূরণ করতাম। আমি প্রমাণ করতাম অন্যভাবে যে, আমি দাদার ছেলে তুমুকে আমার মেয়ে মিনির চেয়ে একটুও কম ভালবাসি না।

কিন্তু...। যাকগে এসব কথা।

পরমার মামাতো দাদা-বৌদি আসবেন আজ আমাদের এখানে বেড়াতে। আজ মাসের পঁচিশ তারিখ। কাল মানিব্যাগে দেখেছিলাম, তিরিশটি টাকা আছে।

ওঁরা বড়লোক। ডাক্তার দুজনেই। কোলকাতায় নিজেদের গাড়ি-বাড়ি আছে। পরমার নিজের দাদাদের সামর্থ্য ছিল না। ছোটবেলায় ওর বাবা মারা গেছিলেন। এই দাদাই পরমার বিয়ের সময় বেশি খরচ দিয়েছিলেন। সে বাবদে পরমার কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রতিভাআমাকেই।

আমি আজ বাজারে যাওয়ার সময় পরমা কিছু বলেনি। অন্যদিন ফর্দ করে [illegible] আজ বলেছিল হেসে, আমি কি বলব ? তোমার যা-খুশি তাই-ই এনো।

বাজারে গিয়ে কুড়ি টাকা খরচ হয়ে গেল তেল টেল নিয়ে, কিন্তু বাড়ি ফিরে থলে উপুড় করে রান্নাঘরের বারান্দাতে ঢেলে দিলাম যখন, তখন পরমার মুখটা কালো হয়ে গেল। বেশি কিছু বলল না। শুধু বলল, অনেক বাজার করেছ দেখছি আজ !

কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝলাম যে, ওর দাদা-বৌদির জন্যে আমি আরও অনেক কিছু বাজার করব বলে ভেবেছিল ও।

আমার বড় লজ্জা হয়েছিল। দুঃখও।

একটা হাওয়া উঠেছে মাঠে, খোয়াইয়ে ; বনে বনে। কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতা ও লাল ফুলে ভরা ডালগুলো নৌকার পালের মত ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছে। খবরের কাগজটাকে একটু নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়লাম। বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। তবুও সময় মত উঠলাম। ঘরে গিয়ে পায়জামার উপর পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিলাম।

পরমা জানালার পাশে চেয়ারে বসে উক্যালিপটা বনের দিকে চেয়েছিল। কী যেন ভাবছিল ও। ওর চোখের দৃষ্টি বহু দূরে নিবদ্ধ ছিল। কেমন উদাস দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে

ও বলল, অমন হাভাতের মত যাওয়ার দরকার কি ? হাওয়াইন শার্ট প্যান্ট বের করে দিচ্ছি, পরে যাও।

আমি কথা বললাম না। একবার ফিরে তাকালাম।

পরমা বলল, চা খেয়ে যাও। পাঁচ মিনিটে করে দিচ্ছি।

আমি বললাম, না। থাক। বাস স্ট্যান্ডেই খেয়ে নেব।

পরমা বলল, তোমার মত পয়সার অপচয় আর কেউ করে না। কত যেন বড়লোক ! ভাব দেখলে হাসি পায়।

আমার গা জ্বলে উঠল। আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাস-স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাস প্রায় ঘন্টাখানেক লেট করে এল। অনেকক্ষণ পায়চারী করলাম। লাভের মধ্যে রাবারের চটির স্ট্র্যাপটাই ছিঁড়ে গেল। কাল সকালে বাজারে গিয়ে সারানো ছাড়া উপায় নেই। এক পায়ে চটি পরে হাঁটা যায় না। চটি-জোড়া হাতে করে যখন সন্ধের অন্ধকারে বাড়ি ফিরলাম তখন দেখি, বাড়ির সামনে একটি ঝকঝকে কালো ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন গাড়িতে বসে আছে। ড্রাইভার হবে বোধহয়।

ভিতরে ঢুকতেই বৌদি বললেন, কী হে জয়ন্ত, আমরা তো লিখেইছিলাম যে গাড়িতে আসব।

পরমা বলল, বাস কখন এসে গেছে ! আমার উপর রাগ দেখাবার জন্যে বেরিয়ে-টেরিয়ে ফিরলেন।

তারপর ওর বৌদির দিকে ফিরে বলল, তোমরা তো আমারই দাদা-বৌদি। ওর তো কেউই নও।

রবিদা হঠাৎ আমার হাতে-ধরা চটির দিকে চোখ পড়ায় বললেন, ওকি, হাতে ওটা কি ?

মিনি হাততালি দিয়ে বলল, এমা, বাবা চটি হাতে হেঁটে এলো।

পরমা চকিতে আমাকে দেখে নিয়ে বলল, সং-এর মত দাঁড়িয়ে থেকো না তো ! চটিটা রেখে এসো।

চটি রেখে আসতেই, রবিদা বললেন, আর এক কাপ করে চা খাওয়া পরমা।

পরমা চা করতে গেল ভিতরে।

বৌদি বললেন, আমাদের সঙ্গে কিন্তু ড্রাইভার আছে ! ও-ও খাবে বুঝলে জয়ন্ত। পরমাকে বলে দিও।

পরমা ভিতর থেকে বলল, বলতে হবে না। পরমার চোখ আছে। আমি কি আর রাম সিংকে চিনি না ?

বৌদি বললেন, জয়ন্ত, এখানে কেন এসেছি বলো তো ?

আমি বোকার মত বললাম, পরমার সংসার দেখতে।

বৌদি বললেন, তাতো বটেই ! তবে সেটা আসল কারণ নয়। আসল কারণ বালুচরী শাড়ি। নিয়ে যাবে তো দোকানে ?

আমি বললাম, নিয়ে যাব না কেন ? কিন্তু তার তো শুনেছি অনেকই দাম ! হাজার টাকা পনেরোশো টাকা এক-একটা শাড়ি।

রবিদা হাসলেন। বললেন, তোমার বৌদিও কি আর কম দামী হে ?

আমি হাসলাম। বললাম, তাতো বটেই!

তারপর বললাম, থাকবেন ক'দিন?

বৌদি বললেন, বেশীদিন থাকলে তোমার আপত্তি?

আমি আবারও হাসলাম। বোকারা অকারণেই হাসে।

বললাম, না, না। কি যে বলেন।

রবিদা বললেন, পরশু ভোরে ব্রেকফাস্ট খেয়েই চলে যাবো। আমার আবার বিকেলে একটা অপারেশন আছে বেলেভ্যুতে। খুব বড় মাড়োয়ারি ব্যবসাদারের একমাত্র মেয়ের অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন। কাজ কিছু নয়। কিন্তু ভালো মাল-কড়ি আছে। ফোকটে লাভ, বুঝলে না?

ভালো ছাত্র না হলে ডাক্তার হওয়া যায় না জানতাম। জানতাম, ডাক্তারদের প্রফেশান সবচেয়ে নোব্‌ল প্রফেশান। কিন্তু রবিদার কথা শুনে, হাব-ভাব দেখে বোঝা যায় না উনি লোহা-ঢালাইওয়ালা, না ডাক্তার। অবাব লাগল।

ওঁরা চা-টা খেয়ে বললেন, এখানে আমার এক বন্ধুর ভাই আছেন এস-ডি-ও। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যাই একবার দেখা করে আসি। গেলে অবশ্য বিপদ আছে। নাও ছাড়তে পারে, খাইয়ে তো ছাড়বেই; ওখানে রেখেও দিতে পারে।

তারপর বললেন, তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?

আমি বললাম, না, না, উনি কতবড় অফিসার। এ সব ছোট জায়গায় আমাদের অনেক প্রোটোকল মেনে চলতে হয়। উনি যদি আমার কথা শুনে আমাকে দেখতে চান বা আলাপ করতে চান, সে অন্য কথা।

আমার কাছ থেকে ডিরেকশান নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন ড্রাইভারের চা খাওয়া হয়ে গেলে।

ওঁরা চলে যেতেই পরমা বলল, তোমার মত ছোটলোক দেখিনি। অমন করে কেউ অতিথিকে শুধোয় যে, ক'দিন থাকবেন? কথাটা কি অন্যভাবে বলা যেত না? তোমার জন্য আমার মাথাকাটা যায় লজ্জায়।

কী বললে তুমি খুশী হতে?

বলতে পারতে যে, বেশ কয়েক দিন থাকতে হবে কিন্তু। তা হলেই জানতে পেতে যে ক'দিন থাকবেন।

তোমার মত আমার বাড়ি তো শান্তিপুরে নয়। অত সুন্দর করে কথা বলতে শিখিনি।

শেখোনি তো অনেক কিছুই। কিন্তু শিখতে আপত্তি কি?

আমি আর কিছু না বলে, আবার বাইরে গিয়ে বসলাম অন্ধকারে।

মিনি, বারান্দা থেকে তোতা পাখির মত বলল, বাবা অন্ধকারে বোসো না। মা বলেছে, বিছে কামড়াবে।

পরমা এসে বলল, রাম সিং অনেক দিনের ড্রাইভার আমাদের। ওকে খাতির যত্ন না করলে হবে না। একটু পরই ভিতর থেকে আবার ফিরে এসে বলল, শুনছ, দাদা বৌদি আর আমি আমাদের ঘরেই শোব। মিনিকে নিয়ে তুমি বারান্দার চৌকিতে শুয়ে মিনির ঘরের খাটটা রাম সিংকে ছেড়ে দাও।

আমি বললাম, তাই-ই হবে।

রবিদা বৌদি প্রায় এগারোটায় ফিরলেন এস-ডি-ওর বাড়ি থেকে।

পরমা রান্না-বান্না সেরে বসে বসে হাই তুলতে-তুলতে মিনির পাশে শুয়ে পড়েছিল। ওঁরা আসতে আবার খাবার-টাবার গরম করে সকলে মিলে খেতে বসা গেল।

পরদিন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দুশো টাকা ধার নিলাম। সকালে বাজার করলাম পাশের বাড়ির মুখার্জীবাবুর কাছ থেকে ধার করে।

সকালে বৌদি বলেছিলেন যে, তোমার দাদার ক্লোরোস্টোল বেড়েছে। লীন্ মীট ছাড়া কিছু খান না। পাঁঠার মাংস এনো না কিন্তু। চিকেন এনো জয়ন্ত।

তারপর বললেন, এখানে অ্যাসপারাগাস্ পাওয়া যাবে ? গেলে, তোমার দাদাকে সঙ্গে একটু অ্যাসপারাগাসের স্যুপ করে দেওয়া যেত।

পরমা বলল, কাকে কি বলছ বৌদি ? ও এসবের নামই শোনেনি। তবে হ্যাঁ, চিকেন আনবে। আর মাছ ?

বৌদি বললেন, বড় রুই মাছ পেলে এনো। অনেক দিন মুড়ি-ঘন্ট খাই না। কলকাতায় তো পার্টি-ফার্টি লেগেই আছে। রোজই। আজ কক্‌টেল। কাল ডিনার। দিশি রান্না খেয়ে যে একটু সুখ করব তার উপায় নেই।

বাজার সেরে, কোনোক্রমে খেয়ে আমি অফিসে গেলাম। পরমা আমাকে বলল, তোমায় নিয়ে যেতে হবে না। আমরা আস্তে-সুস্থে খেয়ে দেয়ে, শাড়ির দোকানে যাব। আমি তো চিনিই।

বললাম, মিনির স্কুল ?

পরমা বলল, মেয়ে আমার এমন কিছু এম এস সি পড়ছে না। সবে তো কে-জি ওয়ান। ক'দিন কামাই করলে কিছু হবে না। মামা-মামী এসেছে। ওকেও নিয়ে যাব সঙ্গে।

অফিস থেকে ফিরে দেখলাম পরমা গলদঘর্ম হয়ে রান্না করছে। আর মিনিটা ভরসন্ধেয় ঘুমোচ্ছে।

আমি বললাম, চা খাওয়াতে পারো এক কাপ।

পরমা বলল, মুখ হাত ধোও। করে দিচ্ছি।

পরমার গলার স্বরটা অন্য রকম শোনালো।

পরক্ষণেই বলল, ঢের ঢের ছোটলোক দেখেছি। এমনটি দেখিনি। খালি বড় বড় কথা আর চালিয়াতি। চক্ষুলজ্জা বলেও কোনো ব্যাপার নেই। দেখছে লোক নেই, জন নেই, রান্না করছি, নিজে বাসন মাজছি, একটু সাহায্য করতেও তো পারত বউদি ! মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে গেল একটা চকোলেট তো কিনে দিতে পারত। তিন-তিনটে বালুচরী শাড়ি কিনল জানো ? কত দাম বলো তো ? তিনটের দাম আড়াই হাজার টাকা।

আমি বুঝলাম, কোথায় লেগেছে পরমার ? ঐ দোকানে আমার সঙ্গে গিয়ে বহুবার ও শাড়ি নেড়ে-চেড়ে দেখে এসেছে। ওর বহু দিনের শখ একটা লাল পাড় গরদের শাড়ির। দাম প্রায় দেড়শো মত। আমার কাছে তাইই অনেক। ঠিক করেছিলাম, একজন জানাশোনা তাঁতীর কাছ থেকে নিয়ে মাসে-মাসে কুড়ি টাকা করে শোধ করে দেব। যে মেয়ের পক্ষে দেড়শো টাকার শাড়িও স্বপ্ন তারই সামনে অন্য মেয়ে আড়াই হাজার টাকার শাড়ি কিনলে তা কি সহ্য হয় ?

আমি কিছু বলার আগেই পরমা আবার বলল, এই যে বড় রুই মাছ আর চিকেন কিনলে, টাকা পেলে কোথায় ? এত টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে ?

বললাম, পরমা তোমার মনটা বড় ছোট হয়ে গেছে। এই দাদাই না তোমার বিয়ে-দিয়েছিলেন ? এঁরা আসবেন বলেই না তুমি কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলে ? আর আসতে-না-আসতেই তুমি এত সব কথা বলছ ?

পরমা প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল, তুমি বুঝবে না। আমার জন্যে আমার ভাবনা নেই। ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি গরীব বলে ওঁরা তোমার কাছে বড়লোকী দেখাতে এসেছেন। এস-ডি-ওর বাড়িতে উঠলেই তো পারতেন ! গরীবের বাড়ি উঠে যদি তাদের কোনো রকম কনসিডারেশন না থাকে তাহলে কি বলতে পারি ?

বললাম, ওরকম কোরো না ! ওঁরা তোমার কত আপন লোক ! আমি তো আনন্দই পেলাম। আমি তো যা করার করছি হাসিমুখেই। তুমি এতে অন্য রকম ভাবছ কেন ? আমি যদি তোমাকে কিছু বলতাম, তা হলে তুমি লজ্জা পেতে পারতে। আমি তো কিছুই বলিনি। তোমার এত আপন জনের জন্যে আমি কিছু করতে পারছি বলে কত ভালো লাগছে আমার। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, তোমার জন্যে বা তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে তো কিছুই করিনি, করতে পারিনি। এইবার যখন সুযোগ এল তখন হাসিমুখে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করো।

পরমা মুখ তুলে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল চোখ বড় বড় করে।

ওর মুখ দেখে মনে হল, ও আমাকে চেনে না।

তারপর বলল, যাও। শীগগিরী মুখ-হাত ধুয়ে এসো, চা জলখাবার খেয়ে নাও।

বাথরুম থেকে এসে চা জলখাবার খেতে খেতে আমি বললাম, ওঁরা কোথায় গেলেন ?

পরমা বলল, বাঁকুড়ায়। পোড়া-মাটির ঘোড়া কিনতে।

তারপরই আমার সামনে এসে আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, তুমি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার করেছো, না ?

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, হ্যাঁ।

ওর ডান হাতে খুন্তি ছিল। আমার নাকের সামনে খুন্তি নেড়ে বলল, কত ?

বললাম, দুশো।

দু—শো। বলেই, দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরমা।

ওর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এলো। খুন্তিটাকে খাওয়ার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আমার একেবারে কাছে এসে বলল, তোমার উপর বড় অত্যাচার হলো গো ! আমি খুব অবিচার করলাম তোমার উপর।

আমার গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে এল।

আমি বললাম, ওরকম করে বোলো না। ওঁরা তোমার কত আপনার জন। তোমার জন্যে যাঁরা এত করেছেন, তাঁদের জন্যে আমি করব না ? তা কি হয় ? পরমা বলল, খুব খারাপ হল। নিজের উপর খুবই অন্যায় করছ তুমি !

রবিদা-বৌদি চলে যাবার ক'দিন বাদেই অফিসে বাবার হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ড পেলাম। বাবা লিখেছেন :

"রমেনের পীড়াপীড়িতে আমি ও তোমার মা এই মাসের তিরিশ তারিখে বিষ্ণুপুরে যাইতেছি। রমেন তাহার অফিসের গাড়ি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। সেই গাড়ি আমাদের সহিতই থাকিবে। আমরা তিন দিনের জন্যে যাইতেছি। সাক্ষাতে আর সমস্ত খবর দিব। আশাকরি তুমি ও পরমা কুশলে আছ। মিনিকে আমার আদর জানাইও।"

বাবা মা আমার কাছে আসছেন এর চেয়ে বেশী আনন্দের আর কি হতে পারে? কিন্তু এ যে কত বেদনাদায়ক তা অযোগ্য ছেলে মাত্রই জানে। নিজের অযোগ্যতার কারণে বাবা মায়ের জন্যে যা করার, মন যা করলে খুশী হয়; তা না করার যে কী দুঃখ তা আমি সেই মুহূর্তে প্রথম অনুভব করলাম।

যোগ্য হইনি, হতে পারিনি বলে; নিজেকে অভিসম্পাত দিলাম।

পরমা গত দু' দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বেশ অসুস্থই হয়ে পড়েছে। ওর একটা অ্যালার্জির মত হয়। হাঁপানির টানের মত ওঠে। সেইটা উঠেছে। পাছে আমার খরচ বেশি হয় তাই কিছুতেই অ্যালোপাথিক ডাক্তারের কাছে যায়নি। হোমিওপ্যাথের কাছ থেকে ওষুধ এনে খাচ্ছে।

ঠিক এই সময়েই বাবা মা এবং বড়দার অফিসের ড্রাইভার! এ-খবর আমি পরমাকে দিতে পারবো না। তার চেয়ে ওঁরা আসুন। যেন আচমকা এলেন। আমি মিথ্যে করে বলব যে, চিঠি পাইনি।

সে-রাতে পরমা খুবই কষ্ট পেল। আমি ওর বুকে পিঠে হাত বোলাতে গেছিলাম রাতে উঠে। আমাকে খুব বকল। বলল, কালকে তোমার অফিস নেই? আমার কি কাজ? আড়াই জনের জন্যে একটু রান্না। আর সারাদিন তো বাড়িতেই শুয়ে থাকি। আমি ঠিক হয়ে যাব। তুমি ঘুমোও তো দেখি গিয়ে।

চলে যেতে যেতে মিনির ঘুমন্ত মুখে চোখ পড়ল আমার। মেয়েটার মুখের দিকে চাইলেই বড় কষ্ট হয়। বুকের মধ্যেটা মুচড়ে ওঠে। বড় কষ্ট দেওয়ার জন্যে ভুল করে ওকে আমরা পৃথিবীতে এনেছি। এতটুকু শিশু! ওর কি দোষ? আমার অযোগ্যতার জন্যে ওকে ভালো খাওয়াতে পারব না, পরাতে পারব না, ভালো শিক্ষা দিতে পারব না, পারব না ভালো বিয়ে দিতেও। কিন্তু যোগ্যই হই বা অযোগ্যই হই; বাবা তো বাবাই! বড়লোক বা গরীবই হোক, সব বাবা মায়ের কাছেই সন্তান তো সন্তানই! গরীব বাবা মায়ের বুকের মধ্যের চাপা কষ্ট যে কতখানি তা কি সন্তানরা কোনদিনও জানতে পারবে, বুঝতে পারবে? তাদের বাবা মায়েরা তাদের যা দিয়েছিল তা কি মনে রেখে যা দিতে পারেনি সেই কথার ক্ষোভ ভুলে যাবে বড় হলে? ক্ষমা কি করবে মিনি আমাদের? অন্তরের, বোধের দাম কি ও বুঝবে ভবিষ্যতে? এ-কথা কি জানবে যে ওকে জাগতিক কষ্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মা-বাবা তাদের অক্ষমতার কারণে মানসিক কষ্ট কত পেয়েছে প্রতিটি ক্ষণ?

বাবা মায়ের যেদিন আসার কথা সেদিন আমি ইচ্ছে করেই দেরী করে বাড়ি ফিরলাম। কারণ জানতাম যে, ওঁরা নিশ্চয়ই সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে বেরুবেন এবং বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাবেন। আজ আমার ভূমিকা অযোগ্য বাবার নয়, অযোগ্য ছেলের। অযোগ্য ছেলের বুকে সেই অযোগ্যতার গ্লানি যে কতখানি বাজে তাও কি বৃদ্ধ বাবা-মা বোঝেন? হয়ত বোঝেন। কারণ, তাঁরাই যে জন্মদাতা। তাঁরাও আমাকে না বুঝলে আর কে বুঝবেন?

বাড়ির সামনে দূর থেকে একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই হাসি, গল্প, হৈ-হৈ শুনতে পেলাম। বাড়ি ঢুকেই অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, একি? তোমরা?

বাবা বললেন, চিঠি পাসনি?

মিথ্যে কথা বললাম। কিসের চিঠি?

বাবা বললেন, না, এ দেশের কিস্যু হবে না। কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর আসতে চিঠির সময় হলো না। তেলাপোকা হেঁটে এলে এর চেয়ে আগে পৌঁছে যেত।

আমার ভয় ছিল মাকে নিয়ে। বিয়ের পর থেকে এক দিনের জন্যেও মায়ের সঙ্গে পরমার বনিবনা হয়নি। কারণটা আমার সম্পূর্ণই অজ্ঞাত। স্ত্রী চরিত্র নাকি দেবতারাই জানেন না। তাই আমার পক্ষে ওর রহস্য আবিষ্কারও অসম্ভব ছিলো। মায়ের এই হঠাৎ-আগমন পরমা কিভাবে নেবে এবং তাঁর সবচেয়ে অযোগ্য এবং সে কারণেই সবচেয়ে আদরের ছেলেকে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এসে পরমার এখানে সংসার পাতার অপরাধ মাও যে কি ভাবে নেবেন আমার জানা ছিল না তা।

কিন্তু ঘরে ঢুকে যা দেখলাম, তাতে নারীচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আমার যতটুকুও বা আছে বলে জানতাম সেটুকুরও অনস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হলাম।

দেখি, মা রান্না করছেন। পরমা তাঁর পাশে বসে তরকারি কাটছে। মিনি বাবার কোলে বসে গল্পে মশগুল। বাবা বলছেন, আমার কোলটা যে কতদিন ধরে মিনির জন্যে কাঁদছিল তা আমিই জানি।

মিনি ছোট ছোট হাত নেড়ে বলল, আমার কোলও যে দাদু তোমার জন্যে কী কাঁদছিল কী বলব!

মা বললেন, ওরে আমার পাকুনী রে।

সবাই হাসছেন, সবাই গল্প করছেন। পরমা খুশী হয়েছে সবচেয়ে বেশী। যে মায়ের সাংসারিক কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিল সেই মায়ের হাতেই হাতা-খুন্তি তুলে দিয়ে এই মুহূর্তে সে যেন পরম নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

মাকে বললাম, কি রাঁধছ মা?

মা বললেন, তুই কতদিন আমার হাতের খিচুড়ি খাস না। তাই এসেই তোর জন্যে খিচুড়ি রাঁধতে বসেছি।

বাবা ফোড়ন কাটলেন, বুঝলে পরমা, এবার আমরা দুজনে নোহ্যোয়ার। খিচুড়ি-ভক্ত মা-ছেলে একসঙ্গে হয়েছে। এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি।

মা বললেন, জানিস খোকন; তুই কড়াইশুঁটির চপ খেতে ভালোবাসিস, তাই বড়-খোকা টিনের কড়াইশুঁটি দিয়ে দিল আমার সঙ্গে। বড় বউমা বলল, মা আপনি গিয়েই খোকনকে খিচুড়ি আর কড়াইশুঁটির চপ রেঁধে খাওয়াবেন। বলল, দুটো ছেলেমানুষ যে কী করছে সেখানে, কী খাচ্ছে, কী রাঁধছে; ভগবানই জানেন।

বাবা বললেন, তোর আর পরমার জন্যে রাধু দুটো ফোল্ডিং ইজিচেয়ার দিয়ে দিয়েছে রে। তোরা দুজনে বসে গল্প করবি, খবরের কাগজ পড়বি। তুই যে চেয়ারটায় বারান্দাতে বসে খবরের কাগজ পড়তিস রাধু সেই চেয়ারটা দেখে রোজ বলত, খোকনের বিষ্ণুপুরের

কোয়ার্টারে ইজিচেয়ারের অভাবে নিশ্চয়ই ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। চেয়ারটাই পাঠিয়ে দিয়েছে গাড়ির মাথায় করে!

রাধু অর্থাৎ কাকা যে আমার মত অপদার্থ কেরানী ভাইপোটিকে নিয়েও এতখানি ভাবতে পারেন তা আমার স্বপ্নেরও বাইরে ছিল।

আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।

কত যে জিনিস এনেছেন বাবা-মা। পরমা কই মাছ ভালোবাসে, তাই মেজবউদি হাঁড়ি করে কই মাছ পাঠিয়েছেন। বলেছেন বিষ্ণুপুরে নাকি কই মাছ পায় না ওরা?

মেজবউদি হয় জানেন না, অথবা জানলেও মানতে চান না যে, কই মাছ বাজারে উঠলেও তা কিনে খাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই।

পরমা বলল, মা তিনদিন থাকলে কিন্তু হবেনা। বড়দার গাড়ি পাঠিয়ে দিন কালই। ও চিঠি লিখে দেবে ড্রাইভারের সঙ্গে। আপনি আর বাবা, আমাদের সঙ্গে এক মাস থাকবেন কম করে। এসে যখন পড়েছেন না বলে-কয়ে তখন এক মাসের আগে ছাড়ছি না। কোনো কথাই শুনছি না আমি।

বলেই, বাবার দিকে ফিরে বলল, কি বাবা?

বাবা বললেন, এখন তো আমার কোন মত নেই, তোমার সংসারে এসেছি; তুমি যা বলবে তাইই শুনব।

কতদিন, কত বছর পরে সে-রাতে যে কত আনন্দ করলাম তা কী বলব। মিনিটা রাত বারোটা অবধি জেগেই রইল। খাওয়া-দাওয়ার পর মা ওকে নিয়ে প্রহ্লাদের গল্প বলে ঘুম পাড়ালেন।

পরমা, বাবা মা আর মিনিকে ওর ঘর ছেড়ে দিল জোর করে। কোনো কথা শুনল না। বড়দার অফিসের ড্রাইভারকে মিনির ঘরের খাটে আদর যত্ন করে বিছানা করে শোওয়ালো। নিজে, বোধহয় বহুদিন পর মিনি হওয়ার পর এই প্রথম, আমার সঙ্গে শুলো ঢাকা বারান্দায়।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে গেছিল একটু। উঠে দেখি, মা চায়ের জল চাপিয়ে বাইরে নতুন ইজিচেয়ারে বাবার পাশে বসে আছেন। আমাকে দেখেই চা করে দিলেন। বললেন, তোর সঙ্গে আরেক কাপ খাই।

পরমাকে দেখলাম না। ভাবলাম, সকাল সকাল চান করে নিতে গেছে বোধহয় বাথরুমে।

চায়ের কাপ নিয়ে বাইরে এসে দেখি গাড়িটা নেই। বাবাকে শুধোতে, বাবা বললেন, পরমা নিয়ে গেছে। বলল, এক্ষুনি আসছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, পরমা? এত সকালে ওর কি কাজ?

মা বাবা দুজনেই চিন্তান্বিত গলায় বললেন, তা তো আমরা জানি না। কেন? তুইও জানিস না কিছু?

আমি উত্তেজনা না দেখিয়ে বললাম, এলেই জানা যাবে।

মা বললেন, পরমাটার চেহারাটা যা খারাপ হয়ে গেছে তা বলার নয়। লোকজন নেই, সব একা করতে হয়। অভ্যেস নেই। পারে নাকি এতটুকু মেয়ে? তার উপর মিনিকে দেখা। সব একা হাতে।

একটু পর পরমা ফিরল। এক চ্যাঙারি গরম জিলিপী সিঙাড়া নিয়ে। বাবাকে বলল,

বাবা খান। আপনি গরম জিলিপী ভালোবাসেন। তারপর একটা ছোট ঠোঙ্গা বের করে বলল, মা, এটা আপনার। আপনি ভালোবাসেন।

মা বললেন, কি রে ওটা?

দেখুন। বলে পরমা হাসল।

মায়ের সুন্দর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা বললেন, বোঁদে?

ভিতরে যাওয়ার সময় পরমা আমাকে ডাকল।

বলল, চা খেয়ে একটু শুনে যেও।

ভিতরে যেতেই শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে পরমা আমার হাতে অনেকগুলো একশো টাকার নোট আর অনেকগুলো খুচরো নোট দিলো। ফিসফিস করে বলল, সাড়ে বারো শো টাকা আছে। তার মধ্যে পাঁচ টাকা খরচ হয়েছে জিলিপী-টিলিপীতে।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। অত টাকা বহুদিন দেখিনি একসঙ্গে। খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লাম আমি।

বললাম, এত টাকা? কোথায় পেলে তুমি এই সকালে?

পরমা বলল, আমার একটা গয়না বেচে দিয়ে এলাম মধু স্যাকরার কাছে।

আমি বিশ্বাস না-করে বললাম, দোকান তো এখনও খোলেনি!

দোকানে নয়, বাড়িতে গেছিলাম।

সে কি? কী সাংঘাতিক কান্ড! সাতসকালে! গয়না বিক্রী করলে সংসারে অলক্ষ্মী আসে জানো না তুমি?

কি লক্ষ্মী আর কী অলক্ষ্মী আমাকে শেখাতে হবে না তোমার। এখন সরো, তাড়াতাড়ি দরজা খুলি, নইলে বাবা মা কি মনে করবেন?

বললাম, ছিঃ ছিঃ কেন এমন করলে? তুমি জানো, কত ছোট করলে আমাকে তোমার কাছে?

পরমা তখন হাসছিল।

বলল, বাবা মাকে এক মাস রাখবোই আমি। হয়ত তুমিও একদিন বড় অফিসার; বড়লোক হবে, কিন্তু বাবা মার জন্যে কিছু করার সুযোগ আর নাও আসতে পারে। বাবা মার জন্যে যা করবে, ভগবান তার দশগুণ তোমাকে ফেরত দেবেন।

হেসে ফেলে বললাম, তাহলে দশগুণ ফেরত পাবার জন্যেই এই কান্ডটা করলে?

কিন্তু হাসলাম যে কী করে; জানি না।

পরমা এবার পরিপূর্ণ হাসল। হাসলে, ওর গালে ভারী মিষ্টি টোল পড়ে একটা। বলল, আজ্ঞে না স্যার। তোমাকে হারাবার জন্যেই করলাম। তুমি কি ভেবেছ তুমিই জিতে যাবে? আমিও কি জিততে জানি না?

কিন্তু মিনি? মিনির ভবিষ্যৎ? এইভাবে চললে ওর কি হবে?

পরমা রেগে উঠল। বলল, সরো দরজা খুলতে দাও।

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, নিজের মা বাবার কারণে কারো ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় এ-কথা আমি মানি না; বিশ্বাস করি না। আমি যা করেছি, বেশ করেছি। আমার গয়না আমি যা-খুশী করব। আমি তা বিক্রী করি, দিয়ে দিই, ফেলে দিই তোমার

তাতে কি ?

বলেই, দরজা খুলে রান্নাঘরে গেল।

আমি বাইরে এসে বাবার পাশে বসলাম।

মা ভিতরে গেলেন পরমাকে রান্নায় সাহায্য করতে।

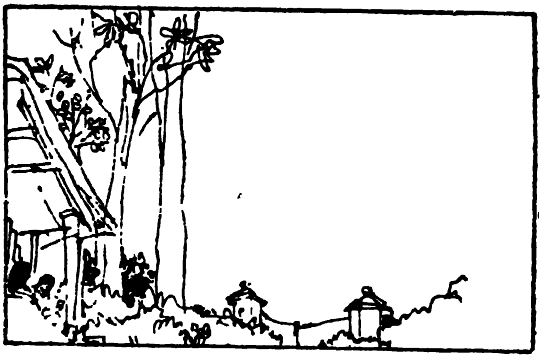
কৃষ্ণচূড়া গাছের শিকড়গুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। আমার বাবার পাশে আমি.................

বাবাকে আজকাল বেশ বুড়ো বুড়ো দেখায়। চুলগুলো সবই সাদা হয়ে গেছে। দাঁড়ালে কুঁজো লাগে। হাতের শিরাগুলো দেখা যায় গাছের শিকড়ের মত।

বাবার পাশে বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হল যে, প্রত্যেকটি দূরত্বের লাটাই-এই নৈকট্যের সুতো গোটানো থাকে সব সময়ই এবং শিকড়ের মধ্যেই থাকে গাছের প্রাণ, লতায়, অর্কিডেও।

বাবা, মা, আমি, পরমা এবং মিনি...

কাজিরাঙ্গা



দাদুর বয়স হয়েছিল তখন অনেক। দাদুকে বেড়াতে নিয়ে যেত, তেল মাখাতো এবং দাদুর খিদ্‌মদগিরি করত নিশু। নিশু আর আমার বয়স কাছাকাছি ছিল। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

কাকা ব্যারিস্টারী পাশ করে এসে দাদুর চেম্বারে যাওয়া শুরু করেছেন সবে। অফিসে একজন নতুন লোকের দরকার হল চা বানানোর জন্যে। হাইকোর্ট পাড়ার দোকান থেকে বারবার চা আনতে বেয়ারারা অতিষ্ঠ। নিশু তার দাদাকে নিয়ে এল এক রবিবার কাকার কাছে, ইন্টারভিউ দিতে।

কাকিমা বললেন, তুমি কি কর?

স্মাগলিং।

স্মাগলিং? মানে?

হেঁ। চাল-চিনির ছাম্‌গলিং। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা।

তোমার নাম কি?

যিশু।

ওদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। এক বস্ত্রে বর্ডার পার হয়ে কোনক্রমে পালিয়ে আসে। মাকে নিয়ে, দুভাই। ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে তখন, নদীয়া জেলার বীরনগরে।

চাকরিতে বহাল হল যিশু।

আমি যখন অ্যাডভোকেট হয়ে কাকা ও খুড়তুতো দাদার পার্টনার হয়ে ফার্মে এলাম তখন যিশুর চাকরি হয়ে গেছে বহু বছর। ওদের মা মারা গেছেন। নিশু গৌহাটিতে চলে গেছে এক ব্যবসাদারের সঙ্গে।

বৌ ও ছেলে নিয়ে সেই ঝুপড়িতেই থাকে যিশু এখনও বীরনগরে। যিশুর বয়স এখন পঞ্চাশ। আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ।

আমারও কম দিন হলো না এ অফিসে। আমার এক ছেলে। যিশুরও তাই। আমি গাড়ি থেকে বেরোই দশটা নাগাদ। ড্রাইভার নিয়েই আসি। কোলকাতায় আজকাল নিজে গাড়ি চালানো অসম্ভব ব্যাপার। যিশু বাড়ি থেকে বেরোয় ভোর পৌনে পাঁচটায়। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়। ফার্স্ট লোকালে শিয়ালদায় এসে অফিসে পৌঁছে যায় সকাল সাড়ে আটটার

মধ্যে। ছ'টার সময়ই ওকে ছেড়ে দেন কাকা। আমরা এসব ব্যাপারে খুবই কন্‌সিডারেট্। বাড়ি পৌঁছোয় ও রাত ন'টা সাড়ে ন'টায়। চান করে, ভাত খায় সেই তখন।

গত তিরিশ বছরে প্রতি উইকডেজের দুপুরে যিশু মুড়ি অথবা চিঁড়ে খেয়েই থেকেছে। তিরিশ বছর চাকরি করার পর আজ ওর মাইনে হয়েছে চারশ টাকা। আমরা খুবই কন্‌সিডারেট্। প্রতি বছরই প্রায় কিছু না কিছু ইনক্রিমেন্ট দিয়েছি যিশুকে। নইলে, এই বাজারে খাবে কি মানুষগুলো। ওরাও তো মানুষ।

সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা অবধি অনেক কাপ চা বানায় যিশু। টোস্ট্ করে। মুড়ি মাখে। যোগেনবাবুদের জন্যে তেলেভাজা নিয়ে আসে। কাকার জন্যে কে সি দাসের ডায়াবেটিকদের রসগোল্লা। দাদার জন্যে কফি হাউসের অনিয়ন-পাকোড়া। আমার জন্যে লাঞ্চ। গ্রেট ইস্টার্ন বা অ্যাম্বার থেকে ; যেদিন বাড়ি থেকে চুমকি লাঞ্চ না দেয়।

কিন্তু যিশুর চা মুখে দেওয়া যায় না। প্রতিবার ওর চা মুখে দিলেই, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার লে'জলীর বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায় আমার।

"Something was being sold at Mincing lane, which looked like Coffee, tasted like cocoa and was told to be tea."

দোষটা হয় যিশুর। কিন্তু গুণটা আসলে আমাদেরই। যেমন চা আনানো হয়, তেমনই তো স্বাদ হবে [illegible]।

বছর সাতেক আগে যিশু একবার শেয়ালদা থেকে অফিসে আসতে ট্রাম থেকে পড়ে যায়। মাস দুয়েক হাসপাতালে ছিল। একটা পা একটু ছোটো হয়ে যায় অপারেশনের পর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটে ও এখনও। যখন হাসপাতালে ছিল আমি একদিনও দেখতে যেতে পারিনি। কাকা আর দাদা তো পারেনই নি। ওঁরা আমার চেয়েও অনেক বেশি ব্যস্ত। আমার খুড়তুতো বোন এবং চুমকির বাবা যখন বেলেভ্যু ক্লিনিকে ছিলেন তখন হার্ডলি চার-পাঁচবার যেতে পেরেছি। বেলেভ্যুতে গাড়ি পার্ক করা এক প্রবলেম। ড্রাইভার থাকলেও গাড়ি খুঁজে বের করা যায় না।

কোলকাতাটা দিন দিনই বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে।

২

দিন দশেক আগে আমার এক ওল্ড ফ্লেম গ্র্যান্ড হোটেলের পলিনেশীয়াতে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গেছিল। নিজে বেশ কয়েকটি জিন অ্যান্ড টনিক খেয়ে আমাকে কাম্পারি—সোডা খাইয়েছিল সুমি। সুমি এখন স্টেটস্-এ থাকে। দেশে বেড়াতে এসেছিল। বলছিল, মিডল-ইস্ট-এ মাসে এক লাখ টাকা মাইনের ট্যাকস-ফ্রী একটা চাকরির অফার পেয়েছে। নেবে কি না ঠিক করেনি।.........She is just toying with the idea.

লাঞ্চ থেকে ফিরে আমার মেজাজ বহতই খুশ ছিল। একটা বড় মামলার রায়ও বেরিয়েছিল ঠিক সেইদিনই। জয়জয়কার। কাকার কাছে মক্কেল ব্ল্যাংক চেক পাঠিয়ে দিয়েছেন। সারা অফিস তোলপাড়। যিশু পাঁচনের মত চা নিয়ে ঘরে এল। আমি বললাম, তোর ছেঁচা-বাঁশের বাড়িটা এবার পাকা করে নে যিশু। যা খরচ লাগে, আমিই দেব। কত লাগবে ?

যিশু আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, ছার্ ! আপনে ভগবান।

ঠিক আছে ! ঠিক আছে !

গর্ব গর্ব গলায় বলেছিলাম আমি।

করতে তো অনেক কিছুই ইচ্ছা করে অনেকের জন্যেই। কিন্তু ক্যামাক স্ট্রীটে একটি ফ্ল্যাট কিনেছি। তার ফিফথ্ ইন্স্টলমেন্ট দিতে হবে সত্তর হাজার টাকা। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রতি বছর ষাট হাজার টাকা ও লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে দিতেই অবস্থা কাহিল। যা ইনফ্লেশান, তাতে ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা সকলের। ওয়েল—অফ্ফ্ লোকেদেরও সংসার চালানো মুশকিল। বছরে হাজার আশী টাকা ঐভাবে ফোর্সড-সেভিং করি বলেই সামান্য সঞ্চয় আছে, নইলে এক পয়সাও থাকত না।

আফটার ওল্ আমি অথবা যিশু যেমন এক নই, আমার ছেলে অথবা যিশুর ছেলের ফিউচার বা সিকিউরিটিও তো একরকম হতে পারে না !

আমরা আমরা। ওরা ওরা। এটাই নিয়ম। এইই সোসাইটির অ্যারেঞ্জমেন্ট। যিশু বা যিশুদের কথা যে কখনও সখনও ভাবি না, তা নয়, ভাবি ; কিন্তু বড় ডিসটার্বড্ লাগে ভাবলে। তাছাড়া আমার মাথায় এতসব ইম্পর্ট্যান্ট ভাবনা গিস্‌গিস্ করে যে, যিশুদের ভাবনা ভাবার সময় কোথায় ?

তবু যারা দয়ার যোগ্য, আমাদের দয়াতেই যারা বেঁচে আছে ; বেঁচে থাকে, তাদের দয়া করা কর্তব্য আমাদের। আমরাই তো ওদের হুজুর। মা-বাপ।

ভগবানও বটে !

৩

একদিন বিকেলে, তেলাপোকার পায়ে কালি লাগিয়ে কাগজের ওপরে ছেড়ে দিলে যেমন দেখায়, তেমন হাতের লেখায় গ্রাম্য ঠিকাদারের একটা এস্টিমেট এনে রাখলো আমার টেবিলের উপর যিশু।

দুর্বল মুহূর্তে মুখ ফস্কে কোনো কথা বেরিয়ে গেলে তার অ্যাডভ্যান্টেজ পুরোপুরি নিতে ভোলে না এরা।

কিন্তু এ কী ? মাই গুড্‌নেস্। চার হাজার দুশো বত্রিশ টাকার এস্টিমেট। বাড়ি বানাবে। সকলেই প্যালেস চায় ? কী, ভাবে কী লোকটা আমাকে ? দানসত্র খুলে বসেছি ?

যিশুকে বললাম, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

যিশু আমার দিকে অবাক চোখে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, ছার্ ! আপনেই বল্‌ছিলেন এস্টিমেটো কষতে।

বলেছিলাম তো কি ? এ অফিস না থাকলে তো এতদিন ফুটপাথে মরে থাকতে বাছা। যেমন করে অনেক রেফ্যুজি মরেছে। এখানে চাকরি করে কী চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছো আমাদের ?

বলেই, এস্টিমেটটা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে।

রেগে গেলে, আমি অমানুষ হয়ে যাই।

আস্পর্ধা তো কম নয় ! এরা প্রশ্রয় পেলেই মাথায় চড়ে। উদারতা দেখাতে গেলাম,

তাইই ডাকাতি করতে এল। এদেশে কন্‌সিডারেট হলেই সর্বস্বান্ত হতে হয়। বোকা পেয়েছে আমাকে ? দুশো-পাঁচশো হয়, বুঝি। কিছু বলার নেই। এত অবুঝ, ডিমানডিং এরা। এদের সব সময়ই পায়ের তলায় রাখতে হয়। লাই দিলেই মাথায় চড়ে। একেবারেই কুকুরের মত স্বভাব।

যিশুকে ঘৃণার সঙ্গে বললাম, তুই অত্যন্ত লোভী। বুঝলি।

যিশু আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হাসল, নিঃশব্দে।

চমকে চেয়ে দেখলাম, ওর মুখে হতাশা নেই, রাগ নেই, প্রতিহিংসা নেই ; এমনকি ঈর্ষা পর্যন্ত নেই। শুধু এক অসীম ক্ষমাময় স্নিগ্ধ হাসি জ্বলজ্বল করছিল বেথেলহেমের তারার মত সেই মুখে।

মনের শান্তি হঠাৎ ভঙ্গ হওয়াতে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম।

নিজেকে শান্ত করার জন্যে বাইরে তাকালাম জানালা দিয়ে। সার সার ঝকঝকে গাড়ি পার্ক করানো রয়েছে নিচের রাস্তা জুড়ে। সমানে চলেছে গাড়ির স্রোত। বাম্পার-টু-বাম্পার। ধবধবে পোশাক পরা কালো শামলা গায়ে উকিল, ব্যারিস্টার, সলিসিটর, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, এঁদেরই মধ্যে অনেকেই আবার কম্যুনিস্টও , মক্কেল-বিক্কেলের ভিড়ে গিসগিস করছে পুরো অফিস পাড়াটা। ...ড় শান্তি ; নিরুপদ্রবতা এখানে।

এ এক দারুণ অভয়ারণ্য।

ভাগ্যিস এই অভয়ারণ্য ছিলো।

ইঁদুর



একটা ইঁদুর খাটের তলা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে সোজা এসে সুধীনবাবুর ইজিচেয়ারের তলায় ঢুকে গেল। তালতলার চটি থেকে পা-দুটো তাড়াতাড়ি চেয়ারের উপর তুললেন তিনি। তুলেই হাঁক দিলেন, দেবেন।

দেবেন ছিলো না। থাকে না। কখনই ও আজকাল সময়মত থাকে না হাতের কাছে।

চেঁচামেচি শুনে শ্যামা দৌড়ে এল, বলল, কী হল বাবু?

সুধীনবাবু ওকে দেখে পা দুটো নামিয়ে ফেললেন।

মুখে গাম্ভীর্য এনে বললেন, ইঁদুর।

শ্যামা অনেকদিনের লোক। মা, মানে সুধীনবাবুর স্ত্রী থাকতেই সে দশবছর এ বাড়িতে কাজ করেছে। সুধীনবাবুর বড় ছেলে এবং মেজো ছেলের বাচ্চারা সবাই শ্যামার হাতেই মানুষ। ওর শরীরে মায়াদয়া আছে। বয়সও হয়েছে। কপালের দুপাশের চুলগুলো সব রূপোলী হয়ে গেছে। নিজেরও গেঁটে বাত ও ডায়াবেটিস্-এর কারণে বাবুর দুঃখ ও একটু একটু বোঝে।

শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হুঁঃ। ইঁদুরই তো। ঘর থেকে যে বাঘ বেরোয়নি এই যথেষ্ট। কী অবস্থা করেছে দেবেন ঘরটার। আর বৌদিদেরও বলিহারি যাই। বুড়ো শ্বশুরের দিকেও তো মানুষ একটু দেখে। নিজেদের ঘরও তেমনিই। কী নোংরা; কী নোংরা।

সুধীনবাবু কখনও পরনিন্দা পরচর্চা প্রশ্রয় দেননি। এখনও দেন না। চাপা ধমক দিলেন তিনি শ্যামাকে। বললেন, আঃ শ্যামা। যাও, নিজের কাজ করো। দেবেন এলে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে।

শ্যামা গজ্‌গজ্ করতে করতে চলে গেল।

সিঁড়ির কাছে গিয়েই শ্যামা চুপ করে গেল। বৌদিরা কেউ তার বক্তৃতা শুনতে পেলে আর রক্ষা নেই।

সুধীনবাবুর চোখ দুটো ভারী হয়ে এল। তাঁর আপন বলতে যে একমাত্র মানুষটি ছিল সেই নীহারিকাই চলে গেছেন দু বছর হল। যদিও নীহারিকা থাকাকালীন তিনি যে তাঁর এতখানি আপন সে-কথা পঁয়তাল্লিশ বছরের পার্টনারশিপেও কখনও বুঝতে পারেননি -ধীনবাবু। দাবী করার, জোর খাটানোর, ঝগড়া করার মানুষ ঐ একজনই ছিল।

বির দিকে তাকালেন একবার সুধীনবাবু। বড় ছেলে একটা অয়েল পেন্টিং

করে এনেছে কাকে দিয়ে যেন অনেক পয়সা খরচ করে। বেঁচে থাকাকালীন সপ্তাহে একদিনও ছেলে মা বলে ডাকেনি, কী মা-বাবার ঘরে আসেনি পর্যন্ত। আর মায়ের মৃত্যুর পর ছবি বাঁধিয়ে এনে ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে!

মেজ ছেলে গত মৃত্যুদিনে কাগজের ফুলের একটা সাদা মালা এনে নীহারিকার ছবির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। এখন সে সাদা কাগজের ফুলের চেহারা হয়ে গেছে প্রায় রুদ্রাক্ষের মত। এত ধুলো পড়েছে যে ছবি তো দূরের কথা, মালাটাতেও হাত ছোঁওয়ানো যায় না।

মানুষটা চলে গেছে বলে কী কাগজের মালা পরিয়ে তাকে অবহেলা করতে হয় এমন করে? ছেলে-বৌরা কী রোজ একটা করে সাদা ফুলের মালাও নীহারিকার গলায় পরাতে পারে না? যে তাদের স্তন্যদায়িনী, যে কোলে-কাঁখে করে মানুষ করল, যে সারা জীবনে একদিনও স্বামীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেল না পাছে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতি হয়; সেই মানুষটাকে? জন্মদাত্রী, পরম শুভার্থী মাকেও ওরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল?

ভেবে, বড়ই কষ্ট পান সুধীনবাবু।

দেবেন এল : বলল, ডাকছিলেন?

সুধীনবাবুর কষ্ট বলতে ইচ্ছা করল না। মুখে শুধু বললেন, ইঁদুর।

দেবেন ঘরে আসার আগেই শ্যামার মুখে শুনেছিল। বলল, আজ ইঁদুরের বিষ আনব। মজা টের পাবেন বাছাধনরা।

সুধীনবাবু আস্তে আস্তে বললেন, ঘরে ইঁদুরের চাষ করে তারপর বিষ দিয়ে মারা কেন? চাষটা বন্ধ করো না ঘরে।

তারপর বললেন, প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর।

সুধীনবাবু অভ্যেসবশেই বলে ফেললেন ইংরেজি। দেবেন ইংরেজিটা বুঝতে পারল না। বলল, ঝাড়ব ঘর। একা লোক চারদিকের কাজ সামলাতে পারি না। এই বড়দা ডাকল সিগারেট আনতে, মেজদা ডাকল পান আনতে, তাও তো ছোড়দারা এ বাড়িতে থাকে না। বাঁচোয়া। বৌদিরাও কী কম ডাকাডাকি করে? শুধু আপনার একার কাজ করলে না হয় এসব ঠিক ঠিক করে রাখতাম।

এসব কথাতে সুধীনবাবু আজকাল সত্যিই বিরক্ত হন। এসব কথা শুনতে বা আলোচনা করতেও চান না তিনি। তাঁর একার কাজের জন্যে তো দেবেনকে অথবা বাড়ির কাউকেই রাখা হয়নি। তাই এসব কথা কোনো ছেলে বৌ-এর কানে গেলে মিছিমিছি অশান্তিই বাড়বে। যতদিন নীহারিকা ছিলেন, ততদিন অন্য কথা ছিল। আজ তাঁর এই অবসরপ্রাপ্ত, কর্মহীন, অপ্রয়োজনীয় জীবনে এইরকম তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অশান্তি ভালো লাগে না। একা ঘরে ইজিচেয়ারে বসে যতই অনাদর অবহেলা পান, ততই যেন অসহায়তায় চোখের কোল দুটো জ্বালা করে। নীহারিকার কথা মনে পড়ে বার বার।

এই বয়সে সকলেই একটু দেব-দেবী গুরুটুরুর দিকে ঝোঁকে। সুধীনবাবুর ঐসব দুর্বলতা কখনও ছিলো না। সুধীনবাবুর ধারণা যে, যারা জীবনে অনেকানেক অন্যায় করে তারাই শেষ জীবনে হঠাৎ ঠাকুর দেবতার শ্রীচরণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাপস্খালন করতে চায়। না, সুধীনবাবু যৌবনেও ওসব করেননি; বার্ধক্যেও করেবেন না।

সবচেয়ে মুশকিল হয় সময় নিয়ে। সময়ের ভার বড় ভার। যাঁরা বেশী বয়সে স্বামী হারান তাঁরা এতটা একা হয়ে পড়েন না, কারণ বিধবাদের পক্ষে সংসারের মধ্যে অনেকখানি সময় আদরেই হোক কী অনাদরেই হোক, কেটে যায়ই। কিন্তু বিপত্নীক পুরুষমানুষ সত্যিই বড় নির্জন। সময় তাঁদের বুকে পাথরের মত চেপে বসে। কিছুতেই নড়তে চায় না। বই পড়ে সময় কাটাতেন আগে আগে কিন্তু এখন চোখও বিদ্রোহ করছে। দুটি চোখেই ছানি পড়েছে অথচ ম্যাচিওর করেনি যে কাটাবেন। সন্ধের পর টি ভি দেখে সময় কাটে। তবু শনি-রবিবার বাংলা হিন্দী সিনেমা যখন হয় তখন আজকাল আর দেখেন না। ছেলে বৌএরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে জমিয়ে বসে সিনেমা দেখে। তাই হংসমধ্যে বকযথা হয়ে থাকতে খারাপ লাগে তাঁর।

একদিন আড়'ল থেকে শুনেছিলেন,বড় বৌমা বলছিলেন কাউকে। "বুড়োর রস কম নয়।"

এসব শুনেও গায়ে মাখেন না বিশেষ সুধীনবাবু। মাখেন না, এই কারণে যে, এ বাড়িটা তাঁর। তাঁর বাড়িতেই ছেলে-বৌ নাতিপুতিরা রয়েছে। এই বাজারে আলাদা আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকতে হলে প্রত্যেকেই বুঝত। বড় সরকারী চাকরী করতেন বলে এখনও মাসে হাজার টাকা করে পেনসান পান উনি। তাছাড়া ফিকসড্ ডিপোজিটের সুদও আছে। নিজের কোনো ব্যাপারে তো তিনি পরের মুখাপেক্ষী ননই উপরন্তু তিনিই ছেলেদের সংসারে প্রতি মাসেই নিজের সামর্থ্যর প্রায় সবটাই ঢেলে দেন। এ কারণেই, আর্থিক বিষয়ে কোনোরকম মানসিক দৈন্য কখনও বোধ করেননি। যতটুকু অবহেলা পান সুধীনবাবু তা নিছক জেনারেশান গ্যাপ এবং নীহারিকার স্বার্থপরের মত আগে চলে যাওয়ার দোষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন।

টেলিফোনটা বাজছিল। টেলিফোনটা নীচের বসার ঘরে আছে। ওঁর ঘরে একটা একস্‌টেনশান্ আছে। টেলিফোনটা বেজেই চলল অথচ কেউই ধরছে না। দেবেনটাই বা কোথায় গেল?

যখন কেউই ধরল না, তখন অগত্যা নিজেই উঠলেন। কোমরটা কন্‌কন্ করে উঠল। ধীরে ধীরে গিয়ে রিসিভারটা তুললেন। ওপাশ থেকে মিষ্টি গলা ভেসে এল।

কে—এ—এ? দাদু?

সুধীনবাবুর মুখ-চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, হ্যাঁ দাদু। তোমার কী খবর?

ভালো। ওপাশ থেকে পাঁচ বছরের মিষ্টি বলল।

তুমি কবে আসবে আমাদের বাড়ি?

আসবো না। আড়ি তোমার সঙ্গে।

সুধীনবাবু উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কেন? কেন? আড়ি কেন? কী করেছি আমি?

তুমি আমাকে রথ কিনে দিলে না কেন? আজ না রথ! আমাদের বাড়ির দোতলার মিঠুকে ওর দিদা কিনে দিয়েছে। পাশের বাড়ির বুজুকে ওর বাবা কিনে দিয়েছে। আমাকে কেউ কিনে দিলো না।

সুধীনবাবু বললেন, ঠিকই তো। বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো। ভেরী সরি। তোমাকে কালই কিনে দেব।

মিষ্টি বলল, কাল কিনলে কি হবে ? রথ তো আজ হয়েই গেল।

তাতে কি ? উল্টোরথের দিন টানবে।

আচ্ছা। আশ্বস্ত হয়ে বলল মিষ্টি।

তোমার মা বাবা কোথায় ?

পার্টিতে গেছে।

তুমি একা আছো ?

না, বেলাদি আছে।

তুমি খেয়েছ ?

না, খাবো।

কি খাবে ?

এই ভাত আর পেঁপের তরকারি। আমার তো শরীর ভালো না। ও জানো দাদু, দাদু ; আজ না কাঁচকলার ঝুরি করবে রঘুদাদা। ঝুরি খেতে কী ভালো, না ?

হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো।

আজ থেকে দশ বছর আগে হলে এই কথার উত্তরে সুধীনবাবু হয়ত বলতেন, খুব ভালো। ঝুরি, ঝুড়ি ঝুড়ি খেতে ভালো।

তখন কত সহজে রসিকতা করতে পারতেন। কত আনন্দ ছিল মনে। আজকাল নিজের সবচেয়ে প্রিয়তম ছোট্ট নাতনীর সঙ্গেও রসিকতা করেন না তিনি।

তারপর বললেন, শোনো, আমি এক্ষুনি মেলায় যাচ্ছি তোমার জন্যে রথ কিনতে। তুমি কি আসবে এখানে ? মেলায় যাবে আমার সঙ্গে ?

এখন ? এখন কি করে যাবো ? এখন তো খাবো। মা বকবে এখন গেলে। কার সঙ্গে যাবো ?

ঠিক আছে।

তারপর বললেন, আজ রথ, তুমি পাঁপড়ভাজা খেয়েছিলে ?

পাঁপড়ভাজা ? না তো। রথের দিন বুঝি পাঁপড়ভাজা খেতে হয় ?

হয় তো। আমরা তো তাই-ই খেতাম ছোটবেলায়। তোমার দিদা থাকতেও। এবার খাইনি।

মা পাঁপড়ভাজা খেলে রাগ করে। বলে, পেট আপসেট করবে।

ও—ও। না, না। তাহলে খেও না।

রেখে দিই ? মিষ্টি গলায় মিষ্টি বলল।

আচ্ছা।

নাতনি রিসিভার নামিয়ে রাখল।

সুধীনবাবু ডাকলেন, দেবেন।

সাড়া নেই। আবারও ডাকলেন, দেবেন, অ্যাই দেবেন।

সাড়া নেই।

ঠাকুর সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল ওপরে। বলল, দেবেনের সঙ্গে তো আমার রাস্তায় দেখা হল বাবু। দেবেন তো ঋষির দোকানে গেল—বৌদিদের জন্যে ভেলপুরী কিনতে। আর দই-বড়া।

ড্রাইভারকে ডাকো তো ঠাকুর। সে কি আছে? না চলে গেছে?

ড্রাইভার তো বড়দাকে নিয়ে বেরোল, বলছিল, নাখুদা মসজিদের কাছে যাবে। রয়্যাল না কি হোটেল আছে, সেখান থেকে বিরিয়ানী পোলাউ আনবে। বড়দার সম্বন্ধীরা খেতে আসছেন।

ঠিক আছে। বললেন সুধীনবাবু।

তারপর আস্তে আস্তে ধুতিটা পরলেন। আলমারি খুলে হ্যাঙার থেকে এন্ডির পাঞ্জাবিটা বের করলেন। ছাতাটা নিলেন। তারপর সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন। আজকাল তিনি বাড়ি থেকে বেরোলে কোথায় যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন, এবং আদৌ ফিরবেন কিনা তা জিগ্যেস করার লোক কেউ নেই। উনি ভাবেন, ভালোই হয়েছে। একেবারে মুক্তপুরুষ।

মেজবৌ বসবার ঘরে বসেছিলো। বলল, গাড়ি তো দাদা নিয়ে গেছেন, গাড়ি ছাড়াই বেরোচ্ছেন বাবা?

হ্যাঁ।

মেজবৌও আর কিছু বললেন না। সুধীনবাবুও না।

সুধীনবাবু বুঝলেন যে, মেজবৌ-এর তাঁর সম্বন্ধে যত না মাথাব্যথা, দাদাই যে গাড়িটা বেশী ব্যবহার করে এ কথাটা তাঁকে জানানোর উৎসাহটাই তার চেয়ে অনেক বেশী।

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল সকাল থেকে। তখনও পড়ছিল। ছাতাটা খুললেন তিনি। রথের দিনে প্রত্যেক বছরই বৃষ্টি হয়। সারা পথ কাদা প্যাচ প্যাচ করছে। হাঁটুতে এতই ব্যথা যে, পদ্মপুকুর হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মোড়ে এসে রিকশা নিলেন। তারপর মেলায় পৌঁছে একটা রথ কিনলেন সাড়ে চার টাকা দিয়ে। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার কাঠের মূর্তিও কিনলেন।

ফেরার সময় একটা মিনিবাস আস্তে করে ধাক্কা দিলো রিকশাটাকে। একটু হলে তিনি ও রিকশাওয়ালা দুজনেই পড়ে যেতেন। কিন্তু পড়লেন না। রিকশায় চড়া মানেই লোকের কাঁধে চড়া। যৌবনে কখনও সেজন্য রিকশা চড়েননি তিনি। কিন্তু এখন নিজের পায়ের উপর আর কোনো জোর নেই বলে পরস্কন্ধারূঢ় হন নিরুপায়েই।

গাড়িটাও তাঁর নিজেরই। যেবার প্রথম ওভারহেড ভাল্‌ভ্‌এর অ্যামবাসাডার বেরুল, সেবার কিনেছিলেন। আজ অনেক বছর হল। কন্ডিশান এখনও ভালোই আছে। এক-হাতের গাড়ি ছিল। এখন ছেলেরাই চড়ে। ওরাই চাঁদা করে ড্রাইভার রেখেছে। ছেলেরা অবশ্য বলে, বাবা, যখনই আপনার দরকার একটু আগে বলে দেবেন, গাড়ি নিয়েই বেরোবেন। কিন্তু নিজের গাড়ি নিয়ে বেরোতে হলেও পাঁচদিন আগে থেকে অন্যদের বলাবলি তাঁর পছন্দ হয় না।

তাছাড়া, যাবেনই বা কোথায়? সত্তর বছরে পৌঁছে সংসারে বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়-পরিজনের স্বরূপ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন তিনি। যতদিন বড় সরকারী চাকরিতে ছিলেন, প্রভাব প্রতিপত্তি, বেকারদের চাকরি করে দেওয়ার ক্ষমতা এ সমস্তই বিদ্যমান ছিল, ততদিন তাঁর কাছে লোকের ভিড়ের অভাব হয়নি। বন্ধুরা এসেছে দলে দলে। আজকে সারাদিনে দুটো কথা বলার লোকও পান না একজনও। তাই, গাড়ির প্রয়োজন তাঁর মিটেই গেছে। যখন দরকার হয় তখন এমন হঠাৎ হঠাৎই দরকার হয়। আগে বলবার সময় কোথায় পান?

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই প্রতিবেশী জগবন্ধুবাবুর সঙ্গে দেখা। ময়দার কল আছে ভদ্রলোকের। হাসিখুশী মোটাসোটা আমুদে মানুষ। বয়সে সুধীনবাবুর চেয়ে বছর চার-পাঁচের ছোট। তিনি গাড়ি থামিয়ে দুটো কথা বলে নিলেন। বললেন, কি খবর বড়সাহেবের? গেছিলেন কোথায়? রিকশা কেন? গাড়ি কি হল?

সুধীনবাবু হাসলেন। গাড়ির কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, এই রথের মেলায়। কাছাকাছিই।

ওহো তাই তো। রথ দেখছি যে। তা পেঁয়াজী-ফুলুরী খেলেন?

সুধীনবাবু হাসলেন। বললেন, অম্বল।

কীসের অম্বল? ইয়াং ম্যান। জগবন্ধুবাবু বললেন।

তারপর বললেন, চলুন চলুন আমার বাড়ি। আপনাকে দেখে যদি আমার গৃহিণী গালাগালি থেকে ক্ষান্ত হন। আজ বড় দেরী হয়ে গেল ফিরতে। ওঁকে নিয়ে এক জায়গায় যাওয়ার ছিল। চলুন। আপনার সুন্দর মুখ দেখলেই রাগ পড়ে যাবে।

সুধীনবাবু হাসলেন। আজকাল যেমন নিজে রসিকতা করতে পারেন না। অন্য কেউ করলেও ভালো লাগে না।

বললেন, আজ ছেড়ে দিন।

তারপরই বলতে গেলেন; শুনুন। স্ত্রীকে অমন হেলাফেলা করবেন না। স্ত্রী যে কী জিনিস, চলে গেলে বুঝবেন। কিন্তু কথাটা আর বললেন না। ভাবলেন, তিনি নিজেও বুঝতেন কী জিনিস স্ত্রী; নীহারিকা থাকতে। ভাবলেন, স্ত্রীর কথা ওঠালে জগবন্ধুবাবু ভাবতে পারেন যে, দাঁত চলে যাওয়ায় দাঁতের কদর বুঝেছে বুড়ো। হ্যাঃ হ্যাঃ।

রিকশাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে রথটা নিয়ে বাড়ি ঢুকতে গিয়েই দেখলেন, বড় দুটো রথ সুন্দর করে সাজিয়ে-টাজিয়ে তার বড় ছেলের ও মেজ ছেলের পুত্ররা টানাটানি করছে।

সুধীনবাবু বললেন, রথ? একি? রথ কোথায় পেলি?

বারে। বাবা কিনে দিয়েছে। বাবা কিনে দিয়েছে।

শান্টু বলল, দাদু ঐ রথটা আমাকে দাও।

সুধীনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, না। এটা মিষ্টির।

বলেই, উপরে চলে গেলেন আস্তে আস্তে।

দেবেন এসে ভিজে ছাতাটা নিলো।

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে সুধীনবাবু খুব দুঃখিত হলেন। যা ভেবেছিলেন, তার কিছুই হলো না। ভেবেছিলেন, ছেলেরা সব এক বাড়িতেই থাকবে। জমজমাট সংসার। নীহারিকার ফর্সা, লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন চেহারাটা মনে পড়ল। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি। চাবির গোছা আঁচলে। বউরা ঘিরে রয়েছে। ছেলেদের ভাব গলায় গলায়। মা বাবা ছেলে বউ।

কিছুই হলো না।

ছোট ছেলে দীপু পড়াশুনায় সবচেয়ে খারাপ ছিলো। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় কখনই তেমন ভালো করেনি। কিন্তু জীবনের পরীক্ষাতে ঐ সবচেয়ে সফল হলো। সাহেবী কোম্পানীতে সামান্য সেলস্‌ম্যানের চাকরিতে ঢুকে দেখতে দেখতে মার্কেটিং ম্যানেজার হলো।

কোম্পানীর ফ্ল্যাট, কোম্পানীর গাড়ি। দীপুর বউ শিখা বোম্বের মেয়ে। ওর বাবা ছিলেন এক মার্কেন্টাইল ফার্মের বড় কর্তা। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। সাহেবী ধরনের মানুষ। তার পক্ষে এই বাড়িতে পাঁচমিশেলী রুচির মধ্যে থাকা সম্ভব হলো না। মিষ্টিটাকে বড়ই মিস্ করেন সুধীনবাবু। আর কী যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ও। নীহারিকার বড়ই প্রিয় ছিলো এই নাতনি।

আসলের চেয়ে সুদ যে বড় একথা যাদের সুদ নেই তারা জানেন না।

আজকাল দীপু ও শিখার সঙ্গেও দেখা হয় না বেশী। সপ্তাহে একদিন করে আসে। অবশ্য ফোন করে খোঁজখবর নেয় মাঝে মধ্যে। রান্না করে এটাওটা পাঠায়। কিন্তু মিষ্টির জন্যেই মনটা হু হু করে সুধীনবাবুর। নীহারিকা চলে যাওয়ার পর মিষ্টি ওদের নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ায় দ্বি৺ীয়বার ধাক্কা খেয়েছিলেন তিনি। পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন।

যখন দীপু চলে গেছিল, খুব রাগ হয়েছিল সুধীনবাবুর। কিন্তু এখন মনে হয় যে, তাঁর প্রজন্মের মানুষদের পক্ষে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে যৌথ পরিবারের ভাঙন আরম্ভ হয়েছে তা রোধ করা তার সম্ভব নয়। আলাদা থাকা এক এক সময় ভালো বলেও মনে হয়। তাতে সম্পর্ক বোধহয় ভালো থাকে। যদি প্রত্যেকের রুচি, রোজগার, শিক্ষা এসব একরকম না হয়, তাহলে জোর করে এক সঙ্গে থেকে বাইরের লোককে সুখের বন্যা দেখানো হয় বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পায়ের তলায় মাটি সরতে থাকে। কেউ অত্যাচার করে ; কেউ অত্যাচারিত হয়। যার রোজগার বেশি এবং যার কম তাদের দুজনেরই দু রকম কমপ্লেক্স ন্মায়। সেটা প্রত্যেকেরই জীবন উপভোগের পথে বাধাস্বরূপ। সুধীনবাবু আর নীহারিকা ইকে নিয়েই থাকতে চেয়েছিলেন জড়িয়ে। কিন্তু তিনি নিজের জীবনেও দেখেছেন। যৌথ রবারে কেউ ঠকে ; কেউ ঠকায়। কেউ অন্যায় করে ; কেউ তা সয়ে যায়। যে ভালো, কে বোকা ভাবা হয়। জীবন যেহেতু একটাই, তখন যার যার যোগ্যতা, যার যার রুচি, র যার মতামত নিয়ে আলাদা থাকাই বোধ হয় ভালো। যারা, তা থাকতে পারে। বড় বৌ, মেজ বৌ তাঁর সামনে কখনও ঝগড়া করেন না বটে, কিন্তু সুধীনবাবু বোঝেন, ভালো করেই বোঝেন যে ; ওদের মধ্যে সবসময় একটা রেষারেষি, একটা কোল্ড-ওয়ার চলে। সেটা আরও অসহ্য ঠেকে।

রথ নিয়ে উনি উপরে উঠে যেতেই মেজ বৌ ঘরে গিয়ে উষ্মার সঙ্গে মেজ ছেলেকে বললেন, বাড়াবাড়ি।

কেন ? কার ?

খাটে শুয়ে, বই পড়তে পড়তে মেজ বলল।

কার আবার ? তোমার বাবার। মিষ্টির জন্যে নিজে হাতে রথ কিনতে গেলেন, বৃষ্টিতে ভিজে। কেন আমার ছেলেদের জন্যে তো কখনও একটা চকোলেটও কিনে দেন না ?

মেজ বলল, তাই নাকি ? বাবা নিজে গেছিলেন ? স্ট্রেঞ্জ !

মেজ বৌ বলল, তোমার ছেলেরা কী ভেসে এসেছিল ?

বড় বৌ জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল যখন সুধীনবাবুর সঙ্গে জগবন্ধুবাবু কথা বলছিলেন।

বড় বৌ মেজকে ডাকলেন। মেজ বাইরে এলে বলল, দ্যাখ্ কী লজ্জার।

কি ? মেজ বলল।

বাবা জগবন্ধুবাবুকে, গাড়ি পান না, রিকশায় যাতায়াত করেন এসব কথা বলছিলেন নিশ্চয়ই ; এটা অপমানের নয় ? বুড়ো হলে মানুষগুলো কুটিল হয়ে যায় ? কাজকর্ম নেই তো।

সুধীনবাবুও ইজিচেয়ারে বসে ভাবছিলেন, স্ট্রেঞ্জ। বড় ছেলে মেজো ছেলে নিজেদের ধাড়ি ধাড়ি ছেলেদের রথ কিনে দিলো আর ছোট ভাইয়ের একমাত্র মেয়ে মিষ্টির জন্যে চার টাকা দিয়ে একটা রথ কেনার কথা মনে হলো না ওদের। এরা একেবারে চামার হয়েছে। তাঁর নিজের ছেলে বলে ভাবতেও কষ্ট হয়।

সুধীনবাবু বোঝেন সব। মুখে কিছু বলেন না। বড়লোক বাবার কাছে গরীব সেজে থাকার লাভ অনেক। অন্তত তাই ভাবে ওরা। তিনি চিরদিন ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিপক্ষে। দীপু চলে গেছে বলেই তিনি তাকে দূর করে দিতে পারেন না। উইল করে ফেলেছেন তিনি। যা-কিছুই আছে স্থাবর অস্থাবর, ছেলেমেয়ে সকলকে সমান ভাগ। বৌমারা একথা জানেন না বলেই বোধহয় রেষারেষি হয়। কে শ্বশুরের বেশী কাছের, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে।

ড্রাইভার ফিরে এসে উপরে এল দেখা করতে। সুধীনবাবু বললেন যে, এক্ষুণি রথটা ছোটোবাবুর নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসতে।

ড্রাইভার চলে গেল। বড় ছেলে, শালা ও শালা-বউ এর জন্যে গরম গরম বিরিয়ানী ও চিকেন চাঁব নামিয়ে রেখে রাগের গলায় শালাদের সামনেই বলল, বাবা যত বুড়ো হচ্ছেন, ততই ইনকর্নসিডারেট হচ্ছেন। এত রাতে বৃষ্টির মধ্যে ড্রাইভারকে কী না পাঠালেই চলত না। গরীব লোকটা সারাদিন খাটছে। বুড়ো হলে মানুষগুলো সেনাইল হয়ে যায়। ভীমরতি ধরে।

বড়বাবুর বড় শালা কথা ঘুরিয়ে বলল, যাই বল আর তাই বল, শিখা ও দীপু চলে গিয়ে তোমাদের বাড়িটা কেমন খাঁ খাঁ করে যেন।

বড় বৌ বলল, তাতো লাগবেই দাদা তোমার। আমরা তো শিখার মত সুন্দরীও নই আর অমন শরীর বের করে সাজতেও পারি না।

বড় শালা হেসে ফেললেন। বললেন, নমু তুই কোন লজ্জায় এ-কথা বলছিস ? তুই যা শরীর করেছিস তা কী কাউকে দেখাবার ? তুই তো একেবারে আমাদের কোম্পানীর সাপ্লায়ার ঢালাইওয়ালা মিঃ আগরওয়ালার স্ত্রীর মতন দেখতে হয়ে গেছিস। ওজন কত কুইনটাল হল ?

বোন রেগে গেল। বলল, তোমাদের সব দেমাকি মেয়েছেলে ছাড়া ভালোই লাগে না। শিখার দেমাক একদিন ভাঙব। ভগবান কি নেই ? ভগবানই একদিন ওকে মুড়িয়ে খাবেন।

দাদা বললেন, ছিঃ ছিঃ, তুই না পড়াশুনা করেছিস। তুইও এরকম ? টিপিক্যাল। তারপর বলল, ভগবানের আরও অনেক ইমপর্ট্যান্ট কাজ আছে। যাই বলিস, তোদের বাড়িতে কিন্তু দীপু-শিখাকে আমার সবচেয়ে পছন্দ। ভেরী স্ট্রেইট্-ফরোয়ার্ড।

বড় বৌদি বললেন, খুব লক্ষ্মী মেয়ে কিন্তু শিখা। ওরা যখন এখানে থাকত, একটা ঘরে থাকলে কী হয় ; ঘরের মেঝেতে মুখ দেখা যেত। এখন তোদের বাড়িতে ঢুকলে মনই খারাপ হয়ে যায়। মাসীমা আর শিখা চলে গিয়ে তোদের বাড়ি একেবারে শ্রীহীন হয়ে গেছে।

বড় বৌ চটে গেল। বলল, তা ; এই বাড়িতে আসা কেন বাবা ? না এলেই তো পারো। কেউ বাড়ি বয়ে এসে এমন অপমান করে, শুনিনি কোথাও।

ঘর ফাঁকা হতেই বড় শালা নিজের স্ত্রীকে বললেন, তোমার এমন স্পষ্ট কথা বলার দরকার কি ?

আমি স্পষ্ট কথাই বলি। তোমার বোন বলে কী ছেড়ে দেবো ? ওরা কেউ শিখার ধারে কাছে নয়। তাই-ই তো দলাদলি আর পলিটিক্স করে ওকে তাড়াল। শিখা চাপা মেয়ে কিন্তু একদিন আমার কাছে সব বলেছিল। শিখার কি ? ও নিজে বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, স্বামীরও যথেষ্ট যোগ্যতা আছে ; ও কেন এই নোংরামির মধ্যে থাকবে ? আমার সামর্থ্য থাকলে আমিও তোমাদের বাড়ি থাকতাম না। কত সুখেই রেখেছো তুমি আমাকে জগাখিচুড়ির সংসারে।

তারপর বলল, লোকে ঈর্ষা আর হিংসা করে তো আর কারো কপাল পোড়াতে পারে না। কপাল কে নেবে ? যে যেমন কপাল করে আসে। তোমার বোনের এই পরশ্রীকাতর স্বভাব আমার মোটে ভালো লাগে না।

আঃ কী করছ। বাড়াবাড়ি কোরো না, শুনতে পাবে।

শুনুক। তোমার মত আদেখলাও দেখি নি আমি। বিরিয়ানী খাওয়ার এত লোভ, তো হোটেলে গিয়ে খেলেই পারো !

আহা। সমীর এত করে নেমন্তন্ন করল। সমীরের কী দোষ। বলল, হুইস্কী খাওয়াবে। বৃষ্টির দিন। সমীর তো ভালোই।

বড় শালার স্ত্রী বলল, ভালো। তেমনি ভালো। যেমন দেবা, তেমনি দেবী। এরকম ছোট মনের পুরুষও আমি দেখিনি। স্ত্রীর কথায় ওঠে বসে।

থামো তো। ধমক্ লাগালেন বড় শালা।

বড় এসে বলল, এসো ঘরে এসো, চুপচাপ হুইস্কী খেতে হবে ঘরে বসে। হাশ্-হাশ্ করে। বাবা জানতে পারলে তো কোনো সম্পত্তিই দিয়ে যাবেন না। ত্যাজ্যপুত্তুর করবেন।

বড় শালা অবাক হয়ে বললেন, কেন ? দীপু তো খেতো বাড়িতে মাঝে মধ্যে।

বড়ছেলে সমীর বলল, দীপুর কথা ছাড়ো। ওর কি কোনো রেসপেক্ট্ আছে নাকি বড়দের প্রতি ? ও সাহেব লোক।

২

একী ? দেখেছো, সর্বনাশ করেছে। ঘুম থেকে সেদিন উঠেই চেঁচিয়ে উঠলেন সুধীনবাবু।

তারপরই ডাকলেন, দেবেন, দেবেন।

দেবেন নেই। যথারীতি !

মেজ বৌ তখনি উপরে এসেছিলো। ছেলের খাবারের তাগাদা দিতে। চিৎকার শুনে ঘরে ঢুকে বলল, কী হল বাবা ?

ইঁদুর।

কোথায় ?

এই দ্যাখো না, তোমার মায়ের লেপটা কেটে কী করেছে।

লেপটা কোথায় ছিলো ?

সুধীনবাবুর রাগ হল। ভাবলেন, বলেন যে, লেপ কোথায় থাকে তা তো তোমাদেরই জানার কথা মা ! এ ঘরটা তো আবর্জনার স্তূপই হয়ে আছে। কখনও তো চোখ মেলেও দেখো না।

কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলেন।

পরের বাড়ির মেয়ে। ছেলের বউ। রাগ করেন তাদের উপরে, সে অধিকার কোথায় ? রাগ করার লোক, ঝগড়া করার লোক, তো চলেই গেছেন।

তোমার মায়ের খাটের মাথার কাছেই ভাঁজ করা ছিলো। দেখেছো, কেটে তুলোগুলোকে কী করেছে। তোমার মায়ের বড় প্রিয় লেপ ছিলো ওটা। উনি বলতেন, বড় ওম ধরে। সেই যেবার আমরা শীতকালে উটীতে গেছিলাম সেইবার এই লেপটা সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন তোমার মা। সঙ্গে সেবার ছোটনও গেছিল। মনে আছে। ওঃ সেবারে কী শীত ! তখন কতই বা বয়স আমাদের। তোমার মার সে কী আনন্দ উটী দেখে।

মেজ বৌ মনে মনে বলল, কী কুক্ষণে এই ঘরে ঢুকলাম। এখন বৃদ্ধের মধুচন্দ্রিমার গল্প শুনতে হবে।

এমন সময় দেবেন এল।

সুধীনবাবু বললেন, দেবেন, তই আমার কাছে মার খেয়েই মরে যাবি।

ফেলুন, মেরেই ফেলুন। দেবেন বলল। এই চাকরি আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমি মরে গিয়েই বাঁচি।

সুধীনবাবু বললেন, তুই ইঁদুর মারবি কি মারবি না ? দেখেছিস, হতভাগা, ইডিয়ট্ দেখেছিস কী করেছে।

মেজ বৌ বললেন, বাবা ইঁদুরের কী দোষ। এইতো ইঁদুরের ধর্ম।

ধর্ম মানে ?

প্রায় চটেই উঠেছিলেন সুধীনবাবু।

মেজ বৌ বলল, ধর্ম মানে ; না কাটলে যে, ইঁদুর মারা যায়। মানে, ইঁদুরের দাঁত থাকে এমন যে, সব-সময় সেটা জিনিসপত্র কেটে কেটে ঘষে ঘষে ছোট না-করলে সেই দাঁত ইঁদুরের মগজ ফুটো করে দেয়। দেখেন না, ইঁদুর কাগজ কাটে, লেপ কাটে, তোষক কাটে, যা পায় তাই-ই কাটে, যা কাটে সেগুলো কিছুই খায় না। না কাটলে যে, ইঁদুর বাঁচতেই পারে না। আমার জুওলজি ছিল তো।

তা তো জানতাম না। সুধীনবাবু বললেন।

মেজ বৌ মনে মনে বলল, অনেক কিছুই জানেন না আপনি।

দেবেন বলল, দেখেছেন, মায়ের লেপটাকে কী করেছে ব্যাটারা। এমন বিষ দেবো যে মানুষ পর্যন্ত মরে যাবে। দেখাচ্ছি মজা।

সুধীনবাবু বললেন, দয়া করে দেখাও।

বড় বৌমা ঘরে ঢুকলো। মেজ বৌ বাবাকে কী জ্ঞান দিচ্ছে দেখার জন্যে। চান্স পেলেই

একা একা বাবার কাছে ঘুসুর ঘুসুর করে। মায়ের যত গয়না ছিল সবই তো হাত করেছে মেজই! বড় কিছুই পায়নি! তবে আনন্দ এইটুকুই যে ছোট কিছু চায়ও নি এবং তাকে কিছু দেওয়াও হয়নি। তার স্বামী বড়লোক তাকে দেবেনই বা কেন?

বড় বৌমা মধুর স্বরে বললেন, বাবা।

বল।

সুধীনবাবু বললেন।

আজ রাজার জন্মদিন।

তাই নাকি? তা এত দেরি করে বললে, রাজাকেও তো দেখলাম না সকাল থেকে।

ও দেরি করে উঠেছিল। তাই সকালে আসতে পারেনি আপনার কাছে। স্কুল থেকে ফিরেই আসবে।

মেজ বৌ বলল, সে কী দিদি, আমারও তো মনেই ছিল না।

বড় বৌ মনে মনে বলল, কত যেন মনে করে রাখো তুমি!

তারপর বললেন, রাজার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে খেতে বলব আর রাজার পিসী আর পিসেকে। ওর মামা-মাসীদের।

সুধীনবাবু বললেন, দীপু আর শিখাকে বলছো না?

মানে, ও বলছিলো, জায়গা কম; লোক বেশী হলে........।

জায়গা যত কমই হোক আমার ছোট ছেলে এবং তার স্ত্রীর দীপু-শিখার জায়গার অকুলান হবে না এ বাড়িতে। অন্তত হওয়া উচিত নয় বলেই আমার মনে হয়।

বড় বৌ বুঝলেন যে, সুধীনবাবু ভীষণ চটেছেন।

বললেন, ওরা তো ভালো খায়; ভালো থাকে। ওরা কী সাধারণ ব্যাপারে আসবে? তারপর পার্টি-ফার্টি তো লেগেই আছে! কক্‌টেলস্। তাই ভাবছিলাম.......।

সুধীনবাবু অনেক বছর পরে বড় বৌএর চোখে লাল চোখে তাকালেন। বললেন, কী ভাবছিলে?

এমন সময় নিচ থেকে দীপুর কোম্পানীর উর্দিপরা ড্রাইভার সুন্দর র‍্যাপিংপেপারে মোড়া একটা এয়ার রাইফেল, এক বাক্স চকোলেট আর লাল গোলাপ ফুল নিয়ে এল। সঙ্গে শিখার ছোট্ট চিঠি।

রাজাবাবু,

আজ তোমার জন্মদিন। তোমাকে অনেক অনেক অনেক আদর পাঠাচ্ছি তোমার ছোটকাকু, মিষ্টি ও ছোটকাকীমা।

আমি যখন ও-বাড়িতে ছিলাম তখন তুমি পাশের বাড়ির রণুর এয়ার-রাইফেলটা একদিন চেয়ে পাওনি বলে খুব দুঃখ করেছিলে। আমার মনে আছে। তোমার ছোটকাকু তাই তোমার জন্যে একটা এয়ার-রাইফেল পাঠালেন! মিষ্টি ফুল পাঠালো। আর আমি অনেক আদর। তোমার জন্যে পায়েস রেঁধেছি। বিকেলে আমরা সকলে তোমার কাছে যাবো, পায়েস নিয়ে।

—ইতি ছোটকাকীমা

চিঠিটা পড়ে বড় বৌমার মুখ কালো হয়ে গেল।

সুধীনবাবু বললেন, কে লিখেছে?

শিখা।

কী লিখেছে? দেখি?

বড়বৌ চিঠিটা এগিয়ে দিলেন।

চিঠিটা পড়ে সুধীনবাবু বড়বৌমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

বড়বৌ বলল, আমি যাই শিখাকে ফোন করি গিয়ে।

সুধীনবাবু কিছু বললেন না।

দেবেন ইঁদুরে-কাটা তুলো টুলোগুলো পরিষ্কার করছিল। বাইরের রাস্তার বকুল গাছে কাক ডাকতে লাগল। হঠাৎ বকুলের গন্ধ এল নাকে এক ঝলক। নীহারিকা এই গন্ধ ভারী ভালোবাসতেন।

পাশের বাড়িতে রাজেশ্বরী দত্তর গাওয়া 'এ পরবাসে রবে কে' গানের রেকর্ড বাজছিল। সুধীনবাবুর মনটা উদাস হয়ে গেল। নীহারিকার বড় প্রিয় গান ছিল এটি। সত্যিই পরবাস! শুধুই স্বার্থকোলাহল; শুধুই বিবাদ।

৩

বারান্দার বাইরেটা বেলুন আর কাগজে সাজানো হয়েছে। বাচ্চারা হৈ-চৈ করছে। আজকাল হৈ-চৈ মোটে সহ্য হয় না সুধীনবাবুর। নিজের ঘরেই আছেন।

নিচে গাড়ির শব্দ হল। বোধহয় বড় বৌমার দাদা-বৌদিরা এল। সুধীনবাবুর একমাত্র মেয়ে ফুচি। ওরা এখন দিল্লীতেই সেটেলড্। এক মাসের ছুটিতে এসেছে এখানে। নীহারিকা থাকলে এখানে এসেই উঠত। নীহারিকা যাওয়ার পর আর ওঠে না। কেন ওঠে না তা বলেনি ফুচি সুধীনবাবুকে। কিন্তু সুধীনবাবু বোঝেন যে, হয়ত বড় বৌমা বা মেজ বৌমা অথবা দুই বৌমারই কোনো ব্যবহারে ও বা প্রদীপ দুঃখিত হয়েছে। বোঝেন সবকিছুই। মুখে চুপ করেই থাকেন। একটাই মেয়ে। কিছুই করতে পারেন না ওদের জন্যে। উল্টে, মেয়ে জামাই-ই সুধীনবাবুকে নিয়ে এখানে ওখানে যায়। থিয়েটার দেখতে, যাত্রা দেখতে। বড়ো ও ভালো রেস্তোরাঁতে খাওয়ায়। পাজামা-পাঞ্জাবি বানিয়ে দেয়। এবারে আসার সময় একটা শাল কিনে নিয়ে এসেছে। কত দামী শাল। কবে এবং কোথায় পরবেন সুধীনবাবু? দিন তো ফুরিয়ে এল।

শিখা আর দীপুর সঙ্গে কিন্তু খুব ভাব ফুচি আর প্রদীপের। প্রত্যেকটা উইক-এন্ডে ওরা ওদের ওখানে গিয়ে থাকে। এটাও একটা প্রচণ্ড অশান্তির কারণ। মেজ বৌ ও বড় বৌ-এর ধারণা কভেনান্টেড অফিসারে অফিসারে মিলে গেছে। দুজনেই সাহেব তা আমাদের কী আর পছন্দ হবে তাদের?

আরেকটা গাড়ির শব্দ হল।

ফুচি, প্রদীপ, শিখা ও দীপু একসঙ্গে নামল গাড়ি থেকে। ওদের গলার শব্দ পেলেন সুধীনবাবু। তারপরই মিষ্টির পরিচিত জুতোর শব্দ পেলেন সিঁড়িতে। হালকা পায়ের নরম থপ্ থপ্ শব্দ। মুখস্থ হয়ে গেছে সুধীনবাবুর। নাতিরা এত দুরন্ত নয়। মিষ্টি, মেয়ে হয়েও ভারি দুরন্ত। এনার্জিতে ভরপুর। ওর হাঁটা-চলা কথা-বলা সমস্তই এতই প্রাণবন্ত যে

পরপারের পথে চোখ চাওয়া সুধীনবাবুর ওকে দেখে আবার জীবনকে ব্যাক-গীয়ারে ফেলে অনেক দূরে পিছিয়ে মিষ্টির বয়সে পৌঁছতে ইচ্ছে করে।

মিষ্টি, গাড়ি থেকে নেমেই সোজা দৌড়ে উপরে আসে দাদু, দাদু, দাদু ডাকতে ডাকতে। মিষ্টি যখন সিঁড়ি থেকে ডাকে দাদু দাদু দাদু তখন সুধীনবাবুও ঘর থেকে উত্তর দেন কি দাদু, কি দাদু, কি দাদু ?

মিষ্টি এসেই সুধীনবাবুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজও পড়ল। সুধীনবাবু ওকে জড়িয়ে ধরলেন জোরে। যখনই মিষ্টিকে বুকে করেন সুধীনবাবু, সুধীনবাবুর মনে হয়, যেন বিয়ের সময়ের ছোট্ট বালিকা-বধূ নীহারিকাকেই আদর করেন। তার একটা কারণও ছিল। মিষ্টি যে পাউডার মাখে, নীহারিকাও সেই পাউডার মাখতেন। একটি পাউডারের গন্ধে মিষ্টির মাধ্যমে তাঁর নীহারিকা তাঁর কাছে ফিরে আসত।

সুধীনবাবু প্রত্যেকবারই মিষ্টিকে কোলে নিয়ে ভাবতেন পাউডারের কোম্পানী থেকে যায় ; শুধু মানুষই চলে যায়।

ফুচি আর প্রদীপও ঘরে এলো দীপুর সঙ্গে। শিখা এলো না। হয়ত পরে আসবে। শিখার মধ্যে, মন-রাখা লোক-দেখানো কোনো ব্যাপার নেই। সেটা ভালো যেমন ; খারাপও।

একটু পরেই শিখাও এলো। পিছনে পিছনে বড়বৌ মেজবৌ।

ফুচি হাসতে হাসতে সত্যি কথাটা বলল। এই বৌদিরা, তোমরা আমার বাবাকে কী করে রেখেছ ? ঘরটার কী অবস্থা দ্যাখো তো ? এর মধ্যে মানুষ থাকতে পারে ? আলমারীর মাথায় টিন, নিচে জুতো, ছেঁড়া মশারি, খাটের তলায় পুরো গুদাম !

বলেই, চেঁচিয়ে উঠল, ওমা, ওটা কি ?

মিষ্টি উত্তেজিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল, দাদুর কোলে বসে, বলল, ইঁদুর, ইঁদুর। ওমা। পিসী ইঁদুরকে ভয় পায়।

শিখা হাসতে হাসতে বলল, এসব বলিস না ফুচি, বললেই দিদিরা বলবে আমি তোকে শিখিয়ে দিয়েছি।

শিখা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বড় বৌ বলে উঠল, তুমি তো কয়েকদিন এখানে থেকে বাবার ঘরটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেই পারো।

শিখা হাসল। বলল, নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু তা করলে তোমাদের অপমান করা হয় বলেই কখনো তা করিনি। তোমরা যদি অনুমতি দাও তো নিশ্চয়ই করব এবং করে দেখিয়ে দেব যে এই ঘরই কীভাবে রাখা যায়।

বড় বৌ চেঁচিয়ে উঠল, ম্যাগো। বলে।

একটা বড় ইঁদুর কামড়ে দিয়েছে পায়ে।

মেজ বৌমা বললেন, দিদি শীগগির ওষুধ লাগা, প্লেগ হবে ; প্লেগ।

প্রদীপ অবাক হয়ে তাকাল মেজ বৌ-এর দিকে। মেজ বৌদি যে এত অশিক্ষিত জানত না প্রদীপ।

ফুচি বলল, বড়দি চল, চল নিচে। শিগগীরি ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি।

তারপর শিখার দিকে চেয়ে বলল, শিখা, আয় আমরা দুজনে মিলে কাল এসে বাবার ঘরটা পরিষ্কার করে দিয়ে যাই। বৌদিরা নানা ঝামেলায় সময় পায় না।

শিখা বলল, বেশ তো। খুব ভালো।

ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে দীপু বলল, কেমন আছ বাবা?

এই আছি!

তোমার ব্লাড সুগার? প্রেসার? সব ঠিক?

ঠিকই আছে।

আসলে সুধীনবাবুর এই বয়সে মেপে-খেয়ে, মেপে-হেঁটে, প্রেসার মেপে, বেঁচে থাকার আর ইচ্ছা নেই। জীবনের সব প্রয়োজনীয়তা, সার্থকতা তো শেষই। হাইওয়েতে একটা গাড়ির এঞ্জিন কাট-অফ করে দেওয়া হয়েছে। গীয়ারও নিউট্রালএ। এখন যতদূর যায় গড়িয়ে গড়িয়ে। এ গাড়িতে তেল মবিল দিয়ে আর লাভ কী? গন্তব্যই যখন নেই কোনো; একমাত্র থেমে যাওয়া ছাড়া।

দীপু বলল, আমাদের অফিসের ডাক্তারের সঙ্গে ঠিক করেছি, তোমাকে সপ্তাহে একবার করে দেখে যাবেন।

কেন? আমাদের গজেন ডাক্তার কী দোষ করল?

না। উনিও দেখুন। তবে উনি তো মাঝে মাঝেহ্ ডুব দিয়ে দেন।

ঘর থেকে উঠে চলে যাওয়ার সময় দীপু বলল, বাবা, মিষ্টিকে আজেবাজে কিছু খাইও না যেন। ওর সকাল থেকে পেটের গণ্ডগোল। শিখা টিফিন ক্যারিয়ারে করে ওর জন্যে শুকতো নিয়ে এসেছে। ঐ খাবে। ভাতে মেখে।

সুধীনবাবু মুখে বললেন, ঠিক আছে।

মনে মনে বললেন, এদের কায়দার শেষ নেই। ছেলেমানুষ, নেমন্তন্ন খেতে এসেছে; তা না টিফিন ক্যারিয়ারের শুক্তো খাবে। যত্ত সব।

রাজা ঘরে এলো। মিষ্টির দুগুণ বয়স রাজার।

রাজা বলল, মিষ্টি নিচে চল। আমরা কেক কাটব। তুই গান গাইবি না? হ্যাপী বার্থডে?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। বলে নেচে উঠল মিষ্টি।

সুধীনবাবু বললেন, আমিও যাবো। তারপর মিষ্টির হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন নিচে। ততক্ষণে বাচ্চারা সকলে ভীষণ মেতে গেছে।

কেক কাটা হল। গান হল। কেক খাওয়া কিন্তু হলো না মিষ্টির। শিখা খুব নির্দয় মা। বলল, মিষ্টি, তোমার ভাগ আমি বাড়ি নিয়ে যাবো। কাল, ভালো হয়ে গেলে, খাবে।

মিষ্টি মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলল না।

সুধীনবাবু বললেন, চলো, কেক কাটা হল, আমরা এবারে উপরে যাই। তারপর মিষ্টির কানে কানে বললেন, তুমি কি দই খাবে? যদুবাবুর বাজার থেকে দই আনাবো?

নাঃ।

বলল, মিষ্টি।

ওপরে উঠে দেখেন ঘরে দেবেন কাবাব রেখে গেছে দুটো। একটা প্লেটে। আর প্লেটটা রেখেছে খাটের নিচে মাটিতে। একটা চামচ পর্যন্ত দেয়নি। দেবেনটা দিনকে দিন......

সুধীনবাবুর শরীরটাও কাল থেকে ভাল নেই। ঠিকই করেছিলেন যে, রাতে শুধু দুধ-খৈ খাবেন।

কাবাবটা মিষ্টিও দেখেছিল।

বলল, দাদু, কাবাব ! চোখ বড় বড় হল ওর।

দাদু বললেন, তোমাকে কেক খেতে দিল না, তুমি কাবাব খাবে কী করে দাদু ?

মিষ্টি মুখে কিছু না বলে এমনভাবে তাকাল সুধীনবাবুর চোখে যে, সুধীনবাবুর বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করে উঠল। ভদ্রলোক অপত্যস্নেহ কাকে বলে জীবনে জেনেছিলেন। কিন্তু আসলের প্রতি যে স্নেহ, যে দরদ ; তার মধ্যে কিছুটা তবুও ভারসাম্য থাকে। সুদের প্রতি স্নেহ ও দরদে তা থাকে না। সুধীনবাবুর মনে হয় যিনি দাদু বা দিদা হননি, তিনি জানেন না সুদের কী টান। কী কষ্ট ? যে নাতি বা নাতনির প্রতি স্নেহ আছে অসীম কিন্তু যার মালিক তার মা ও বাবা ; তাকে আদর করতে, তাকে হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যেতে যখন তার নিজের অনিচ্ছুক ছেলে মেয়ের অনুমতি চাইতে হয় তখন বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হয়।

সুদকে ভালোবাসায় ভীষণ জ্বালা।

হঠাৎ সুধীনবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে এল। তাঁর নিজেরও কি কোন দাবী নেই নাতনির উপর ?

উনি মিষ্টিকে বললেন, তোমার কি এখন পেট ব্যথা করছে ?

না তো দাদু।

তবে কী অসুবিধা ?

জানি না। সকালে তিনবার পাই করেছিলাম।

তারপর আর যাওনি ?

না।

ওষুধ খেয়েছো ?

হ্যাঁ। মেক্সাফর্ম্।

দাঁড়াও। বলে সুধীনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজাটা বন্ধ করলেন ঘরের। বন্ধ করেই, তাড়াতাড়ি কাবাবের প্লেটটা হাতে করে এনে মিষ্টিকে বললেন, খাও দাদু।

দুটোই ?

মিষ্টি বলল।

তারপর বলল, তুমি একটা খাও দাদু।

দুটোই তুমি খাও। আমি খাবো না।

মিষ্টির চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাবাব মুখে দিলো মিষ্টি।

কেমন লাগছে ?

সুধীনবাবু বললেন।

ভালো।

মিষ্টি বলল।

তারপর বলল, ঝাল। তারপরই বলল, গন্ধ লাগছে।

সুধীনবাবু ভাবলেন, শিখা মেয়েটাকে বেশী যত্নে যত্নে একেবারে স্পয়েল্ করে ফেলেছে। এদের ইমিউনিটী বলে কিছুই ডেভেলাপ্ করেনি। যা কিছুই খায়, তাতেই অসুখ।

সুধীনবাবু বললেন, আরেকটা খাও।

মিষ্টির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। বলল, না থাক। খুব ঝাল।

সুধীনবাবু বললেন, দাঁড়াও তোমাকে জল দিই। দেবেনকে ডাকলেই তো জানাজানি হয়ে যাবে। শিখা বা দীপু এখুনি চলে এলে প্রচণ্ড ঝামেলা বাধাবে। ফুচিও আসতে পারে। তাই নিজেই বারান্দায় গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে মিষ্টিকে দিলেন।

মিষ্টি, জল খেয়েই বলল, দাদু, আমি মার কাছে যাবো।

কেন দাদু ? কী হল।

ভালো লাগছে না।

কেন ভালো লাগছে না ? হলোটা কী তোমার ?

না। এমনিই।

আমি পৌঁছে দিয়ে আসব ? না, তুমিই যাবে ?

আমি যেতে পারব নিচে।

আচ্ছা। তবে যাও। বাড়ি যাওয়ার আগে আমাকে বলে যেও। একটা আব্বা দিয়ে যেও আমাকে।

আচ্ছা।

মিষ্টি দরজার কাছে পৌঁছতেই সুধীনবাবু বললেন, কাউকে বোলো না যেন কথাটা।

মিষ্টি হাসল।

ভারী স্মার্ট মেয়েটা। চোখ পিট্-পিট্ করে বলল, কাউকে বলব না। প্রমিস্।

৪

অনেক রাত হয়েছে। দেবেন মশারি গুঁজে দিতে এসেছিল। সুধীনবাবু বাঁধানো দাঁতের পাটিটা খুলে একটা জলভরা বাটির মধ্যে রাখলেন। রাতে দুধ খৈ-ই খেয়েছিলেন। এখন শরীরটা ভালোই লাগছে। নিচে এখনও ওদের গলা পাচ্ছেন। এগারোটা বাজে। খাওয়া-দাওয়া হতে বারোটা সাড়ে-বারোটা হবে। শিখা, মিষ্টিকে নিয়ে আগেই চলে গেছে। মিষ্টির শরীরটা নাকি ভালো নেই। দীপুকে ফুচি আর প্রদীপ নামিয়ে দিয়ে যাবে ট্যাক্সি করে।

মিষ্টির শরীরটা ভালো নেই শুনে ভয়ে সুধীনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে। শিখার রাগী মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

মশারিটা গুঁজে দিয়ে দেবেন বলল, কাল ঘরে গন্ধ পেলেই বলবেন বাবু।

কিসের গন্ধ ?

পচা ইঁদুরের।

কেন ? ইঁদুর পচবে কেন ?

সুধীনবাবু শুধোলেন।

পচবে না ? দুটো কাবাবে ভালো করে ইঁদুর মারা ওষুধ মাখিয়ে রেখেছিলাম খাটের নীচে। একটা এরই মধ্যে খেয়ে ফেলেছে ব্যাটারা। একটা ইঁদুরে নিশ্চয়ই খায় নি। ধেড়ে ইঁদুরের বংশ নির্বংশ হবে এক কামড় খেলে।

সুধীনবাবুর হৃৎপিণ্ডটা খাঁচা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইল এক লাফে।

সোজা খাটে উঠে বসলেন। বললেন, দাঁড়া! দাঁড়া! দেবেন।

তারপর মশারি ছেড়ে বাইরে এলেন। বললেন, কোথায় দেখি, তোর কাবাব।

এই তো! বলেই, দেবেন মিষ্টি যে-প্লেট থেকে খেয়েছিলো সেটা টেনে বের করল। হতভম্ব হয়ে অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন সুধীনবাবু।

এমন সময় নিচ থেকে দেবেনকে মেজ বৌমা ডাকলো। দেবেন নিচে গেলেই ফিসফিসে গলায় বললেন, বাবা শুয়ে পড়েছেন? খেলেন না?

না। শরীর ভালো নেই।

মেজবৌমা বললেন, শোনো, মিষ্টির খুব শরীর খারাপ হয়েছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এক্ষুনি ফোন এসেছিল ছোট বৌদির। বাবাকে একথা এখন বোলো না। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই আমরা অসুখের খবর দেবো। সকালে দেখতে নিয়ে যাবো।

দেবেন ওপরে ফিরে গেল।

সুধীনবাবু ইজিচেয়ারে গিয়ে বসেছিলেন। টেবিলের উপর মিষ্টির একটা ছবি ছিলো। সেদিকে তাকিয়েছিলেন। নীহারিকার ছবির দিকেও। দেবেন আসতেই বললেন, বৌদি ডাকল কেন?

না, এমনিই....

বেশী চালাক হয়েছিস না? কী হয়েছে বল?

কিছু তো হয়নি। আপনার কাজ শেষ করে নিচে মেজবাবুর বিছানা ঠিক করে দিতে বললেন।

ও। তুই মিথ্যে বলছিস না?

না বাবু।

আমাকে টেলিফোনের বইটা দে। গজেন ডাক্তারের ফোন নাম্বার জানিস?

আমি জানি না। বলে, দেবেন বইটা এনে দিলো।

চশমাটা নাকে লাগিয়ে গজেন ডাক্তারের ফোন নম্বরটা বের করে পাশের ঘরে গিয়ে ডায়াল করলেন উনি। দেবেনকে বললেন, তুই নিচের যা কাজ আছে সেরে, তারপর আমার কাছে আয়।

দেবেন চলে গেল নিচে।

গজেন?

বলছি। কে? বড় কর্তা নাকি? কেমন আছেন? রোজ শোওয়ার সময় ক্যাম্পোজ খাচ্ছেন তো একটা করে?

তা খাচ্ছি। শোন, ইঁদুর মারার ওষুধ।

মানে? বলেন কী আপনি? মাথা খারাপ হল না কি?

না তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। কোনো খাবারে, ইঁদুর মারার ওষুধ বেশী করে দিয়ে যদি কোনো বাচ্চাকে খাওয়ানো যায় তবে তার এফেক্ট কি হবে?

গজেন ডাক্তার হেসে বলল, আপনি কী গোয়েন্দা গল্প লিখছেন নাকি?

আঃ, গজেন! যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর দাও।

এফেক্ট আর কি হবে ? মরে যাবে।

সুধীনবাবুর হাতটা রিসিভার থেকে আলগা হয়ে এলো।

বললেন, আর উ্য শিওর ?

অ্যাব্‌সলুটলী।

খাওয়ার কতক্ষণ পরে মারা যাবে ?

স্টম্যাক্ পাম্প না করলে অল্পক্ষণের মধ্যেই।

আচ্ছা। ঠিক আছে।

গজেন ডাক্তার বললেন, ব্যাপারটা....

গজেন ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই সুধীনবাবু ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

দেবেন ফিরে এলো একটু পরে। বলল, কি হলো বাবু, ঘুমোবেন না। লাইট নিভিয়ে দেবো ?

সুধীনবাবু বললেন, ঘুমবো রে ঘুমবো। আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে তোদের এত তাড়া কিসের ?

তারপরই বললেন, মিষ্টিকে কখন হাসপাতালে নিয়ে গেছে রে ?

দেবেন অবাক হল। তারপরেই ভাবল, গজেন ডাক্তারের কাছে শুনেছেন বোধ হয়।

বলল, এক্ষুণি।

সুধীনবাবু মনে মনে হিসেব করলেন, মিষ্টি সন্ধে সাড়ে ছ'টায় ওঁর কাছে এসেছিল। এখন বাজে সাড়ে-এগারোটা। অনেক ঘন্টা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ দেবেনের উপর রেগে উঠলেন তিনি। বললেন, তুই ভেবেছিস কি ? রয়ে রয়ে মুরলী বাজাবি ? এক্ষুণি আরো আন, বিষ আন, সারা ঘরে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে রাখ, যাতে ঘরের যত ইঁদুর আছে একদিনেই মরে যায়। তুই রোজ রোজ এইরকম বিষ দিবি নাকি ? রোজই ইঁদুর পচবে ? এটা কি ধাপার মাঠ পেয়েছিস ?

কাবাব তো নেই। অবাক হয়ে বলল দেবেন। বিষ মেশাবো কিসে ?

নবাব হয়েছেন। ইঁদুরকে কাবাব খাওযাতে হবে না। পাঁউরুটি আন। তাতে বিষ মাখিয়ে রাখ। যা শীগগিরী যা।

দেবেন চলে যেতেই, স্লিপিং পিলের শিশিটা নিযে এলেন তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলে।

তারপরে প্যাড বের করে, বল্ পেন বের করে, চশমা নাকে দিয়ে দ্রুত চিঠি লিখলেন একটা। খামে ভরে, মুখ বন্ধ করলেন সেটার।

দেবেন ফিরে এলেই বললেন, রাখ ওখানে। আমি নিজে দেবো আনাচে কানাচে।

আপনি কেন ? আমিই দিচ্ছি। বলে, দেবেন ভালো করে বিষ মাখিয়ে রুটির টুকরোগুলো এদিকে ওদিকে সবদিকে দিয়ে দিলো। আলমারির নিচে, খাটের নিচের সব জায়গায়।

সুধীনবাবু বললেন, আমি এখন পড়ব। তুই মশারিটা গুঁজে দিয়ে যা। জল দিয়েছিস ?

হ্যাঁ। সব দিয়েছি।

দেবেন চলে যাওয়ার আগে খামে বন্ধ চিঠিটা দেবেনের হাতে দিয়ে বললেন, কাল সকালে এই চিঠিটা ছোট-বৌদিকে পাঠিয়ে দিবি ড্রাইভারকে দিয়ে। কেউ না থাকলে, তুই নিজেই

যাবি। জরুরী চিঠি। কাল সকালেই। বুঝলি ?

আচ্ছা। দেবেন বলল।

এবার যা। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া কর। হাত ধুয়ে নিস ভালো করে। অনেক খাটনি গেছে আজ তোর।

দেবেন বলল, খাটনির কথা বলবেন না বাবু ! অন্যরা তো সব গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে। খাটনি যা, সব দেবেনেরই। তাও তো আপনি বেশী ভালোবাসেন বলে অন্য সব লোকজনের কী আক্রোশ আমার উপর।

দেবেন চলে যাচ্ছিল। সুধীনবাবু ডাকলেন। বললেন, তুই একটা হাতঘড়ি চেয়েছিলি না আমার কাছে ? বলেই, নিজের রোলেকস্ ঘড়িটি বালিশের তলা থেকে তুলে দেবেনকে দিলেন।

বললেন, এটা তুই রাখিস।

এ কি। এ কি ! বলল দেবেন। এটা যে আপনার নিজের ঘড়ি। এত দামী !

তা হোক। তুইও দামী। তুই-ই নে। সময়ের দাম ফুরিয়ে গেছে আমার কাছে। ঘড়িতে আমার আর কী দরকার ?

তাহলেও।

অভিভূত গলায় বলল, দেবেন।

এবার যা ভাগ। আমি পড়বো।

সুধীনবাবু ওকে তাড়ালেন।

দেবেন চলে যেতে যেতে ভাবল, আজ ঘড়িটা কাউকে দেখাবে না। কাল দেখাবে। ঠাকুর, নটবর সকলকে চমকে দেবে ঘড়িটা দেখিয়ে। তারপরই ভাবল, ওরা আবার ভাববে না তো যে চুরি করেছি ? ভাবলে কি ? বাবুর কাছে ডেকে আনব। বাবুর নিজের মুখেই শুনুক ওরা দেবেনের কী পজিশান এ বাড়িতে।

দেবেন চলে যেতেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন সুধীনবাবু। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সারা ঘরময় ঘুরে ঘুরে পাঁউরুটির টুকরোগুলো তুলে খেতে লাগলেন। যেন শিশু হয়ে গেলেন। যেন মিষ্টির চেয়েও ছোট। হামাগুড়ি দিয়ে থাবা মেরে মেরে যমকে মুখে পুরতে লাগলেন। তারপর দাঁতে কাটতে লাগলেন। ছিঁড়ে ছিঁড়ে মৃত্যুকে খেতে লাগলেন তিনি।

বড় জ্বালা করতে লাগল বুক পেট। আঃ মিষ্টি। দাদু আমার। প্রমিস্। তুমি তোমার প্রমিস্ রেখেছো দাদু। অত যন্ত্রণাতেও প্রমিস্ ভাঙোনি। এ আমি কী করলাম ? মিষ্টি সোনা আমার ! কী করলাম আমি ! শেষে...

শিখা, তুমিই ঠিক। বুড়োগুলোর কোনোই দিশা নেই।

রুটির টুকরোগুলো চিবোতে চিবোতে, গিলতে গিলতে মনে মনে বললেন, তোমার কি হবে শিখা ? দীপুরও কি হবে ? মিষ্টিকে ছাড়া তোমরা বাঁচবে কী করে ? মনে মনে বলতে লাগলেন সুধীনবাবু।

তারপর স্লিপিং ট্যাবলেটের শিশি খালি করে মুঠো করলেন, দু গ্লাস জলের সঙ্গে সবগুলো গিলে ফেললেন।

ফেলেই, কোনোক্রমে বিছানায় হামাগুড়ি দিয়ে শিশুরই মতো উঠে শুয়ে পড়লেন

৫

বাইরে ভোর হয়ে আসছিল। নার্সিংহোমের ওয়েটিং রুমে বসেছিল ওরা সকলে। শিখা, ফুচি, প্রদীপ, অন্যরা। দীপু ভিতরে ছিলো ডাক্তারদের সঙ্গে। মেজবৌ ছিলো বাড়িতে, বাচ্চাদের আগলাতে।

ডাক্তার ব্যানার্জী এসে শিখাকে ডাকলেন।

ডাক্তার ব্যানার্জী ভণিতা না করেই বললেন, উই আর সরী। ভেরী ভেরী সরী। ইট ওয়াজ আ কেস অফ পয়জনিং। পুরো চিকিৎসাই তো প্রথমে অন্যরকম হয়েছিল। দেরীও হয়ে গেছিল....তাই.....। পুলিশ কেস হবে।

৬

এখন আর কোনো কষ্টই নেই মিষ্টির। সুধীনবাবুরও কোনো কষ্ট নেই।

সুধীনবাবু গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

সুধীনবাবুর খুব কষ্ট হতে লাগল। কষ্টের মধ্যেই যেন হঠাৎ মনে হলো, ঘরময়, বাড়িময় তার মস্তিষ্কময়ই ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করছে।

উনি যেন দেখলেন, ওঁর ছেলেমেয়ে বৌমারা সকলেই ইঁদুর। পৃথিবীময়ই বড় বড় ধাড়ি ধাড়ি ইঁদুর। তেমনই দৌড়াদৌড়ি করছে। ওঁর বাড়িতে, কোলকাতা শহরের সব বাড়িতেই ; যেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ইঁদুরের বাস। ওরা নিরন্তর কুটি কুটি করে কাটছে। সম্পত্তি কাটছে, সম্পর্ক কাটছে, সুখ শান্তি ভালোবাসা ; মাযা মমতা সততা সব কিছুই কাটছে। খাওয়ার লোভে নয়। শুধু কাটারই লোভে। কাটাই ওদের স্বভাব।

মেজবৌমা বলেছিল, ইঁদুররা কিছু না-কেটে বেঁচে থাকতে পারে না।

ঈর্ষায় কাটছে। পরশ্রীকাতরতায় কাটছে। লোভে, ঘেন্নায কাটছে, একে অন্যকে ইঁদুরগুলো। সর্বক্ষণ কুটুর কুটুর কুটুর........

হঠাৎই তাঁর মনে হলো এতগুলো ইঁদুরের মধ্যে উনি এতদিন ছিলেন কি করে ?

সামনে একটা বিরাট চওড়া মসৃণ রাস্তা। চলে গেছে। আদিগন্ত। কিন্তু সুন্দর গন্ধভরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। কত ফুল, পাখি, প্রজাপতি। তাঁর হাতে স্টীয়ারিং। পাশেই গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে মিষ্টি বসে আছে। একটা সুন্দর হলুদ-সাদা ফুল-ফুল ফ্রক পরেছে ও। জোরে চলেছে গাড়ি। জঙ্গলের মধ্যের পথ দিয়ে। বর্ষার ভোরের বনের থম-ধরা গন্ধে ম' ম' করছে চারধার। সবে ভোর হয়েছে। ফুর ফুর হাওয়া লাগছে গায়ে।

মিষ্টি বলল, ও দাদু। দিদার কাছে কখন পৌঁছবো ?

এই তো। পৌঁছে গেলাম বলে দাদু।

সুধীনবাবু বললেন।

দিদা, তোমাকে দেখে কী বলবে মিষ্টি ?

কী বলবে আবার। আদর করবে।

তুমি দিদাকে কিছু বলবে না ?

না। কিছু বলব না। আব্বা দেবো।

তুমি আব্বা দেবে দিদাকে ? দাদু ?

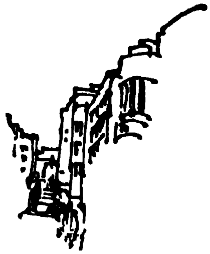
একটু চুপ করে থাকলেন সুধীনবাবু।

মিষ্টির গায়ের পাউডারের গন্ধে নীহারিকার গায়ের গন্ধ পেলেন। তারপর বললেন, দেবো। আমিও দেবো।

দাদু, একটা গল্প বলো না যেতে যেতে। মিষ্টি বলল।

সুধীনবাবু বললেন, জানো দাদু ; একজন বাঁশীওয়ালা ছিলো। তার নাম হ্যাম্‌লীনের বাঁশীওয়ালা। সে না, একদিন সব ইঁদুরদের বাঁশী বাজিয়ে, বাজিয়ে ; বাজিয়ে.......

রক্ত



ওয়ার্ড বয়টি বলল, খেয়ে ফেলুন।

আমার সামনে দু'হাতে দু'গ্লাস গ্লুকোজ-গোলানো জল ধরে দাঁড়িয়েছিল সে। ঢক্‌ঢক্‌ করে গ্লাস দুটি নিঃশেষ করে আবার তার হাতে ফিরিয়ে দিলাম।

যিনি ক্লিনিকের চার্জে ছিলেন, সেই প্যাথলজিস্ট বললেন, ঘড়ি দেখুন। ঠিক দু'ঘণ্টা পরে রক্ত নেওয়া হবে।

দু' ঘণ্টা ?

বিরক্তির গলায় শুধোলাম ওঁকে।

উনি নৈর্ব্যক্তিক গলায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হ্যাঁ ! ঠিক তাই।

দু'টি ঘণ্টা সময় ঐখানে বসে নষ্ট করতে হবে ভেবেই অস্বস্তি লাগতে লাগল।

আজ অনেক দিন হয়ে গেছে সেই দু'ঘন্টা। অনেক ঘন্টা, দিন, মাস, বছর পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু পিছন ফিরে তাকালে মনে হয়, ভাগ্যিস সেদিন দু'ঘন্টা সময় ওখানে বসে ছিলাম, নইলে সাকচুদের সঙ্গে পরিচিত হতাম না কখনও। ওদের সম্বন্ধে কিছু জানতেও পেতাম না।

ওখানে বসে থাকতে থাকতেই একটু পরেই চারজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক একই সঙ্গে সেই এয়ার-কন্ডিশানড্‌ ক্লিনিকের দরজা ঠেলে ঢুকল। কাউন্টারে একজন ক্যাশিয়ার টাকা-পয়সা জমা নিচ্ছিলেন। অন্যজন রক্তের রিপোর্ট টাইপ করছিলেন। তাঁদের দুজনেরই এই লোকগুলোকে দেখে চমকে ওঠার কথা ছিল ; কারণ ঐ পরিবেশে, ঐ সময়ে, ঐ লোকগুলোকে একেবারেই মানাচ্ছিল না।

কিন্তু ওঁরা একবার চোখ তুলেই, সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলেন।

বুঝলাম, ওরা ওঁদের চেনা লোক।

পার্টিশানের ভিতর থেকে একটি ভারী গলা ঐ লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এক একজন করে ভিতরে এসো তোমরা।

সেই গলার স্বর শুনে মনে হল, এই লোকগুলোর কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই। ওরা এক ভিন্ন জগতের প্রাণী যেন। এমনকি গায়ে কোনো নম্বর বা দাগও নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা এক এক করে ভিতরে গেল এবং এক এক করে ফিরে এল কনুইয়ের উল্টোদিকে হাতের শিরায় এক টুকরো করে তুলো গুঁজে।

বুঝলাম, রক্ত দিয়ে এল ওরা।

চারজন একসঙ্গে হতেই আবার যেমন দলবদ্ধ হয়ে এসেছিল তেমনি দলবদ্ধ হয়ে দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল একটিও কথা না বলে।

ওদের মধ্যে একজন লুঙ্গি পরে ছিল। কাঁধের কাছে অনেকখানি ছেঁড়া একটা নীল টুইলের শার্ট ছিল তার উর্ধ্বাঙ্গে। কিন্তু তার চোখ-জোড়ায় চোখ পড়লে চোখ ফেরানো সম্ভব ছিল না। লাল টক্‌টকে বাঘের চোখের মতো চোখ।

তারা অদৃশ্য হলে, আমি ফিস্‌ফিস্ করে ওয়ার্ড বয়কে শুধোলাম, এরা কারা ?

ওয়ার্ড বয় বলল, ডোনার।

মানে ?

মানে, রক্ত দেয়, দিয়ে পয়সা রোজগার করে।

পয়সার জন্যে রক্ত দেয় ?

হ্যাঁ। আজ তো শনিবার, রেসের মাঠে যাবে ওরা আজ।

ঐ লুঙ্গি পরা লোকটার নাম কি ? নিয়মিত রক্ত দিয়েও ঐরকম গুণ্ডার মতো চেহারা রাখে কি করে ও ? চোখের দিকে তাকালে মনে হয় গিলে খাবে।

ওয়ার্ড বয় হাসল।

বলল, ওরা ওরকমই। ও গুরুদেব। ওর নাম সাকচু সিং। ও গুণ্ডা সর্দার।

কত পায় রক্ত দিয়ে ?

যতবার দেয় ততবার ছাব্বিশ টাকা। ওরা আর সাকচু অনেক বেশী। কারণ ওর নেগেটিভ।

নেগেটিভ মানে ?

আমি বললাম।

ওয়ার্ড বয়টি বলল, মানে নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত।

ও। কিন্তু এতেই চলে যায় ?. রোজ তো আর রক্ত দিতে পারে না।

রোজ দেয়ও না। মাঝে মাঝে দেয়, বাদবাকী সময় পকেট মারে, ছিনতাই করে, মদ খায়, লোকের পেটে চাকু চালায়। কী করে না ?

তারপরই বলল, আপনার পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিন একবার। সব ঠিক-ঠাক আছে তো ?

তাড়াতাড়ি বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম। প্রেসক্রিপসান, টাকা সব বুক পকেটেই রেখেছিলাম।

নাঃ, ঠিক-ঠাকই আছে।

বসে থাকতে থাকতে দু'ঘন্টা হয়ে গেল। রক্ত দিলাম আমিও। পরীক্ষার জন্যে। পয়সা নিয়ে নয়। দিয়ে, তারপর বেরিয়ে এলাম।

ঐ লোকগুলোর কথা, সাকচুর কথা তারপর ভুলেই গেছিলাম। কাজে-কর্মে, নিজের নানা ধান্দায়।

আমার ছোটবেলার বন্ধু পরিতোষের স্ত্রী রমার হার্টের সাংঘাতিক অসুখ। রমার মত এমন সুন্দরী মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। যেমন চেহারা, তেমনি নম্র শান্ত মিষ্টি স্বভাব। অথচ

এমন মেয়েকে ভগবান এমন কঠিন অসুখ দিয়ে পাঠালেন কেন ভেবে পেতাম না। তিন বছর হল বিয়ে হয়েছিল। ছেলেমেয়ে হয়নি। হবার সম্ভাবনাও ছিল না হার্টের ঐ অবস্থায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ওরা আড্ডা মারতে খুব ভালোবাসত। প্রতি রবিবার সকালে আমার আড্ডাখানা ছিল ওদের বসার ঘর। প্রথম সকালে বসবার ঘরে কাপের পর কাপ চায়ের সঙ্গে আড্ডা জমত। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার ঘরে। আমরা তিনজন পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে শেষ বিকেলে ঘুমিয়ে পড়তাম। ছাড়াছাড়ি হত সেই সন্ধের মুখে চা খাওয়ার পর।

রমা বলত, আপনার একটা বিয়ে না দিলে আমাদের দাম্পত্য জীবনে প্রাইভেসী বলতে কিছুই থাকবে না দেখতে পাচ্ছি। স্বামীকে যে রবিবারেও একটু একলা পাবো, তারও কি উপায় আছে?

আমি হাসতাম।

বলতাম, আমার বন্ধুর মত কৃতী ছেলেকে বিয়ে করেই আপনার হার্ট অকেজো। আমাকে যে বিয়ে করবে, সে তো হার্টফেল করেই মারা যাবে তিনদিনের মধ্যে।

রমা হাসত উত্তরে। রমার হাসিটা ছিল ভারী বুদ্ধিদীপ্ত ও মিষ্টি।

পরিতোষ বর্তমানে আই-বি ডিপার্টমেন্টের অফিসার। ওর কাজের কোনো সময় অসময় ছিলো না; ছিলো না ছিরিছাঁদও। যখন তখন যার তার বাড়ি হানা দিতে হত। হানা দিয়ে অনেক সময় নিজেদের এবং কিছু সময় যাদের বাড়ি হানা দিত, তাদেরও অহেতুক বিব্রত করত।

রমা এই নিয়ে হাসাহাসি করত। পরিতোষ বলত, আই-পি-এসদের সকলকেই এই আনপ্লেজেন্ট কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় জীবনের কোনো না কোনো সময়ে। উপরতলায় ওঠার সিঁড়ি কি সবসময়েই মোজাইক টাইল্‌সের হয়?

এক বৃহস্পতিবারেই ফোন পেলাম পরিতোষের কাছ থেকে যে, রমার অবস্থা হঠাৎই বিপজ্জনকভাবে খারাপ হয়ে গেছে। নার্সিং হোম-এ রিমুভ করেছে কাল। ক্রিটিক্রাল কণ্ডিশান। শনিবার সকালে ওর অপারেশান হবে। এছাড়া নাকি কোনো উপায়ই ছিলো না। কলকাতার খুব নামজাদা নার্সিং হোমেই ভর্তি করেছে রমাকে। বাঁচা-মরা একেবারে ভগবানের হাতে।

কলকাতাতেও এরকম অপারেশন নাকি বড় একটা হয় না। হচ্ছে, তাই হৈ-হৈ পড়ে গেছে পুরো নার্সিং হোমে এমনকি ডাক্তার মহলেও।

রমাকে দেখতে গেলাম সেদিনই অফিস-ফেরতা। ওকে নার্সিং হোমের দুধ-সাদা বিছানার উঁচু বালিশে হেলান দেওয়া অবস্থায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ও চাঁপাফুল খুব ভালোবাসে। ওর জন্যে চাঁপাফুলের তোড়া নিয়ে গেছিলাম।

রমা ফুলগুলো নিয়ে বলল, রবিদা, এবার আপনাকে বিয়ে করতেই হবে। আপনার জন্যে নয়; বলেই পরিতোষের দিকে চেয়ে বলল, ওর জন্যে। আপনার বৌ যেন আপনাদের দুজনেরই হয়। আমার অনুরোধে পাণ্ডব হবেন আপনারা।

পরিতোষ চাপা ধমক দিল।

ঘর ভর্তি রমা ও পরিতোষের আত্মীয়-স্বজনরা ছিলেন। তাঁরাও বিব্রত হলেন।

আমি বললাম, আমি বাইরে আছি কেমন ? যাওয়ার আগে দেখা করে যাবো।

নার্সিং হোমের করিডরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম প্রত্যেক মানুষেরই হৃদয় থাকে। কিন্তু রমার মত নরম, সহানুভূতিশীল সংবেদনশীল মেয়ের হৃদয় নিয়েই কাটাছেঁড়া কেন ? ভগবান লোকটার সেন্স বলে কোনো পদার্থ নেই।

শনিবার ছিল। অফিস ছুটি নিলাম। সকাল সাতটার মধ্যেই নার্সিং হোমে এসে হাজির হলাম। পরিতোষ স্বাভাবিক কারণে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। আমিও হয়েছিলাম। কিন্তু ওকে বল দেওয়ার জন্যে হইনি যে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলাম।

অপারেশন আরম্ভ হবে সকাল আটটায়। শেষ কখন হবে, ঠিক নেই। এ অপারেশনে নাকি দশ-বারো ঘন্টা লাগে।

নার্সিং হোমে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই পরিতোষ বলল, একটা খুব গোলমাল হয়েছে বুঝলি ?

ওর গলার স্বরে চিন্তা ঝরে পড়ল।

আমি বললাম, কি ?

রমার ব্লাড নেগেটিভ গ্রুপের। যদিও এখানে ওদের যথেষ্ট স্টক আছে, তবুও যদি কম পড়ে ! আমার রক্ত পরীক্ষা করালাম, পজেটিভ। রমার সঙ্গে মিলবে না।

আমি বললাম, আমারটা পরীক্ষা করে নিতে বল্।

পরিতোষ মনে মনে খুশী হলেও একটু সংকোচের সঙ্গে বলল, তুই রমার জন্য রক্ত দিবি ? যদি অনেক রক্ত লাগে ?

পরিতোষ জানে না, রমা পরিতোষের স্ত্রী বলে আমার যেমন আনন্দের শেষ নেই ; দুঃখেরও না। আজ রমার জীবন-সংশয় না হলে আমি কখনও বুঝতে পারতাম না হাসি-ঠাট্টা-আড্ডার মধ্যে দিয়ে কোন মুহূর্তে, কেমন করে রমাকে আমি ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি। আজ সকালে রমার জন্যে কিছুমাত্র করতে পারার সম্ভাবনাও আমাকে মনে মনে দারুণ খুশী করে তুলেছে।

আমি দেখতে ভালো না। সাধারণ চাকরি করি, চাল-চুলো নেই, কিন্তু আমি তো বদলে কিছু চাইনি রমার কাছ থেকে, শুধু ভালোবাসতেই চেয়েছি। ভালোবাসার বোধটা যে এত গভীর, এত গাঢ়, নিজের রক্তের চেয়েও গাঢ় ; এই মুহূর্তের আগে কখনও যেন বুঝতে পারিনি।

আমার রক্ত পরীক্ষা করলো যখন ওরা, তখন আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, আমার গ্রুপ যেন নেগেটিভ হয়। যেন রমার জন্যে, রমার কারণে আমি রক্তশূন্য হয়ে নীল হয়ে যেতে পারি। হঠাৎ এমন ভাবনাতে নিজেই আশ্চর্য হলাম।

আজকের পৃথিবীতে উঁচু ঘোড়ায় চড়ে, খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে শিভালরী দেখাবার কোনো উপায় নেই। পুরুষের পুরাকালীন, সহজে-দৃশ্যমান সমস্ত শিভালরী আজ এমনই ছোট ছোট টুকরো টুকরো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণজন্মা অনুভূতিতে ছড়িয়ে গেছে। যখন সেই অনুভূতির শরিক হই নিজেরা তখনও যেন বুঝতে পারি না যে, এই অনুভূতিকেই ব্লো-আপ করলে আমি এই কেরানী রবি সেনই টগ্‌বগানো ঘোড়াছুটোনো প্রবল প্রতাপান্বিত বর্মাবৃত মহাবল যোদ্ধাতে রূপান্তরিত হয়ে যাবো।

আমার রক্ত পজিটিভ।

রমার কোন উপকারেই আমি আসব না।

পুরাকালটাই ভালো ছিল।

অপারেশন আরম্ভ হলো। রমার হৃদয়, আমাদের সকলের হৃদয়, সার্জেনের হৃদয়, প্রত্যেকের হৃদয় ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। চলতেই লাগল।

রক্ত। রক্ত চাই রক্ত।

বেলা বারোটা বাজল দেখতে দেখতে। অপারেশন শেষ হবে কিনা এবং হলেও কখন শেষ হবে তা এখনও জানার উপায় নেই। সার্জেন টাকা নেননি। নেবেন না। এ অপারেশনটা তার পৌরুষের পরীক্ষা। এও এক রকমের শিভাল্‌রী।

ভিতরে কী হচ্ছে আমরা জানি না। শুধু জানি যে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী আঙিনায়, ওর শোবার ঘরের আর বসার ঘরের মধ্যের চওড়া বারান্দারই মত শান্তিনিকেতনী মোড়া পেতে রমা বসে আছে। ওর নিয়তির নির্দেশের অপেক্ষায়।

ঘড়ি দেখলাম। আড়াইটে। অন্য শনিবারে হলে রমা বলত, এবার চলুন তো মশায়, খেয়ে নেবেন। আপনার জন্যে কি আমার বরের গ্যাসট্রিক্ আলসার হবে?

পরিতোষ মিনিটে মিনিটে সিগারেট খাচ্ছে। এটাও কি এক রকমের শিভাল্‌রী? না শিভাল্‌রী দেখাবার কিছুমাত্র না করতে পারার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার পথ?

ওর আঙুলগুলো হলুদ হয়ে গেছে পুড়ে।

বললাম, কী করছিস কি?

ও বিড়বিড় করে বলল, কিছু তো করতে হয় একটা।

মাঝে মাঝে অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলছে। শাদা এ্যাপ্রন পরা অ্যাসিস্টাণ্ট একটাই শব্দ ছুঁড়ে মারছেন আমাদের দিকে।

রক্ত।

বারেবার।

আমরা দৌড়ে যাচ্ছি।

এক এক বোতল কিনে আনছি।

নার্সিং হোমে আট বোতল নেগেটিভ রক্ত ছিল সবসুদ্ধু।

ওরা বললেন, আরও রক্তের দরকার হলে কিন্তু এখন থেকেই বন্দোবস্ত করুন। পুরো কোলকাতা শহর ঢুঁড়েও চট্ করে নেগেটিভ রক্ত পাওয়া মুশকিল।

পরিতোষ ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা তুলেছে। বুকপকেট ভারী টাকায়, বেদনায়; চিন্তায়। আমার দু হাতের পেশী ও ঘাড়ের পেশী ফুলে উঠেছে। উত্তেজনায়।

রক্ত চাই। নেগেটিভ।

এখন আমি মানুষ খুন করতেও পারি। রমাকে বাঁচানোর জন্যে রক্ত চাই।

পরিতোষ বলল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্কে যাবি? গাড়িটা রেখে যা। কখন কি হঠাৎ দরকার হয়!

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, সাকচু সিং।

পরিতোষ অবাক ও বিরক্ত গলায় বলল, সে কে ?

আমি উত্তর না দিয়ে বললাম, দাঁড়া।

বলেই দৌড়লাম।

পরিতোষ বলল, টাকা নিয়ে যা।

আমি বললাম, টাকা আছে।

আমিও কাল টাকা তুলেছিলাম।

দৌড়তে দৌড়তে মনে মনে বললাম, তুই না-হয় বড়লোক। আমি না-হয় গরীবই। কিন্তু রমা কি আমার কেউই নয় ? তোর বৌ বলেই কি ও তোরই একার ? সমস্তটুকু রমাই কি তোর ? আমার কি ও একটুও নয় ? আমাকেও কিছু করতে দে পরিতোষ। প্লিজ, পরিতোষ। এটা আমার আনন্দ। তোর বা রমার কাছ থেকে যা পেয়েছি, পাই ; তাতেই আমি সুখী। এটা পাওয়ার ব্যাপার নয়। দেওয়ার ব্যাপার। আমাকে ভুল বুঝিস না ভাই। রমার জন্যে কিছুমাত্রও করতে পারলে বড় ভালো লাগবে আমার।

নিজেই বললাম, নিজেই শুনলাম। পরিতোষ জানতেও পেলো না। ভাগ্যিস পেলো না। পেলে, লজ্জিত হতাম।

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, কাঁহা ?

আমি চমকে উঠলাম।

বললাম, সাক্চু সিং।

কেয়া ?

ট্যাক্সিওয়ালা ধমকাল আমাকে।

আমি বললাম, পার্ক স্ট্রিট।

সেদিনও ক্লিনিকে ক্যাশিয়ারবাবু, টাইপিস্টবাবু কাজ করছিলেন। আমি ঝড়ের মত দরজা ঠেলে ঢুকে বললাম, ওদের ঠিকানা জানেন ?

ক্যাশিয়ারবাবু পেন্সিল হাতে শামুকের মত ধীরে ধীরে একটা বিলের টোটাল দেখছিলেন।

আমি ধমকে বললাম, ক্যাল্কুলেটর কেনেন না কেন আপনারা ?

ক্যাশিয়ারবাবু চমকে চোখ তুলে তাকাতেই বললাম, ওদের ঠিকানা ?

কাদের ? উনি বিরক্ত ও রাগী গলায় বললেন।

বললাম, সাক্চু সিংয়ের। ভীষণ দরকার।

আমার বে-এক্তিয়ারের ধমকে উনি চটে গেছিলেন। বোধহয় দিতেন না।

টাইপিস্টবাবু আমার চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলেন।

ঠিকানাটা পেলাম।

বেক্‌বাগান।

ট্যাক্সি, বেক্‌বাগান।

সাক্চু সিং বস্তীর উঠোনের মধ্যে খাটিয়াতে হাঁটুর উপর লুঙ্গি তুলে বসে একটা নেড়ি কুকুরকে কোলে নিয়ে আঠালি বাছছিল।

দড়াম্ করে দরজা পড়তেই বলল, কওন বে ?

আমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, ভাই, এক আওরাতকি জান্ বাঁচানা হ্যায়।

সাকচু সিং অনেকক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকল।

তারপর হাসল। অদ্ভুত হাসি।

বলল, তুম্ গলদ গল্লীমে আয়া ইয়ার। হিঁয়া জান লেনেকা মাম্লা লেকে আয়া করো জান্ বাঁচানেকা নেহী।

আমি বললাম আপকা খুন নেগেটিভ। এক জওয়ান খাবসুরৎ আওরৎকি জান্‌বাঁচানা হ্যায়। বড়া ভারী অপারেশান চল রহ্ হ্যায়।

সাকচু সিং একটা বড় আঠালি কুকুরটার ঘাড় থেকে ক্যাজুয়ালী তুলে খাটিয়ার পায়ায় আরো ক্যাজুয়ালী টিপে মারল।

ঘন, কালো রক্ত বেরোলো আঠালিটার শরীর থেকে। ওর আঙুলেও রক্ত লাগল।

সাকচু সিং আঙুলটা আমার দিকে তুলে বলল, খুন সিরীফ খুনই হোতা হ্যায। উসমে খাবসুরতীকা সওয়াল ক্যা ? সব হি খুন লাল হোতা হ্যায়— মরদ কি, আওরৎ কি ; কুত্তে কি,....... খাটমল্ কি ......

বললাম, চালিয়ে, মেহেরবানী করকে চালিয়ে। ট্যাক্সি খাড়া হ্যায়।

সাকচু সিং আমার অহেতুক আত্মবিশ্বাস ও হয়ত ধৃষ্টতাও দেখে আমার দিকে কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থাকল।

তারপর বলল, সাচমুচ জানকা সওয়াল ?

বললাম, সাচমুচ।

সাকচু মুখ নীচু করে কী ভাবল একটু, তারপর বলল, তব চলিয়ে।

আমি বললাম, কিতনা রূপেয়া ?

সাকচু সিং একরাশ কালো আবীরের মত আমার মুখময় ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ম্যায় আদমী হুঁ। জানোয়ার নেহী।

নার্সিং হোমে সাকচু সিংকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম দিনের মধ্যে কত রক্তই চোখের সামনে নষ্ট হয়। মাছের রক্ত, খাসীর রক্ত, ডাস্টবীনে ফেলে-দেওয়া ন্যাপকিনে লেগে থাকা রক্ত। পৃথিবীতে এত রক্তারক্তি কিন্তু রমাকে বাঁচাবার জন্যে রক্ত পাওয়ার এত অসুবিধে ?

ভাবলাম, রমার মত যারা অসামান্য তাদের বোধ হয আনকমোন নেগেটিভ রক্ত দিয়েই পাঠান ভগবান।

নার্সিং হোমে পৌঁছেই প্যাথলজি ডিপার্টমেণ্টে বললাম, ডোনার এনেছি।

ওঁরা মুখ চুন করে বসেছিলেন। সব রক্ত শেষ হয়ে গেছে। পরিতোষ পাগলের মত ছুটে গেছে রক্তের খোঁজে।

প্যাথলজি ডিপার্টমেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সাকচু সিংকে দেখে ওর সামনেই বললেন, ভেনারেল ডিজীস-টিজীস নেই তো ?

সাকচু সিং বলল, নেহী নেহী মেরা খুন সাচ্চা হ্যায়। ম্যায় সাচ্চা হুঁ।

রক্ত পরীক্ষা হল। নেগেটিভ।

কিন্তু তারপরেই উনি বললেন, এখনও কত বোতল রক্ত লাগবে কে বলতে পারে ? ও একা দেবে কি করে ? মরে যাবে তো ?

সাকচু সিং হাসল। বলল, মেরী মওত্?

তারপর একটু চুপ করে থেকে স্বগতোক্তির মত বলল, মেরী মওত্ ইত্নী আসানীসে নেহী।

তারপরই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, লিজিয়ে খুন। কিত্না চাহিয়ে।

সাকচু সিংয়ের রক্তে দেখতে দেখতে বোতলটা ভরে উঠতে লাগল। ঘন কাল্চে—লাল রক্ত।

গুণ্ডা বদমাসদের রক্তের রং কি আলাদা? ভাবছিলাম আমি।

এমন সময় পরিতোষ দৌড়ে এসে ঢুকল। দু বগলে দু বোতল রক্ত নিয়ে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আর পাওয়া গেল না; যাবে না।

পরক্ষণেই, সাকচু সিংকে দেখে আমার দিকে চেয়ে নাক সিঁটকে বলল, একি, এর রক্ত? রমার শরীরে যাবে?

এমন ভাবে বলল কথাটা, যেন সাকচু সিং রমার শ্লীলতাহানিই করেছে।

সাকচু সিং শুয়ে শুয়ে রক্ত দিতে দিতেই বলল, খুন সব বরাব্বর হোতা হ্যায় সাহাব। গরীবোঁ, আমীরোঁ, বদ্সুরত্, খাবসুরৎ; সব্হিকা বরাব্বর।

পরিতোষ শক্ড্ হলো কথাটা শুনে। বোতল দুটো পৌঁছতে গেল অপারেশন থিয়েটারে।

সেখান থেকে খবর নিয়ে ফিরল আরও রক্ত হলে ভালো হয়।

এক বোতল রক্ত দিয়ে উঠে বসল সাকচু সিং।

বলল, জরুরৎ হোগী তো ফির লিজিয়ে গা। ম্যায় তৈয়ার হুঁ। জান কবুল।

তারপর আমার দিকে ফিরেই ফিস্ফিস্ করে বলল, আপসে ঔর ঈ খাবসুরৎ মারীজ্সে মুহব্বৎ হ্যায়? না? কিঁউ জী? দুসরা কোই রিস্তা?

আমি তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক চেয়ে নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়লাম।

ও বলল, বি-ফিক্কর রহিয়ে, ম্যায় ভাগেগা নেহী। আজতক্ খুন তো কিতনা বরবাদ কিয়া; মগর আজ মেরী খুন্কা বড়ী ইজ্জত মিলা।

এমন সময় পরিতোষের এক বন্ধু ক্লিনিকে ঢুকে সাকচু সিংয়ের দিকে তাকিয়েই পরিতোষকে ইসারায় ডাকল বাইরে।

আমার সন্দেহ হতে আমিও বাইরে এলাম।

পরিতোষের বন্ধুও পুলিশ অফিসার। স্থানীয় থানার লোক।

আমাকে বললেন, একে পেলেন কোথায়? গত তিন মাস গরু খোঁজা খুঁজে বেড়াচ্ছি। একে আমি অ্যারেস্ট করবো।

পরিতোষ বলল, ডোণ্ট বি সিলী। রমার জন্যে আর কত রক্ত লাগবে কে জানে? রমার কারণে যতক্ষণ ওকে দরকার ততক্ষণ ওর রক্ত চুষে নেওয়া যাক্। তারপর বেরোলেই অ্যারেস্ট করিস। রমা বেঁচে উঠলে প্রমোশনের খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে ভুলিস না।

আমি ভিতরে গিয়ে সাকচু সিংয়ের পাশে বসলাম।

বসলাম, কিন্তু কী করব, আমার কী করা উচিত বুঝতে পারছিলাম না।

সাকচুকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

বললাম, কেয়া? থক্ গয়া?

নহি। ঠিকে হ্যায়। বলল ও।

পরিতোষের বন্ধুর মুখটা দরজার কাঁচে একবার ফুটে উঠেই সরে গেল।

আমি জানি, ও বাইরে থাকবে। ওর প্রমোশন আটকে আছে এই কাঁচে।

আমার সেই মুহূর্তে মনে হলো, হঠাৎই মনে হলো ; যেন এই রুক্ষ পুরুষ অশিক্ষিত সাকচু সিংকে আমি নরম মিষ্টি সুশ্রী শিক্ষিতা রমার চেয়েও অনেক বেশী ভালোবাসি। চিরদিনই যেন বেশী ভালোবেসে এসেছি।

ক্লিনিকের দরজা, দেওয়াল, সব যেন মিলিয়ে গেল। আমার মনে হলো আমি যেন সেই পুরাকালেই ফিরে গেছি, যে-যুগে মঙ্গলগ্রহের মাটি খুঁড়তো না মানুষ, হার্ট-ট্রান্সপ্ল্যানটেশান্ করতে জানতো না ; সেই যুগে আমি আর সাকচু সিং দুটো পাশাপাশি সাদা ঘোড়ায় খোলা তলোয়ার হাতে ধুলো উড়িয়ে জোড়ে ছুটে গিয়ে পরিতোষকে তলোয়ারের এক কোপে কেটে ফেলে, রমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে টগবগিয়ে বুক ফুলিয়ে ফিরে আসছি। ফিরে আসছি তো আসছিই।

পরিতোষের বড় শালা দরজা খুলে এসে আমাকে উত্তেজিত হয়ে বললেন, অপারেশন সাকসেসফুল। খুব সম্ভব রমা বেঁচে যাবে এ-যাত্রা।

বলেই, সাকচু সিংয়ের রক্তের বোতলটা উনি নিয়ে গেলেন রমার জন্যে।

আমি জানতাম যে, রমা বেঁচে যাবে। আগে থেকেই জানতাম।

ভাবলাম আমি।

ভেবে, একটা শুঁয়োপোকার মত নিজের উপরই নিজে ঘৃণায় বেঁকে গিয়ে, সাকচু সিংয়ের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম। বড় ভালোবাসার সঙ্গে, গভীর কৃতজ্ঞতার আঙুলে।

সাকচু সিং যখন সিগারেটটা ধরালো, যখন আগুনটা এক এক লাফে নীচে নামতে লাগল, তখন আমার মনে হলো যে সিগারেটটার সঙ্গে আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু শুদ্ধ, পবিত্র, সৎ উপাদান ছিলো তার সব কিছুর সঙ্গে কোনো কটুগন্ধ তামাকেরই মতো অতি দ্রুত পুড়ে যাচ্ছি।

ভাবছিলাম, সাকচু সিং ভুল বলেছিল। একেবারেই ভুল।

রক্তে রক্তে অনেকই তফাৎ।

প্রজন্ম



আজও পিওন এসে চলে গেছে। খোকার চিঠি আসেনি।

সূর্যকান্ত এবং মৃণালিনী দুজনেই খুব চিন্তায় আছেন। গত সপ্তাহের চিঠিতে খোকা লিখেছিল যে, বৌমার একটু জ্বর-ভাব মত হয়েছে।

চিন্তা করা ছাড়া ওঁদের আর কিছুই করার নেই এত দূর থেকে। ভাবলেও খারাপ লাগে।

মৃণালিনীর দিনের এই সময়টাতেই একটু যা অবকাশ। সূর্যকান্ত ঠিক বিকেল তিনটেয় উঠে পড়বেন। মুখ ধোবেন শব্দ করে। ততক্ষণে মৃণালিনী কেটলিটা চাপিয়ে দেবেন হিটারে। তারপর চা করে দেবেন সূর্যকান্তকে। নিজের চায়ের কাপটা নিয়ে বসবার ঘরে এসে বসবেন।

অনেক বছর হয়ে গেল মৃণালিনীর কাছে পৃথিবী, এই জীবন, বড়ই একঘেয়ে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। সূর্যকান্ত কানে আজকাল বেশ কম শোনেন। মাস কয়েক আগেও অন্যরকম ছিলেন। এদিকে কথা বলার লোক বলতে ঐ একজনই ; তাঁর স্বামী। বাড়িতে না আছে কোনো চাকর-বাকর, না কোনো ছেলে-মেয়ে ; নাতি-নাতনি।

মেয়ে সুধার বিয়ে হয়েছে পুরুলিয়ায়, এখান থেকে ওখানে। কিন্তু তবুও কী আসে একটু ' অবশ্য মেয়ের দোষ নেই কোনো। জামাইও ভালো। কিন্তু মেয়ের শাশুড়ী একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ। তাঁর শাশুড়ী তাঁর ওপর অত্যাচার করেছিলেন বলে তিনিও তাঁর নিজের বৌমার উপর সবরকম অত্যাচার চালিয়ে যান। এ-যুগে এমনটি দেখা যায়না। মৃণালিনীর মাতৃভক্ত জামাইও তেমনই। তার মায়ের মুখের ওপর একটিও কথা বলে না।

এ-বাবদে জামাইয়ের ওপর রাগও কেমন হয়, তেমন জামাইকে তারিফও করেন মনে মনে। সব ছেলেরাই যদি এমন মাতৃভক্ত হতো, স্ত্রীর কথামতো না চলত তবে তাঁর নিজের সংসারের চেহারাটাও আজ অন্যরকম হতে পারত হয়ত।

মৃণালিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই নির্জনে একা ঘরে, নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে উঠলেন।

বাইরের কাঁচা রাস্তা দিয়ে নয়াটোলীর গয়লা সাইকেল চড়ে ঘণ্টি বাজিয়ে কাছারীর দিকে চলে গেল। ওর সাইকেলে অনেকগুলো দুধের ভাঁড় থাকায় অদ্ভুত একটি ধাতব শব্দ ওঠে। ও যখনই যায়। এই গয়লাটিই ইদানিং মৃণালিনীর ঘড়ির কাজ করে।

বসবার ঘরে বড় ঘড়িটা আজ দু'বছর হলো খারাপ হয়ে পড়ে আছে। তাঁর নিজের রিস্ট-ওয়াচটারও স্প্রিং কেটে গেছে বহুদিন। খোকাকে কখনও সারিয়ে দিতে বলেননি, কিন্তু খোকা

ও বৌমা জানে যে ঘড়িগুলো খারাপ। বাড়িতে যে একমাত্র ঘড়িটি সচল, সেটি সূর্যকান্তর রিস্ট-ওয়াচ্। কিন্তু সেটা তাঁর বালিশের নিচেই থাকে সবসময়। সকালে যখন সূর্যকান্ত বাড়ির হাতায় হেঁটে বেড়ান, তখনই মাঝে মাঝে হাতে পরেন শুধু আজকাল। রিটায়ার্ড-জীবনে ঘড়িটা একটা বেমানান গয়না হয়ে গেছে। রিটায়ার করার পর থেকে এই কয়েক বছরে মানুষটাও একেবারেই অন্যরকম হয়ে গেলেন। যৌবনের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দাপটে এবং হাসিখুশী মানুষটার সঙ্গে এই স্তব্ধ, দাবীহীন সূর্যকান্তর কোনোই মিল নেই।

আগে রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, সমস্তই ব্যবহৃত হতো ; বাড়িতেই কত জাঁকজমকে থাকতেন। ঠাকুর-চাকর সবই ছিল। এখন আর সে দিন নেই। সাতশ টাকা মতো পেনশান পান সূর্যকান্ত। খোকা প্রতি মাসে একশ টাকা করে পাঠায়। আজকাল টাকার কি কোনো দাম আছে ? ঐ টাকার মধ্যে ওষুধ-বিষুধ, ইলেকট্রিক বিল, খাওয়া, ডাক্তারের খরচ, অতিথি-আপ্যায়ন সব কিছুই। ওষুধেই চলে যায় অনেক টাকা।

খোকার যে অনেকই খরচ ! বেচারা ! তার বেশী পাঠাতে পারে না। ওর ছেলেমেয়েরা ভালো স্কুলে পড়ে। অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে একটা। তার পেছনেও খরচ কম নয়। বৌমার ফুলের শখ খুব। তাই মালী রেখেছে একজন। ক্লাবের বিল আছে। অতিথি আপ্যায়ন আছে। বৌমার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। আসানসোলে, তাদের দিকেও দেখতে হয় খোকাকে নিশ্চয়ই। টাটানগরে তাঁর খোকা আজ একজন হোমরা-চোমরা লোক। ভাবতে গর্ববোধ করেন মৃণালিনী। বিরাট বাংলো, চাকর-বাকর ; গাড়ি।

মাঝে-মাঝে মৃণালিনীকে টাটায় নিয়ে যায় খোকা, গাড়ি করে। যখন বৌমা অসুস্থ হয়, অথবা বাচ্চারা কেউ অসুখে পড়ে। হঠাৎ করে ভালো ট্রেইনড আয়া পাওয়া যায় না। যখনই দরকার হয়, মৃণালিনীই যান। নাতি-নাতনীকে কাছে পেয়ে খুশীই হন। তখন অবশ্য সূর্যকান্তর বড়ই কষ্ট হয়। চৌধুরী বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করতে হয়।

নাতনীটি আড়াই বছরের। ভারী মিষ্টি। বড়ই দিদা-ভক্ত।

চায়ের জলটা বোধহয় হয়ে গেল। মৃণালিনী কেটলি নামাতে গেলেন।

সূর্যকান্ত উঠে পড়েছেন। বালিশের নীচ থেকে হাতঘড়িটা বের করে দেখলেন। দেখেই, রেখে দিলেন। আজকাল বড় ঘন ঘন ঘড়ি দেখেন সূর্যকান্ত। এই শব্দময় পৃথিবী তাঁর কাছে শব্দহীন হয়ে গেছে। কানে কিছুই শোনেন না। আজকে কানে শোনেন না বলেই বড় স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, হাওয়ারও শব্দ ছিল ; ছিল রোদের, ভোরের শব্দ ছিল, রাতের, প্রদোষেরও শব্দ। দশদিক ঘিরে শব্দমঞ্জরী। কানে যাঁরা শুনতে পান, তাঁদের কাছে শব্দের দাম থাকে না কোনোই। কত সুন্দর সব শব্দশিঞ্জনে শিহরিত ছিল তাঁর তখনকার জীবন। আজ পাখির ডাক, গাড়ির হর্ন, মৃণালিনীর কথা কিছুই আর শুনতে পান না তিনি। তবে বেয়াল্লিশ বছরের পার্টনারশিপ ! ঠোঁট নাড়ালেই বুঝতে পারেন সূর্যকান্ত, মৃণালিনী কী বলতে চাইছেন। সূর্যকান্তর চেয়ে মৃণালিনী বয়সে বছর বারো তেরোর ছোট। আগেকার দিনে তো এদেশের প্রায় সব দম্পতিরই বয়সের তফাৎ ঐরকমই হতো। তাঁদের দাম্পত্য জীবনে সুখের অভাব কখনও ঘটেনি। কিন্তু ইদানীং মৃণালিনী যেন একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। মনে হয়, সূর্যকান্তর চেয়েও বয়স তাঁর বেশী। হাত-পা ফুলে গেছে। হাই ব্লাড-প্রেসার। ব্লাড-সুগার। প্রায় অথর্বই। অক্ষম, অর্থহীন সূর্যকান্ত আজকাল মৃণালিনীর মুখে সোজাসুজি চাইতে পর্যন্ত

পারেন না। বড়ই অপরাধবোধ জাগে।

একটি ঠিকে লোক রাখেন, আজ এমন সামর্থ্যও নেই সূর্যকান্তর। আজকের অপারগতার গ্লানিটা তাঁরই। তাঁরই একার।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, চাকরি যোগাড় করে দেওয়া, বিয়ে দেওয়া, তাদের যার যার সংসার গোছানোতেই তাঁর জীবনের যা-কিছু সঞ্চয় ছিল সবই গেছে। কোনো ইনস্যুরেন্স পলিসি ছিল না সূর্যকান্তর। মৃণালিনীকে গর্বভরে বলতেন, আমার খোকাই আমার ইনস্যুরেন্স। বুড়ো বয়সে খোকা কি আমাদের ফেলে দেবে ? দেখোনা, মাথায় করে রাখবে ওর বাবা-মাকে। ও তো আমারই ছেলে !

মৃণালিনী চায়ের দুটি কাপ ট্রেতে বসিয়ে রাবারের বাথরুম-স্লিপার পায়ে, বিবর্ণ বিষণ্ণতার প্রতীক খয়েরী শালটি গায়ে দিয়ে বাই-ফোকাল চশমা নাকে লাগিয়ে আস্তে আস্তে সূর্যকান্তর দিকে চটি ঘষে-ঘষে এগিয়ে আসেন। যেন এক গ্রহের প্রাণী চলেছেন অন্য গ্রহে।

আজকাল কানে শোনেন না বলে মৃণালিনীর পদশব্দ শুনতে পান না সূর্যকান্ত। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকেন তাঁর বেয়াল্লিশ বছরের সুখ-দুঃখের ভাগীদারের দিকে। নৈঃশব্দ্যর শব্দময়তা মাথার মধ্যে ঝম্‌ঝম্ করে।

মৃণালিনী কি আজকাল নিঃশব্দে চলাফেরা করেন ? সূর্যকান্ত ভাবেন। মৃত্যুর পায়ের শব্দ কি শোনা যায় না ? মৃত্যু, তবু শান্তির ; বড় শান্তির।

সেদিন মুখুজ্যে মশাই গেলেন। গত মাসে সোমেশ্বর গেল। বার্ধক্য, জরা ; এই সবই বড় কষ্টের। যাদের টাকা নেই, যাদের অবলম্বন নেই, যারা শুধুমাত্র কোনোক্রমে বেঁচে থাকার জন্যই নিজেদের বড় সাধের, বড় আদরের, বড় আশার পুত্রকন্যার দয়ার উপর নির্ভর করেন তাঁদের মত গ্লানির জীবন যেন শত্রুরও না হয়।

সূর্যকান্ত নিরুচ্চারে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, হ্যাঁ। যেন শত্রুরও না হয়।

মৃণালিনী সূর্যকান্তকে চা দিয়ে, নিজেও সামনে বসলেন। পায়ে উলের ছেঁড়া মোজা। সমস্ত শীতকালটা প্রায় সারাদিনই মৃণালিনী মোজা পরে থাকেন আজকাল। এদিকটায় ঠান্ডা খুব বেশি। পাহাড়টা কাছে। নদীটাও। আগে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বালাতেন ; যখন সূর্যকান্তর চাকরি ছিল, প্রতিপত্তি ছিল।

শুনতে পান, আজকাল অনেকরকম রুম-হিটার বেরিয়েছে। এই বয়সে বড়ই শীত করে। সারা পৃথিবীর পাহাড় নদীর সমস্ত শীত এসে বুড়ো-বুড়িদের শরীরে জমে। সাইবেরিয়ান হাঁসের মত ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা উড়ে আসে। এসে, ওদের জলভেজা ফ্যাকাশে হলুদ চ্যাপ্টা পায়ের পাতা দিয়ে সূর্যকান্তকে, মৃণালিনীকে জাপ্টে ধরে। হিসহিসিয়ে শীতের শিস ওঠে।

রাতে হট্-ওয়াটার ব্যাগে গরম জল করে দেন তিনি সূর্যকান্তকে। একটাই আছে। তাঁর জন্য জোটে না। সূর্যকান্ত তাঁর ব্যাগটাই মাঝে মাঝে এগিয়ে দেন মৃণালিনীকে। মৃণালিনীর খাটের দিকে। দুজনে দু বিছানাতে শোন বহুদিন হল। মাঝের টেবিলে নাতি-নাতনীর ছবি থাকে। কৃতি ছেলে এবং বৌ-এর।

সারা দিনে-রাতে সূর্যকান্ত এবং মৃণালিনীর মধ্যে তিন-চারটির বেশী কথা হয় না আজকাল। কথার কিছু নেইও আর।

সূর্যকান্ত হয়ত জিজ্ঞাসা করেন, আজ কি পূর্ণিমা ? পায়ের আঙুলে, হাঁটুতে এতো ব্যথা

হল কেন ?

মৃণালিনী বলেন, এই তো অমাবস্যা গেল।

সূর্যকান্ত ভুল শোনেন। বলেন, ও বৃহস্পতি বার ?

মৃণালিনী নিষ্ঠুরের মত চুপ করে থাকেন। কাঁহাতক কালা লোকের সঙ্গে বকবক্ করা যায় ?

সূর্যকান্ত আজকাল মেনেই নিয়েছেন এই অবস্থা। প্রতিবাদ করেন না, অনুযোগও নয়, চুপ করে থাকেন। ওঁর মুখটা দেখে শিশুর মুখ বলে মনে হয়। যাঁরা একদিন কানে শুনতেন কিন্তু এখন শোনেন না তাঁদের মুখমন্ডলে কেমন যেন এক অসহায় ভাব ফোটে। অতীতের সমস্ত হাসি, সানাই, গান, ভোরের পাখির ডাক, রাতের শিশির পড়ার শব্দ ; সমস্ত শব্দময়তা নিঃশব্দে স্থানান্তরিত হয়ে সূর্যকান্তর মুখের অভিব্যক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। উঁচু-নীচু হয়ে। ব্রেইলি-সিস্টেমের লিপিরই মত কান দুটোও এখন অবোধ জাবরকাটা গরুর চোখের মত কিছু হতে চায়। সূর্যকান্তর মুখে তাকালে বড়ই দুঃখ হয় মৃণালিনীর। নিজের জন্যেও দুঃখ হয়। কিন্তু সূর্যকান্তকে এইরকম অসহায় অবস্থায় ফেলে তিনি যে আগে চলে যাবেন একথা ভাবতেও বড় ভয় করে। মনে মনে ঠাকুরকে ডাকেন। বলেন, ঠাকুর। আগে যেন ওঁকে রওয়ানা করিয়ে দিতে পারি।

বাইরে দেখতে দেখতে শীতের বেলা পড়ে আসে। আম আর আকাশমণি গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে এককালীন বাগানের সর্বত্র গজিয়ে-ওঠা মরা, লালচে ঘাসগুলোর উপর পড়ে। চারিদিকে, মৃণালিনীর মনের মধ্যে ; বিষণ্ণতা গড়িয়ে যায়।

ফুল গাছগুলো যত্নের অভাবে মরে গেছে বহুদিন। মৃণালিনীর এক সময়ে পালিত সীয়ামীজ বিড়ালনীটির মত। কবে ? তা আজ আর সঠিক মনে পড়ে না। আজকাল সন্ধে লাগতে না-লাগতেই বাড়ির হাতার মধ্যেই শেয়াল ঘোরাঘুরি করে। আমগাছের ঝাঁকড়া ডালে বসে হুতোম প্যাঁচা দুরগুম্ দুরগুম্ করে বুক কাঁপিয়ে ডাকে। অন্ধকার হয়ে গেলেই থম্থম্ করে নির্জনতা চারিদিকে। ছম্ছম্ করে শীত। সন্ধের পর কোলাপ্সিবল গেট টেনে দিয়ে মৃণালিনী ইজিচেয়ারে আধোশুয়ে পড়েন, এবং ভাবেন। পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে কোথায় না কোথায় চলে যান।

আর সূর্যকান্ত, এককালীন জাঁকজমক-ভরা এখন শতচ্ছিন্ন কার্পেটমোড়া বসবার ঘরে নিজের আর্থিক সঙ্গতি, নিজের সুখের দিনের স্মারক যৌবনের দামী ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার, আর ফুলহাতা সোয়েটার পরে টেবিলের উপর তাসগুলো দুহাতে মেলে ধরেন, বাঁটেন ; দান দেন ছুঁড়ে, ছুঁড়ে। বারে বারে, রোজ সন্ধেবেলাই বৃদ্ধ ও অপমানকরভাবে পরাজিত সূর্যকান্ত অনুপস্থিত প্রতিপক্ষকে ওয়াক্-ওভারে হারান।

তাসগুলো আবার হাতে তুলে নেন, বাঁটেন ; দান দেন।

বাইরে শেয়াল হুক্কাহুয়া করে হেসে ওঠে। হুতোম পেঁচা আবার ডাকে।

মৃণালিনীর মনে পড়ে যায়, বহু বছর আগে একবার একটা লক্ষ্মী-পেঁচা এসে বসেছিল এই বাড়িতেই। পূর্ণিমার রাতে। রান্নাঘরের পাশের ছোট ল্যাংড়া আমগাছটার ডালে বসেছিল অনেকক্ষণই। সেবারই সূর্যকান্তর উন্নতি হয়। শেষ উন্নতি। সেই সময়কার খোকা আর সুধার ছেলেমানুষ কচি মুখ ও উজ্জ্বল চোখের কথা মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে যায় মৃণালিনীর।

অনেক ধরাধরি করার পর সে বছরই খোকার জামসেদপুরের চাকরীটা যোগাড় করেন সূর্যকান্ত। মনে পড়ে, সে বছরই সেকেন্ড-হ্যান্ড অ্যামবাসাডার গাড়িটাও কেনেন। কিন্তু খোকার বিয়ের পরেই খোকার তখনকার কোয়ার্টার সুন্দর করে সাজাবার জন্য অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল। বৌমার বাপের বাড়ি থেকে শাঁখা-সিঁদুর দিয়েই পাঠিয়েছিলেন তাকে। সুন্দরী দেখেই পছন্দ করেছিলেন। কুটুম বাড়ি থেকে টাকা নেওয়ার মতো-ছোটলোক কখনওই ছিলেন না সূর্যকান্ত। সেই সময়ই ওঁর গাড়িটাকে বিক্রী করে দেন সূর্যকান্ত। মৃণালিনী নিষেধ করেছিলেন। তাও মনে পড়ে। সূর্যকান্ত বলেছিলেন, আহা ছেলেমানুষ ! এই তো আনন্দ, মজা করার সময়। আমাদের বিয়ের পরের দিনগুলোর কথা ভুলে গেলে ? আমাদের জন্যে তো করার কেউ ছিলো না। ওরাই তো আমাদের সব। ওদের সুখই তো আমাদের সুখ।

একটা টর্চের আলো পড়ল যেন বাইরে। কেউ কি এল ?

মৃণালিনী উদ্বিগ্ন হলেন। আশে-পাশের বাড়ি থেকে কেউ এলে ভালোই লাগে ওঁদের, যাঁরা ওঁদের ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন ; যাঁদের সকলের অবস্থাও প্রায় ওঁদেরই মত। এক চৌধুরীরা ছাড়া। ওঁদের ছেলে বৌ প্রতিমাসেই কোলকাতা থেকে ওঁদের দেখতে আসে। কত কী নিয়ে আসে ওদের জন্যে। খাবার-দাবার, জামা-কাপড়। প্রতুল ওঁদের ছেলে। এঞ্জিনিয়র। কখনও কখনও গাড়ি নিয়েও আসে। তখন মৃণালিনী ও সূর্যকান্তকেও নিয়ে ওরা এখানে-ওখানে যায়। নিজের কারখানা আছে হাওড়া না কোথায় যেন। ছেলের বৌটিও বড় ভালো হয়েছে। যেমন দেখতে, তেমনই স্বভাব। কে বলবে নিজের মেয়ে নয় ? চৌধুরী গিন্নীকে এমন করে মা বলে ডাকে যে, মৃণালিনীর বুকটাও যেন জুড়িয়ে যায়।

চৌধুরীরা এলেই নিজেদের ছেলে-বৌয়ের কথা মনে পড়ে যায় ওঁদের। বড়ই খারাপ লাগে।

কিন্তু একদিন চৌধুরী-গিন্নী খোকার সম্বন্ধে কী একটা কথা বলতে গেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মৃণালিনী বলেছিলেন যে, আমার খোকাকেও বকাবকি করেই থামাতে হয়। আমাদের জন্যে যে কী করবে, কিসে আমাদের সুখ, এই ভেবেই মরে ওরা সব সময়। যেমন খোকা, তেমন হয়েছে বৌমা। এমনটি আর হয় না। মৃণালিনী চৌধুরীদের বুঝিয়ে বলেন, আমরা বলি, ওরে, আমরা বুড়ো হয়েছি, তোমাদের সুখই এখন আমাদের সুখ, আমাদের নিজেদের সুখ বলে এখন আর কিছু আলাদা করা-যায় নাকি ? উনিও খুবই রাগারাগি করেন। বলেন, একেবারে অপচয় করবে না। সামনে তোমাদের সমস্ত জীবন পড়ে আছে। আমাদের আর ক'দিন। তবু কথা শোনে কই ছেলে-বৌ ?

চৌধুরীরা বোঝেন সব। মুখে কিছুই বলেন না। এক মা-বাবার কষ্ট অন্য মা-বাবা বোঝেন।

ক'দিন আগে পাটনা থেকে খোকার এক ছোটবেলার বন্ধু এসে থেকে গেল দুদিন ওঁদের সঙ্গে। মিলু ছেলেটা বড়ই ভালো। ডাক্তার। পাটনাতে খুব ভালো প্র্যাকটিস মিলুর। বিয়ে-থা করেনি। একেবারে একইরকম আছে। মৃণালিনী কী আদর করবেন ওকে ? মিলুই যে কত আদর-যত্ন করে গেল এ-দুদিনে তাঁদের দুজনকে, তা বলার নয়। মৃণালিনীর জন্যে শাড়ি, সূর্যকান্তর জন্যে ট্রাউজারের কাপড়, বাটার জুতো, সব কিনে দিল। ইলেকট্রিক টোস্টারটা খারাপ হয়ে পড়েছিল দেখে একটা টোস্টার কিনে আনল। আরও কত কী। কত বছর পরে যে রসমালাই খেলেন মিলুর দৌলতে ওঁরা দুজন আর বড় বড় কই মাছ। ধনেপাতা কাঁচা

লঙ্কা দিয়ে তেল-কই, তা মৃণালিনীই জানেন। সূর্যকান্তর গলায় তো কাঁটাই ফুটে গেল।

ছোটবেলায় খোকা আর মিলু একরকমই ছিল। বড় হয়ে দুরকম হয়ে গেছে। এখানেরই একটি মেয়েকে খুব ভালোবাসত। রানীকে। রানী এখন দুই ছেলের মা। এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কোলকাতায় আছে। মেয়েটা ভুলে গেছে, কিন্তু মিলু ভোলেনি ওকে। মৃণালিনীর মনে হয়, পুরোনো স্মৃতির জন্যেই বার বার এখানে ফিরে ফিরে আসে মিলু। বাসারীয়ার চড়ুই-ভাতির জায়গাতে গিয়ে দুপুরে ঘুরে বেড়ায়। একা একা। রানীদের বাড়ী, এক রাজস্থানী ব্যবসায়ী কিনে নিয়েছেন। তবু এখনও সকাল-বিকেল সে বাড়ির সামনের পথ দিয়ে পায়চারি করে মিলু। ছেলেটা গভীর। জীবনে অনেক দুঃখ পাবে।

ভাবেন মৃণালিনী।

মিলুর কাছে মৃণালিনী ও সূর্যকান্ত তাঁদের সমস্ত অভাব অসুবিধে অতি সাবধানে গোপন করে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, এখানে চাকর মোটে পাই না, বুঝেছ বেটা। এ কোনো বাহানা নয়। নইলে, খোকা তিনটে চাকর রেখে দিত আমাদের জন্যে। কাজের লোকগুলোও সব হতভাগা। যদি বা আসে তো দুদিন থেকেই পালায়।

লোক না বাখতে পারার অক্ষমতাকে নানা অজুহাতেই ঢেকে রেখেছিলেন। মিলুর কাছ থেকে ওঁরা। অন্য সব অক্ষমতাকেও।

মৃণালিনী বলতেন বটে, কিন্তু মিলুর মুখ দেখে মনে হতো, মিলু যেন ওঁর কথা সব বিশ্বাস করছে না। ছেলেটা সব শুনতো, আর কেমন অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে থাকত মৃণালিনীর দিকে।

যাই হোক। যে ক'দিন ছিল, বড় হৈ চৈ হয়েছিল। কত পুরনো দিনের গল্প, খোকা আর সুধার ছোটবেলার কথা ; এইই সব। কত মজার কথা। গরমের ছুটিতে আম খাওযা। ওদের সখের থিয়েটার। বাইরে, চাঁদোয়ার নীচে, গালিচা বিছিয়ে ; হ্যাজাক জ্বালিয়ে। তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না। কিন্তু অনেক আলো ছিল মনের মধ্যে।

বাড়ির হাতায় ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে একটানা। টর্চের আলোটা কি সত্যিই ? বাইরে যেন কার পাযেব শব্দও পেলেন মৃণালিনী। এবারে জোরালো টর্চের আলো।

অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলেই ভয় করে বড়। কী খাওয়াবেন ? কী দিয়ে আতিথেযতা করবেন ? ভেবেই আতঙ্কিত হন।

একদিন এমন ছিল, যখন অতিথি এলে ওঁরা সত্যিই খুশী হতেন। আজ ভীত হন।

টর্চের আলোটা আরও জোর হলো। কে যেন কোলাপসিবল গেট ধরে ঝাঁকালো।

সূর্যকান্ত নির্বিকার। কল্পিত প্রতিপক্ষকে জব্বর দান দিয়েছিলেন একটা এইমাত্র। তারপর উল্টোদিকের শূন্য চেয়ারের দিকে মনোযোগ সহকারে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। যেন সোমেশ্বর বসে আছেন উল্টোদিকের চেয়ারে। সোমেশ্বর তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, তাস খেলার বন্ধু। সোমেশ্বর চলে গেছেন গত মাসে। সেরিব্র্যাল অ্যাটাকে। চার ঘন্টার মধ্যে।

পালিয়েছে শালা।

মনে মনে সূর্যকান্ত বললেন।

এই ঠান্ডা, নির্জন, অপমানকর, অবসরপ্রাপ্ত অভাবী জীবনের গ্লানি থেকে পালিয়ে বেঁচেছে শালা।

মাইজী!

কে যেন ডাকল।

মৃণালিনী বললেন, কে?

সূর্যকান্ত শুনতে পেলেন না কিছু। ফিরতি দান দিলেন।

বাইরে চমনলাল কোম্পানীর ড্রাইভার জাগ্‌গু সিং দাঁড়িয়েছিল। সে হাত বাড়িয়ে একটা খাম দিল মৃণালিনীকে।

বলল, সাহাব হামারা হাঁথসে ভেজিন্। প্যাসেঞ্জার লেকে আভ্‌ভিহি ম্যায় টাটাসে আয়া।

এই ট্যাকসি-ড্রাইভারের হাতে মাসে মাসে চিঠি পাঠায় খোকা।

মৃণালিনী ভদ্রতা করে বললেন, বসবে না জাগ্‌গু? বড়ই শীত পড়েছে। চা খাও একটু?

মৃণালিনী জানেন, যতটুকু দুধ আছে তাতে কাল সকালে ওঁদের চায়ের মতই হয়ত হবে না। কিন্তু তাহলে কী হয়? উনি হলেন গিয়ে টাটানগরের সান্যাল সাহেবের মা! উনি কী গরীব হতে পারেন? হলেও তা দেখাতে কি পারেন কারো কাছে?

জাগ্‌গু সিং ভাগ্যে সবিনয়ে বলল, নেহী মাতাজী। আভ্‌ভি, চায়ে পী কর্, আঁয়ে।

জাগ্‌গু সিং-এর হাতে চিঠি পেয়ে দুজনেই বড় আশ্বস্ত হলেন।

খোকার চিঠি এলেই সূর্যকান্ত তা জোরে জোরে পড়েন। মৃণালিনী তাঁর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ারের হাতলে হাত রেখে শোনেন। প্রত্যেকবার। প্রত্যেকটি শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে।

চিঠি দেখেই সূর্যকান্তর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাস রেখে বললেন, চিঠি এসেছে? দাও দাও; আমাকে দাও। কী লিখেছে আবার বেটা দেখি?

মৃণালিনী, সূর্যকান্তর পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, চিঠিটা পড়ো, বৌমার জ্বরটর বাড়লো না তো? হঠাৎ রাত করে চিঠি পাঠাল! পড়ো পড়ো, তাড়াতাড়ি পড়ো।

সূর্যকান্ত চিঠিটা খুলেই, জোরে জোরে পড়তে লাগলেন।

নীল্‌ডি
জামশেদপুর
২০/১২/৮৩

বাবা,

এখুনি জামশেদপুর ফিরলাম কোলকাতা থেকে। পরশু কোলকাতা গেছিলাম, কারণ জয়তীর দিদি-জামাইবাবুর বিয়ের অ্যানিভার্সারি ছিল। এসেই আপনার চিঠি পেলাম ও পাটনা থেকে মিলুর চিঠি।

মিলু যেভাবে আমাকে লিখেছে তাতে এ সম্বন্ধে আমার কোনোই সন্দেহ নেই যে, নিজেদের অভাব-অসুবিধার কথা ওর কাছে বলেছেন। হয় মা, নয় আপনি। অথবা দুজনেই। আমি যে আপনাদের কত খারাপ ছেলে, আমি যে আপনাদের প্রতি কোনো কর্তব্যই করি না, এসব প্রচার করেছেন। নইলে ওর এত বড় সাহস হতো না আমাকে এই সব কথা লেখার। মানে, যা ও লিখেছে।

যাই হোক। মিলুর এই চিঠি পড়ে জয়তী তো রাগে প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছে। ও চিরদিনই আমাকে বলেছে, আপনাদের জন্যে কিছুই না করতে। আপনাদের কোনো রকম

দায়িত্বই আমাদের নয়। আজকালকার কোনো ছেলে এ দায়িত্ব নেয় না। নেওয়াও সম্ভব নয়।

আপনাদের জন্যে আমি যা করেছি, জোর করেই করেছি। জয়তীর মতের ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এখন দেখছি, ভুলই করেছি।

আমার এখানে নানা রকম অসুবিধা। "মৌকে" এই মাস থেকে পিয়ানো শেখাবো ঠিক করেছি।

আপনারা আপনাদের ছেলেমেয়েকে যেভাবে মানুষ করেছিলেন আমরা সেই রকম জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চার মত ছেলেমেয়ে মানুষ করার কথা ভাবতেও পারি না।

এই মাস থেকে আপনাদের আমার পক্ষে পঞ্চাশ টাকার বেশী পাঠানো সম্ভব হবে না। আমার কিছুই করণীয় নেই। গত দশ বছরে আমি আপনাদের জন্যে যা করেছি তাতে আপনারা আমাকে "মানুষ" করতে যা খরচ করেছিলেন তা শোধ হয়ে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার এই মানসিক অবস্থাতে আর কিছুই লেখা সম্ভব নয়। ইতি—ক্ষমাপ্রার্থী

—আপনার খোকা

সূর্যকান্ত প্রথম দিকে খুব জোরে জোরে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। কানে কালা হবার পর ওঁর গলার স্বর অনেকই জোর হয়ে গেছে। কিন্তু চিঠিটা যতই পড়তে লাগলেন, ততই তাঁর গলার স্বর নেমে আসতে লাগল।

চিঠিটা পড়া শেষ করেই চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন সূর্যকান্ত।

বেশ কিছুক্ষণ পর মৃণালিনীর দিকে চাইলেন একবার। দেখলেন মৃণালিনীর দু' চোখ বেয়ে জল ঝরছে ঝরঝর করে।

বহুদিন, বহু যুগ পরে, সূর্যকান্ত মৃণালিনীকে হাত ধরে কাছে টানলেন। তারপর নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। অস্ফুটে কী সব বললেন।

বোঝা গেল না।

অনেকক্ষণ পর সূর্যকান্ত বললেন, মিনু, আমি চাই যে, তুমি মরো। তুমি মরে বেঁচে যাও। আমি তোমাকে টানাটাঁড়ের শ্মশানে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে তারপরই যাব। তুমিই আগে যাও।

মৃণালিনী অস্ফুটে বললেন, এমন করে বোলো না।

আমি চলে গেলে, পেনসানের টাকাটাও যে বন্ধ হয়ে যাবে।

গলা বুঁজে এল সূর্যকান্তর।

মৃণালিনী মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু মাথাটা ডান দিকে বাঁ দিকে নাড়াতে লাগলেন।

বাইরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল জোরে।

এটা লক্ষ্মী পেঁচা নয়। হুতোম্ পেঁচা।

লক্ষ্মী পেঁচারা আর এখানে আসবে না।

১ কোনদিনও।

পাখিরা জানে না



বুঝলাম তো ইংরিজিতে বলে Salt-lick। বাংলাতে কি বলে?

রুনা কোমরে হাত দিয়ে অর্জুন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সুজনকে শুধোলো।

সুজন বলল, বলছি। বলে, একটা সিগারেট ধরালো। তারপর গাছের নিচের একটা পাথরে বসে বলল, বাংলায় বলে নোনা-মাটি। বনের জানোয়ারদের আফিঙের মত নেশা লাগে। রোজ একবার করে এই পাহাড়ি মাটিতে নুন চাটতে না এলে হরিণ শম্বরদের ঘুম হয় না।

আমি তো হরিণও নই, শম্বরও নই। আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?

বলব, বলব। সব বলব। সুজন বলল।

রুনা ওর চশমা-পরা কাটা কাটা বুদ্ধিদীপ্ত মুখটি তুলে সুজনের চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার বলল, অ্যাই, বল না কেন এনেছো?

সুজন হাত ঘুরিয়ে চারিদিকে দেখাল, বলল, কেন? জায়গাটা তোমার ভালো লাগছে না? একপাশে পাহাড়। গাছ-গাছালি। কত পাখি ডাকছে। প্রজাপতি উড়ছে। কাঁচপোকা গুন গুন করছে। শীতের দুপুরের লজ্জাবতী রোদ তোমার গায়ে এসে পড়ছে। বাতাসে জীরহুল আর ফুলদাওয়াই-এর গন্ধ ভেসে আসছে, তোমার ভালো লাগছে না তবুও?

রুনা বলল, আমি কি বলেছি ভালো লাগছে না?

তাহলে শোনো, বলছি। এই হল আমার কনফেশানাল। আর তোমাকেই আজ আমার সাক্ষী করব। আমি ক্রীশ্চান নই। আমি কোনো গীর্জায় যাইনি কখনো। আমি শুধু এই নির্জন নদী, পাহাড়, বনকে চিনি। আর তোমাকে চিনি। কোনো অচেনা স্যাঁতসেঁতে গীর্জার উঁচু-সিলিংওয়ালা ঠান্ডা ঘরে কোনো গম্ভীর পাদ্রীর সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে ভয়ে আমার দোষ স্বীকার করার চেয়ে আদিগন্ত আকাশের নিচে এই সবুজ আস্তরণের আড়ালে নোনা-মাটির পাশে তোমার কাছে হাঁটু-মুড়ে বসে তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার অপরাধ স্বীকার করা অনেক সহজ বলেই তোমাকে আজ ডেকে এনেছি এখানে।

রুনা প্রথমে কেমন অস্বস্তিভরা চোখে চারদিকে চাইল। তারপর বলল, কী যে পাগলামি কর জানি না। দাদা বউদি ঘুম থেকে উঠলে হয়ত খোঁজাখুঁজি করবেন! সমস্ত বাংলো তোলপাড় করবেন।

করবে না, করবে না। তুমি কি এখনো ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী আছো নাকি? তাছাড়া.

নববিবাহিত তারা নিজেরা এখন এমনই সুব্যস্ত আছে যে তোমার খোঁজ করবার সময়ই নেই তাদের।

ভারী খারাপ তো তুমি। ফিরে চল না। বলে দেব।

তা দিও। আমি ভয় করি না। সত্যি কথা বলতে কী, আমি এখন আর কিছুকেই, কাউকেই ভয় করি না।

তুমি তো বীরপুরুষই।

বীরপুরুষ নই। বরঞ্চ দায়িত্বজ্ঞানহীন বলতে পারো। এখন কী রকম যেন হয়ে গেছি।

ওরকম ছটফট করছ কেন? চুপ করে একটুক্ষণও কি বসে থাকতে পার না? রুনা ধমকে বলল।

সুজন পাঞ্জাবি পাজামা গুটিয়ে শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল পাথরটার উপর। বলল, এই বসলাম।

তারপর অনেকক্ষণ ওরা দুজন চুপচাপ নোনামাটির দিকে চেয়ে রইল।

মন্থর হাওয়াটা লাল মাটিতে আর পাথরে শুকনো শালপাতাগুলোকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে মচমচানি তুলে বনে বনে আলতো পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক ঝাঁক টিয়া কাছের একটা গাছে এমন করে ছেয়ে বসেছে যেন তারাই পাতা। ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করে নিজেদের মনে কত কী বলছে।

রুনা বলল, শীতের বিকেলের রোদটা দারুণ লাগে, না?

দারুণ। ঠিক তোমার মত। রোদে বসে ঘরে গেলে যেমন শীত অনেক বেশি লাগে তুমি কিছুক্ষণ কাছে কাছে থেকে তারপর চলে গেলে আমার মনের ঘরের বরাবরের শীতটা অসহ্য হয়। দু'একদিনের জন্যে কেন যে তুমি আমার কাছে আস তা তুমিই জানো।

রুনা কথাটা চাপা দিয়ে বলে উঠল, এবার দেখছি তোমারও কপালের পাশে দু-একটা রুপোলি রেখা ঝিলিক মারছে। জানো, আমিও যখন সমস্ত দিন ক্লাস নেওয়ার পর বাড়ি এসে চশমা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়াই তখন চোখের নিচের গভীর কালো রেখাগুলি আমাকে কেবলই মনে পড়িয়ে দেয় বেলা পড়ে আসছে, বেলা পড়ে আসছে; বেলা পড়ে আসছে। জানো, এ কথা ভাবতে ভালো লাগে না। আমার দু' একজন ছাত্রীর পর পর বিয়ে হয়ে গেল। বুঝলে মশাই? কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমার ছাত্রীদেরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কি তুমি এখনো ছেলেমানুষই ভাববে?

তোমাকে ছেলেমানুষ কোনোদিনও ভাবিনি।

তবে কি ছোটবেলা থেকেই আমি বুড়ি ছিলাম?

রুনা দুষ্টুমি-মাখা চোখে, হেসে বলল।

সুজন হাসল, বলল জানি না। হয়ত তাইই ছিলে। একটু যেন গম্ভীর হয়ে থেকে বলল, তোমার যখন তোমার ছাত্রীদের মত বয়স ছিল ইচ্ছে করলে তুমি তো তখনই স্বয়ংবরা হতে পারতে। রুনা রায়ের তো অ্যাড্‌মায়ারারের অভাব ছিলো না।

হয়ত পারতাম। কিন্তু সকলের বোধ হয় সব কিছু হয় না। আমি হয়ত সবাই যে সময়ে যা চায় তা চাইনি। ঠিক করেছি কি ভুল করেছি জানি না। সত্যি। এখন মাঝে মাঝে ভাবি তোমাকেই বা এমন কষ্ট দিলাম কেন এতদিন এবং নিজেই বা অন্য একজনের জন্যে এত

বছর এত কষ্ট পেলাম কেন? জানো সুজন, আমার মনে হয় সব কিছুরই শেষ আছে। দেখিই না শেষে কি আছে?

এই অবধি বলেই বুনা থেমে গেল। বলল, কই? তুমি যা বলবে বলে এতদূর হাঁটিয়ে আনলে তা'তো এখনো বললে না?

সুজন একটু চমকে উঠল মনে হল। বলল, বুনা, আমি সত্যিই এমন কিছু বলব তোমাকে, যা শুনলে তুমি হয়ত আমাকে খুবই ঘেন্না করবে। তুমি হয়ত ভাববে এতদিন তুমি একজন নোংরা লোকের ভালোবাসা পেয়েছ।

বুনা অধৈর্য গলায় বলল, আঃ বলোই না। কী যে গৌরচন্দ্রিকা করছ তখন থেকে।

সুজন একবার কাশল। বলল, বলছি। আমি একবার বলা আরম্ভ করলে তুমি কিন্তু আমাকে থামিয়ে দেবে না। থামিয়ে দিলে, আমি সত্যি সত্যিই একেবারে থেমে যাব......আমি আর কিছুতেই শুরু করতে পারব না।

কালকে, মানে কাল রাতের কথা বলছি বুনা। তুমি মনোযোগ দিযে শোনো আমি যা বলছি।

আগে না, আমার ঘুমও খুব গাঢ় ছিল। কিন্তু গত কয়েক মাস আমি ভালো ঘুমোতে পারি না। সারাদিন কাজে-কর্মে থাকি। বিকেলের পর থেকে এত ক্লান্তি লাগে যে মনে হয় রাতে বিছানায় শোব আর ঘুমাব। কিন্তু যেই বিছানায় শুই তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার হাসি, তোমার কথা বলা, তোমার সব কিছু আমার মধ্যে ভীড় করে আসে। রোজ ; রোজ রাতে। আমি চোখ বুজে থাকি। পাছে চোখ খুলে অন্ধকারকে দেখতে হয়, সেই ভয়ে। বারে বারে পাশ ফিরে শুই। ঘুমুবার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না।

কখনো বা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। বাংলোর হাতার ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের ডালে অন্ধকারে কোনো নাম-না-জানা নিরাবয়ব পাখি নড়ে চড়ে বসে। গেটের কাছে, মহুয়া-মিলনের রাস্তায় জোনাকির ঝাঁক নিঃশব্দে ওড়ে। জানালা দিয়ে তারা-ভরা আকাশ দেখা যায়। দূরের নদীর পাশে হিমেল হাওয়ায় হায়না ডেকে বেড়ায় হাঃ হাঃ করে। বুকের মধ্যেটা কেমন কেমন করে।

বুনা উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা বলতে গেল।

সুজন বাধা দিয়ে বলল, আমাকে শেষ করতে দাও। তুমি ইন্টারাপ্ট কোরো না।

বুনা আবার পাথরটায় বসে পড়ল। বসে, দুটি হাত কোলের উপর রেখে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

সুজন বলতে লাগল, এ সব তো গেল রোজকার কথা। এতে কোনো নতুনত্ব নেই। কালকের কথা বলি।

তুমি শুয়ে পড়লে। বিধুদা-বউদি শুয়ে পড়ল। তারপর অনেক সময় কেটে গেল। ঘুমোতে পারলাম না। আমি জানতাম, তুমি আমার ঘরের দিকের দরজা ভেজিয়ে শুয়েছো। বন্ধ করোনি। নতুন জায়গায়, জঙ্গলে তোমার ভয় করে। তুমি আমাকে বলেওছিলে।

মশারির ভিতর ভূতের মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে নিজেকে আমি কতক্ষণ কত বকলাম। কত বোঝালাম। বললাম, ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ো। সুজন চ্যাটার্জি ঘুমিয়ে পড়ো। তবু ঘুম এলো না। নিজেকে অন্ধকারে বার বার অনেক কিছু শুধোলাম। কোনো স্পষ্ট উত্তর

পেলাম না।

তারপর, কী যেন হয়ে গেল রুনা। আমার শিক্ষার দম্ভ, রুচির গর্ব, সব যে আমার কোথায় ভেসে গেল। আস্তে আস্তে চোরের মত তোমার ঘরে ঢুকলাম। তারপর.....। সে যেন কত যুগ। মনে হল, কত যুগ যুগান্তর পা-টিপে-টিপে হেঁটে তোমার ঘরের দৈর্ঘ্যটুকু পেরোলাম। মশারির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাইরের বারান্দায় হ্যাজাকটা তখন ফ্যাকাশে-হলুদ মুখে জ্বলছিল। হঠাৎ হ্যাজাকটার দিকে চোখ পড়তে আমার মনে হল, ও যেন আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। আমি এমন চৌর্যবৃত্তি করতে পারি ওর যেন তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। সুজন যে এমন দুর্জন হবে তা ও ভাবতেও পারছিল না যেন।

রুনা, তুমি আমার মুখের দিকে তাকিও না। প্লিজ, আমার মুখের দিকে তাকিও না। আমি তাহলে গুছিয়ে বলতে পারব না।

তারপর শোনো, আমি তোমার মশারিটা আস্তে আস্তে তুললাম সাবধানে। মনে হল, তুমি খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছ। তুমি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিলে। তোমার বেণীটা বালিশের উপর দিয়ে বিছানার একপাশে মাথার দিকে ছড়ানো ছিল। তোমার হারের লকেটটা একদিকে ঝুলে ছিল। তোমার বুক নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কম্বলের নীচে কাঁপছিল। হ্যাজাকের আলো, জানালা দিয়ে তোমার মুখে এসে পড়েছিল। আমি অনেকক্ষণ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তোমার ঠোঁটের ঢেউ, তোমার চশমা-খোলা ক্লান্ত চোখ, তোমার টিকোলো নাক, তোমার শান্ত-কপাল ; সব, সব আমি অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। যেন তোমায় কখনো আগে দেখিনি। তুমি নড়লে না, চড়লে না, তুমি ঘন-ঘুমে অঘোরে শুয়ে রইলে। তারপর রুনা, সেই শীতের রাতে তোমাকে এক উষ্ণতার পাখি বলে মনে হল আমার। তোমার সুন্দর তুমিকে দেখে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। আমার ভীষণ জল পিপাসা পেল।

জানো রুনা, আমার মনে হল, হঠাৎই আমার মনে হল, চাঁদের পিঠ থেকে দেখা ছোট্ট গোল সুন্দর ঘূর্ণায়মান পৃথিবীটাকে যেন আমি মুঠি ভরে ধরে ফেলেছি। পৃথিবীতে আমার যা-যা চাইবার ছিল আমি সব ভুলে গেছি। সেই ক্ষণটুকুর প্রাপ্তিতে শুধু বুঁদ হয়ে আমি তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

জানো, সেই মুহূর্ত অবধি খুব ভালো লেগেছিল। দারুণ ভালো লেগেছিল।

এমন সময় হঠাৎ, একেবারে হঠাৎই আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমার আবাল্য বিবেক তার ফোলা-ফোলা গাল নিয়ে যাত্রাদলের বিবেকের মত ঢিলেঢালা পোশাক পরে মুখে সুবুদ্ধির রঙ মেখে হাত নেড়ে নেড়ে আমাকে ম্যরালিটির গান শোনাতে লাগল।

তারপর তোমার বুকে মুখ রেখে অনেকক্ষণ আমি কাঁদলাম। বার বার প্রার্থনা করলাম। তুমি ঘুম ভেঙে উঠে আমাকে ওখানেই আবিষ্কার করো। আমাকে মারো। আমাকে অপমান করো। তোমার দাদা-বউদিকে ঘুম থেকে তুলে সব বলে দাও। আমাকে লাতেহারের কোতোয়ালির পুলিশে ধরিয়ে দাও। তোমার যা খুশি তুমি আমাকে তাই শাস্তি দাও।

কিন্তু তোমার এমনই ঘুম যে তুমি ঘুমিয়েই রইলে। তুমি যদি তখনও ঘুম ভেঙে উঠতে, আমাকে হাতে-নাতে ধরে অন্ধকারের লজ্জাহীনতায় শাস্তি দিতে ; যদি দাঁতে দাঁত চেপে

আমাকে বলতে 'জানোয়ার' ! বলতে 'অসভ্য, জংলী, দুশ্চরিত্র' ; তবুও বোধ হয় আমার এত লজ্জা, এত অপমান হতো না বুনা।

এখন এক-আকাশ আলোর নিচে বসে, দিনের বেলায়, তোমার সামনে তোমার দিকে মুখ করে আমাকে দুঃস্বপ্নের মত গত রাতের কথা বলতে হচ্ছে। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো না বুনা। তুমি আমাকে মারো। তুমি আমার গায়ে থুথু দাও। কাল রাতের পর থেকে আমি এক ভীষণই অস্বস্তিতে আছি। তোমার কাছে ভীষণ ছোট, বরাবরের মত ছোট হয়ে গেছি।

বুনা পাথরে বসে, মাটির দিকে চেয়ে পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছিল। শালবনের পাতায় পাতায় ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ফালি-ফালি রোদ পিছলে এসে বুনার মুখে পড়ছিল। বুনা একটা ক্ষয়েরী জংলা কাজের বাটিকের শাড়ি পরেছিল। গায়ে সাদা শাল।

বুনা কোনো কথা বলল না। মুখ নিচু করে পায়ের নখ দিয়ে চটিতে দাগই কেটে চলল।

সুজন কিছুক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ যেন অধৈর্যে ফেটে পড়ল। দু হাত দুদিকে ছুঁড়ে বলল, কী ? তুমি ভেবেছ কি ? চুপ করে থেকে আমাকে ক্ষমা দেখিয়ে তুমি মহৎ হবে ? প্রতিমুহূর্ত তুমি আমাকে অনেক শাস্তি দাও বুনা। সে সব শাস্তির কথা তুমি জানো না। তোমার কাছ থেকে কোনো রকম দয়া চাই না আমি। প্লিজ, বুনা। তুমি আমাকে দিয়ে তোমার সামনে আর নাটক করিয়ো না। দোহাই তোমার, আমাকে কঠিন কিছু বলো। কঠিন কিছু।

বলতে বলতে, সুজন দু হাতে মুখ ঢেকে বুনার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে লাগল। কয়েক পা গিয়ে, বুনার দিকে পিছন ফিরে একটা বুড়ো শাল গাছের গুঁড়ির পাশে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

বুনা এতক্ষণে মুখ তুলল। মুখ তুলে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে পেছন-ফেরা সুজনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

বেশ কিছুক্ষণ পর বুনা ডাকল ওকে। অ্যাই শোনো। আমার কাছে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সুজন এলো না। তবুও, তেমনিভাবে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল।

বুনা পাথর ছেড়ে উঠে ওর কাছে গিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর দু হাত দিয়ে সুজনের মুখ-ঢাকা দু হাত নামিয়ে দিয়ে ও হঠাৎ বলে উঠল ; আমি তখন জেগেছিলাম সুজন।

তারপর সুজনের হাত ধরে টেনে পাথরগুলোর কাছে নিয়ে যেতে যেতে খুব আস্তে আস্তে বলল, আমিও মহৎ নই সুজন। আমার তোমাকে ক্ষমা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কাল তুমি যেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলে অমনি আমি চোখ বন্ধ করে মড়ার মত শুয়ে রইলাম। তার আগে আমি জানালা দিয়ে বারান্দায় ঝুলোনো হ্যাজাকটার দিকে চেয়ে ছিলাম। ওটার চারপাশে নানারকম বড় বড় পোকা উড়ছিল। তাই দেখছিলাম। আমার ভয় করছিল। আমি ঘুমোতে পারছিলাম না।

তুমি দরজা ঠেলে এলে। আমার কাছে এলে। আমার মুখের কাছে মুখ নিলে। আমি চোখবুজে শুয়ে থেকে তোমার মুখে সিগারেটের গন্ধ পেলাম। তারপর, তুমি যখন তুমি যা বললে ; তাই করলে......। সুজন, ক্ষমা করার কোনো কথা ওঠে না এতে। হয়ত তুমিই

ক্ষমা করবে আমাকে। ক্ষমা করা উচিত। কাল তুমি যখন আমার কাছে আমার বুকের কাছে, আমার বুকে মুখ রেখে আমাকে জড়িয়ে রইলে ; আমি জানি তুমি তখন কাঁদছিলে। যে—তুমি পায়ে দাঁড়ানোর দিনগুলোতে কোনোদিন না-খেয়ে থেকেও কাঁদোনি। একবারও কাঁদোনি। সেই তুমিই যখন কাঁদছিলে, তোমার গাল বেয়ে তোমার চোখের জল আমার গলায় গড়িয়ে পড়েছিলো। তুমি জানো না, আমার সমস্ত শরীর, আমার সমস্ত মন শুধু আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একমাত্র অমোঘ পরিণতির দিকে। তোমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে, তোমার সঙ্গে কাঁদতে। তোমাকে পরিপূর্ণভাবে পেতে। মেয়েদের শরীর বুঝি শরীর নয় !

কেন যে পারলাম না, জানি না। হয়ত আমি জেগে গেলে তুমি লজ্জা পাবে এই ভয় আমার মনে ছিল। অথবা জানি না, আমি হয়ত ভয় পেয়েছিলাম আমার মধ্যের শরীরী মানুষটাকে ; যার তিরিশ বছরের জীবনে এমন উত্তেজিত আগে সে আর কখনো হয়নি। হয়ত ভয় পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ; শরীরের ছাইচাপা আগুনে ফুঁ দিলে হয়ত আমার নিজের ইচ্ছায় তা আর নিভবে না।

এই অবধি বলেই রুনা থেমে গেল।

একটুপর বলল, তুমি কেন আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশী করলে না সুজন ? পরে যা হত তা হত। আমি কি বুঝি না যে, তুমি আমাকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছ ? অথচ তুমি জান, ভালো করেই জান যে, আমিও অন্য একজনকে চেয়ে চেয়ে তোমার মতই ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমরা দুজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত। আমাদের পথ এক ; কিন্তু গন্তব্য অন্য। তুমি যদি তোমার যা খুশি তাই করতে, আমরা না হয় এই দীর্ঘ শীতল পথের মাঝামাঝি এসে উষ্ণ আশ্রয়ে কিছুক্ষণ দুজনকে বুকে জড়িয়ে জিরিয়ে নিতাম। এই ক্লান্তি আমারও অসহ্য লাগে। তোমার মতো যা মনে হয় তা গুছিয়ে চিঠিতে লিখতে পারি না আমি। কিন্তু আমার মনেও তো কথা জমে। আমার ক্লান্তিও তো ক্লান্তি। আমার যন্ত্রণাও তো যন্ত্রণা। তুমি কেন আমাকে বোঝো না সুজন ? তুমি কেন কোনদিন আমাকে একটুও বুঝলে না ?

কেউ কোনো কথা বলল না তারপর। ওরা দুজনে দুদিকে মুখ করে বসে রইল। দুপুরের হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়তে লাগল।

রুনার মনে হল, ওরা দুজনে দাঁড় বেয়ে একটি নদীতে অনেকদূর চলে এসেছিল। মাঝ নদীতে এসে দুজনের হাত থেকেই কোনো দৈবদুর্বিপাকে দাঁড় দুটি জলে পড়ে গেছে। ওরা দুজনে দাঁড়-বিহীন নৌকোয় বসে চারদিকের ঢেউয়ের দিকে চেয়ে আছে। নৌকোটা ঘুরছে। টলমল করছে। ঠিক ভয় নয় ; কী এক অনামা শীতল অনুভূতিতে রুনার-মন ভরে আছে।

অনেকক্ষণ পর রুনা বলল, আমরা দুজনেই ক্ষমা করে দিই। বুঝলে সুজন, তুমি আমাকে ; আর আমি, তোমাকে। দুজনে দুজনকে যা দিতে চেয়েছিলাম তা দিতে পারিনি বলে ক্ষমা করে দিই।

সুজন যেন ঘুম ভেঙে উঠে বলল, কাল হয়ত আমরা দুজনেই ভুল করেছিলাম ? আজ সে ভুল শোধরানো যায় না রুনা ?

রুনা যেন ভয় পেল। ভয়-পাওয়া গলায় বলল, ন্-ন্না, তা হয় না গো। হয় না। এমনভাবে দুজনের কাছে দুজনে ধরা পড়ার পরে আজ রাতের প্রাঞ্জল অন্ধকারে সে আর হয় না। কাল হলে অন্য কিছু হত। সিন্ডারেলার স্বপ্নের মতো, ঠাকুমার ঝুলির গল্পের মতো।

আমি রাজকন্যা হয়ে পদ্মফুলের পালঙ্কে ঘুমোতাম তুমি ভিন্‌দেশী রাজকুমার হয়ে আমাকে চুরি করতে আসতে। আফটার অল সে ব্যাপারটা খুব রোম্যান্টিক হত। ভেবে দ্যাখো সুজন, জীবনে তুমি, আমি, আমরা সকলেই যা কিছু অনুক্ষণ করি বা করাই তার সবটাই তো স্থূল, আটার্‌লী গ্রস্‌। তাই জীবনের দু-একটি প্রধান প্রধান ঘটনাও যদি রোম্যান্টিক না হয় ; তার চেয়ে সুজন, সে দুর্ঘটনা না ঘটাই ভালো।

রুনা থেমে গেল। হাঁপাতে লাগল। মনে হল, ও যেন এক্ষুনি ওকে, নিজেকে ; খুব কঠিন কিছু বুঝিয়ে উঠল। আজকাল রুনা বোঝে যে, ছাত্রীদের কিছু বোঝানো অনেকই সহজ। নিজেকে কিছু বোঝানোর চেয়ে।

রুনা বুকের কাছে দু হাঁটু জড়ো করে হাঁটুর উপর চিবুক রেখে নোনামাটির দিকে চেয়ে রইল।

সুজন অনেকগুলো কাঠি নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত একটা সিগারেট ধরালো।

রোদ পড়ে এসেছে। নোনামাটির উপরে শালগাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়েছে। একটি ঠান্ডা সোঁদাভাব মাটি থেকে আস্তে-আস্তে উঠতে আরম্ভ করেছে। ওরা দুজনেই নোনামাটির উপরে শালগাছে প্রলম্বিত ছায়ার দিকে চেয়ে অপসৃয়মান উষ্ণতার কথা ভাবছিল।

এমন বিকেলে সকলের মনেই একটা শীতার্ত একাকীত্ব এসে বাসা বাঁধে। যে একাকীত্ব প্রত্যেকেরই একান্ত নিজস্ব। যে একাকীত্ব সম্বন্ধে বাইরের কারো কিছুই করণীয় থাকে না।

এক ঝাঁক ময়ূর নিঃশব্দে পায়ে হেঁটে নোনামাটির পাশ অবধি এল। তারপর হঠাৎ ওদের দেখতে পেয়ে বড় বড় ডানা ও লেজ ঝাপটাতে ঝাপটাতে কেঁয়া কেঁয়া রব তুলে পশ্চিমের দিকের জঙ্গলে উড়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর সুজন বলল, চল, উঠি এবারে। বেলা পড়লেই জানোয়ারেরা আসতে শুরু করবে এখানে নোনামাটিতে। এখানে আর না থাকাই ভালো।

রুনা নিস্পৃহ গলায় বলল, চল।

ওরা দুজনে জঙ্গলের বিকেলের লাল মাটির পথে হাঁটতে লাগল। পাশাপাশি।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর, সুজন রুনার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে যেন নিঃশব্দে কোনো প্রশ্ন করল।

রুনা নিঃশব্দ উত্তরে সুজনের হাতে ওর হাত দিয়ে চাপ দিল।

ওরা কথা না বলে হাঁটতে লাগল।

সুজনের হাতের আঙুলগুলির সঙ্গে ওর আঙুলগুলি ছুঁয়েই রাখল রুনা।

হঠাৎ সুজন বলে উঠল, আচ্ছা, ওকে তুমি ভালো করে শিক্ষা দিতে পারো না? শিক্ষা দেওয়া যাকে বলে।

রুনা চমকে উঠে বলল, কাকে?

কাকে আবার? যে তোমাকে এতদিন ধরে এমনভাবে কষ্ট দিচ্ছে তাকে।

ও এক ঝলক রোদের মত হেসে উঠল, বলল, বেচারীর কি দোষ! সব দোষ তো আমার। প্রথম দিন থেকেই তো আমাকে মানা করে এসেছে—বরাবর মানা করেছে। বলেছে, আমাকে কত বুঝিয়েছে, যে বিবাহিত লোককে ভালোবাসলে কপালে অনেক দুঃখ। ও তো সব সময়ই বলে অন্যকে দুঃখ না দিয়ে নিজে কখনো সুখী হওয়া যায় না। ও যখন সে রকমভাবে

সুখী হতে চায় না, তো ওকে দোষ দিয়ে কি লাভ বল ?

তাছাড়া, শিক্ষা দেবার কথাই যদি বল, তো তুমি আমাকে শিক্ষা দাও না কেন ? আমি জানি, আমিও তো তোমাকে কম কষ্ট দিইনি। অবশ্য কোনো কষ্টই আমি ইচ্ছা করে দিইনি। কিন্তু তুমি পেয়েছ। আমার জন্যেই পেয়েছ ; পাচ্ছ। আমাকে শিক্ষা দাও না কেন ? আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারো না কেন ? একবার রাগ করে লিখলে দশবার ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখো কেন ? এই কেনর জবাব দাও তুমি।

জবাব নেই। আমি তোমাকে দুঃখ দেবার কথা ভাবতে পারি না।

আমিও হয়ত তোমাকে দুঃখ দেবার কথা ভাবতে পারি না। তারপর বলল, এ সব কথা এখন থাক। আমার কপালের পাশের শিরাগুলো দপ্‌দপ্ করছে। বড় কষ্ট পাচ্ছি সাইনাসাইটিসে।

—ডাক্তার দেখাও, অনেক কষ্ট তো এমনিতেই পাচ্ছ। আবার অসুখবিসুখের কষ্ট কেন ? নিস্পৃহ গলায় বলল সুজন।

রুনা সে কথা গায়ে না মেখে বলল, জানো, তোমার জন্যে একটি ফুলস্লিভস পুলোভার বুনছি। তোমাকে দারুণ মানাবে।

বুনো না।

কেন ?

আমার অনেক সোয়েটার পুলোভার আছে। যা চাই, মুঠি উপুড় করে তাই যখন কোনোদিন দিতে পারলে না ; তখন এসব থাকই না।

—তুমি ওরকম কোরো না। সত্যি বলছি, আমার খারাপ লাগে। তুমি ভালো করেই জানো যে, আমার খারাপ লাগে।

তাহলেও পুলোভার চাই না আমার। তার চেয়ে কোনো বই বা রেকর্ড কিনে রেখো। পরের বার কোলকাতা গেলে নিয়ে আসবো। কিছুদিন আগে "ল্যারাজ থীম" পাঠিয়েছিলে। মনে আছে ? কি যেন নাম রেকর্ডটার ?

'সামহোয়্যার মাই লাভ'। রুনা বলল।

ঐ রেকর্ডটা শুনলে বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করে। তোমার কথা মনে হয়। তুমিই যেন লারা।

রুনা হেসে উঠল, বলল, আমি লারা হলেই তুমি যদি ডক্টর জিভাগোর মত কেউ হতে পার তাহলে আমি লারা হতে রাজী।

সুজন অন্যদিকে চেয়ে বলল, সুযোগ দিলে কোথায় ? আমি কী হতে পারতাম আর কী হতে পারতাম না, তা নিয়ে তুমি কখনও ভেবেছ ? তোমার ভাবার সময় কই ? অথচ, আমি।

থাক্ এসব অনেকবার বলেছি।

রুনা সুজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার সুন্দর সুজন, তুমি জানো না, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। যখনি উল কাঁটা নিয়ে বসি তখনি তোমার কথা ভাবি। তোমাকে চোখের সামনে দেখতে পাই। দেখি তুমি আমার সোয়েটার গায়ে দিয়ে জীপ চালিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কাজ দেখে বেড়াচ্ছ। আদিবাসী কাঠুরেদের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছ।

আকাশে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছুঁড়ছ। সব-সব। এসব কি একেবারে কিছুই নয়? এ সবের দাম নেই?

জানি না। আমি জানি না। সুজন বলল।

তোমার হয়ত মনে নেই, গতবার তুমি যখন কোলকাতায় গেছিলে, আমার ঘরে, আমার সাধের সর্ষেরঙা বেড-কভারটার উপরে কফি ঢেলে ফেলেছিলে, মনে আছে? তোমাকে কত করে বললাম, ঘরের কোণের ইজিচেয়ারটায় বসো তুমি শুনলে না। ভীষণ হাসতে হাসতে তুমি কাপসুদ্ধ কফি ঢেলে ফেললে। চাদরটায় দাগ হয়ে গেল। কী হাসি হাসছিলে। বাবাঃ। আচ্ছা, তোমার মনে আছে কী নিয়ে অত হাসছিলে?

না। আমার মনে নেই। এত ছোট ছোট টুকরো টুকরো কথা আমার মনে থাকে না।

আমার থাকে। আমরা 'মাই ফেয়ার লেডি' দেখতে গেছিলাম। তুমি সিনেমা থেকে ফিরে রেক্স হ্যারিসনকে নকল করে আমায় ফোনেটিকস শেখাচ্ছিলে; ব্যস হাসতে হাসতে.....।

এত অবান্তর কথা মনে করে রাখার কি দরকার?

গম্ভীর গলায় সুজন বলল।

তোমার আজ কি হয়েছে সুজন?

কিছু তো হয়নি।

রুনা বলল, তোমার কাছে যা অবান্তর আমার কাছে তা হয়ত নয়। তাছাড়া সব কথা মনে থাকে না। তোমার কথাই মনে থাকে শুধু। এবং আরেকজনের কথা। তুমি জানো না সুজন, সেই বেড-কভারটার কফির দাগ ধোপাবাড়ি দিয়েও ওঠেনি বলে আমি ভীষণ খুশী। যেদিনই ঐ চাদরটা পাতি, সেদিনই তোমার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়। সেদিন তোমার জন্মদিন ছিল। আমার কিনে দেওয়া একটি র'-সিল্কের হাওয়াইন শার্ট পরে আধশোয়া ভঙ্গীতে তুমি খাটে বসেছিলে। পাশের ফ্ল্যাটের হাসিদির রেডিওতে কণিকা ব্যানার্জীর গান হচ্ছিল। সব যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, শুনতে পাই। তোমার কথা মনে পড়ে। তোমার জন্যে মনটা ভীষণ খারাপ লাগে যখনি বেডকভারটা পাতি। সত্যি গো।

রুনা আবার বলতে লাগল, জানো সুজন, এই যে তোমার কথা ভাবি সব সময় আমার মনে হয় তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ, হাত নেড়ে কথা বলছ; তুমি সিগারেট খাচ্ছ, এই যে সাতদিন তোমার চিঠি না এলে ডাক-পিওনের উপর রেগে যাই, যখনি একটু অবকাশ পাই, অফ-পিরিয়ডে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে, কলের ঝরঝরানি শুনতে শুনতে চান করতে করতে তখনি তোমার কথা এই যে ভাবি—আমার মনে হয় এর নামই ভালোবাসা। আমার ভালোবাসা এই রকমই। তোমাকে যা সবসময় দিই, দিতে পারি; তা 'কিছুই নয়' 'তা কিছুই নয়' বলে দুহাতে তুমি ঠেলে সরিয়ে দাও। আর যা তোমাকে দিতে পারি না তার জন্য সব সময়, তুমি আমাকে অপমান করো।

অপমান করার কথা বললে অন্যায় করবে রুনা। আমি তোমাকে কোনোদিন অপমান করিনি। করতে চাইনি। একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলার স্বামী এবং দশ বছরের একটি ছেলের বাবাকে তুমি ভালোবেসে, সেই ইনকনসিডারেট লোকটিকে ভালোবেসে; তোমার জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টুকু নষ্ট করলে। এবং তার সঙ্গে আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিলে।

বল তুমি ? এ কথা সত্যি কিনা ? তুমি তো প্রতিমুহূর্তে আমার সমস্ত অস্তিত্বকেই অপমান করো ; করছ। আমিও যে একটা মানুষ এ কথাই তুমি কোনোদিন ভেবে দেখোনি। এটা অপমান করা নয় ? এর চেয়ে বেশী অপমানের কথা তো আমি ভাবতে পারি না। সত্যিই তুমি আমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করেছ।

কেউই কারুর জীবন নষ্ট করতে পারে বলে আমার মনে হয় না সুজন। তুমি বিনা কারণে আমাকে দোষ দিও না।

দোষ দেব না কেন ? তুমি যে তাই করেছ।

রুনা সুজনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, চশমাটা খুলে ; শাড়ির আঁচল দিয়ে একটু মুছে নিল। তারপর আস্তে আস্তে, যেন কথাগুলো বলতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, এমনভাবে বলল, জানো সুজন, কারো জীবন নষ্ট করার কথা জানি না ; তবু বলব, তাকে ভালোবেসে শুধু কষ্টই পেয়েছি আর তোমাকে ভালোবেসে শুধুই আনন্দ। তোমার আমার যে-সম্পর্ক, সেটা তার আমার সম্পর্কের চেয়েও অনেক বড় সম্পর্ক। একটা অন্য সম্পর্ক। কাল রাতে চোরের মত তোমাকে আমার ঘরে ঢুকতে হয়েছিল। অথচ তোমাকে যা দিয়েছি আমি, সব সময় দিই, তার তুলনায় তুমি যা-চুরি করতে গেছিলে তা হয়ত কিছুই নয়। অথচ দ্যাখো, আমার বিশ্বাস, তুমি না হয়ে যদি সে কাল আমার পাশের ঘরে শুয়ে থাকত, জানি না সুজন, হয়ত আমিই তোমার মত চুরি করে তার কাছে যেতাম।

এ নিয়ে আমি অনেকদিনই ভেবেছি। আমার আজকাল কেমন যেন একটি দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছে যে, জীবনে ভালোবাসা পাওয়াটাই সব নয়, শুধু ভালোবাসা পেয়েই মন ভরে না। নিজে আবেগে, আশ্লেষে, আনন্দে, তীব্রভাবে কাউকে ভালোবাসতে পারাটাও অনেকখানি। তুমি যার কথা বলছ সে আমাকে যেমন চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। অত্যন্ত নির্লজ্জের মতই বলছি, তার ভালোবাসা আমার সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে আমার সমস্ত সত্তায় অস্বস্তি ভরিয়ে আমাকে যেমন ভাবে ডাক দেয় তেমন করে কেউ কোনোদিন আমাকে আকর্ষণ করেনি। ডাকেনি। ঠিক তাকে যেমন করে ভালোবাসি, তেমন করে অন্য কাউকেই ভালোবাসতে পারলাম না। সজ্ঞানে, সে ছাড়া আমি কারো বুকে শুয়ে থাকার কথা ভাবতেও পারি না সুজন। তার ভালোবাসা আমার সমস্ত জীবনময় রংমশালের মত জ্বলে, জ্বালায় ; অথচ তোমার ভালোবাসা এই জঙ্গলের শান্ত ছবির মত আমার মনকে এক সুন্দর শান্তিতে ভরে দেয়। অথচ দ্যাখো, আমি তোমাদের দুজনকেই চাই। অথচ, আশ্চর্য। কত অন্য রকমভাবে চাই।

সুজন চুপ করে রইল।

রুনা বলল, কি ? কিছু বলছ না যে ?

সুজন হাঁটতে হাঁটতে বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলল, তুমি হয়ত বক্তৃতা দেবার সময় ভাবো .তোমার ছাত্রীদের সামনেই বক্তৃতা করছ। কিন্তু তোমার ছাত্রীরা সব কিছু যত সহজে বোঝে, আমি বুঝি না। আমি শুধু এটুকু বুঝি যে, তুমি স্বার্থপর। বেশ স্বার্থপর। নিজের কথা ছাড়া অন্য কারো কথা তুমি কখনো ভাবনি।

রুনা সেই আসন্ন সন্ধ্যার মত এক চিলতে বিষণ্ণ হাসি হাসল।

শুকনো গলায় বলল, তা তো তুমি বলবেই।

বলব না ? একশ' বার বলব। তুমি অত্যন্ত খারাপ। বাজে, অত্যন্ত স্বার্থপর মেয়ে।

রুনা চমকে উঠে বলল, কী বললে ?

সুজন আবার কেটে কেটে বলল, তুমি একটা সস্তা, বাজে মেয়ে। তোমাকে ভালোবেসে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে গেছে।

রুনা যেন কেঁপে উঠল। যেন ডাঙায়-তোলা মাছের মত হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল। মুখে কিছু বলল না।

সুজন এবার বেশ ঘৃণার সঙ্গে বলল, আমি সত্যিই জানি না, তুমি আমার কাছে আস কেন ? এত বছর আমাকে এমন ভাবে প্রতিমুহূর্ত ফেরানোর পর তবু তুমি এদেশে আছ কেন ? তুমি দূরে কোথাও চলে যেতে পারো না ? কোনো চাকরি নিয়ে ? দূরে, এতদূরে যে, কখনো আর তোমাকে আমার দেখতে হয় না। প্রতিমুহূর্তে তুমি আমারই চোখের সামনে দিয়ে তোমার প্রেমিকের কাছে যাবে, আমারই সামনে সব সময় তার কথা বলবে ; এ আর আমার সহ্য হয় না রুনা। কোনোদিন অন্য কারো প্রেমিকাকে ভালোবাসতে চাইনি। তোমাকে, একটুও সহ্য করতে পারি না আজকাল। একমুহূর্তও সহ্য করতে পারি না।

রুনা অনেকটা পথ কোনো কথা বলল না, তারপর হঠাৎ যেন অন্ধকারে কিছু খুঁজে পেয়েছে এমনি ভাবে ওর কাঁধে ঝোলানো অফ্-হোয়াইট রঙা ব্যাগটা হাতড়ে হাতড়ে কি একটা কাগজ বের করে সুজনের হাতে দিল। বলল, মনীষার চিঠি।

সুজন বিরক্ত গলায় বলল, কি ? লিখেছে কী ?

রুনা আস্তে আস্তে বলল, আমার বাইরে যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে সুজন। এবার আমি এখানে এসেছিলাম কেবল এই কথাটাই তোমাকে জানাতে। আমার ভয় ছিল, তুমি দুঃখ পাবে, তুমি হয়ত বাধা দেবে ! তোমাকে কথাটা বলি বলি করেও এ পর্যন্ত বলতে পারিনি। ঠিক করেছিলাম, কথাটা তোমাকে এখানে জানানো যাবে না এভাবে। ভেবেছিলাম, এভাবে জানালে হয়ত তুমি শুনবে না। তোমার দিক থেকে যে কোনো আপত্তি নেই, একথাটা তুমি নিজে থেকে বলে আমাকে যে কীভাবে বাঁচালে তুমি জানো না সুজন। আমারও ভালো লাগে না। আমিও দূরে যেতে চাই। যেখানে কোনো চেনা লোক নেই।

এইটুকু এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে রুনা বলল, বাংলো তো আর বেশী দূর নেই। আমি একটু বসলাম। বুঝলে। আমার মাথার যন্ত্রণাটা ভীষণ বেড়েছে।

একটি ক্ষীণা পাহাড়ী নদী পথের নিচ দিয়ে বয়ে গেছে। তার উপরের কালভার্টের উপর রুনা বসে পড়ল। কালভার্টের নিচ দিয়ে কুলকুল করে জল বইছে। গাছের ছায়া দুপাশে ঝুঁকে পড়েছে নদীতে। সামনেই পথটা একটা বাঁক নিয়েছে। তার সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। বাজরা আর সর্ষে লেগেছে সেখানে। হলুদ আর সবুজে সমস্ত পাহাড়তলিটিকে গালচে-ছাওয়া মনে হচ্ছে। দূরে শিরিনবুড়ুর পাহাড় দেখা যাচ্ছে। নদীর জলে গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে দু-একফালি রোদ এসে পড়েছে। সেই পড়ন্ত রোদের দিকে চেয়ে রুনা চুপ করে বসে রইল।

সুজন, রুনার দেওয়া বিদেশের টিকিটমারা চিঠিটি খুলতে খুলতে বলল, তুমি বাইরে যাবে তাতে আমি দুঃখ পাব কেন ? তুমি কী করবে না করবে তাতে আমার কি ?

বলেই চিঠিটি খুলে, দুহাতে ধরে, পড়তে লাগল।

সমস্ত জঙ্গল আর পাহাড়তলি পাখিদের কলকাকলিতে ভরে উঠেছে। বুনা পাহাড়তলির দিকে আর একবার তাকাল। তারপর চশমাটাকে খুলে একবার কাঁচ দুটোকে আঁচল দিয়ে মুছল। ওর চোখে কি যেন হয়েছে। চশমাটায় কেবলি ঝাপসা দেখে।

এমন সময় সুজন বুনার কাছে এসে কালভার্টে ওর পাশে বসে পড়ল। চিঠিটা মেলে ধরে অবিশ্বাস্য গলায় শুধালো, তুমি চলে যাবে? ব্রিটিশ গায়ানাতে?

বুনা আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ। বললাম তো তোমাকে। তারপর মুখ না তুলেই বলল, জানুয়ারির উনিশে যাব। সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার যা কোয়ালিফিকেশান তাতে এমন সুযোগ আর পাবো না।

ভালো চাকরি। অ্যাপার্টমেন্ট ওরা দেবে। পাঁচ বছর পরপর হোম লিভ। মনীষা যা লেখে, ওখানকার ক্লাইমেটও নাকি ভালো। অনেকটা আমাদেরই মত। শীত নেই বললেই চলে। তারপর একটু থেমে বলল, যদি সময় পাও এবং ইচ্ছে করে, তাহলে আমার কাছে একবার বেড়াতে যেও। তোমার এখানে তো কতবার আমি বেড়িয়ে গেলাম। যদি....

বুনা! সুজন চীৎকার করে উঠল। বুনা তুমি জানো যে, তুমি যাবে না।

বুনা অবাক হয়ে মুখ তুলল। বলল—বাঃ কী যে বল? সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল। কত কষ্ট করে টাকা-পয়সা সব যোগাড় করলাম। এখন যাব না কেন? তাছাড়া, এখানে আমার আছেটা কি? কে আছে আমার? আমার তো কোনো পিছুটান নেই। আমি যাব।

তুমি যাবে না। তুমি যাবে না। বলতে বলতে চিঠিটাকে হঠাৎ হাতের মুঠোয় পাকিয়ে মুঠো করে দিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুজন। দোমড়ানো চিঠিটা জলের উপর একবার নেচে উঠে পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেসে গেল।

বুনা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ইস কি করলে বলত? ওর মধ্যে যে অনেক কিছু দরকারী ইনফরমেশান ছিল। কি করলে তুমি?

বুনা আমি জানি তুমি যাবে না। তুমি যেতে পারবে না।

বুনা বসে পড়ে বেশ শক্ত গলায় বলল, আমি জানি যে, আমি যাব। তুমি আমাকে মানা করার কে? আর মানা করলেই বা তা আমি শুনব কেন? অনেকদিন হল। এবার আমি আমার নিজের দিকে তাকাব। আমার নিজের দিকে তাকাবার সময় হয়েছে এবার।

বুনা তুমি যাবে না।

আমি যাব, যাব; যাব।

সুজন হঠাৎ বাচ্চা ছেলের মত কেঁদে উঠল। কেঁদে হাঁটু গেড়ে বসে বুনার কোলে মাথা রেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। তুমি যাবে না বুনা, তুমি যাবে না বুনা, তুমি যাবে না বুনা; বলতে বলতে মাথাটা ওর কোলে এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

বুনা কথা না বলে, স্থির হয়ে বসে রইল। পাহাড়তলির দিকে মুখ করে।

বুনা নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল।

সুজন একেবারে ভেঙে পড়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল, তোমার কাছ থেকে আমি আর কিছু চাই না বুনা। আর কোনোদিন কিছু চাইব না। তোমার যাকে খুশী তুমি তাকে ভালোবাসো। আমাকে শুধু মাঝে মাঝে তোমায় একটু দেখতে দিও। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো। তুমি অত দূরে যেও না বুনা। তোমাকে মাঝে মাঝে না দেখতে

গেলে......। তোমার পায়ে পড়ি বুনা তুমি যেও না। তুমি ওখানে যেও না।

বুনা এতক্ষণ শক্ত ও স্থির হয়ে বসেছিল। এখন কী করবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ দু'হাত দিয়ে সুজনের মাথার চুলে হাত বোলাতে লাগল। দু' হাতে ওর মাথাটা ধরে রইল অনেকক্ষণ। বলল, সুজন ওঠো, কী ছেলেমানুষী করছো? আমরা কী এখনো ছেলেমানুষ আছি?

বুনার খুবই নার্ভাস লাগতে লাগল।

ওর কোল থেকে মুখটা তুলে সুজন তবু বলল, তুমি কথা দাও। আমাকে তুমি কথা দাও যে যাবে না। বুনা। কথা দাও।

বুনা কোনো উত্তর দিল না। চুপ করে বসে উদাস চোখে চেয়ে রইল।

কতগুলো লম্বা-গলাওয়ালা পাখি, পাহাড় আর উপত্যকাটার মধ্যে গ্লাইডিং করে ভেসে যাচ্ছিলো। ওরা ডানা নাড়াচ্ছে না একটুও। ওই শান্ত পাহাড়ী পটভূমিতে ওর মনের এক বিষণ্ণতম মুহূর্তে ওদের ভেসে-যাওয়া দেখতে দেখতে বুনার চোখের কোল জলে ভরে উঠল। ওদেরও বাসা আছে। নীড়।

বুনার মনে হল, ঐ নাম-না-জানা পাখিগুলোর মতো ও-ও বুঝি ভেসে যাচ্ছে। শাড়ি পরার পর থেকে, বড় হবার পর থেকে ; ও ইচ্ছার ডানানাড়া একেবারেই ভুলে গেছে। কোথায় বাসা ছিল ভুলে গেছে। কোথায় যে বাসা বাঁধবে তাও সঠিক জানা নেই। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। উষ্ণতা মরে যাচ্ছে। শীতের রাতের নিশ্চিত কালো হাত ওর দিকে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। তবুও এখনো ও ভেসেই চলেছে।

বুনার দু' গাল চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল। চশমার কাঁচ দুটো আবার একেবারে ঝাপসা হয়ে গেল।



হাতি

রায়সাহেব জঙ্গলে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। একা যেতে সাহস হয় না আজকাল। আগে সবকিছু বিপদকে তুচ্ছ করার যে সহজ ক্ষমতা ছিল তা পঞ্চাশে পা দিয়েই যেন উবে গেছে। জঙ্গলে পথ হারাবারও ভয়।

বাংলোর চৌকিদার একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ন্যাড়া মাথা ছেলেকে সঙ্গে দিয়েছে পথপ্রদর্শক হিসেবে। ছেলেটার নাম দুখিয়া। ছেলেটা একটা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে লাফাতে লাফাতে একবার আগে আর একবার পিছনে চলেছে শীতের সকালের গন্ধে ম-ম রোদ-পিছলানো জঙ্গলে।

জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় গ্রামটিকে। শীতের ফসল লেগেছে ঢালে ঢালে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে। সরগুজা আর কাড়ুয়ার হলুদ আর নরম সবুজে চোখে স্নিগ্ধতার প্রলেপ লাগে। অড়হরের ক্ষেতে ফুল এসেছে। কিছুদিন আগে জিনৌর লেগেছিল। জিনৌর, বাজরারই মত। কিন্তু থোকা থোকা হয়। দুখিয়া বলছিল, এ বছরে বেশীর ভাগ লোকেই জিনৌর ঘরে তুলতে পারে নি। হাতিতে নষ্ট করে দিয়েছে। গোন্দলি ও সাঁওয়া ধানও যে যা করেছিল, তাও হাতিতে নষ্ট করে দিয়েছে।

মকাই হয় পুজোর সময়। এই ভরা শীতে এখন মকাই উঠে গেছে। কুলথী, মটরছিম্মি, অড়হর লেগে আছে এখন।

পথের পাশে তিরতির করে বহমান নালাতে ছেলেরা বাঁধ বেঁধে জল ছেঁকে ছেঁকে চেতনী মাছ ধরছে। পাহাড়ী পুঁটি। রোদ পড়ছে ছটফট করা ছোট মাছগুলোর রুপোলি শরীরে।

একজন বিবর্ণ বুড়ো মানুষ হেঁটে আসছিল ছোট মাছধরা জাল কাঁধে ফেলে শুঁড়ি-পথ বেয়ে।

দুখিয়া তাকে জিগ্যেস করলো, কোথা থেকে?

বুড়ো বলল, রাতভর ঔরঙ্গা নদীতে চালোয়া মাছ ধরছিল সে। সারা রাতে মাত্র দেড় কেজি মত পেয়েছে।

রায়সাহেব নিজের উর্ধ্বাঙ্গের মোটা ব্লেজার আর নিম্নাঙ্গের ফ্ল্যানেলের ট্রাউজারের ভিতরেও রোদ ঝলমল সকালে শীত বোধ করছিলেন। সারা রাত নদীতে মাছ ধরার কথায় একটা ধাক্কা খেলেন তিনি। শীতের প্রকোপ এখানে কীরকম তা উনি কাল রাতে পৌঁছেই বিলক্ষণ বুঝেছিলেন।

বুড়োকে উনি শুধোলেন, এখানে হাতি পাওয়া যায়?

মাছ-হাতে বুড়ো রোদে দাঁড়িয়ে অবাক গলায় শুধোলো হাথী? হাথী তো চারোতরফ্ হ্যায় মালিক। হাথী-কা কারণসে হামলোগ সব পরিসান্ হ্যায়।

রায়সাহেব বললেন, বলছ তো বটে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কোথায়?

বুড়ো ভেবেছিল, এমন রাজার মত চেহারা ও পোশাক। সাহেব হয়ত সারা রাতধরে ধরা মাছটুকু কিনবেন ওর কাছ থেকে ভালো দামে। কিন্তু বুড়ো নিজে কিছুই বলল না। ভাবল, কেন যেচে বলতে যাবে? তার দুঃখ তারই থাক।

বুড়ো তার পথেই চলে যাচ্ছিল। রায়সাহেব পিছু ডাকলেন। বললেন, তোমার মাছটুকু কততে দেবে?

বুড়ো বলল, দু টাকা।

দু-উ-উ-টাকা! বল কি?

রায়সাহেব অবাক হওয়ার ভান করলেন। জঙ্গলে বা গ্রামে এসে যে-কোনো জিনিসই কেনার সময় বিক্রেতাকে কে কতখানি ঠকাতে পারে, ভান করে, ভঙ্গী করে, মিথ্যে কথা বলে; সেটাই শহুরে ভদ্রলোকদের বুদ্ধির প্রখরতার মাপকাঠি।

বুড়ো অবাক গলায় বলল, ইয়ে জারেমে রাত ভর ক্যা মেহনত্ মালিক।

রায়সাহেব উত্তর না দিয়ে বললেন, দেড় রুপিয়া হোনে সে, দে দেও।

বুড়ো ব্যথিত হয়েছে বোঝা গেল। মাথা নিচু করে বলল, নেহী মালিক। বলে, বুড়ো তার পথে আবার চলতে লাগল।

রায়সাহেবও নিজের পথে।

হঠাৎ বুড়োটা থমকে দাঁড়াল একটা বড় শালগাছের নিচে। ওর ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ের মুখ ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে।

বুড়ো ফিরল। বলল, এক রুপিয়া পঁচাত্তর দে মালিক।

রায়সাহেব হাসলেন, আত্মপ্রত্যয়ের হাসি : জয়ের আনন্দে। বললেন, রফা করো। এক রুপিয়া ষাট।

রাতভর শীতটা বুড়োর হাড়ে-মজ্জায় ঢুকে গেছিল। বুড়োর ঘুম পেয়েছিল। বড় খিদেও। বুড়ো বলল, লে লে মালিক।

রায়সাহেব টাকা দিলেন। দুখিয়া মাছটাকে তার গামছায় বেঁধে নিল।

দুখিয়া বলল, বাংলামে দেকে আয়গা হুজৌর? তৈয়ার কর্‌কে রাখেগা বাওয়ার্চি?

রায়সাহেব এই ছেলেটাকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছেন। ছেলেটা বেশ সপ্রতিভ। ভাবলেন, ভালোই হবে, হেঁটে ফিরে গিয়ে রোদে তেল মালিশ করে চান করে উঠে বাংলোর হাতায় রোদের মধ্যে বসে বীয়ার দিয়ে কড়্‌কড়ে করে ভাজা কুঁচো মাছ খেতে পারবেন।

দুখিয়া মাছটা রেখে আসতে দৌড়ে গেল। বুড়ো যেদিকে গেল তার বিপরীতে। রায়সাহেব, পথের উপরের একটা ছোট্ট সাঁকোর কাঠের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

এখনও গ্রামের সীমানা ছাড়াননি। বাংলোটা আধমাইলটাক হবে এখান থেকে। বনের বুক চিরে যে রাস্তাটা গেছে তারই দু পাশে সামান্য উঠোন, সর্‌হি বাঁশের বেড়া-দেওয়া,

চালে লাউ আর সিমঝোলা ছোট ছোট কুঁড়েঘরের সমষ্টি। ছাগল মুরগীর গলার স্বর। গলায় কাঠের ঘণ্টা-দোলানো গরুর গম্ভীর হাম্বা রব, ছোটলোকদের, ছোট ছেলেমেয়েদের অসভ্য খাই-খাই চিৎকার।

বেশ লাগে। রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, ভালো সিগারেট খেতে খেতে ভারতের জনগণের এই আসল চেহারাটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে।

রুরাল ইন্ডিয়া না জাগলে, ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নেই। ভাবলেন রায়সাহেব।

পথের পাশে কুল গাছ, পলাশের বন ; একটা দুটো বড় শিমুল। হলুদ সোনালি স্বর্ণলতাতে অনেক গাছ ছেয়ে আছে। পরগাছা ও পররস শোষণকারী উদ্ভিদমাত্রই কী সুন্দর উজ্জ্বল। তাঁর মত এককালীন রাজাদের মত ! এদেশীয় রাজনৈতিক নেতাদের মত। কী উদ্ভিদজগতে, কী মনুষ্যজগতে পরগাছারা অন্যের ঘাড়ে নিজের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে অন্যের ঘাড়ের রক্ত চুষে পরম ঔজ্জ্বল্যে ও জাঁকজমকে জীবন কাটিয়ে দেয়। সকালের রোদ পড়ে স্বর্ণলতাগুলোকে কী আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। পরাশ্রয়ী, পরনির্ভর বলেই বোধ হয় তাদের শ্রীমতী হবার সুযোগ এত বেশী।

পিঠে-কুঁজওয়ালা প্রাগৈতিহাসিক একটা কালো জানোয়ারের মত দেখতে বড় পাহাড়টার পটভূমিতে একটা মাথা উঁচু সাদা শিমূল তার ফর্সা পুরুষ্ট মসৃণ উরু ও হাত-পা টান টান করে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। হঠাৎ পিছন থেকে সাঁ সাঁ করে এক ঝাঁক টিয়া, সবুজ ছোট ছোট এক ঝাঁক তীরের মত হাওয়ায় তরঙ্গ তুলে ছুটে গেল ! গরু বাছুর মোষ, ছাগল চরছে টিলার উপরে। সকালের শিশিরের গন্ধ, রোদের গন্ধ ওদের গন্ধের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে। কেটে-নেওয়া সাঁওয়া ধানের ক্ষেতের পাটকিলে বিধুর রঙে সকালের এই রোদ, হলুদ জল-রঙ বুলিয়ে দিয়েছে। কাঠের ঘণ্টা বাজছে ডুং ডুং করে। মন্থর হাওয়াটা বনতুলসী আর অড়হরের ক্ষেতে মৃদু ঢেউ তুলেছে।

ভালো লাগছে, ভারি ভালো লাগছে রায়সাহেবের। ঘাড়ে রোদ পড়েছে, ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

দুখিয়া ফিরল, বলল, চালিয়ে হুজৌর। বলেই, জঙ্গলের শুঁড়িপথে ঢুকল। বড় বড় ঘাস পথের দু'পাশে। তারপরেই গভীর জঙ্গল।

রায়সাহেব বললেন, হাতি দেখলায় গা ? দেখলাও। একঠো রুপিয়া দেগা।

দুখিয়া বলল, হিঁয়াকা হাথী সব খতরনাগ্ হ্যায়।........হামলোগোনে সব থকা হুয়া হ্যায় হুজৌর। হাতি ম্যায় দেখনে নেহী মাংগতা, দিখানে ভি নেহী।

ও বলছিল, ফরেস্ট ডিপার্ট ওদের কোনোরকম ভরতুকি দেয় না। একরাতে হাতি সারা বছরের সব পরিশ্রমের ফসল খেয়ে যায়। কথা ছিল, প্রতি রাতে ক্ষেত পাহারা দেবে গ্রামের লোকেরা হাতির গ্রাস থেকে ফসল বাঁচাবার জন্যে। ওরা এই শীতের শুরু থেকে তাই দিচ্ছে কিন্তু ডিপার্ট টাকা দিলো না ওদের। টিপ সই নিয়ে অনেক আর্জি পেশ করেছে : কিছুই হলো না এখনও। হাতিগুলো পাহারা-টাহারা মানে না, আছাড়ি পটকা ফুটোলেও শোনে না, লজ্জাহীন : যেন গন্ডারের চামড়া পরা। সবকিছুই নিজেদেরই পেটে পুরতে ওদের একটুও লজ্জা করে না।

রায়সাহেব বললেন, তুম বহত্ই বক্‌বকাতা। হাতি তো দেখলাও।

ছোটখাটো দুখিয়া একবার পিছন ফিরে রায়সাহেবের প্রকান্ড শরীরটার দিকে অবাক চোখে

চাইল। তারপরই চোখ নামিয়ে নিল।

পথের পাশে ঘাসের মাঠে দুটো বড় বেজি দৌড়ে গেল, আলোড়ন তুলে। একটা ফলভারাবনত আমলকী গাছ থেকে দুটো আমলকী খসে পড়ল টুপ্-টাপ্ করে দুখিয়ার ন্যাড়া মাথায়। দুখিয়া চমকে উঠেই হেসে উঠল। তারপর একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আমলকী গাছের উঁচু ডালে ছুঁড়ে মারল। ঝর্ ঝর্ করে শ্রাবণের বৃষ্টির মত আমলকী ঝরল তলায়। রায়সাহেব উল্লাসে কুড়োতে গেলেন তা দুখিয়ার সঙ্গে। উনি মুহূর্তের জন্যে সাধারণ, অল্পবয়সী, সহজ সরল হয়ে কোমর বেঁকিয়ে উত্তেজনায় দুখিয়ার মত নীচে ঝুঁকলেন।

কোমরে লাগল। কট্ করে।

যন্ত্রণায় রায়সাহেব আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, এই জীবনে উনি কখনোই আর দুখিয়াদের কাছে পৌঁছে ওদের সমান হতে পারবেন না। তাঁর শরীর, মন, সবকিছুই পথ আগলে দাঁড়াবে।

রায়সাহেব বললেন, হাতি, দুখিয়া? হাতি?

দুখিয়া হাসল। সরল, জংলী, পবিত্র ঝিক্-মিক্ হাসি।

বলল, হাথ্থী রাত্মে দেখিয়েগা। বেতলা যাইয়ে না রাতমে। কিত্না হাথ্থী। রাত্মে হিঁয়াপরভি আতা হ্যায় উলোগ। দিনমে ছিপ্‌কে রহতা হ্যায় কাঁহা কাঁহা।

রায়সাহেব উত্তেজিত হয়ে বললেন, যাঁহা ছিপ্‌কে রহতা উঁহাই লে চল্।

নেহী মালিক, নেহী মালিক......বলতে বলতে কালো ব্রেজার-পরা বিশাল শরীরের রায়সাহেবের দিকে আবার অবাক চোখে চাইল দুখিয়া।

জঙ্গলের গভীরে সড় সড় করে দৌড়ে গেল যেন কী জানোয়ার।

ভয় পেয়ে, চমকে উঠে রায়সাহেব বললেন, চল্ দুখিয়া, আমরা ফিরে যাই।

দুখিয়া জানত কী জানোয়ার। নীলগাই।

জী হুজৌর! দুখিয়া বলল।

২

এখানে এসে অবধি রায়সাহেব হাতিরই গল্প শুনছেন।

এখনও হাতি দেখার সৌভাগ্য হয়নি। বেতলার জঙ্গলে সকলে হাতি দেখতেই আসে। শীতে। তার সঙ্গে উপরি পাওনা আছে বাইসন, ঝাঁক-ঝাঁক চিতল, শম্বর, ময়ূর, বুনো মুরগী, শেয়াল, হায়না। এবং ক্বচিৎ বাঘ।

জংলী হাতি দেখতে চান উনি। পোষা হাতি রায়সাহেব অনেক দেখেছেন। তাঁদের রাজবাড়িতেই হাতিশাল ছিল। চরের অ্যালিফ্যান্ট গ্রাসের জঙ্গলে বিশেষ উৎসবের দিনে, মা-বাবার বিয়ের তারিখে, কি নিজের জন্মদিনে হাতির শোভাযাত্রা করে হাতি দিয়ে হাঁকোয়া করিয়ে দোস্ত-বিরাদরদের সঙ্গে নিয়ে বড় বাঘ মেরেছেন। তিনি নিজে ঠিক মারেননি, মাইনে-করা শিকারীরাই মেরেছে। চোখের সামনে হাতির বাচ্চা হতে দেখেছেন। কিশোর বয়সে যখন যুবতী দাসী এবং রাজ পরিবারের বিভিন্ন ভাষাভাষী অসংখ্য অল্পবয়সী আসা-যাওয়া করা কাজিনদের সম্বন্ধে প্রথম গা-সিরসিরানো ঔৎসুক্য বোধ করেছেন, তখন হাতি-হাতিনীর সঙ্গমও দেখেছেন।

মস্ত্ হয়ে যাওয়া হাতি কী করে তাঁদের পুরোনো মাহুতকে পায়ে পিষে মেরে ফেলেছিলো তাও তাঁর পরিষ্কার মনে আছে। হাতি সম্বন্ধে তাঁর তেমন কোনো ঔৎসুক্য নেই আভিজাত্যহীন সাধারণ মানুষদের মত।

কিন্তু জংলী হাতি সম্বন্ধে আছে। তিনি একজন নেচার-লাভার।

রাজ-পরিবারের ব্যাপারই আলাদা। প্রেম এবং কামের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখাও তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই টেনে নিয়েছিলেন। কামোদ্রক হলে যে কোনো নারীর শরীরে যেতে তিনি দুবার ভাবেন নি। কামের সঙ্গে প্রেমকে তিনি কখনও গুলিয়ে ফেলেন নি।

নারী সম্বন্ধেও তাঁর আর কোনো ঔৎসুক্য নেই। আভিজাত্যহীন সাধারণ মানুষদের মত। কিন্তু জংলী-মেয়েদের সম্বন্ধে আছে। নেচার-লাভার বলেই।

যতদিন তিনি বেঁচে থাকেন ; তা থাকবে।

প্রেম বলে কিছু একটা আছে বলে তিনি লোকমুখে শুনেছেন। দেখেছেন। পড়েছেন, নাটক-নভেলে। কিন্তু তার জীবনে তিনি একজনকে মাত্র ভালোবাসতে পেরেছেন। একমাত্র প্রেম তার। সেই প্রেম তার নিজেরই প্রতি। তাঁর উন্নত গৌরবর্ণ শরীর, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর প্রতি। ইংল্যান্ডের স্কুলে লেখাপড়া-শেখা উন্নাসিকতা, তাঁর অক্সোনিয়ান্ ইংরেজি উচ্চারণ, ভারতীয় এবং পশ্চিমী উচ্চাঙ্গ সংগীতের ব্যাকরণের উপর তাঁর মনোমুগ্ধকর দখল তাঁকে এক অমানুষিক ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতায় সম্পৃক্ত করেছে।

রায়সাহেব পালামৌতে এসে বেত্লার টুরিস্ট লজে ওঠেননি। সেখানে সকলেই ওঠেন। সাধারণ জায়গা সেটা। উনি উঠেছেন একটা ফরেস্ট বাংলোতে। যদিও একাই এসেছেন, সঙ্গে গাড়ি এবং জীপ আছে। বাবুর্চী, রেয়ারা, খিদমদগার, মখমলের কোলবালিশ ; সবই। পুরো বাংলো নিয়ে একা আছেন। এক ঘরে দু-খাট জোড়া করে শোওয়ার বন্দোবস্ত, অন্য ঘরে তাঁর জামাকাপড় ও অন্যান্য নানা জিনিস। রায়সাহেব কখনও পালামৌর হাতি দেখেন নি। পালামৌর জংলী মেয়েদেরও ভোগ করেন নি। এবারে ইচ্ছা আছে যে, দেখবেন ও করবেন।

সন্ধের মুখে মুখে হুড-খোলা জীপে চুড়িদার পায়জামা ও পাঞ্জাবির উপ. কালো-রঙা দশ হাজারী শাল গায়ে দিয়ে তিনি বেত্লার দিকে চললেন। খিদ্মদ্গারের কাছে চিভাস্-রিগ্যাল হুইস্কির বোতল, থার্মোফ্ল্যাস্কে জল এবং কাটগ্লাসের গ্লাস।

ড্রাইভার আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। রায়সাহেব বেত্লার চেক-নাকায় এসে পৌঁছলেন যখন, তখন সবে অন্ধকার নেমেছে। অনেক গাড়ি এসেছে সেখানে। অ্যাম্বাসাডর, ফিয়াট, জীপ। সাধারণ সব লোকেরা। ব্যবসাদার, চাকুরে, সরকারী অফিসার, বাচ্চা-কাচ্চা, স্ত্রী-শালী ; মিডল-ক্লাস মেন্টালিটি নিয়ে। রায়সাহেব খিদ্মদ্গারের হাত থেকে হুইস্কীর গ্লাসটা নিয়ে বড় চুমুক দিয়ে নিজের কোলে রাখলেন। তারপর চারদিকে তাকালেন।

একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে জানালার পাশে একটি বাঙালী মেয়ে বসেছিল। হাত বের করে।

বেশ ভালো।

রায় সাহেবের খুব ইচ্ছা হল যে আজ রাতে মখমলের ওয়াড়্-পরানো কোলবালিশের বদলে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে শোন। বড় ঠান্ডা। প্রচুর হুইস্কী পানের পর গরম গরম স্যুপ,

বিরিয়ানি পোলাউ এবং বটি কাবাব খাওয়ার পরও রাতে শীত করে তাঁর। তিনি কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন ? আজ চান করার সময়ে হঠাৎ রায়সাহেব লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর বুক এবং অন্যান্য স্থানের কৃষ্ণ কেশদামে অনেক রুপালি রেখা। সাদা চুল। মনটা বিষণ্ণ হয়েছিলো রায়সাহেবের। আর একটা বড় চুমুক দিলেন হুইস্কীর গ্লাসে। বিষণ্ণতা একটু কাটল। ড্রাইভার গিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে গেট খোলাল। একজন ফরেস্ট-গার্ড এসে উঠল জীপের পিছনে। সে জানোয়ার দেখাবে স্পট লাইট ফেলে।

জীপ চলল। পেছনের শীতার্ত শিশির ভেজা অন্ধকার রাতে আলতো করে লাল ধুলো উড়ল। পেট্রলের গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, পালামৌর শীতের রাতের গায়ের নিজস্ব গন্ধের সঙ্গে রায়সাহেবের কালো শালে-মাখানো আতরের গন্ধ মাখামাখি হয়ে গেল। একদল চিতল হরিণ জোট বেঁধে দাঁড়িয়েছিল পথের পাশে। তাদের চোখগুলো ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির মত একসঙ্গে জ্বলে উঠল আলো পড়ে।

গার্ড বলল, দেখিয়ে হুজৌর কিত্‌না বঁড়িয়া স্ট্যাগ্। শিঙাল। স্পটেড্ ডিয়ার।

রায়সাহেব বিরক্ত গলায় মুখ তুলে বললেন, পিছনের গাড়িতে যেসব ফর্সা উরুর চিতল হরিণী আসছে তাদের ওইসব মদ্দা শিঙাল হরিণ দেখিও। আমি তোমার মামুলি বাবু নই। হাতি দেখাও আমাকে, হাতি। এইসব আল্‌তু ফালতু জানোয়ার দেখতে আসিনি আমি। জানোয়ার আমি অনেক দেখেছি, অনেক মেরেছি।

তারপর একটু থেমে, কথাটাকে দ্ব্যর্থক করে বললেন, জীবনে অনেক চিতল হরিণ মেরেছি আমি........

আভিজাত্যহীন ফরেস্ট-গার্ড কথাটার অশালীনতায় চমকে উঠল। তারপর সামলে নিল। ও জানে যে, রইস্ আদমীদের শালীনতা বোধ সাধারণত থাকে না।

সারা পার্ক এদিকে ওদিকে ঘোরা হল। অন্য সব জানোয়ার দেখা গেল। মায় একটা চিতাবাঘ পর্যন্ত। কিন্তু হাতি দেখা গেল না। এদিকে রায়সাহেবের নেশা চড়ে গেছিল। গার্ডকে বললেন, তোমাদের এসবই ধান্দাবাজি। পার্কে হাতিই নেই আর হাতি দেখাবার জন্যে এত লোককে ভড়কি দিয়ে তোমরা আনো। বের করো হাতি, নইলে ভালো হবে না।

ফরেস্ট গার্ড মিনমিন করে বলে উঠল, কৌসীস্ তো কর্ রহা হ্যায় হুজৌর।

তারপর সকলেই চুপচাপ। আবার ফার্স্ট গীয়ারে আর সেকেন্ড গীয়ারে চলা জীপের এঞ্জিনের একটানা গোঁ গোঁ নরম শব্দ। ঢেউ খেলানো রাস্তা। আলতো ধুলো, পেট্রলের হালকা মিষ্টি গন্ধ।

উল্টো দিক থেকে সেই অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা এলো। জীপের পাশাপাশি দাঁড়ালো। ঐ গাড়ির ফরেস্ট-গার্ড জীপের পেছনে দাঁড়ানো ফরেস্ট গার্ডকে বলল, হাত্থী হ্যায় সাত নম্বর ক্যাম্প্‌মে। হামলোগ আভি দেখকে আয়া। ছোটা ছোটা, মগর এক ঝুন্ড্। ডানদিকের জানালার পাশে-বসা মেয়েটির মুখে আলো পড়েছিল। লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ জীপের ডানদিকের সীটে-বসা রায়সাহেব মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে বলছিল, জামাইবাবু, থ্যাঙ্ক উ্য ভেরী ভেরী মাচ্। উঃ ! যা দেখলাম না। চিরদিন মনে থাকবে।

গাড়িটা চলে গেল। রায়সাহেবের জীপ এগিয়ে এল আবার।

সাত নম্বর ক্যাপে এসে অনেক ভাঙা ডালপালা, হাতির পুরীষ, সবই দেখা গেল, কিন্তু হাতি দেখা গেল না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও।

রাত অনেক হল। হুডখোলা জীপে অসম্ভব ঠান্ডা। গেম পার্ক থেকে বেরিয়ে বাংলোতে যেতেও সময় লাগবে।

বিরক্ত, ক্ষুধার্ত রায়সাহেব বললেন: গাড়ি ঘুমাও।

জীপ থেকে নেমেই রায়সাহেব বাংলোর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ার প্লেসে আগুন করেছিল ওরা। বড় বড় ডাল এনে সাজিয়ে দিয়েছিল ফায়ার প্লেসের ভিতরে। ফুটফাট করে কাঠ পুড়ছিল। ঘরটা আগুনের আভায় লাল হয়ে ছিল। গরমও। হ্যাজাক জ্বলছিল উঁচু স্ট্যান্ডে। রায়সাহেব ইজিচেয়ারে বসে পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিলেন। খিদ্‌মদ্‌গার হুইস্কী দিয়ে গেল নতুন গ্লাসে।

রায়সাহেব বললেন, চৌকিদারকো বোলাও।

এই বাংলোর চৌকিদার লোকটার চেহারা শেয়ালের মত। খল, চতুর, জ্বলজ্বলে চোখের ছোট-খাটো মানুষ। একটা পা টেনে টেনে হাঁটে। ছোটবেলা বুনো শুয়োর টুঁ মেরেছিল। নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ভিতরে এসে দাঁড়াল সে। খাকি হাফ প্যান্টের উপর খাকি জামা। খালি পা। তার উপ.. চাদর জড়িয়ে।

প্রেতলোকের বাসিন্দার গলায় ফিসফিস করে বলল, হুজৌর।

রায়সাহেব সেই অ্যাম্বাসাডর গাড়ির মেয়েটির কথা ভাবছিলেন। কিন্তু জংলী হাতি না-দেখা গেলেও জংলী-মেয়ে দেখতে তিনি বদ্ধপরিকর। বললেন, ছোক্‌রি মিলেগা?

জী হুজৌর। সব ইন্তেজাম্ কর্‌কে রাখ্‌খা।

রায়সাহেব অবাক হলেন। লজ্জিতও হলেন একটু। তিনি ন' মাসে ছ' মাসে এক-আধবার লজ্জিতও হন। তাঁর চেহারাটাতে কি হায়নার মত, শকুনের মত মাংস-লোলুপতা আঁকা হয়ে গেছে? নইলে, না বলতেই; চৌকিদার বুঝল কি করে? রায়সাহেব বললেন, উমর কিত্‌না?

তেরো চোদ্দ।

ফারস্ট ক্লাস। অনাঘ্রাত ফুল।

বললেন, কিত্‌না দেনা হোগা?

চৌকিদার বলল, পাঁচ রুপিয়া।

পাঁচ টাকা?

চমকে উঠলেন রায়সাহেব। তাঁর চাকররা সেদিন অনুযোগ করেছিল যে, ট্যাংরা মাছের কেজিই এখন কুড়ি টাকা। আর পাঁচ টাকায় একটা ফুটন্ত নারী শরীর। কে বলে, ইন্ডিয়াতে ইনফ্রেশন আছে?

ভাবছিলেন, এই পাঁচটাকার তিনটাকাই হয়ত চৌকিদার নেবে। মেয়েটা পাবে মাত্র দু টাকা? সন্দেহ হল রায়সাহেবের।

বললেন, অসুখ টসুখ নেই তো?

চৌকিদার বলল, ও আমার বোনের মেয়ে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সন্ধে লাগার আগেই আমি আমার বাড়িতে এনে খাইয়ে দাইয়ে ওকে আমার বৌ-এর পাশে শুইয়ে রেখেছি। ও

ঘুমোচ্ছে এখন। আপনার লোকজন সব খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লে, সব শান্ত হয়ে গেলেই আমি আপনার ঘরে পাঠিয়ে দেবো।

রায়সাহেব বললেন, সেতো অনেকই রাত্তির। অত দেরী কেন ? না, না, আমার খাওয়া হলেই পাঠিয়ে দিও।

চৌকিদার বলল, হুজৌর ইজ্জতের ভয় কে না করে ? এখানে অন্য কেউ দেখে ফেললে, পাশে ফরেস্ট-গার্ডের কোয়ার্টারও আছে। জেনে ফেললে, ওর ইজ্জত যাবে। গরীবের ইজ্জত গেলে আর কি বাকি থাকে ?

রায়সাহেব বললেন, আর আমার ইজ্জত ? আমার বুঝি ইজ্জতের ভয় নেই ?

চৌকিদার হাত জোড় করে বলল, গরীবের ইজ্জত চলে গেলে তা আর ফেরে না। পয়সাওয়ালা আদমী অথবা রাজনৈতিক নেতাদের ইজ্জত হারানোর ভয় নেই কোনো। পয়সা খরচ করলে সব বেইজ্জতি ধুয়ে যায়, আর ইজ্জত ধুয়ে-মুছে না এলে এদেশে রাজনৈতিক নেতা হওয়াই যায় না। এখনও ! পরে কী হবে জানি না।

রায়সাহেবের কথাটা ভালো লাগলো না। কিন্তু শীত থেকে গরমে এসে তাঁর শরীর গরম হয়ে উঠছিল। খুউব ভালো লাগছিল। মুখে কিছু বললেন না তিনি।

চৌকিদার বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সকালে যে ছেলেটি আপনাকে জঙ্গলে হাঁটাতে নিয়ে গেছিল, এই মেয়েটি তারই দিদি। ওর চেয়ে এক বছরের বড়।

রায়সাহেব সোজা হয়ে উঠে বসলেন ইজিচেয়ারে।

বললেন, কে ? দুখিয়া ? সেই ন্যাড়া-মাথা ছেলেটা ?

চৌকিদার বলল, জী হুজৌর ?

রায়সাহেব দুখিয়ার মুখটা মনে করবার চেষ্টা করলেন। একটু রখু-সুখু কিন্তু মিষ্টি মুখ। সপ্রতিভ। মাথা ন্যাড়া করেছে কেন জিজ্ঞেস করতে বলেছিল যে, ওর ছোট ভাই মারা গেছে পনেরো দিন হল ; তাইই।

রায়সাহেব ভাবলেন, সব ভাল, কিন্তু দুখিয়ার বোনের নামও হয়ত ঐরকম মেলাঙ্কলী গোছের একটা হবে। দুখিনী ফুখিনী গোছের নাম হলে সহবাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ফুল, পাখি, চাঁদ, তারা এমন কিছু হলে ভালো লাগে।

হুইস্কীতে একটা চুমুক দিয়ে রায়সাহেব মনে মনে বললেন, সে যাই হোক নাম একটা দিয়ে দেওয়া যাবে সময় মত।

চৌকিদার চলে যাচ্ছিল, রায়সাহেব ডেকে বললেন, হাতি ? হাতি কি হল ? নেই তোমাদের এ জঙ্গলে ?

চৌকিদার বলল, হুজৌর, হাতি অনেকই আছে। ঝুন্ডকা ঝুন্ড্। হাতির অত্যাচারে আমরা মরে গেলাম।

রায়সাহেব বললেন, তোমাদের সবটাতেই বাড়াবাড়ি। হাতি দেখতেই তো লোকে আসে এখানে। হাতির কারণে তোমাদের মত কিছু বেজন্মা লোক মরলে মরবে। তার কি করা যাবে ? আর তো দুদিন আছে। হাতি না দেখতে পেলে বড়ই দুঃখ হবে।

চৌকিদার বলল, দুখী মত্ হোনা হুজৌর। রাতমে সব দুখ ধোলা দেগা উ ছোকরী।

রায়সাহেব আর এক চুমুক খেলেন।

তাঁর ভালো লাগলো। ভালো লাগছে। আশা করতে লাগলেন যে, আরো ভালো লাগবে।

উনি ফায়ার-প্লেসের বাঁধানো বেদীতে দুটি পা তুলে দিয়ে বসে হুইস্কী খেতে লাগলেন। হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর, আজ সকাল বেলা জঙ্গলে একটা সাদাটে সুন্দর নরম গাছ দেখেছিলেন। গাছটির কান্ড এবং ডালপালা ভারী সুন্দর। দুখিয়া নাম বলেছিল, চিল্‌বিল্। দুখিয়ার দিদির উরু দুটি কি চিল্‌বিল্ গাছেরই মত মসৃণ হবে?

রায়সাহেবের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। বাবুর্চিখানা থেকে তাঁর লোকজনের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। কে যেন গাইছে ওদের মধ্যে। সিদ্ধি খেয়েছে নিশ্চয়ই। হতভাগা। ওরা যতক্ষণ না শুয়ে পড়ছে ততক্ষণ দুখিয়ার দিদি আসতে পারবে না। যতসব ইডিয়টিক ইজ্জত। যে ইজ্জত মেয়েদের দু পায়ের মধ্যে লুকানো থাকে তা যদি পাঁচ টাকায় কেনা যায়, তাহলে আর ইজ্জত-এর দাম কি? রায়সাহেব পাঞ্জাবির পকেট থেকে পার্সটা বের করে দেখলেন। এই জঙ্গলের সব নারীর ইজ্জতই কিনে নেবার মত টাকা আছে তাঁর কাছে। আশ্বস্ত হলেন তিনি। পার্সটা হালকা হয়ে এলে বড় ইন্‌সিকিওর্ বোধ করেন। যাঁরা টাকা দিয়েই পৃথিবী বশ করেন; কাছে টাকা না থাকলে তাঁরা বড়ই অসহায় হয়ে পড়েন।

ফুট্-ফাট্ শব্দ করে কাঠ পুড়ছে। রায়সাহেবের নেশা একেবারে চুড়োয়। উঠে গিয়ে একটা রাম্ এর বোতল নিয়ে এলেন ও-ঘর থেকে। ছুঁড়িটাকে রাম্ খাইয়ে গরম করে নিতে হবে। এই বয়সে, অন্য পক্ষ সক্রিয় ভূমিকা না নিলে ওঁর নিজের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। অহল্যার মত, উনিও প্রস্তরীভূত হয়ে গেছেন। দুখিয়ার দিদি তাঁকে প্রাণদান না করলে আরামের আ-ও হবে না তাঁর।

বস্তী থেকে কুকুর ডাকল একটা। দূরের কোনো উঠোন থেকে অন্য একটা কুকুর সাড়া দিল। বাইরে কান পাতলে ফিস্‌ফিস্ করে শিশিরের শব্দ শোনা যায়। চিতল হরিণও ডাকছে থেকে থেকে। টাঁউ-টাঁউ-টাঁউ করে ডাকছে মদ্দাগুলো। আর টিঁউ-টিঁউ-টিঁউ করে সাড়া দিচ্ছে মাদীগুলো।

রায়সাহেব অস্ফুটে ডাকলেন টাঁউ, টাঁউ। তাঁর মাদী হরিণ, চিল্‌বিল্ গাছ কি এখনও ঘুমিয়েই আছে? কই সাড়া দিচ্ছে না তো?

বাইরে সব নিস্তব্ধ হয়ে এলো। এখন হাতিগুলো কোথায় কে জানে? রায়সাহেব উঠে শোওয়ার ঘরে গেলেন! ড্রেসিং-টেবিলের সামনে লণ্ঠন জ্বালানো ছিল, ঘাড়ে একটু ওডিকোলন মাখলেন। তারপর ইন্টিমেট্ পারফ্যুমের বড় স্প্রেটা হাতে তুলে নিলেন। দুর্গন্ধ তিনি সইতে পারেন না।

ঠিক তক্ষুনি আয়নাতে তার ছায়াটা পড়ল। তাঁর কালো শালে জড়ানো মস্ত শরীরের ছায়া সমস্ত আয়নাটাকে ভরে দিল। রায়সাহেব চমকে উঠলেন। হাতি! একটা হাতিরই ছায়া পড়েছে বেঁটে আয়নাতে। মুখ নেই, পা নেই, শুঁড়ও নেই। শুধু একটা বিরাট গোলাকৃতি কালো পেট। হুবহু হাতি! রায়সাহেব একটা ধাক্কা খেলেন।

ঠিক সেই সময়ই তাঁর শোবার ঘরের দরজায় কে যেন আলতো হাতে ধাক্কা দিল। চমকে উঠলেন তিনি। ডাকাত নয়? চৌকিদারের কারসাজিও হতে পারে। দুখিয়ার দিদির নাম করে ডাকাতও পাঠাতে পারে ও। তাঁর পার্সের দিকে কাল থেকেই জ্বলজ্বলে চোখে তাকাচ্ছিল

লোকটা।

রায়সাহেব ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেন।

দরজার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে শুধোলেন, কওন্?

চিকন পাখির গলার অদেখা চিল্‌বিল্ গাছের শরীর আর টুঁই পাখির স্বরের মেয়েটি বলল, ম্যায় হুঁ।

দুড়ুম করে ছিটকিনি খুলতেই বাইরের এক ঝলক শীত সঙ্গে করে মেয়েটি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই দুড়ুম্ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন আবার রায়সাহেব।

একটা নোংরা হলুদ শাড়ি পরা, বিনুনী-বাঁধা কিন্তু উস্কোখুস্কো চুলের মেয়েটা তাড়াতাড়ি তাঁর সিল্কের চাদর মোড়া বিছানার দিকে যাচ্ছিল।

রায়সাহেব ধমক লাগালেন। সাহস তো কম নয়? ওঁর বিছানায় শুতে চায় এই দুর্গন্ধ আভিজাত্যহীন জংলী মেয়েটা?

রায়সাহেব ইশারায় ওকে বসবার ঘরে আগুনের পাশে নিয়ে এলেন। নিয়ে এসেই বললেন, সব খুলে ফ্যাল্।

মেয়েটা শীতে হি-হি করে কাঁপছিল। রায়সাহেবের হাতিসুলভ চেহারা ও ভাবভঙ্গী দেখে ছিপ্‌ছিপে বাচ্চা মেয়েটা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর চোখে সেই ভয় চক্‌চক্ করছিল। হাঁকোয়া শিকারে তাড়া খাওয়া হরিণী, শিকারীর বন্দুকের মুখোমুখি পড়ে যেমন ভয়ে সিঁটিয়ে যায়, মেয়েটিও তেমন সিঁটিয়ে গেছিল।

রায়সাহেব আবারও আদেশ করলেন।

মেয়েটি অস্ফুটে বলল, বড়ি জারা লাগল্‌থু।

রায়সাহেব কন্‌সিডারেট্ হলেন। ঐ জামাকাপড়ে চৌকিদারের বাংলো থেকে কাঁচা-ঘুম ভেঙে কাঁথা ছেড়ে উঠে হেঁটে আসলে শীত লাগা স্বাভাবিক। রায়সাহেব রাম্-এর বোতলটা আর একটা গ্লাস ওর দিকে এগিয়ে দিলেন। মেয়েটি নীট্ রাম এক্‌গ্লাস ঢক্‌ঢক্ করে খেয়েই মুখ বিকৃত করে ফেলল। ওদের মহুয়ার চেয়ে এ জিনিস যে অনেক কড়া, তা ওর জানা ছিলো না।

ভালোই হল। এই ভুলের ফায়দা ওঠাবেন রায়সাহেবই। তিনি খুশি হলেন।

রায়সাহেব পাশের ঘরের চৌপাই থেকে একটি তোশক তুলে এনে বসার ঘরের কার্পেটে বিছিয়ে দিলেন। একেবারে আগুনের সামনে। তারপর মেয়েটির জামা-কাপড় ছাড়িয়ে একেবারে আগুনের গায়ে লেগে তাকে কোলের মধ্যে নিয়ে তোশকে শুলেন। এসব মেয়েকে নিয়ে নিজের খাটে শোওয়া যায় না।

মেয়েটি বেশ। কিন্তু ওর গায়ে বনতুলসী আর পুটুস ফুলের উগ্র গন্ধের মত একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। উঠে গিয়ে, ইন্টিমেট এনে ভালো করে সর্বাঙ্গে স্প্রে করে দিলেন। দুর্গন্ধ বা বিজাতীয় গন্ধ কোনো অভিজাত লোকই সহ্য করতে পারেন না। এই সাধারণ মহুয়া-কুড়োনো ঘুঁটে দেওয়া ভিখারিণীকে রায়সাহেব উড্‌নট্ হ্যাভ টাচ্‌ড্ উইথ্ আ পোল্। কিন্তু জংলী ফলের স্বাদ একটু তিক্ত কষায় তো হবেই। সব তিক্ততার গভীরেই মধু থাকে। রুক্ষতার আড়ালে পেলব নিভৃত আর্দ্রতা। রায়সাহেব তা জানেন।

রায়সাহেব শুধোলেন, তোর বিয়ে হয় নি? কি রে?

মেয়েটি বলল, না। আমার বাবা নেই। যতটুকু ফসল হয় সামান্য জমিতে তা পর পর তিন বছর হাতিতে শেষ করে দিয়েছে। ভাল ফসল হলে, ও তা বাঁচাতে পারলে ; তবেই তো বিয়ের কথা !

রায়সাহেব এসব আলোচনায় সময় নষ্ট করতে রাজী ছিলেন না। উনি মেয়েটিকে আরো কাছে টানলেন। সব ব্যাপারেই হাথ্বী। যত্ত.................

অতখানি রাম খেয়ে মেয়েটি বিবশ হয়ে পড়েছিল। ওকে যা যা করতে বললেন ও তাই করল রায়সাহেবের কথা মত। আসলে মেয়েটি তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে তার মাটির ঘরের চৌপাইয়ের দুর্গন্ধ কাঁথার নীচে ফিরে যেতে চাইছিল। বড় ঘুম-কাতুরে মেয়েটি। রাম্ না খেলে আধ-ঘুমন্ত শীতার্ত শরীরের দরজা জানালাগুলির একটিও খুলতো না। রায়সাহেব ভাবলেন।

আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরের অনুপরমাণু গরম হয়ে উঠতে লাগল রায়সাহেবের। এইই পরম উষ্ণতা। পৃথিবীর কোনো আগুনই এই উষ্ণতা দিতে পারে না কোনো পুরুষকে। যা একমাত্র পারে নারীর স্তনবৃন্ত, তার তলপেটের পেলব নিটোল বেলাভূমি, তার উষ্ণ রোমশ কোমল কাঠবিড়ালীর গা সিরসিরানো দৃশ্য। তিনি জানেন তা।

রায়সাহেবের বয়স তিরিশ বছর কমে গেলো। ঐ ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ ইংরিজি না-জানা ভিখারিণীকে ক্ষণিকের জন্যে তাঁর রানীর মর্যাদা দিলেন রায়সাহেব। রায়সাহেব জীবনে রাজা হয়েও এই প্রথমবার প্রজার মত ব্যবহার করলেন। মেয়েটিকে তাঁর পেটের হাওদায় বসিয়ে, নিজের শরীরটাকে সেই চিল্‌বিল্ গাছের মত মসৃণ দুই উরুর নিচে সঁপে দিলেন। এই প্রথমবার জীবনে এক আদিম অথচ চির-নূতন ক্রীড়াভূমিতে নিজে ক্রীড়নক হলেন।

বাইরে শিশির ঝরছিলো ফিস্‌ফিস্ করে। বরফের মত ঠান্ডা শিশির। কিছুক্ষণ পরে সেই আগুন-লাল ঘরের মধ্যে এক প্রাগৈতিহাসিক অথচ নরম, ক্ষুদ্র কোরকেও শিশির ঝরলো ; কিন্তু বাইরেব ফিসফিসানির সঙ্গে নিজের গতিবেগে নিজেই গতিবান হয়ে, উচ্ছলতায় ; উষ্ণ প্রস্রবণের মত।

এবার রায়সাহেবের ঘুম পেল। হাতিরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় ? রায়সাহেব শুয়েই ঘুমোবেন।

ঘোর কাটলে, শরীরের কাঁকড়াগুলো কামড়াকামড়ি করে শান্ত হলে রায়সাহেব উঠে বসে মেয়েটিকে বললেন, যা ভাগ্।

রুপাইয়া ?

মেয়েটির দিকে চরমানন্দের চরণামৃতে আপ্লুত, ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে রায়সাহেব বললেন, তুম্ যো পিয়া, উ শরাবকা কিম্মৎ কিত্‌না ? ফিন্ রুপিয়া কিস লিয়ে ?

মেয়েটি খুব অসহায় ভয়ার্ত গলায় বলল, রুপাইয়া নেহি দিজিয়েগা ?

রায়সাহেব বললেন, কিত্‌না ?

মেয়েটি বলল, পাঁচ।

রায়সাহেব মেয়েটির তলপেটে বাঁ হাতের তর্জনী ছুঁইয়ে বললেন, ঈ গন্ধা চিজ্‌কা কিম্মৎ পাঁচ রুপিয়া ?

মেয়েটি বড় অপমানিত বোধ করল।

লজ্জায় ওর ফ্যাকাশে মুখটি গোলাপী হয়ে উঠল। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে সে জামা-কাপড় পরতে লাগল। মনে হল, অপমানে দুঃখে ও কেঁদে ফেলবে।

রায়সাহেব চারটি একটাকার নোট বের করে গুনে গুনে মেয়েটিকে দিলেন।

মেয়েটি নির্বাক জানোয়ারের চোখে প্রকান্ড লম্বা চওড়া মানুষটার দিকে চেয়ে রইল!

রায়সাহেব বললেন, তুম্ হাতি দিখানে সেকতা ? হাতি দিখানে সে ওউর ভি এক রুপিয়া দেগা। মেয়েটি তখনও মুখ নিচু করেই ছিল। সে দুদিকে নীরবে মাথা নাড়ল। দু ফোঁটা জল তার দু বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল।

রায়সাহেব দৃশ্যটি উপভোগ করলেন।

মনে মনে নিজেকে বাহাদুরী দিলেন। এক টাকা বাঁচিয়েছেন বলে। বিলেতে তাঁর এক স্কচ বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন যে, "আ শিলিঙ সেভড্ ইজ আ শিলিঙ আর্নড।" "আ রুপি সেভড্ ইজ আ রুপি আর্নড্!" বিশ্বাস করেন রায়সাহেব।

মেয়েটি আর কোনো কথা বললো না। ও চলে যাচ্ছিল। রায়সাহেব ইজিচেয়ারে বসে আগুনের দিকে দুটি পা তুলে দিয়ে ওকে বললেন, হাতি কাঁহা ?

তারপর মেঝে থেকে তোশকটাকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে জায়গামত রেখে আসতে বললেন ওকে। মেয়েটি ফিরে এলেই, তাঁর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন।

ভাবলেন, যদি শরীর কিছুক্ষণের বিশ্রামে আবার সজীব হয়ে ওঠে তাহলে দিয়ে দেওয়া চারটি টাকার বিনিময়ে আরেকবার ওকে বিবস্ত্র হতে বলবেন।

এমন সময় কে যেন দরজায় জোরে ধাক্কা দিল।

কওন্ ? রায়সাহেব চমকে উঠে শুধোলেন।

ম্যায় দুখিয়া।

দুখিয়া ?

মেয়েটি ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পালিয়ে গেল। লজ্জায়, ভয়ে ওর মুখটা এতটুকু হয়ে গেল।

রায়সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে দরজা খুললেন। হুড়মুড় করে আবারও একগাদা শীত ঢুকে পড়ল দুখিয়ার সঙ্গে। এই লোকগুলো সব থার্ডক্লাস।

রায়সাহেব বললেন, কি ব্যাপার ? এত রাতে ?

দুখিয়া বলল, হাথ্থী, হুজৌর হাথ্থী। বড়কা, এক্‌রা হাথ্থী আয়া। বহত বড়া বড়া দাঁত। আপ বোলেথে এক রূপাইয়া বকশিশ্ দিজিয়েগা, হাথ্থী দিখানেসে।

রায়সাহেব বললেন, দাঁড়া, দাঁড়া। তুই এখানেই দাঁড়া। বলেই, বড় টর্চটা আর ফ্ল্যাশগান-লাগানো মহামূল্য ক্যামেরাটা নিয়ে এলেন ও-ঘর থেকে। দরজা খুলে, দুখিয়াকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে বললেন, কাঁহারে ?

বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুখিয়া আঙুল দিয়ে দেখালো, ঐ যে। হুঁশিয়ার মালিক, ঈয়ে হাথ্থী বড়া খতরনাগ হ্যায়।

রায়সাহেব দেখলেন, একটা পাহাড়ের সমান হাতি বাংলোর হাতার বড় বয়ের গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর রাতের কুয়াশায় মেশা একফালি নীলচে চাঁদের আলো হাতিটার বিরাট দাঁত দুটোতে ঠিক্‌রে যাচ্ছে।

রায়সাহেব তখন শারীরিক এবং মানসিক এক চরমানন্দের মধ্যে ছিলেন। হাতি তিনি জীবনে অনেকই দেখেছেন। তাঁর আসন ছিল চিরদিনই হাতির মাথায়। কোনো হাতিকে ভয় করার বিন্দুমাত্র কারণ তাঁর জীবনে ঘটেনি।

বারান্দা থেকে নেমে দু পা এগিয়ে গেলেন ক্যামেরা ধরে। দুখিয়াকে বললেন, টর্চটা ধর তুই।

দুখিয়া বলল, এই একরা হাতিটা পাজি। নিচে নামবেন না হুজৌর। এখান থেকেই ফোটো খিঁচুন।

রায়সাহেব অভিজাত মানুষ। সাধারণে যাকে ভয় পায়, তাকে ভয় না পাওয়াই আভিজাত্য।

আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ক্যামেরা ঠিক করলেন তিনি।

বয়ের গাছের নীচে সেই হঠাৎ-আসা হাতিটা আদিগন্ত জঙ্গল, জঙ্গলের গরীব-গুর্বা অসহায় মানুষ-জন, দুখিয়ার দিদির চোখের জলের প্রতিভূর মত নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল, যেন একটি স্টাফড-এলিফ্যান্ট।

রায়সাহেব ক্যামেরা তুললেন।

দুখিয়া বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

হঠাৎ নিমেষের মধ্যে এক দৌড়ে এসে হাতিটা রায়সাহেবকে তাঁর দশ হাজারী শাল সমেত পাঁজাকোলা করে শুঁড়ে তুলে নিল। ফ্ল্যাশলাইটটা অশনি সংকেতের মত একবার জ্বলে উঠেই ক্যামেরাসুদ্ধ মাটিতে পড়ে গেল।

শীতার্ত রাতের নিস্তব্ধতা মথিত করে একটা আঁ—আঁ—আ—আ—আ—চিৎকার ভেজা বন-পাহাড়ে গড়িয়ে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে রায়সাহেবকে দেখা গেল হাতির মাথার উপরে ; যেখানে তাঁর বংশানুক্রমিক আসন ছিলো, সেইখানেই। শেষবারের জন্যে।

পরক্ষণেই হাতিটা তাঁকে নিয়ে বয়ের গাছের ডালে কয়েকবার আছাড় মেরে পায়ের নিচে এনে ফেলল। পা দিয়ে মাড়াল বার বার। তারপর নিঃশব্দে হাতিটা ফিরে গেল দূরের কুয়াশা-ঘেরা নীল পাহাড়ের দিকে গজ-গমনে। কালো শাল, রক্ত ও মাংসপি খিচুড়ি পাকিয়ে রায়সাহেব পড়ে রইলেন পালামৌর এক অখ্যাত বাংলোর হাতার বয়ের গাছের তলায় ; কাঁকর, ধুলো আর শিশিরের সঙ্গে মিশে।

দুখিয়া হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এমন সময় কে যেন দরজা খুলল ভিতর থেকে খুট করে। দরজার পাল্লা একটু ফাঁক হলো। ঘরের ভিতর থেকে আগুনের লাল আভা বারান্দার একটা অংশকে লাল করে দিল। মেয়েটা সাবধানে বেরোল বারান্দায়।

দুখিয়া একটু আগের দৃশ্যে যত না স্তম্ভিত হয়েছিল তার দিদিকে ঐ ঘর থেকে বেরোতে দেখে তার চেয়ে অনেকই বেশী স্তম্ভিত হল। ঐ বিপজ্জনক হাতিটাকে এত রাতে অনুসরণ করে সে বাংলো অবধি এসেছিল একটা টাকা পাবে বলে। তার ভাইয়া মরে গেছে পনের দিন আগে। তার মা আর দিদি ছাড়া তার যে, কেউই নেই আর। দিদি একটা মালা দেখেছিল হাটে। তার দাম এক টাকা। টাকাটা হাতি দেখিয়ে পেলে, সে দিদিকেই দিত।

ভুলই দেখল কি? দুখিয়া আবিষ্টের মত বলল, দিদি। দিদি।

মেয়েটি চমকে উঠে বলল, ভাইয়া।

এমন সময় বাবুর্চিখানার দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। ফরেস্ট গার্ডদের কোয়ার্টারেও লোকজনের গলা শোনা গেল। বস্তীর মধ্যে কারা কারা যেন কথা বলে উঠল।

মেয়েটির গলা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। তার ইজ্জত ? সকলে জেনে গেলে ?

দুখিয়া আবার বলল, টেনে টেনে অবিশ্বাসের গলায়। দিদি। দিদি।

মেয়েটি দৌড়ে এসে দুটো এক টাকার নোট দুখিয়ার হাতে দিল।

বাকি টাকা দুটো তাকে রাখতেই হবে চৌকিদার মামাকে দেবার জন্যে।

দুখিয়া কিছু বলার আগেই হঠাৎ মেয়েটি হাতিটা যেদিকে গেছে, কুয়াশা ঘেরা নীল পাহাড়টার দিকে, সেইদিকে ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে শাড়ির আঁচল লুটিয়ে বাঘ, বাইসন, হাতি ভরা রাতের অন্ধকার জঙ্গলে ঝড়ের মত দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাংলোর হাতা থেকে জঙ্গলের মধ্যে ওর ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনে কে যেন বলল, কি ওটা ?

উত্তরে কেউ বলল, হরিণ-টরিণ হবে।

তার দিদি কোন্ ভয়ে যে এই শীতের ভয়াবহ বনের মধ্যে এমন করে দৌড়ে গেল তা বুঝতে না পেরে টাকা দুটোকে মুঠিতে ধরে দাঁড়িয়ে, বোবা অন্ধকারের দিকে বিহ্বল চোখে চেয়ে রইল "গরিবী হঠাও" নির্বাচনী ইস্তাহারের দেশের অভাগা কিশোর দুখিয়া। শক্ত হয়ে।

বাংলোর হাতার মধ্যে আস্তে আস্তে সোরগোল বাড়তে লাগল। সমস্বরে অনেক ঘুমভাঙা গলা বলতে লাগল, হাথী, হাথী, হাথী.....

তার "গরিবী হঠিয়ে" দুটি টাকা হাতে নিয়ে দুখিয়ার কালো দিদি কালোতর কাঁটাভরা অন্ধকারে তখন দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটে চলেছিলো।



বন্‌সাইদের গল্প

এখন অনেক রাত। বম্বের অভিজাত পাড়ায় রাত অথবা দিনে বেশী তফাত না থাকলেও এখানেও রাত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে এখন।

মিসেস সেন একবার লিভিং রুমে এসেছিলেন হালকা নীল রঙা নাইটি পরে। দরজা ঠিকমত লক্ হলো কি না, ছোট নাইট-লাইটগুলো ছাড়া অন্য বাতি সব নেভালো কী না বেয়ারা, তাই দেখতে। সব দেখেশুনে মিসেস সেন আবার এয়ার কণ্ডিশানড বেডরুমে ফিরে গেলেন।

আমাকে মিসেস সেন বড়ই ভালোবাসেন। ঘরে যাবার আগে একবার আমার গায়ে হাত রেখেছিলেন। একে ভালোবাসা বলে কী না জানি না। তবে আজকের রাতের পার্টিতে মিসেস সেন-এর পালি হিল-এর এই ফ্ল্যাটে বম্বের যে সব গণ্যমান্য মানুষ এসেছিলেন তাঁরা আমাকে দেখে মিসেস সেনের আশ্চর্য প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। আমার কারণে তিনি সবসময়ই গর্বিত। তবে, আমার সম্বন্ধে মিসেস সেন যখনই সবাইকে ডাহা মিথ্যে কথাটা বলেছিলেন, তখন ওঁর সুন্দর মুখের কোথাওই চামড়ার একটুখানি কোঁচকায়নি। বড় বড় চোখের সুন্দর গভীর পাতাতেও একটুও কাঁপন লাগেনি।

মানুষ মিথ্যে কথা বলতে পারে আমি জানতাম। তবে মানুষের মেয়েরা আরও বেশী বলে যে, সে কথা জানতাম না। প্রত্যেক মেয়েই বোধ হয় জন্মেই অভিনেত্রী।

আসলে, মানুষদের কথা আমার তো অজানা থাকার কথা নয়। মানুষের হাতে আমার জন্ম না হলেও মানুষের হাতেই বড় হয়ে ওঠা। মানুষের ঘরেই আমার বন্দীত্ব।

মিস্টার সেনের পূর্বপুরুষদের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। নিজে যদিও একবার দুবার ছাড়া কখনও যাননি। তবে, আমারই মত, কিছু গাছ এবং হয়ত মানুষও থাকে, যত উঁচুতেই বাস করুক না কেন, অথবা উঁচুতলায় ; তাদের গায়ে তাদের শিকড় লেগেই থাকে, লেগে থাকে শিকড়ের মাটির গন্ধ।

মিসেস সেন অবশ্য অন্য কথা বলেন। বলেন, "ইউ মাসট কাট ইওর রুটস রুথলেস্‌লি। যে যুগে মানুষ চাঁদে পা দিচ্ছে সে যুগে রুটস্ কথাটাই টাইমবারড হয়ে গেছে।"

হয়ত হবে। শিকড় সঙ্গে করে বয়ে বেড়ালে, উপরে ওঠা যায় না ; ওড়া যায় না ; ওড়া যায় না এই নতুন পৃথিবীর আকাশে।

শিকড়ের কথাতেই [illegible] পড়ল। [illegible]মার জন্ম হয়েছিল কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে যে হাইওয়ে গেছে তারই পাশে। কৃষ্ণনগরের কাছেই। আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সব একই জায়গায়। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করেই বেড়ে উঠেছিলাম আমরা। একে অন্যের গায়ের গন্ধ নিয়ে। বটের ঝুরি নামে, ফল থেকে চারা গজায়। আমিও আমার সেই অভিজাত প্রাচীন বটবংশের এক শিশুবট ছিলাম। সবুজ পাখির ঠোঁটের ঠোকরে মাটিতে পড়া লাল বটফল থেকে আমার জন্ম। কলকাতার এক শৌখিন বাঙালীবাবু আমাকে শেকড়সুদ্ধু উপড়ে নিয়ে এসে আলিপুরের আচার্যি সাহেবের মেমসাহেবকে দান করেন। তিনিই আমাকে বামন করে দেন।

তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চীন দেশের মেয়েরা যেমন এক সময় লোহার জুতো পরে পায়ের গড়ন ছোট র'খতো, তেমনি আমার বটজাতীয় চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নানারকম মানুষী বজ্জাতির সঙ্গে আমাকে মিসেস আচার্যি এবং অন্য অনেকে মিলে পরামর্শ করে বামন করে দিয়েছেন। জীবনের মত নির্বাসন দিয়েছেন একটি চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি পোর্সিলীনের টবে। তবে, সাধারণ টব নয় সে। বম্বের বিখ্যাত দোকান 'পেডার' থেকে কেনা। চমৎকার কারুকাজ, রঙের খেলা সে টবে।

বামন না বানালে আমি হয়ত আজ হাত-পা ছড়িয়ে চল্লিশ বছরে দশকাঠা জমির উপর ঝাঁকড়া চুলের নিশান উড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম! মানুষ, আমার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আমাকে বলত 'বনস্পতি'। কত পাখি এসে বাধা বাঁধত আমার ডালে। সোহাগ খেত। নীড়ের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা সব ক্রীস্টালাইজড্ হয়ে সুন্দর উষ্ণ ডিম হয়ে প্রকাশিত হত। তারপর আরেক নতুন প্রজন্মের পাখি হয়ে ডিমের মধ্যে থেকে অনাগত ডিমের বাহক এবং ধারক সব পুরুষ ও মেয়ে পাখিরা কিচির-মিচির করে উড়ে যেত আমার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে। গভীর রাতে কেউটে সাপ হানা দিয়ে পাখির বাচ্চা আর ডিম খেত এবং প্রমাণ করত যে, সমস্ত রকম নিরাপত্তার মধ্যেই বিপদের বীজ নিহিত থাকেই! ডাকাতের আর মাতালের আর মৈথুনকারীর রম্য স্থান হত আমার ঘনঘোর স্নিগ্ধ ছায়া। শিবলিঙ্গ বসাতো কেউ এনে আমার পায়ের কাছে। সিঁদুর লেপত তাতে। জল ঢালত অনেক বোকা মেয়েরা ঘড়া ঘড়া তার মাথায় আর চালাক বামুন পয়সা লুটত। ভক্তির 'ভ' নেই মনে অথচ ঠাকুরকে নিয়ে ব্যবসা পাতত কেমন! যেমন প্রেমের 'প'ও না নিয়ে ঘর বেঁধেছেন মিসেস সেন।

সততা মরে গেছে। আমার উচ্চতার মতই, সততা এ পৃথিবী থেকে উবে গেছে! অথবা, আমারই মত ; তাকে বামন করে রেখেছে সাবধানী, সতর্ক নির্গুণ সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা।

হঠাৎ মিসেস সেনের বেডরুমের দরজার উল্টোদিকে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। মিস্টার সেন দরজা খুলে বাইরে এলেন। ভদ্রলোকের খালি গা, একটা কালো চেক-চেক লুঙি পরা। উনি এয়ারকন্ডিশানড ঘরে থাকেন না। বসবার ঘরও এয়ার-কন্ডিশানড, যেখানে আমি এবং আরও অনেক বামন-গাছ থাকি এবং যেখানে বড় বড় মানুষ আসেন, হুইস্কী খান, বাখ্, বীটোভন এবং মোৎজার্ট, চাইকোভোস্কি শোনেন। আর্ট ফিল্ম নিয়ে দুর্বোধ্য সব আলোচনা করেন।

মিস্টার সেন মানুষটার মধ্যে দুটো মানুষ বাস করেন। বুঝতে পারি। একটা মানুষ অন্যরকম, অন্য দশজনের মত। কিন্তু আরেকটা মানুষ? তিনি এই গভীর রাতের নিঃসঙ্গ,

অসহায়, সঙ্গীহীন, প্রেমহীন একা ফ্ল্যাটে-থাকা মানুষটা। মিসেস সেন যখন সামনে বা বাড়িতে থাকেন না, শুধু তখনই সেই মানুষটা প্রকাশিত হন। কাফকার মেটামরফসিস এর গ্রেগর এবং সেই পোকাটার সঙ্গে মিস্টার সেনের আর আমার ; এই বামন-বটের কোথায় যেন একটা দারুণ মিল আছে।

আজ রাতেই একজন অতিথি, আমার অসংখ্য কানের একটা কান মুলে দিয়ে তাঁর জাভেরী ব্রাদার্সের হীরে-মোড়া সঙ্গিনীকে ফিসফিস করে বলেছিলেন "উড নট বী সারপ্রাইজড, ইফ সাম ডে আই ভেঞ্চার টু রাইট অ্যান অ্যাপালিং ডায়ারী অফ দিস গ্রেট, ওল্ড, পুওর, ডোয়ার্ফ্‌ড চ্যাপ ; অ্যা বনসাই ব্যানীয়ন।"

সঙ্গিনী ধন্য হয়ে বলেছিলেন, "হানি, ঠাট্টা কোরো না। আমি ভাবছি, 'ফ্রেন্ড্‌স অফ দ্য ট্রীজ'-এরই মত, 'সোসাইটী ফর দ্য প্রিভেনশান অফ ক্রুয়েলটী টু ট্রীজ' নাম দিয়ে একটা সোসাইটি ফাউন্ড করব। দিস ইজ অ-ফুল। দিস বনসাই বিজনেস। গাছেদের বুঝি লাগে না? বলো হানি। জানো তুমি। সেদিন একটা বই পড়ছিলাম, 'দ্যা সিক্রেট লাইফ অফ প্লান্টস'। ফ্যানটাসটিক। ওরাও আমাদেরই মত জীবন্ত, ওরাও ভালোবাসে, ভালোবাসা বোঝে মানুষদেরই মত। ঈসস-স-স।"

মিস্টার সেন ফ্রিজ খুললেন। বিরাট লিভিং রুম পেরিয়ে, অন্য প্রান্তের ডাইনিং রুমে গিয়ে। তারপর পান্তা ভাতের বাটিটা বের করে কার্পেটের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে বসলেন বাবু হয়ে। শুকনো লঙ্কা পোড়া আর বড বড় আস্ত কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে চাকুম-চুকুম করে খেতে লাগলেন পান্তা ভাত। যেন ছোট্ট ছেলেটি। অনাবিল, ঋজু ; অকলুষিত।

কোনো কোনোদিন পাশের ফ্ল্যাটের বাংলাদেশী আয়াকে দিয়ে শুঁটকি মাছও রান্না করিয়ে রাখেন সেনসাহেব। গভীর রাতে, আযার ছেলে লুকিয়ে এসে সে মাছ দিয়ে যায়। মিস্টার সেন পেঁয়াজ, রসুন, আর ঝালে লাল সেই শুঁটকি মাছ জমিয়ে খান।

মিসেস সেন শুঁটকি মাছের গন্ধ পেলেই স্মেলিং সল্টের শিশি তলব করেন এবং ওডিকোলোন স্প্রে করান ফ্ল্যাটময়। খাওয়ার সময় মিস্টার সেনের চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যে, তা দেখে আমার কৃষ্ণনগরের কাছের সেই পথের পাশের পুরোনো চেনা গন্ধের বনস্পতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। উড়াল চুলের কালবোশেখীর মেঘ, প্রথম বর্ষার সোঁদা গন্ধ, বর্ষার ঘনঘোর, রাতভর ব্যাঙের ডাক, জোনাকির নীলচে আলোর কাঁচটিপ, দুগ্গা পুজোর ঢাকের আর কাঁসির বাদ্যির অনুরণন, এই সমস্ত স্মৃতি আমার পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায়, শিরশিরানি তোলে। পাট পচানোর কটু কিন্তু দিশী গন্ধ, পাট কাচার চটাং-পটাং আওয়াজ, পুকুরের হাঁসেদের সম্মিলিত গলার প্যাঁক-প্যাঁকানি এবং গায়ের আঁশটে গন্ধ সবই ভীড় করে আসে আমার ডালে ডালে, পাতায় পাতায় ; শিরায় শিরায়।

মিস্টার সেন খাওয়া শেষ করে নিজেই প্যানট্রিতে সব ধুয়ে ফেললেন। বাসন সব জায়গামত তুলে রাখলেন। পাছে মিসেস সেন বা বাবুর্চি না জানতে পান। তারপর জানালা খুলে দিলেন লিভিং রুমের।

মিস্টার সেন যখন গভীর রাতে এমন করে জানালা খোলেন শুধু তখনই আমি এবং আমার অন্যান্য বামন সঙ্গীরা একটু হাওয়া পাই। সমুদ্রের আওয়াজ আর নোনা গন্ধ কান

ও নাক ভরে দেয়। এই বাইশতলার মার্বেল এবং কার্পেটে মোড়া ফ্ল্যাটে বছরের তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন এয়ারকন্ডিশানারের একই রকম ঝিরঝিরে ঠাণ্ডায় থেকে থেকে আমাদের গুঁড়ি আর ডালপালাতে বাত ধরে গেছে। সেই আড়ষ্টতা নোনা হাওয়ায় ছেড়ে যেতে থাকে। আমরা আমাদের বেঁটে বেঁটে হাত তুলে মিস্টার সেনকে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জানাই।

মিসেস সেনও কখনও কখনও আমাদের রোদ খাওয়াবার জন্য জানালা খুলে জানালার তাকে রাখেন। তখনও একটু মাটি দেখতে পাই। মাটিরই গাছ আমরা। এখন যে চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি পোর্সিলীনের টবে থাকি সে মাটি মিসেস সেন প্লেনে উড়ে গিয়ে কলকাতার হর্টিকালচারাল সোসাইটি থেকে পলিথীনের ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিলেন ! মাইতিবাবু নিজে যত্ন করে সে মাটি বানিয়ে দিয়েছিলেন, সার, ক্ষার সব হিসেব করে। কিন্তু সে মাটিতে কেষ্টনগরের গন্ধ নেই। আমি আসলে আর আমি নেই। আমি বুঝতে পারি। আমার অবয়বে, আমার সুখে দুঃখে, আমার কামনা-বাসনা চাওয়া-পাওয়া আর শব্দে গন্ধে একেবারেই বামন হয়ে গেছি। আমার অনেক নামডাক, অনেক মূল আমার, অনেকই গাছ এবং গাছের মালিকের ঈর্ষার কারণ আমি। কিন্তু যে গর্ভে জন্ম আমার, যে গর্ভে আমার বীজ রোপণ করার কথা ছিল, আমার হৃদয়ের সব লালিমা দিয়ে যে লাল ফল ফলাবার কথা ছিল তা সবই বিফল হল এ জন্মে। আমি একটা নন্-এণ্টিটি, একটা বামন, একটা জড়দগব প্রাণ হয়ে গেছি। প্রশ্বাস নিচ্ছি এবং নিঃশ্বাস ফেলছি। আমার হাত-পা ডাল পাতা সবই আছে, কিন্তু শুধু প্রাণেই আমি জীবিত আছি। বেঁচে থাকা মানে যে প্রাণে বাঁচার চেয়েও অনেক বড় কিছু সে কথা আজ প্রায় ভুলেই গেছি।

শুধু আমিই নই, আমার সব সঙ্গীরাই সে কথা বলে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে। সঙ্গী বলতে, একটি কনকচাঁপা গাছ, এক জোড়া রঙ্গন, আর একটি বোগোনভোলিয়া।

বাইশ. তলার জানালায় বসানো অবস্থা থেকে যখন আমরা নিচে তাকাই তখন মাথা ঘুরে ওঠে আমার। তবে ওদের আরও বেশি ঘোরে। কনকচাঁপা আর আমি তাও আকাশের কথা বুঝি কিছু, কারণ আকাশের অনেকখানিই আমাদের থাকার কথা ছিল, বামন না হলে। এখন আমাদের আকাশ বলতে শুধু এই ডুপ্লে ফ্ল্যাটের হালকা খয়েরি রঙের সীলিংটুকু।

মিস্টার সেন এসে মাঝে মাঝে আমার সামনে দাঁড়ান। আমার গায়ে মাথায় হাত বুলান্। বড় সহানুভূতি আর করুণা থাকে সেই হাতের আঙুলে। মিসেস সেনের আঙুলে শুধুই গর্ব আর মালিকানার দুর্গন্ধ। উনি আমার গায়ে হাত দিলেই আমার পাতাগুলি লজ্জাবতীর পাতার মতই আপনা থেকেই কুঁকড়ে যায়। মিসেস সেন পুলকিত হন। আমার যেটা ঘেন্না, সেটাই ওঁর তীব্র আনন্দ। উনি হয়ত বট গাছের "বনসাই"-এর মধ্যে লজ্জাবতীর লক্ষণ দেখতে পেয়ে খুশী হয়ে ওঠেন পরের "শো"তে অন্য একটা প্রাইজ পাবার আশায়। দশজনকে এই অভূতপূর্ব গুণ দেখিয়ে চমকিত করার আশায়।

শুনেছি মিস্টার সেন মস্ত কাজ করেন। অনেক বছর আমেরিকাতে ছিলেন। এখন এক মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানীর নাম্বার ওয়ান। এয়ারকন্ডিশানড বাড়ি, এয়ারকন্ডিশানড সাদা-রঙা মার্সিডিজ, সে গাড়িতে আমিও চড়েছি অনেকদিন। বটানিস্টের বাড়ি যেতে। সে গাড়িতে চড়েও বাইরের হাওয়া পাই না একটুও। জ্যৈষ্ঠর দুপুরের গরম কাকে বলে আমি ভুলে গেছি।

ভুলে গেছি গ্রীষ্ম রাতের স্নিগ্ধ হাওয়ার প্রলেপ। আমার চুলে খোলা হাওয়া আর কখনও চিরুনি বুলোবে না। যা হবার হয়ে গেছে ; এ জন্মের মত।

মিস্টার সেন মানুষটা বড়ই একা। মনে হয়, মানুষটাকেও মিসেস সেন বনসাই করে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত নিজস্বতা ছাঁটতে ছাঁটতে, যেমন করে আমাদের নতুন গজানো পাতা আর নতুন গজানো ডাল মিসেস সেন তাঁর রুপোর কাঁচিতে ছাঁটেন, তেমনই করে ছেঁটে ছেঁটে কেটে ফেলে ন্যুব্জ, বামন করে দিয়েছেন মানুষটাকে।

মানুষটার বড় সুখ। সকলেই বলে। অথচ এই কোনো সুখেই যেন আমারই মত মানুষটারও প্রয়োজন ছিলো না কোনোই। অশান্তি এড়াবার চেষ্টা করতে, করতে ; মানুষটা আজ রাতে এই বাইশতলার খোলা জানালার কাছে.....

হঠাৎ মিস্টার সেন খোলা জানালা থেকে ফিরে এলেন। ফিরে এসে, আমাদের প্রত্যেককে এক এক করে জানালায় এসে বসালেন। তারপর, অনেকদিন থেকে যা ভেবেছিলাম, মানে যা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলাম, তাইই করে বসলেন তিনি।

আমাদের জন্য হঠাৎ এক তীব্র আনন্দে এবং মানুষটার জন্যে দুঃখে আমার মন কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

মিস্টার সেন হঠাৎই লুঙিটা খুলে ফেললেন। নাইট লাইটের স্বল্প আলোতে উদোম মানুষটাকে হঠাৎ যেন আমার বনস্পতি প্রপিতামহর ছায়ায়, তাঁর পায়ের কাছে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকা সেই নাগা সন্ন্যাসীর মত মনে হল। মানুষটা মনে মনে বোধহয় সন্ন্যাসীই ছিলেন। এই অপ্রয়োজনের আড়ম্বর এবং অবিচ্ছিন্ন আরামকে মানুষটা তার বাড়তি পোশাকের মতই হঠাৎই খুলে ফেললেন। তারপর একে একে বোগেনোভিলিয়া, রঙ্গন দুটি, এবং কনকচাঁপাকেও জানালা গলিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর আমাকে যত্ন করে দুহাতে বুকে তুলে নিলেন।

আহা ! কনকচাঁপা এবং রঙ্গনেরা মাটির সঙ্গে মিশে গেল। হাত পা, চুল ছড়িয়ে ওরা যখন গভীর রাতের বম্বের মালটি-স্টোরিড বাড়ির ইঁট-কংক্রীটের জঙ্গলের মাঝের খোলা জায়গা দিয়ে দ্রুত নিচে পড়তে লাগল তখন যেন নিচের মাটি দু হাত বাড়িয়ে দিল তাদের ধরবার জন্যে। মুহূর্তের জন্যে আরব সাগরের জল উছলে উঠল ওদের এই মুক্তির আনন্দে।

"আর্থ টু আর্থ, অ্যাশেস টু অ্যাশেস, ডাস্ট টু ডাস্ট".....

হঠাৎ মিস্টার সেন জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে, নিজেও জানালার তাকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ধবধবে উলঙ্গ শরীরের চুলে সামুদ্রিক হাওয়া বিলি কাটতে লাগল। তাঁর বুকের ঘন চুলের মধ্যে আমাকে তিনি আর একবার চেপে ধরলেন। তারপর টব থেকে আমাকে এক হ্যাঁচকা টানে মুক্ত করলেন। তাঁর বুকের ঘন চুলে মাইতিবাবুর যত্ন করে সাজিয়ে দেওয়া মাটি মাখামাখি হয়ে গেল। তারপর বামন—আমাকে, হতভাগ্য এক শিশুরই মত দু হাতে বুকে জড়িয়ে আধুনিক সভ্যতার অর্থ ও যন্ত্রদানবের অত্যাচারে অত্যাচারিত, বড় একা মানুষটি, লোভ, গর্ব এবং অহমিকায় স্ফীত-নাসা এই ক্লান্তিকর অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হবার জন্যে এক লাফ দিলেন জানালা দিয়ে।

জোরে হাওয়া লাগতে লাগল গায়ে। রাতের আরব সাগর থেকে সীগাল আর টার্নরা তাদের শান্তির সাদা ডানা মেলে হঠাৎ জল ছেড়ে অন্ধকারে উড়ে এল আমাদের স্বাগত

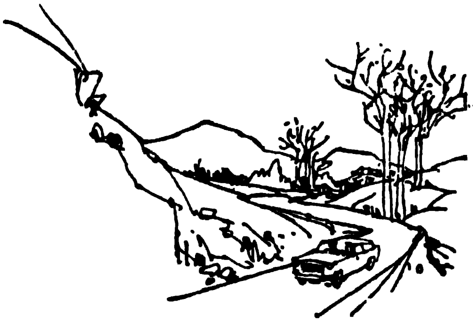
জানাতে। মুক্তির গান ঠোঁটে করে। উড়ন্ত মৃত্যুতে মিস্টার সেনের সঙ্গে আমি মিলিত হলাম।

একজন বামন-মানুষ। আর একটি বামন-গাছ।

প্রচণ্ড শব্দ হল একটা। মিস্টার সেনের মাথাটা ফেটে গেল টুকরো হয়ে। নাক দিয়ে গরম রক্ত গড়িয়ে এল। এসে, চ্যাটচেটে হয়ে আমার সবুজ পাতাতে মাখামাখি হয়ে গেল। আমার এতদিনের শীত মুছে দিল।

দারোয়ান, চৌকিদার, পুলিশ সব দৌড়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। মিস্টার সেন আমাকে যে সোহাগে, যে মমতায়, যে প্রেমে বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন তেমন করে মিসেস সেনকেও কোনোদিন হয়ত জড়াতে পারেননি। অথচ, নিশ্চয়ই জড়াতে চেয়েছিলেন। গাছের মত, মানুষেরও মনটাই আসল। তেমন করে মন ডাক না দিলে, মানুষের শরীরও কথা বলে না। আসলে গাছ, পাখি বা মানুষ সকলেই এক জায়গায় সমানই। বরাবর। কেউই কারো চেয়ে বড় নয়। ছোটও নয়। বামন করা যায় গাছকে, বা মানুষকে ; নিশ্চয়ই। কিন্তু অগাছ বা অমানুষ করা যায় না কখনই।

এই বনসাই-গাছ—আমার, সবুজ পাতার রঙ গাঢ় লাল হয়ে এল বনসাই মানুষটার টাটকা তাজা ভালোবাসার, মুক্তির রঙে। ভীষণই ভালো লাগতে লাগল। কারণ কোনোদিন আবার আমি সবুজ, বিরাট গাছ হব ; প্রাচীন বনস্পতি। লাল ফল আসবে আমারও ডালে ডালে। অনেক ভালোবাসার টিয়া পাখি তার ফল আসবে আমারও ডালে ডালে। অনেক ভালোবাসার টিয়া পাখি তার সঙ্গিনীকে আদর করে আমারই বুকের নীড়ে বসে। নাগা সন্ন্যাসী, গভীর রাতে আমার পায়ের কাছে ধুনি জ্বালিয়ে বসে চুপ করে ভাববে স্তব্ধ রাতে, সেই গন্তব্যর কথা, যেখানে চিরন্তন মানুষ চিরদিনই যেতে চেয়েছিল।



বাদাম পাহাড়ের যাত্রী

বাংরিপোসির বাংলোর অন্ধকার বারান্দাতে পাশাপাশি ওরা দুজনে বসেছিলো। লোডশেডিং হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে বিকেল বিকেল এসে পৌঁছেছে এখানে।

সরোজ বলল, দুস্‌স শালা। লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতেও চাঁদ হাপিস্।

আকাশ বোধহয় ওর কথা শুনেই রেগে গেল। এতক্ষণ মেঘ ছিল, এবার বৃষ্টিও নামল। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। মাটি থেকে গন্ধ উঠল সোঁদা সোঁদা হঠাৎই।

এবং প্রায় সেই সঙ্গেই একেবারে ওদের গায়ের পাশেই এক লম্বা ছায়ামূর্তি দেখে ওরা দুজনে একই সঙ্গে চম্‌কে উঠল।

ভদ্রলোক কখন এলেন, কিসে করে এলেন, কিছুই বোঝা গেল না। তাঁর পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত পায়নি ওরা। যেন ভুঁই-ফোঁড়।

কাঁধে একটা ছোট্ট ব্যাগ। হাতে টর্চ। বোধহয় হেঁটে এসেছেন, দূরে কোথাও বাস বা ট্রাক থেকে নেমে। লম্বা সৌম্য চেহারা ; মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ওদের দুজনের প্রায় কানের কাছে দাঁড়িয়েই চড়া-গলায় ভদ্রলোক বললেন, চৌকিদার কোথায় ?

সরোজ, মূর্তিটি ভূত-টুত নয়, সে সম্বন্ধে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়ে আশ্বস্ত হল।

বলল, চৌকিদারের ঘর ডানদিকে।

ঘর বুঝি খালি নেই ?

তা জানি না। আমরা দুজন তো একঘরেই আছি। অন্য ঘরের কথা চৌকিদারই বলতে পারবে। ওর ঘর ঐদিকে—বলে, ঘরটা আঙুল দিয়ে দেখাল সরোজ।

ও।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে চৌকিদারের ঘরের দিকে চললেন ভদ্রলোক।

বিমল স্বগতোক্তি করল, কানে বেশ কম শোনে রে। একটু হেল্‌প কর্ সরোজ, পার্টিকে।

সরোজ উঠে চৌকিদারের ঘরের দিকে গেল।

ইতিমধ্যে অঝোরে বৃষ্টি নামল। যে বিশাল ঝুরি ছড়ানো গাছটা বাংলোর ডানপাশে একেবারে পঞ্চবটীর মত ছেয়ে আছে তার উড়াল পাতা উথাল-পাতাল করে একটু পরেই যেন প্রলয় এল সশরীরে। যেমন বৃষ্টি ; তেমনই ঝোড়ো হাওয়া।

বিমল বিরক্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বসল গা বাঁচাবার জন্যে। বছরের এই সময়ে এরকম

থার্ডক্লাস ব্যাপার হবে জানলে, কোলকাতা থেকে ওরা দুজন বেরুতই না। তাস খেলত

সরোজ ফিরল অনেকক্ষণ পরে। বলল, পুরো ব্যাপারটাই কেমন হেঁয়ালি ঠেকছে।

কেন ?

পার্টি নাকি আসছে বারিপাদা থেকে বাসে। বলল, কালই যাবে সিম্‌লিপালে। সেখান থেকে বড়াইপানি।

বিমল বলল, বড়াইপানি ? সেটা আবার কি ব্যাপার ?

কী ঘোড়ার ডিম ফল্‌স্-মল্‌স আছে নাকি। যত্ত সব !

বিমল আবার বলল, কিন্তু জীপ ছাড়া এ পার্টি যাবে কি করে ? সিম্‌লিপাল ন্যাশানাল পার্কে বাস বা গাড়ি নিয়ে যাওয়া মুশকিল। আমি তো ন্যাশানাল পার্ক-ফার্কের খোঁজখবর একটু আধটু রাখি।

সরোজ বলল, সেই কথাই তো বলছিলাম পার্টিকে :

এখানে একজন অথরিটি বসে আছে, ইচ্ছে করলে কনসালট্ করতে পারে।

বিমল একটু ফুলে উঠে বলল, তা শুনে কি বলল ?

কিছুই বলল না। শুনতে পেল কি না তাই-ই বা কে জানে ? মরুকগে যাক্।

দুজনেই চুপ করে বাইরের ঝড়-বৃষ্টির আওয়াজ শুনল কিছুক্ষণ।

সরোজ বলল, কেচাইন করল মাইরি ! কী দুয্যোগ।

বিমল কথা ঘুরিয়ে বলল, পার্টি, রাতে খাওয়া-দাওয়ার কি করবে ? এ বাংলোতে তো খাওয়া-দাওয়ার কোনো বন্দোবস্তই নেই। বলেছিস সে কথা ? খিচুড়ি খেতে বল্ না। আমাদের জন্যে তো হচ্ছেই– ভাগাভাগি করে খেয়ে নেওয়া যাবে। ওর কাছ থেকে গোটা পাঁচেক না হলেও গোটা তিনেক টাকা মিল বাবদ নিয়েও নেওয়া যাবে।

সরোজ বলল, গুরু ! তোমার আগেই ভেবেছি সে কথা। বলা হয়ে গেছে অল্‌রেডি। বলল, "খাব। কিন্তু দাম নিতে হবে।" ক্যালানে। বিনি-পয়সায় খাওয়াচ্ছে কে ? বলল, সাড়ে সাত টাকা দেবে।

সাড়ে সাত টাকা ? এক থালা খিচুড়ি আলু ভাজা আর ডিমভাজার জন্যে ? বড়লোকি দেখাচ্ছে ?

তোর-আমার কি ? দেবে, দেবে। সরোজ বলল, লোকটা ছিটেল্ আছে। ভালোই হয়েছে। খাদ্যও খিচুড়ি ; শালার খাদকও খিচুড়ি।

সরোজ বারান্দা থেকে নেমে, ভালো করে উঁকি ঝুঁকি মেরে বলল, একটু একটু করে মেঘ কাটছে। এমন চললে, এক ঘন্টার মধ্যে আকাশ কিলিয়াড় হয়ে যাবে মনে হয়। চল্, চান টান করে আমরা তৈরি হয়ে নিই। লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে এমন জায়গায় এসে একটু জংগল-লাইফ এনজয় না করলে এলাম কি করতে ?

বিমল বলল, চল্, বরাত ভালো থাকলে আজ হাতিও দেখা যেতে পারে। বুঝলি। কাল তো হলো না।

সরোজ বলল, সত্যিই কি দেখতে চাও তুমি গুরু ? কিছু কিছু জিনিস আছে, যেমন ধরো, পরীক্ষার রেজাল্ট, বুনো হাতি, এইসব আমি কিন্তু নিজের চোখে দেখার কোনোদিনই

পক্ষপাতি নই।

ওরা চান-টান করে গাড়িতে উঠে রাম্-এর বোতল, জলের বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে যখন বেরোল, তখন রাত প্রায় আটটা। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে। চৌকিদারকে বলে গেল যে, সাড়ে-ন'টা নাগাদ ফিরবে। খিচুড়ি যেন রেডি রাখে। সঙ্গে ডিমভাজা।

বিমল বলল, চল্, বাংরিপোসির ঘাট পেরিয়ে, বিসোই অবধিই ঘুরে আসি। ঠাণ্ডায় রাম্টা জমবে ভালো।

হাতি-ফাতি সত্যিই বেরোবে নাতো রে?

চল না তুই। আমি তো আছি। তোর ভয় কি?

তাই-ই তো, ওয়াইলড লাইফের মাস্তানের কথা ভুলেই গেছিলাম।

বাংলোর গেট থেকে একটু যেতে-না-যেতেই দেখা গেল ঝক্ঝকে চাঁদের আলোতে একটি প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতি এসে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশের ক্ষেত-জাগানিয়া লোকেরা হুঃ হাঃ করে চেঁচিয়ে, পটকা ফাটিয়ে কানে তালা লাগাবার উপক্রম করল। তাতে হাতিটা ভীষণ চটে গিয়ে ওদের গাড়ির দিকেই দৌড়ে এল শুঁড় তুলে।

সরোজ তাড়াতাড়ি হেডলাইট ডিপারে দিয়ে বিলমকে জিজ্ঞেস করল, কী করব গুরু? শিগগিরি বলো।

তারপর গুরুকে একেবারেই নির্বাক দেখে, ব্যাক গীয়ারে ফেলে বাংলোর গেটের মধ্যে নিয়ে এল গাড়িকে গাঁ-গাঁ করে। হাতিটা গেটের প্রায় মুখ অবধি এসে বাঁ দিকের জঙ্গলে নেমে ঝোপ্-ঝাড় ভেঙে চলে গেল।

সরোজ ফিস্ফিস্ করে তুতলে শুধোল, একলা মা মা-মানেই তো রো-রোগ্ইলিফ্যান্ট? কিরে বিম্লে?

বিমল গাড়িটা বাংলোর হাতার মধ্যে ঢুকেছে কি না ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, ন্-ন্-নট নে-নেসেসারিলি।

তারপরই বলল, অত্ত ভয় পাওয়ার কি ছেল?

বাইরে আর না গিয়ে, ওরা ফিরে এল বাংলোতেই। বাংলোর বারান্দায় বসে রাম্ খেতে খেতে বিমল সরোজকে হাতির বিষয় জ্ঞান দিচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর তাদের হঠাৎই সেই ভদ্রলোকের কথা মনে হল।

বিমল বলল, সেই ছিটেল পার্টি কোথায় গেল রে? কী যে মিসস করল তা নিজেই জানে না।

সরোজ বলল, ছেড়ে দে। কানে খুবই কম শোনে। বড্ড চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। নইলে সঙ্গেই নিয়ে যেতুম।

সরোজ বলল, ভর সন্ধেতে ঘুমোচ্ছে নাকি? দ্যাখ্ মেয়ে-ফেয়ে যোগাড় করে ফেলেছে হয়ত। হেভি চালু বলতে হবে। ঘর ছেড়ে যে বেরুচ্ছেই না র‍্যা।

তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, অ্যাই যে স্যার। যাবেন নাকি? ওয়াইল্ড ইলিফ্যান্ট দেখতে?

বিমল বলল, মুখ্যু। ইলিফ্যান্ট নয়; এলিফ্যান্ট।

সরোজ বলল, বুঝবে তো। তাহলেই হল।

ভিতর থেকে কোনো সাড়াই দিল না কেউ।

সরোজ স্বগতোক্তি করল, কোথায় ভ্যানিস হয়ে গেল ? যাঃ বাব্বা !

আধঘন্টা পর ওরা আবার বেরুলো। ওরা উল্টোদিকে বাংরিপোসির ঘাটের কাছে এসেছে, এমন সময় ফুটফুটে চাঁদের আলোয় হাতির একটি ছোট্ট দলকে নামতে দেখল ঘাট থেকে। বিমল বলল, এই সেরেছে।

কিন্তু, হাতিগুলো ঘাট থেকে নেমেই বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকে এগিয়ে গেল কান্‌চিন্‌ড়া বাংলো যেদিকে, সেদিকে। এদিকের ধানের স্বাদ বোধ হয় তাদের পছন্দ নয়।

চারদিক থেকে আবার হুঃ হাঃ হুঃ হাঃ শব্দ উঠল।

হাতিরা মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘাটের পথ বেয়ে একজন ভূতুড়ে মানুষ পায়ে হেঁটে নেমে আসছে বলে মনে হল। যেন হাতিদের পায়ে-পায়েই। গাড়িটা একটু এগোতেই ওরা হেডলাইটে সেই ভদ্রলোককে দেখতে পেল ;

আতঙ্কিত গলায় সরোজ বলল, হয় ভূত ; নয় নির্ঘাৎ পাগল।

বিমল বলল, পাগল নয়, উন্মাদ। ইডিয়ট্।

সরোজ বলল, পায়ে হেঁটে লোকে রাতের বেলা এইরকম জায়গায় ওস্তাদি করে ? লোকটার কি হাতির নাতি খেয়ে নাড়ু হয়ে যাবার ইচ্ছে নাকি, বল্ তো বিমলে ? তুই তো এসব বিষয়ে অথরিটি ! লোকটা কি আত্মহত্যা করতে চায় ? তা, নাড়ু হয়ে মরার দরকার কি ? কত সোজা রাস্তাই তো ছেল।

বিমল ওয়াইল্ড-লাইফ নিয়ে পড়াশুনো করে। মাসে মাসে ওর বাড়িতে ম্যাগাজিন আসে। তার গাড়িতে পাণ্ডা ভাল্লুকের সবুজ ছবি সাঁটা। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড-লাইফ ফান্ডের লাইফ মেম্বার হয়েছে ও থোক টাকা দিয়ে। ও বিজ্ঞের মত স্বগতোক্তি করল ; গাড়ল।

সরোজ গাড়ি থামিয়ে, হেডলাইট নিবিয়ে দিল।

ভদ্রলোক কাছে এলে, আবার হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল। ওরা এই প্রথম ভালো করে, আলোয় দেখল ভদ্রলোককে। ট্রাউজারের মধ্যে শার্ট গোঁজা। হাতা-গোটানো শার্টের। টান-টান শালগাছের মত ঋজু চেহারা। সারা গা-মাথা-জামা-কাপড় বৃষ্টিতে একেবারে চুপচুপে ভেজা।

সরোজ মুখ বাড়িয়ে বলল, চলুন দাদা, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি বাংলোতে। করেছেন কি ? জ্বর হবে য্যা ! এই কার্তিক মাসের বৃষ্টি !

ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, কালকেই চলে যাব।

সরোজ গলা চড়িয়ে বলল, পায়ে হেঁটে এমনভাবে হাতির পেছনে পেছনে রাতের বেলা কেউ পাহাড় থেকে নামে ? আপনি কি সাহস দেখাচ্ছেন ? তুলে আছাড় মারলে কি হতো একবার ভাবলেন না দাদা ? ঘরে কি কেউই নেই ? বে-থা করেননি ?

ভদ্রলোকের কানে বোধহয় কথাগুলো পৌঁছলো না।

উনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর দূর পাহাড়ের রাত-চরা পাখি-ডাকা রহস্যময়তার দিকে এবং জ্যোৎস্না-পিছলে যাওয়া ধানক্ষেতের দিকে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকেই, ডান হাতটি তুলে যেন অন্য কোনো সুন্দর রহস্যময় গ্রহ থেকে বললেন, আঃ এই পৃথিবী কী সুন্দর ! সবকিছুই কী সুন্দর এখানে।

তারপর বললেন, গাড়ি থেকে নামুন না। এইভাবে কি কিছু দেখা যায়? গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি, এমনকি মানুষও। নিজের পায়ে চলে চিনুন এই জঙ্গল পাহাড়কে ; দিনে রাতে। দেখবেন কত তফাৎ। কী আশ্চর্য সুন্দর। সব কিছু।

সরোজ গলা নামিয়ে বলল, এ দেখি উলটে জ্ঞান দিচ্ছে র‍্যা।

বিমল গাড়ি থেকে নেমে চেঁচিয়ে বলল, রাত সাড়ে-ন'টায় ফিরব আমরা। খিচুড়ি খাব। আপনার তাড়া থাকলে আপনি খেয়ে নেবেন আগে।

ভদ্রলোক বোধহয় শুনতে পেলেন না।

সরোজ চেঁচিয়ে বলল, বুঝলেন তো।

ভদ্রলোক বললেন, আমি কাল ভোরেই চলে যাব। থাকব না। আমি যাত্রী। বলেই, বাংলোর দিকে পা বাড়ালেন।

গাড়িটা ছপছপে চাঁদের আলোয় নিচের রাস্তার উপর রেখে ওরা রাম খেতে লাগল। একটা সাপ ডানদিকের ধানক্ষেত থেকে উঠে রাস্তা পেরিয়ে বাঁ দিকের ধানক্ষেতের দিকে যেতে লাগল আস্তে আস্তে।

বিমল আতঙ্কিত গলায় বলল, রাসেলস ভাইপার।

সরোজ বলল, তোর মুণ্ডু। জল-ঢোঁড়া। গাড়ি চাপা দিয়ে দেখাব তোকে?

বিমল বলল, ছিঃ। ওয়াইলড-লাইফ। তোরা নাঃ।...

দূরের গাছ থেকে হঠাৎ পেঁচা ডেকে উঠল, দুরগুম দুরগুম দুরগুম করে।

সরোজ বলল, আর দেকতে হবে নারে বিমলে। অ্যাইবারে এক্কেবারে রমরমা যাবে হাওড়ায়, তোর ঢালাইয়ের কারবারে। নক্কীপুজোর রাতে নক্কীপেঁচা ডাকছে। আর দ্যাকে কে?

২

ভদ্রলোক যে কোন ভোরে উঠে চলে গেলেন।

ঘুম থেকে যখন উঠল ওরা তখন প্রায় আটটা বাজে। অশ্বত্থের ফল পেকেছে, লাল-লাল। বাঁ পাশে ক্ষীরকুঁড়ি গাছ। পাখির মেলা বসেছে যেন।

চৌকিদার গুরবা সিং বলল, ভদ্রলোক ঠিক সাড়ে চারটেতে রাত থাকতে উঠে, চান করে তৈরি হয়ে প্রথম বাসেই চলে গেছেন যোশীপুরের দিকে।

বিমলরাও আজ যোশীপুরে যাবে। ঠিক করেছে, কোনো ভালো বাংলো ফাংলো না-পেলে আবার ফিরে এসে থাকবে এখানেই। এ জায়গাটায় ভালো ডানলোপিলো আছে ইলেকট্রিসিটি আছে। কিন্তু খরচও ভালো। ঘর ভাড়াই দিনে পঁচিশ টাকা।

সকালটা শুয়ে-বসে আল্‌সি করে, অনেক কাপ চা খেয়ে ওরা কাটিয়ে দিল। দুপুরে ডিমের কারি দিয়ে ভাত খেল। এ হতভাগা জায়গায় মাছ পাওয়া যায় না মোটে।

বিকেল বিকেল পথে বেরিয়ে বিমল বলল, কত গচ্চা গেল র‍্যা? ম্যানেজার?

সরোজ বলল, যাইই যাক, পাঁচশ ক্রেডিটে আছি এখনও। বুঝলে, গুরু।

মানে?

বিমল সরোজের দিকে ফিরে শুধোল।

ফ্রিজের সঙ্গে যে স্ট্যাবিলাইজারটা লাগানো ছিল ঘরে, সে যন্তরকে ঝেঁপে দিয়ে বেডিং-এ পুরে নিয়েছি। কোলকাতায় দাম সাড়ে-সাতশ টাকা।

বিমল বলল, এই নইলে ম্যানেজার ! গাড়িতে ঘুরতে অনেক খরচা ; অথচ গাড়ি ছাড়া ঘোরাও যায় না। অন্তত ভদ্রলোকেরা পারে না।

ওরা অনেকক্ষণ হল বিসোই পেরিয়ে এসেছে। মানাদার বাংলোয় জায়গা পেলো না। মানাদা থেকে অনেকখানি এসেছে। সন্ধেও হয়ে এসেছে। উঁচু মালভূমি মত জায়গাটা। বিসোই-এর পর থেকেই বিমল বার বার বলছিল, আট্টু গেলেই যোশীপুর ; আট্টু গেলেই যোশীপুর।

সরোজ বলল, গুরু ! আর কত আট্টু যেতে হবে ?

বিমল জবাব না দিয়ে অথরিটির মত বলল, এসব জায়গায় যে-কোনো জানোয়ার যখন-তখন বেরিয়ে পড়তে পারে, বুঝলি। এখন কথা বলিস্‌নি ! ভালো করে গাড়ি চালা। দু'পাশের জঙ্গল দ্যাখ্‌।

সরোজ বলল, জঙ্গল আমি দেখতে গেলে, তোমাকে যে গর্ত দেখবে গুরু ! আমি যে গাড়ি চালাচ্ছি।

অনেক হয়েছে। সামনে তো অন্তত দেখতে পারিস।

তা তো দেখছিই !

সরোজ এদিকে-ওদিকে তবু একবার তাকাল। বোঝবার চেষ্টা করল, ওকে অনভিজ্ঞ জেনে বিমল গুল্‌ মারছে কি না ! কিন্তু কোনো জানোয়ারই বেরুল না। এদিকে দেখতে দেখতে অন্ধকারও হয়ে গেল।

ঘন অন্ধকার। দুপাশেই জঙ্গল ও পাহাড়। সরোজের গা ছম-ছম্‌ করতে লাগল। বিমলের কথা আলাদা। ও জঙ্গলের অথরিটি।

এবারে মনে হল, বোধহয় যোশীপুরের খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। গা ছম্‌-ছম্‌ ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে একেবারে নির্জন রাস্তা। চাঁদও উঠেছে। জনমানব তো দূরের কথা ; গাড়ি ঘোড়ারও চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎই ওদের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওরা দেখল রাস্তার বাঁ-ধার ঘেঁষে একজন লোক চলেছে। একটু ঝুঁকে। যোশীপুরের দিকেই। লোকটা যেন বাঁ দিকের জঙ্গলের সুঁড়িপথ দিয়েই বেরুল মনে হল।

ডেঞ্জারাস। ডাকাত-ফাকাত নয় তো ?

বিমল বলল।

কাছাকাছি আসতেই সরোজ চেঁচিয়ে উঠল, এ-যে সেই-ই। সেই-ই মাল।

বিমল বলল, কি বলবি বল এদের ? বন-জঙ্গল ওয়াইল্‌ড্‌ লাইফ সম্বন্ধে কোনোই জ্ঞান নেই ; লোকটার পৈত্রিক প্রাণই চলে যাবে নির্ঘাৎ কোনোদিন।

সরোজ গাড়ি দাঁড় করাল।

বিমল মুখ বের করে বলল, অ্যাই যে, আমরা সেই বাংরিপোসির খিচুড়ির পার্টনার। দাদা ! এখানে কেউ রাতের বেলা এমন একা একা হাঁটে। বনজঙ্গল সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জেনে মশাই, আপনি না...

তারপরই ভদ্রলোককে কিছুমাত্র বলার সুযোগ না দিয়েই আবার বলল, জানেন ? আমি কত সেমিনার অ্যাটেন্ড করি। কত পড়াশুনো করি এসব বিষয়ে—তবু আমিও...আর আপনি...মানে ভাবা যায় না ; ভাব্বাই যায় না।

তারপর গলা আরো চড়িয়ে বলল, বুঝলেন। ভাবা যায় না।

সরোজ গাড়ির পিছনের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে দিয়েই বলল, অনেক তো হয়েছে। এবার মানে মানে উট্টে পড়ুন। আমরা যোশীপুরেই যাব।

ভদ্রলোক কথা না বলে বাঁ হাতের এক ঠেলায় দরজাটা ধপ্ করে বন্ধ করে দিলেন।

সরোজ বলল, সঙ্গে টর্চ পর্যন্ত নেই একটা। এখন চাঁদও তো তেমন জোর হয়নি। নাঃ, রিয়্যালি।

ভদ্রলোক হাসলেন। কাঁচাপাকা চুলে আর পুরু চশমার কাঁচে ভদ্রলোককে এই বিখ্যাত সিম্‌লিপালের জঙ্গলের চেয়েও রহস্যময় বলে মনে হল ওদের দুজনেরই।

বিমল কী যেন বলতে গেল।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, পাওয়ার বেশী হলেও, চোখে আমি ভালোই দেখি।

তারপর বললেন, জানেন ; এই রাতের জঙ্গল কথা বলে ; হাঁটে, অপূর্ব। অপূর্ব। গায়ে কাঁটা দেয়, ভালোলাগায়। কখনও কান পেতে শোনেন নি বুঝি ?

তারপরই বললেন, আচ্ছা। হেমন্তর রাতের বনের গায়ের গন্ধ নিয়েছেন নাকে কখনও ? নেননি ? কোথায় লাগে আতরের গন্ধ। আসুন, নেমে পড়ুন, আমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলুন। অপূর্ব। আঃ।

বলে, নিজেই নাক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন।

ভদ্রলোক নিজে কানে কম শোনেন বলে কথাগুলো খুব জোরে জোরে বললেন।

কথাগুলো দুপাশের জঙ্গলে আর কালো পাথর-ভরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চারদিকে গমগম করে উঠল। ওদের কাছে ফিরে এল।

সরোজ গলা চড়িয়ে বলল, আপনি যাচ্ছেন না তাহলে আমাদের সঙ্গে ?

ততক্ষণে উনি একটু এগিয়ে গেছিলেন। রাস্তার একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে ভদ্রলোক হাসলেন। জোড়া-হেডলাইটে ওঁর ছায়াটা পড়ল সামনে লম্বা হয়ে। ওদের যাবার পথকে প্রায় অন্ধকার করে দিয়ে।

বললেন, নিশ্চয়ই যাব। আবার কাল ভোরেই বেরোব।

কোতায় ?

সরোজ চেঁচিয়ে জিগ্‌গেস করল।

বাদামপাহাড়।

বিমল বলল, চল্ চল্, আর দেরী করিসনি। রাতে কোতায় থাকব, বাংলো খালি পাব কি না ; তাতে ডান্‌লোপিলো আছে কি নেই ; ইলেকট্রিসিটি আছে কি নেই সবই অজানা। যেতে হবে, চান করতে হবে, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। যত্ত সব পাগলের কারবার।

সরোজ গাড়ির অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল।

ভদ্রলোককে প্রথম চাঁদের নরম দুধ্‌লি অন্ধকারের জঙ্গলে ফেলে, ওদের গাড়ি গোঁ-গোঁ

করে এগিয়ে চলল।

বিমল বলল, হ্যাঁ রে, ওষুধপত্র সব আছে তো? না শেষ?

সরোজ বলল, সব আছে গুরু। এখন শুধু তুমি আর চাঁদ ঠিক থেকো। পুরো দু'বোতল রাম্ আছে এখনও। না হলে আর ম্যানেজারি করলাম কি?

চড়াই উঠতে উঠতে গীয়ার বদলাতে বদলাতে অন্যমনস্ক গলায় সরোজ বলল, লোকটা এই অন্ধকারে, এই পথ দিয়ে, পায়ে হেঁটে আসবে কি করে র্যা? আমার তো শালা এপথে গাড়িতে যেতেই ভয়-ভয় করছে।

বিমল বলল, তুই আমার সঙ্গে একটু-আধটু সেমিনারে টেমিনারে ঘোরাঘুরি কর। তোরও ভয় ভেঙে যাবে। আসলে, ভয়ের কিছুই নেই জঙ্গলে! ভয়টা আমাদের মনে।

এমন সময় একজোড়া জুল্‌জুলে চোখ জ্বলে উঠল পথের ডানদিকের জঙ্গলে, হেডলাইটের আলোতে।

বিমল কাঁপা-কাঁপা গলায় ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, টাইগার! প্যান্থেরা টাইগ্রিস! টাইগ্রিস! সরোজ! সাবধান! দাঁড়া!

সরোজ ব্রেক করে গাড়িটা দাঁড় করাল। বেশ ঝাঁকুনি লাগল দুজনেরই। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কী গুরু? খৈরির কাজিন্ না কি?

বিমল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে স্টীয়ারীং ধরা সরোজের হাতে চিম্‌টি-কেটে বলল, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।

ইতিমধ্যে খেঁকশিয়ালটা পথের ডানদিক থেকে বাঁদিকে এক দৌড়ে রাস্তা পেরোল।

বিমল বলল, টাইগার নয়, হায়না; না, না, উল্‌ফ! উঃ!

সরোজ বলল, থাম্ তো! মেলা ভ্যাচোর ভ্যাচোর করিস না! আমার মামাদের হরিপালের বাঁশঝাড়ে এ মাল কত্ত আছে। এ তো শেয়াল! খ্যাঁক্‌শেয়াল।

বলেই, গাড়ি আগে বাড়াল।

বিমল তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বলল, আমি কেবল ঐ পাগলটার কথা ভাবছি। সেই ভোরে বেরিয়ে এসে কোন্‌দিকে মাল গেল, বড়াইপানি না মাঝাইপানি; না ছোটাইপানি রাতে কোথায়ই বা থাকবে যোশীপুরে তা ভগবান-ই জানেন। কতরকমের পাগলই যে আছে এই দুনিয়ায়!

সরোজ বলল, কোতায় যাবে বললে যেন কাল? কাঠাম্‌পাহাড় না গাদাম্-পাহাড়?

বিমল বলল, দুসস্! বড় উল্টোপাল্টা বলিস্ তুই। বাদামপাহাড়!

সেখানে কি আছে র্যা? কাজু বাদামের ঝাড়?

সরোজ শুধোল।

বিমল বলল, কে জানে? কিছু নিশ্চয়ই আছে। পাগলই জানবে।

তারপর হঠাৎই বলল, পাগলটা কি বলছিল র্যা? হেমন্তর বনের গায়ের গন্ধ না কি যেন?

সরোজ ফিচিক্ করে হাসল।

বলল, শালা গন্ধ গোকুল! আমাদের পাড়ার হেমন্তর বোনের গায়ের গন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম!



শান্তুকে পাওয়া যাচ্ছে না

আজ অফিসে খুব খাটুনি গেছে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আটটা। ফিরেই রাণুকে বললাম, ঠাকুরকে বলো, যা হয়েছে তাই-ই দেবে। প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। খেয়েই ঘুমোব।

রাণু বলল, আজ ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে। ভীমসেন যোশীর গান শুনবে না? বললাম, তুমি বরং বাইরের ঘরে বসে শোনো। আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

গাঢ় ঘুমের মধ্যে কেউ ডাকলে প্রথমে কিছুই বোঝা যায় না। অচেতন থেকে অবচেতনে, অবচেতন থেকে চেতনে আসতে মস্তিষ্ক অনেকখানি সময় নিয়ে নেয় তখন।

চোখ মেলে দেখি, রাণু আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। মুখে উদ্বেগের সঙ্গে অপরাধের ছাপ।

বলল, শুনছ; দিদি এক্ষুনি ফোন করেছিল, শান্তুকে পাওয়া যাচ্ছে না। বলেই, অপরাধের গলায় বলল; তোমাকে তুলতে হল কাঁচা ঘুম থেকে।

ততক্ষণে আমি উঠে বসেছি। আমার মা বাবা অনেকদিন হলই চলে গেছেন। দিদি-জামাইবাবুই আমাদের সব। আমরা আজ যে কোনোরকমে পায়ে দাঁড়িয়েছি, আমি ও পিন্টু; রাণু যে আমার ঘরে এসেছে এ সবের পেছনেই দিদি। তাই দিদির ছেলে শান্তুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এখবর জানার পরও আমাকে না জাগালে রাণুর উপর রাগই করতাম।

পায়জামা গেঞ্জি পরেই বাইরের ঘরে এসে ফোন করলাম।

ডায়াল ঘোরাবার সময়েই রাণু বলল, প্রফেসারের বাড়ি গেছিল পড়তে, সেখান থেকে ফেরার কথা ন'টায়। এগারোটা বেজে যেতে, দিদি খুবই চিন্তা করছেন। জামাইবাবুও এখানে নেই। পাটনা গেছেন, মামলা নিয়ে।

দিদিই ফোন ধরল।

আমি বললাম, পুলিস, হাসপাতাল এসবে খোঁজ করেছো?

দিদি বলল, ওর সব বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদেরও ফোন করে দেখলাম কারও বাড়ি গেছে কিনা। কোথাও নেই। মাস্টারমশায়ের বাড়িতেও কানুকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, সাড়ে আটটাতে বেরিয়ে গেছে অন্য দুজনের সঙ্গে। রতনও তো কলকাতায় নেই। আমি জানি না, কিছু ভাবতে পারছি না। তোরা যা ভাল মনে করিস, কর এসে।

রতনদা দিদির দেওর। রতনদাও কলকাতায় নেই। দিদির বাড়ি পৌঁছে রতনদার শালা

ছবুকে নিয়ে আমরা সব ক'টা হাসপাতালে খোঁজ করলাম দক্ষিণের। তারপর থানায় গেলাম।

ও সি ছিলেন না। যিনি ছিলেন, তিনি টেবলের উপর পা তুলে বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার মধ্যে সিগারেট ধরে গাঁজার মত টান দিচ্ছিলেন।

আমাদের শাস্তু যে হারিয়ে গেছে তা নিয়ে আমাদের উত্তেজনা ও উদ্বেগের শেষ ছিল না। কিন্তু ভদ্রলোক নির্বিকার।

পা নামিয়ে বললেন, বসেন বসেন। পোলায় করে কি?

ছবু বলল, এবার প্রি-ইউ দেবে।

প্রি-টেস্ট কেমন দিছিল? আমার ছোটটাও 'দিতাছে প্রি-ইউ এইবার।

ফল ভালো করেনি। আমি লজ্জিত গলায় বললাম।

ভদ্রলোক কান খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, বুঝছি। চিন্তার কোনোই কারণ নাই। খামোখা দৌড়াদৌড়ি কইর‍্যান না। বাড়ি যাইয়া ঘুমান। ভয়ের কিছুই নাই। পোলায় আপনেই আইস্যা পড়বখন।

ছবু উত্তেজিত হয়ে বলল, আপনি তো বেশ ক্যাজুয়ালী নির্বিকারভাবে কথা বলছেন। আমরাই বুঝছি আমাদের কী হচ্ছে।

উনি নিরুপায় গলায় বললেন, আমাগো বিকার কি ভালো? আমাগো উত্তেজিত হওন শোভা পায় না। আমরা হইলাম গিয়া এক্‌জিকিউটিভ।

বলেই, খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, একখান ডাইরী লিইখ্যা দিয়া বাড়ি গিয়া ঘুমান দেহি।

ছবু উত্তেজিত হয়ে বলল, আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই?

উনি নিরুত্তাপ গলায় বললেন, বিলক্ষণ আচ্ছা। আপনাগো একটাই ছাওয়াল। আর আমাগো ছাওয়াল অনেক। মিনিটে মিনিটে হারাইতাছে।

আমরা বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম।

দারোগাবাবু ঘুমোতে বললেই ঘুমুতে পারলাম না আমরা কেউই। পাটনাতে জামাইবাবুকে ট্রাঙ্ক-কল করলাম। জামাইবাবু পাটনা হাইকোর্টে মামলা করতে গেছেন। সব শুনে বললেন, আই অ্যাম নট বদারড। কেন পালিয়েছে তাও আমি জানি। সে বাড়ি ফিরুক আর নাই ফিরুক আমার কিছুই এসে যায় না। সো ফার আই অ্যাম কনসার্নড ; হি ইজ ডেড।

আমি বললাম, কি বলছেন আপনি?

জামাইবাবু বললেন, ইয়েস। হি ইজ ডেড।

দিদিকে রিসিভার দিতেই দিদি কেঁদে ফেলল।

বলল, ডেড? শাস্তু ডেড। ছিঃ ছিঃ। তুমি কি বাবা? না শত্রু?

জামাইবাবু বললেন, শত্রু।

দিদি রিসিভারটা আমাকে দিল।

জামাইবাবু বললেন, থানায় বলে রাখ, পিন্টু যদি ইডিয়টটাকে পায় তাহলে একদিন আটকে রেখে যেন এমন মার মারে যাতে জীবনে আর পালাবার নাম না করে। হাড়-গোড় না ভেঙে যত মার মারা যায় যেন মারে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, আমাকে তোরা আর বিরক্ত করবি না।

কমপ্লিকেটেড মামলা নিয়ে এসেছি। পোলিটিকাল মার্ডার, ম্যাটার পার্ট-হার্ড হয়ে আছে। তিন দিনের আগে আমি ফিরতে পারব না।

তারপর বললেন, কোর্টের বার-লাইব্রেরীর ফোন নম্বরটাও লিখে রাখ। ইডিয়টটা ফিরলেই ফোন করে দিস একটা।

আমি রাণুকে একটা ফোন করে দিয়ে বললাম, সাবধানে থাকতে। ও একেবারে একা আছে বাড়িতে। তখন মনের এমন একটা অবস্থা সকলের যে, মনে হচ্ছিল, রাণুকেও কেউ চুরি করে নিতে পারে। কোনো বিপদ হতে পারে ওর। তখন মনে হচ্ছিল যে, পৃথিবীর সব লোক চোর ; বদমাইস ; ছেলেধরা।

ছবু বলল, দিদি, শান্তুর কারো সঙ্গে লাভ-টাভ ছিলো নাকি ?

কি যে বলিস ? দিদি বললেন, ক্লাস টেন-এ পড়ে।

ছবু বলল, প্রেমে আবার বয়স।

দিদি আহত হল।

কী আর কবব ? আমি তো দিদির ভাই। এখন পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন অনেকেই অনেক কথা বলবে, ভাল-মন্দ। সবই সইতে হবে। শান্তু যে এমন করতে পারে একথা আমিই ভাবতে পারছি না আর তার মা-বাবা কি করে ভাববে ?

দিদি বলল, শুনলি তোর জামাইবাবুর কথা ? খুনের মামলা করে করে খুনীদের সঙ্গে উঠে বসে নিজেও খুনী হয়ে গেছে। নইলে এমন করে কেউ বলতে পারে। ছিঃ ছিঃ......

পরমুহূর্তেই দিদি বলল, খুনী টুনী নিয়ে কাজ করে তোর জামাইবাবু। কেউ আমার ছেলেটাকে গুম করে, খুন টুন.......।

বলেই, দিদি মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দিদিদের বিবাট ড্রয়িংরুমের বড় গ্রান্ডফাদার ঘড়িটা টিক-টিক করে আওয়াজ করছিল। রাত দুটো এখন। সময় চলে যাচ্ছে অথচ কিছুই করার নেই আমাদের।

জামশেদপুরে বড়মামা থাকেন, শান্তুর খুব প্রিয় দাদু। সেখানে ফোন কবে জানানো হল। জামাইবাবুর পরের বোন থাকেন নাগপুর, সেখানেও। কটকে থাকেন জামাইবাবুর ছোট বোন, শান্তুর সবচেযে কাছের লোক ; ছোট পিসী। সেখানেও তাদের কটকচণ্ডী রোডের বাড়িতে ফোন করে বলা হল আজ একেবারে ভোরে জগন্নাথ এক্সপ্রেস কটক স্টেশনে ঢোকার সময়ই যেন স্টেশনে সদলবলে সমীর উপস্থিত থাকে। ট্রেন থেকে নামলেই সঙ্গে সঙ্গে শান্তুকে গ্রেপ্তার করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যেন আমাদের জানায়।

আজ রাতে শুধু আমরা নয়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোকে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে।

জামাইবাবুদের পরিবারে শান্তুই একমাত্র ছেলে। ওঁদের ভাইবোন সকলেরই মেয়ে। তাই শান্তুর বিশেষ আদর ওই পরিবারে। আর আমাদেরও তো একটি মাত্রই ভাগনে।

একমাত্র জামাইবাবুই বোধ হয় ঘুমোচ্ছেন পাটনার এয়ার কন্ডিশানড পাটলীপুত্র হোটেলে।

ছবু আমাকে বলল, কতটাকা ছিলো রে ওর সঙ্গে।

টাকা ?

দিদি আকাশ থেকে পড়ল।

বলল, ওর হাতে কখনও টাকা পয়সা দিই না আমরা। যখন যা দরকার কিনে দিই। টাকা কোথায় পাবে ও ?

দিদিকে বললাম, তুমি গিয়ে শোও দিদি। বাড়িতে সেডেটিভ্ আছে ? ক্যাম্পোজ ? বা অন্য কিছু ? অ্যাটিভান ?

ছবু বলল, হ্যাঁ বউদি যান। শুয়ে পড়ুন। ঘুমের ওষুধ খেয়ে। আমরা তো আছি। দিদি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমাদের মুখে। তারপর বলল, তোরা তো এখনো বাবা হোসনি, মা-বাবা হলে একথা বলতে পারতিস না। ওষুধ খেলেই বুঝি ঘুম আসে ?

রতনদাকেও বোম্বেতে একটা ফোন করে দিল ছবু। কোম্পানীর কাজে গেছে। গেস্ট হাউসেই উঠেছে।

রতনদা বলল, ব'লই সব কাজ ফেলে চলে আসব সকালের ফ্লাইটে।

ছবুর দিদি, মানে রতনদার স্ত্রীর একটা মেয়েলী অপারেশন হয়েছে। ছবুদের বাড়িতেই আছে মিলিদি।

আমি আর ছবু ড্রয়িংরুমে বসেছিলাম, টেলিফোনের কাছে। ছবু একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। শান্তুর যেসব বন্ধুর বাড়ি ফোন নেই, তাদের বাড়ি গেছে কানু গাড়ি নিয়ে। তখনও ফেরেনি।

শান্তুটা আমাদের আত্মীয়স্বজনদের যত ছেলেমেয়ে আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছেলে। খুব সুন্দর ছবি আঁকে। অতি মিষ্টি স্বভাব। বিনয়ী, নম্র, ভদ্র। কখনও ওকে কেউ সমবয়সীদের সঙ্গেও ঝগড়া করতে দেখেনি। বড় লাজুক, অন্তর্মুখী ছেলে। বাংলায় এবং ইংরিজিতে খুব ভালো। অঙ্ক আর সায়ান্সের সাবজেকটগুলো ওর একেবারেই ভালো লাগে না। কিছুতেই ও এঁটে উঠছে না। এবং ফলে অত্যন্ত খারাপ রেজাল্ট করেছিল প্রি-টেস্টে। ক্লাস সেভেন থেকেই ক্রমাগত খারাপ রেজাল্ট করে আসছিল।

দিদির ধারণা যে, শান্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে, ও কিছুতেই ফাইন্যাল টেস্ট পরীক্ষাতে অ্যালাও হবে না।

দিদি আড়ালে গেলে আমি ছবুকে বললাম, জামাইবাবুর ভয়েই শান্তু বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। খারাপ কিছু ঘটেনি, এমন্ হলেই ভাল।

ছবু বলল, সত্যিই অদ্ভুত কিন্তু আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা। ক'টা জিনিস জীবনে কাজে লাগে বল্ ? আর বিষয়েরই বা কী বাহার। ভালো লাগুক না-লাগুক প্রত্যেক ছেলে মেয়েকেই একগাদা বিষয় গিলতেই হবে। যে ছেলে ইংরিজি বাংলাতে ষাট সত্তর করে নম্বর পাচ্ছে সে অঙ্ক আর সায়েন্স সাবজেক্টে ফেল করলেই অশিক্ষিত। উল্টোটা হলেও অশিক্ষিত। মরাখাসীর পেছনে করপোরেশনের একটা করে নীল-রঙা যেমন ছাপ থাকে, তেমন প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পিছনেই একটা করে ছাপ না-মারলে এদেশে কেউই শিক্ষিত হয় না।

আমি বললাম, তার উপর এই পলিটিকস্। স্কুল-কলেজে ইউনিভারসিটি সবেতেই পলিটিকস্ ঢুকে গেছে, দলবাজী হচ্ছে ; লেখাপড়ার আর দরকার কি ?

ছবু বলল, এসব বলে লাভ কি ? আমাদের ছেলে হারিয়েছে বলেই এখন আমরা কনসার্নড। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভাবছি। পরমুহূর্তে ভুলে যাব। সব জেনে শুনেও আমরা কিছু কি করি ? এক পয়সা ট্রামভাড়া বাড়লে এখানে আন্দোলন হয়, গুলি চলে,

লেখাপড়ার সর্বনাশ হচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি নেই, কেরোসিন নেই, বন্দর বন্ধ, ট্রাম-বাসে ওঠা যায় না, ব্যাঙ্কে কাজ হয় না, রেল চলে না, তবু কিছুই ঘটে না এখানে। অত্যন্ত আন্তর্জাতিক, আঁতেল, সর্বজ্ঞ অথচ সর্বংসহ আজকালকার এই বাঙালীরা।

এমন সময় ফোনটা বাজল। এখন রাত তিনটে। জামাইবাবু।

জামাইবাবু বললেন, কি রে? ছোক্‌রা ফিরেছে?

কে? আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

কে আবার? তোমাদের পেয়ারের ভাগ্নে।

বললাম, না।

হুম্‌ম্‌.......ম্‌। নরাণাং মাতুলক্রমঃ। যেমন সব মামারা, তেমন তো হবে ভাগ্নে। ভাগ্নের আর দোষটা কি?

তারপরই বললেন, ফিরলেই খবর দিতে ভুলিস না। আর শোন্‌, দিদিকে দেখিস্‌। ফিট্‌-টিট্‌, হয়েছিলো নাকি? ডাক্তার ভৌমিকের নম্বর জানিস তো? ডঃ রায়কেও ফোন করিস।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

তারপর বললেন, তোর দিদিই তো আদর দিয়ে দিয়ে এই অবস্থা করেছে। কি আর বলব? আমার প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌। কারখানার প্রোজেক্ট রিপোর্ট পর্যন্ত হয়ে আছে আর.......।

জামাইবাবু ফোন ছেড়ে দিলেন।

আমি বললাম, বুঝলি ছবু, জামাইবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ছেলে এখনও প্রি-ইউ পাশ করল না আর এখনই কারখানার প্রোজেক্ট রিপোর্ট। কারখানার মালিক তাকে করবেনই উনি।

তারপর বললাম, ছবু, তুই এবার বাড়ি যা। ওরা চিন্তা করছে। মিলিদি তো বটেই! ফোনটাও তো খারাপ তোদের, নইলে তো চিন্তার ছিলো না কিছু।

ছবু ফুঁসে উঠে বলল, ফোনটা কি আজকে খারাপ? গত একমাস থেকে পঞ্চাশবার ফোন করেছি অফিস থেকে, চিঠি লিখেছি, কে গ্রাহ্য করে? টেলিফোন অফিস থেকে একটা লোক ধরে এনে কিছু টাকা দিই যদি সঙ্গে সঙ্গে ফোন ঠিক হয়ে যাবে। তারপর বলল, তা আমি দিচ্ছি না। করাপ্‌শন সাপোর্ট করি না আমি।

আমি বললাম, তুই মরগে যা। তোর ফোন জীবনেও ঠিক হবে না।

২

রতনদা সকালের ফ্লাইটেই এসে পৌঁছেছিলেন। বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। কলকাতার বাইরে যেখানে যেখানে খবর দেওয়া হয়েছিল সব জায়গা থেকে ঘনঘন ফোন আসছে।

জামাইবাবু নিজেও কাল রাতে খবর পাওয়ার পর থেকে পাঁচবার ফোন করেছেন। বলেছেন, পাটনা থেকে লাইন পাওয়া সোজা। ভাবলাম, তোরা যদি চেষ্টা করে আমাকে না পাস।

অফিস থেকে দুপুরে ফিরে সোজা দিদির বাড়িতেই গেছিলাম। রাণুকে পাঠিয়ে দিয়েছি

ওর মায়ের কাছে। রাণুর বিশেষ খবরটা কেউ জানে না, এমন কি রাণুর মাকেও জানায়নি রাণু। অবশ্য শিওর না হয়ে জানাতে চাইও না আমরা কাউকেই। কাল ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ডাক্তার কনফার্ম করলে তারপর ওর মা এবং দিদিকে জানানো হবে। কিন্তু যা অবস্থা দিদির বাড়িতে, তাতে আমাদের আনন্দ-টানন্দ সব শুকিয়ে গেছে।

আমি চা খেয়ে ভিতরের একটা ঘরে শুয়েছিলাম একটু। এমন সময় ছবু দৌড়ে এসে বলল, এই, বড়দা এসেছেন।

জামাইবাবু চলে এসেছেন পাটনা থেকে। এসেই সোজা শান্তুর ঘরে গেছেন।

শান্তুর ঘরের দেওয়াল নানারকম স্টিকারে ভর্তি। ওর নিজের আঁকা ছবি আছে কয়েকখানা বই-পত্র ছড়ানো। ক্রিকেটের ব্যাট ও উইকেট। রেকর্ডপ্লেয়ার। মেহেদি হাসান আর পপ্ মিউজিকের এল্-পি। টানা-খোলা ওয়াড্রোব থেকে ওর জিনস্ ঝুলছে তালিমারা। পায়জামা-পাঞ্জাবি। জুতো, এদিকে ওদিকে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির জার্নাল।

শান্তু ছেলেটা খুব অ্যাডভাঞ্চারাস। একবার আমার সঙ্গে সিম্‌লিপালের জঙ্গলে গেছিল। খুব সাহসীও। পাশের বাড়ির হিতেনবাবু বলছিলেন।

আমি জামাইবাবুর পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে ঘরটার দিকে তাকিয়ে থেকে পিছন ফিরেই জামাইবাবু যেন নিজের মনেই বললেন, হোয়াট্ ফর ? কিসের জন্যে ? আমার কাজ, আমার দৌড়ে-বেড়ানো, এসব কার জন্যে ? সব তো ওরই জন্যে। আর দ্যাখ্, এই ছোক্‌রা। হাইট অফ্ আনগ্রেট্‌ফুলনেস্ !

একটা একটা করে ঘন্টা যাচ্ছে আর আমাদের হতাশা বাড়ছে, চিন্তা বাড়ছে, চুপ-চাপ হয়ে ঠান্ডা মেরে যাচ্ছি আমরা।

দিদি অত্যন্ত উতলা ছিল কাল রাত থেকেই। কিন্তু হঠাৎ-ফিরে আসা জামাইবাবুর চোখে সে কি দেখেছিল তা দিদিই জানে। জামাইবাবুকে দিদি যতখানি বোঝে ততখানি আমরা কি করে বুঝব ? কিন্তু এখন দিদি শক্ত ও শান্ত হয়ে গেছে। ওঁকে দেখে, মনে হয় দিদি খুউব ভয় পেয়েছে। শান্তুর কারণের চেয়ে জামাইবাবুর কারণেই বেশী। মহীরুহকে ভূলুণ্ঠিত করা ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন থমথম করে, এ বাড়ির পরিবেশ তেমনই।

আমরা সকলে এমনকি দিদিও আস্তে আস্তে কথা বলছি ও বলছে। দিদির জন্যে ডাক্তার ডাকার দরকার হয়নি। কিন্তু দিদির কথামত আমি জামাইবাবুর জন্যেই একবার ডাঃ ভৌমিককে আসতে বলেছি। এও বলে দিয়েছি যে, উনি যেন বুঝতে না দেন জামাইবাবুকে কোনোমতেই যে আমরা ওঁকে ডেকেছি। যেন এ-পাড়ায় এসেছিলেন কোথাও ; হঠাৎই ঘুরে গেলেন আমাদের বাড়ি থেকে !

না। কোনো খবর নেই। এখন রাত আটটা। চব্বিশ ঘন্টা হতে চললো। এখনও কোনো খবর নেই।

হাইকোর্টের বহুলোক এসেছিলেন। ফোন করেছিলেন। সলিসিটর, কাউনসেল্‌স। একজন জজসাহেবও। অনেক জজসাহেব ফোন করেছিলেন।

কিছু খবর পেলেন ?

না। এখনও কোনো খবর নেই।

একমাত্র খবর এই যে, খবর নেই।

আমরা সকলেই এবার যে যার বাড়ি ফিরে যাব।

এক এক করে উঠলাম আমরা।

৩

পরদিন ভোরবেলা উঠেই রাণুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। বেরোবার আগে দিদির বাড়ি ফোন করেছিলাম। আজও কোনো খবর নেই।

রাণুর ইউরিন কালই দিয়ে এসেছিলাম। ডাক্তার রাণুকে পরীক্ষাও করলেন। রাণু খুব লজ্জা পেয়েছিল।

পরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু বাইরের চেম্বারে আমাদের সঙ্গে ফিরে এসে বলেছিলেন, ইয়েস। ইউ আর গোয়িং টু হ্যাভ আ বেবী। "আর" কথাটার উপর খুব জোর দিয়েছিলেন।

ট্যাক্সির পিছনের সীটে বসে আমি রাণুর উরুতে চিমটি কাটলাম।

রাণু অস্ফুটে বলল, অসভ্য।

আমি বললাম, এবার? সিনিয়র বাই ওয়ান জেনারেশন। কি বলো?

রাণু বলল, ফাজিল।

বললাম, চলো, দিদির বাড়ি যাই। তারপর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে অফিস যাব।

ও বলল, আমি তো মায়ের কাছে যাব।

আমি বললাম, তা যাবে যেও, কিন্তু আমি অফিস থেকে ফেরার আগেই ফিরে এসো। তুমি তো আর আমার একার থাকবে না। একটা দুরন্ত দামাল ছেলে অথবা রিনরিনে গলার মিষ্টি মেয়ে তোমাকে দখল করে নেবে। কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে। এই ক'টা মাস তোমাকে এক মুহূর্তও হারাতে চাই না আমি।

রাণু বলল, এখন থেকে মার কাছেই থাকতে হবে। মা অনেকদিন আগে থেকেই বলে রেখেছে মশাই। বাবারও তাই ইচ্ছা।

আমি বললাম, একদমই না। তোমার মাকে প্রমিস করে আসব যে, কোনো রকম দুষ্টুমি করব না আমি। লক্ষ্মী ছেলের মত তোমার পাশে চুপটি করে শুয়ে থাকব শুধু। তোমার জন্যে আচার কিনে আনব নানারকম। বড়বাজার থেকে। কিন্তু তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। একবারও আদর না করে কাটিয়ে দেব এই ক'মাস। দেখো তুমি।

এত অসভ্য না।

বলে, রাণু লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার সর্দারজী। বাংলা বুঝছে না ভেবেই কথাবার্তা বলছিলাম।

হঠাৎ ড্রাইভার পরিষ্কার বাংলায় বলল, সোজা যাব?

রাণু এবার আমার হাঁটুতে জোরে একটা চিমটি কাটল।

আমি বললাম, সরী।

ড্রাইভার বলল, আজ্ঞে?

আমি আরও ঘাবড়ে গিয়ে, তুতলে বললাম, ডানদিকে।

দিদির বাড়ির সামনে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নামতেই রতনদা দৌড়ে এল।

বলল, পিন্টু, দাদার অবস্থা প্রায় লুনাটিকের মত।

কী সব বলছেন। পাগল হয়ে গেছেন। জামাইবাবু।

রতনদা বললেন, আজ সকালের ডাকে শান্তুর একটা চিঠি এসেছে। পরশু রাতে আসানসোল স্টেশান থেকে ড্রপ করেছিল। চিঠিটা পড়ে কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে দাদা। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ছেলেমানুষের মত। এ দৃশ্য দেখা যায় না। শান্তুটা যে কী করল!

আমি এগোতে এগোতে বললাম, কী লিখেছে শান্তু? চিঠিতে?

রতনদা পকেট থেকে একটা ইনল্যান্ড লেটার বের করে দিলেন।

রাণু, রতনদার সঙ্গে ভিতরে গেল। আমি ড্রয়িংরুমে বসে চিঠিটা খুললাম।

শান্তু লিখেছে :

মা ও বাবা,

আমি তোমাদের যোগ্য হতে পারলাম না

আমার জন্যে তোমাদের কষ্টের ও অপমানের শেষ নেই। পাশের বাড়ির বুড়ি ক্লাসে প্রত্যেকবার সেকেন্ড-থার্ড হয়। রানী মাসীমার ছেলে, মনাও ফারস্ট ডিভিসনে পাশ করবে অঙ্ক ও ফিজিক্স-এ লেটার পেয়ে। আর আমি জানি যে, আমি টেস্ট-এ অ্যালাওই হবো না।

আমি তোমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু তোমরা এটুকু জেনো যে, তোমাদের যতটুকু দুঃখ দিয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ পেয়েছি আমি নিজে।

আমাকে তোমরা ভুলে যেও। মনে করো যে, আমি মরে গেছি।

সকলের কাছেই বড়লোক হওয়াটা, সুখে থাকাটাই কিংবা ডাক্তার, উকিল অথবা ভদ্রলোক কেরানী হওয়াটাই একমাত্র ব্যাপার নয়। আমি যা হতে চাই, আমি তাই-ই হবো। আমি ছবি আঁকব, গান গাইব এবং লেখক হব।

যদি তা নাই-ই পারি, তাহলে ফুটপাথে পানের দোকান দেব। অথবা তেলেভাজার। যদি আমার এই পরিচয় তোমাদের কখনও গর্বিত করে, সেদিনই ফিরে আসব নিজে স্বাবলম্বী হয়ে।

আর যদি লজ্জিত করে, তাহলে আর কখনও ফিরব না।

তোমাদের ভালোবাসা, স্নেহ-মমতার ঋণ কোনোদিনও শোধ করতে পারব না।

বাবা মার ঋণ কখনও শোধ করা যায় না।

আমি জানি।

তোমরা দুজনে আমাকে ক্ষমা করো। ইতি—

তোমাদের অযোগ্য ছেলে শান্তু।

চিঠিটা পড়ে আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল।

নরম, লাজুক, স্বল্পবাক্; একটু মেয়েলী, স্বচ্ছল মা-বাবার একমাত্র ছেলে শান্তুর মধ্যে যে এমন একজন দৃঢ় মেরুদন্ডের পুরুষমানুষ লুকিয়ে ছিল তা আমি কখনও ভাবতেও পারিনি। শান্তুর মা বাবাও কি জানতেন?

জামাইবাবু রাগ করে বলেছিলেন, নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

কিন্তু আমি জানি যে, কথাটা সত্যি নয়। হলে, শান্তুর মামা হিসেবে আমারও শান্তুর মতই চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকত।

আমি কীই বা করেছি জীবনে ?

সাধারণ ছাত্র। দিদি-জামাইবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় লেখাপড়া শিখেছি। সাধারণ হয়েও আমার যোগ্যতার চাইতে অনেক বড় মাপের একটা চাকরি পেয়েছি জামাইবাবুরই কল্যাণে। নিজের জীবনকে ইচ্ছানুযায়ী চালিত যে করা যায় ; এ-কথা ভাবার মত মনের জোরই আমার ছিলো না। শান্তুর মত আরাম ও আদরের জীবনের সমস্ত পাহারা স্বেচ্ছায় ছেড়ে গিয়ে নিজের ভাগ্য অন্বেষণের জন্যে অজানা গন্তব্যে পাড়ি দেবার মত সাহসও আমার ছিল না। কখনও এ-সব কথা ভাবিও নি। জীবন মানে ঃ মোটামুটি একটা ভালো চাকরি, ভালো-থাকা, ভালো-পরা, একজন মিষ্টি স্ত্রী। মধ্যবিত্ত বাঙালীর অল্প সুখের, অল্প সাধের আটপৌরে জীবন। এই-ই মোক্ষ। এইটুকুই জানতাম।

ছোট্ট শান্তুর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন নুয়ে এল।

রাণু উদ্বিগ্ন হয়ে দৌড়ে এসে ডাকল আমাকে, বলল, অ্যাই, তাড়াতাড়ি এসো জামাইবাবু ডাকছেন তোমাকে।

ঘরে ঢুকে দেখি দিদি ঘরের কোণায় চেয়ারে পাথরের মতন বসে। আর জামাইবাবু খাটের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছেন। চোখ বসে গেছে। চুল অনেক বেশী পেকে গেছে রাতারাতি।

আমাকে দেখেই বললেন, দ্যাখ্, দ্যাখ্ রে। তোর আদরের বোনপো আমার কি দশা করেছে দ্যাখ্। ও যদি এই-ই চেয়েছিল তো একবার আমাকে বলল না কেন ? আমাদের ও ছাড়া আর কে আছে বল ? ওর জন্যেই তো সব, সব কিছু। শান্তু কি একবার আমাকে বলতে পারত না যে, ও কী হতে চায় ?

আমি মুখ নিচু করে ভাবছিলাম, বললে, আপনি কি শুনতেন জামাইবাবু ? ও চলে যাবার আগে ওর আলাদা অস্তিত্ব ও মানসিকতা সম্বন্ধে আপনি অথবা দিদি কেউই কি সচেতন ছিলেন একটুও ? ওকে আলাদা একটা মানুষ বলে স্বীকার করেছিলেন কি ? আমরা কেউই কি করেছিলাম ?

কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না। চুপ করে তাকিয়ে রইলাম জামাইবাবুর মুখে।

তারপর জামাইবাবু একটু দম নিয়ে বললেন, বুঝলি, শান্তুর বয়সে সিকিওরিটিকে, টাকাকে সহজেই তাচ্ছিল্য করা যায় ; কিন্তু বয়স হলে তখনই বোঝা যায় যে, টাকাটা কত মূল্যবান। ও যাতে সুখে থাকে তাই-ই চেয়েছিলাম। আর ও এমনি করে চলে গেল। বল্ তো ! তোরাই বল ?

অতবড় রাশভারী মানুষটা ভাঙা গলায় কেঁদে কেঁদে কথা বলছেন ! এ দৃশ্য যেমন অভাবনীয়, তেমনই হৃদয়-বিদারক। জামাইবাবুকে কখনওই আমি একটুও উত্তেজিত হতে দেখিনি। চেঁচিয়ে কথা বলতেও না। আর সেই জামাইবাবু !

রাণু চা নিয়ে এসে বলল, জামাইবাবু, উঠুন, উঠে বসুন। চা খান।

জামাইবাবু উঠে বসে চা হাতে নিলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জামাইবাবু বললেন, জানিস পিন্টু, আমার কি ইচ্ছা ছিল ? আমার ইচ্ছা ছিল এয়ার-ফোর্সের পাইলট হবো আমি। ফাইটার পাইলট। আমার যখন

আঠারো বছর বয়স তখনই যুদ্ধে যাওয়ার একটা সুযোগ এসেছিল। মাকে এ-কথা বলতেই বাবা আমাকে ডেকে বললেন, তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব। আমার এত বড় লাইব্রেরী ; কোলকাতা বার-এ এত জানাশোনা ; না, না। তোমাকে আইন পড়তেই হবে। উকীল হতেই হবে। তারপর চেম্বারে বোসো। আমি অনেকদিন খেটেছি, আর পারব না। আর আমি জোয়াল টানব না। আমি মিহিজামে গিয়ে গোলাপ বাগান করব।

তারপরই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন জামাইবাবু।

বললেন, জানিস, ত্যাজ্যপুত্র করার ভয়টাতে ভয় যে একেবারেই পাইনি তা নয়। আমি যেভাবে মানুষ হয়েছিলাম, বাবার দয়া না থাকলে তো সেভাবে চলত না। কিন্তু বাবার মুখের দিকে চেয়ে আমার এও মনে হয়েছিল যে, বাবার ইচ্ছানুযায়ী কাজ না করলে বাবা জেনুইন্‌লি হার্ট হবেন ; ভীষণ দুঃখ পাবেন। আমার পাইলট হতে না-পারার কারণ আসলে সেটাই। অথচ আমার একটামাত্র ছেলে আমার ফীলিংস-এর কথাটা একবারও ভাবল না ?

একটু চুপ করে থেকে জামাইবাবু বললেন, আমি একজন সাকসেসফুল উকীল। যে কোনো কাজই ভালো করে করার মধ্যে একটা আনন্দ, থ্রিল আছেই, কিন্তু বিশ্বাস কর, আজকেও যখন আকাশে প্লেনের গুড়্ গুড়্ শব্দ শুনি, মনে হয়, এই কালো গাউন ছুঁড়ে ফেলে হাইকোর্টের বড় বড় থামওয়ালা বারান্দা দিয়ে দৌড়ে চলে যাই কোনো গোপন এয়ারপোর্টে, যেখানে ছোট্ট ছোট্ট ফাইটার জেট্‌বা আকাশে সাদা-ধোঁয়ার ছায়াপথ এঁকে উড়ে উড়ে শব্দর চেয়েও বেশী স্পীডে মাটিতে নেমে এসে একে একে মাটির তলায় ক্যামোফ্লেজ-করা হ্যাঙ্গারে ঢুকে যায়।

বলেই, জামাইবাবু একেবারে চুপ করে গেলেন।

আমি বললাম, জামাইবাবু, চা-টা খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এখনও যদি আপনি এরকম করেন, তাহলে চলবে কেন ? খবর তো পাওয়া গেছে শান্তুর।

উনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, একে খবর বলে না।

আমি বললাম, ও বেঁচে তো আছে। ও যে গাড়ি চাপা পড়েনি, গুম্ হয়নি, এটাও কি স্বস্তির নয় ?

জামাইবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে অবাক চোখে তাকালেন আমার চোখে। বললেন, একে বেঁচে থাকা বলে না।

তারপর কি যেন বলতে গিয়েই থেমে গেলেন।

ডাঃ ভৌমিক এবং ডাঃ রায় এসে ঢুকলেন ঘরে।

কী ব্যাপার ? জামাইবাবু চটে উঠে, ছেলেবেলার বন্ধু ডাক্তারকে শুধোলেন।

ডাঃ ভৌমিক হেসে বললেন, দ্যাখ সাধন, ছেলের খবর তো পাওয়া গেছে। সে তো আর হারিয়ে যায়নি। চুরি-ডাকাতি করেও বাড়ি থেকে যায়নি। কতদিন পালিয়ে থাকবে ও ? দেখিস ও শীগগিরই ফিরে আসবে। তোর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু এত বড় সংসারে নিজের ছেলে, নিজের জগৎ নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে চলবে কেন ?

জামাইবাবু বললেন, তুই চুপ কর তো গণশা। শালার দার্শনিক এসেছেন। তোর ছেলে হারালে তুই বুঝতিস। বেশী জ্ঞান দিস না। কোথায় আছে ? কী খাচ্ছে ? টাকা নেই, পয়সা নেই...অতটুকু ছেলে !

আমরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

রতনদা বলল, ভৌমিকদা এসে গেছেন। সেডেটিভ পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই দেখিসনি, সে কী কান্না ! আমার নিজেরই হার্ট-অ্যাটাক হবার অবস্থা দাদাকে দেখে। একবার কাঁদছে, একবার হাসছে। এখনও দেখলি না, কিরকম কনফিউজড় ?

বললাম, আমি তুমি আর কি করতে পারি বল ? পুলিস তো ওয়ারলেসে সব জায়গায় মেসেজ পাঠিয়েছে। যা যা করার সবই তো করেছ তোমরা।

রতনদা বললেন, আমি তো তাই-ই বলছি। ফিরে আসবেই ও। আজ আর কাল। যাবে কোথায় ? ফিরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বললাম, আমি এবার এগোই রতনদা, রাণুকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অফিসে যাব।

রতনদা বলল, গাড়িটা নিয়ে যা না। আমি তো ছুটি নিয়েছি অফিস থেকে। আমার ছুটির মধ্যে ছেলেটা ফিরে এলেই বাঁচোয়া।

আমি বললাম, গাড়ি নিয়ে কি হবে। তোমাদের কখন কী দরকার হয়, গাড়ি থাক এখানে।

দিদির বাড়ি থেকে বেরিয়েই, মোড়ে ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম।

রাণুকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। ও আমার কাঁধ ঘেঁষে বসেছিল।

ট্যাক্সিটা চলতে আরম্ভ করতেই, রাণু বলল, অ্যাই জানো, আমার না ভীষণ ভয় করছে।

আমি বললাম, কেন কিসের ভয় ?

ও ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বাচ্চা হওয়ার সময়েই কষ্ট হয় জানতাম, মানে শারীরিক কষ্ট। তারপর সারাজীবন এমন কষ্ট ? বাবাঃ আগে জানলে, চাইতামই না।

আমি ওর পেটে হাত ছুঁইয়ে বললাম, জামাইবাবুর সব কথাই শুনেছে ব্যাটা। এ-সব কথা শোনার পরও, বাবা-মায়ের এত কষ্ট দেখার পরও যদি ব্যাটা আমাদের কষ্ট দেয় তো বলার কিছুই নেই।

রাণু বলল, তোমার সবটাতে এই ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না।

সামনেই, রাস্তার বাঁদিকে একটা স্কুলের সামনে খুব ভিড়। টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে বোধহয় আজ থেকে। শান্তুর বয়সী ছেলেরা এবং তাদের ভয়ার্ত, চিন্তিত মা-বাবারা ভিড় করেছেন স্কুলের গেটের সামনে। শান্তু থাকলে ও-ও পরীক্ষাতে বসত আজ।

ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এদেশে এখন আর কারোই ছেলে-মেয়ে না-হওয়াই ভালো। দেশের মেরুদণ্ড, জাতির ভবিষ্যৎ এই উজ্জ্বল, উৎসুক চোখের ছেলে-মেয়েগুলোর কি হবে ? কোন্ প্রতিশ্রুতি আমরা রেখেছি ? কোন্ ভরসায় পৃথিবীতে এনেছি, আনছি আমরা এদের ? বঞ্চনাতে, সবরকম বঞ্চনাতেই ভরে দিয়েছি আমরা ওদের। এ লজ্জা রাখার জায়গা কি আছে ?

একটা ছেলে ডাকল, বড় মামা, বড় মামা।

ট্যাক্সিটা দাঁড় করাতে বললাম।

ছেলেটা দৌড়ে এল। হাতে স্কেল, জ্যামিতির বাক্স। ও শান্তুর বন্ধু মিঠু। ও অন্য স্কুলে পড়ে কিন্তু দিদিদের পাড়াতেই থাকে।

কপালে দইয়ের ফোঁটা। ওর শুভার্থিনী মা পরিয়ে দিয়েছেন। ছেলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শুধোলো মিঠু, শাস্তুর কোনো খবর পেলেন?

বললাম, পেয়েছি। ও সায়ান্স পড়বে না। চিঠি লিখেছে যে, ও যা হতে চায় তা-ই হবে।

কোথায় আছে শাস্তু? মিঠু শুধোল।

আমি বললাম, সেটা এখনও জানি না।

মিঠু কী একটু ভাবল, তারপর বলল, এইজন্যেই ওকে আমি এতো অ্যাডমায়ার করতাম। সায়ান্স আমারও ভাল লাগে না। বাবা জোর করলেন।

তারপর মুখ নীচু করে বলল, এই পড়াশুনার দামই বা কি? করতে হয় করছি। ডিগ্রী পেয়েও তো কোথাও একটা কেরানির চাকরির জন্যে বছরের পর বছর বসে থাকব। আমরা যে সাধারণ ছেলে। আমরা বেশীর ভাগই তো সাধারণ...। ফালতু...। সব ফালতু...

আমি বললাম, চলি রে।

মিঠু বলল, আচ্ছা। শাস্তু বাড়ি আসলে খবর দেবেন। যাব।

মিঠু স্কুলের দিকে চলে যাচ্ছিল। পরীক্ষা শুরু হবে একটু পর। ওর কপালে দই-এর ফোঁটা। আমার দিদিও কি দিত? শাস্তুকে? যদি আজ পরীক্ষায় বসত ও?

বোধহয় না।

আর রাণু? রাণুও কি দই-এর ফোঁটা পরাবে, ভাগ্যবিশ্বাসী দুর্বল ছেলের দুর্বলতর মা হয়ে?

নিশ্চয়ই না। হয়ত চুমু দেবে কপালে।

সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে; যাবে।

দূরে রাণুদের বাড়ি দেখা যাচ্ছিল।

রাণু বলল, কি ভাবছো গো?

আমি হাসলাম। ওর হাতে হাত ছুঁইয়ে বললাম, যে আসছে; তার কথা; তাদের কথা।

তারপর বললাম, তুমি দেখো রাণু, যে আসছে সে কিন্তু আমাদের ঠিক হারিয়ে দেবে। ও ওরিজিনাল হবে। আমাদের মতো ছাঁচে-ফেলা প্রোটোটাইপ নয়।

রাণু বলল জানো, আমার মা বলছিলেন, ছেলেমেয়েদের কাছে হেরে যাবার মত আনন্দ নাকি বাবা-মায়ের আর কিছুই নেই।

তারপরই, রাণু প্রথম মাতৃত্বের, গর্ব-গর্ব, ভয়-ভয়; কিন্তু দারুণ খুশী মুখে আমার দিকে চাইল একবার। বলল, তাহলে আমাদের খবরটা মাকে বলছি কিন্তু আজ। বুঝলে?

বলেই, বলল: ভীষণ লজ্জা করছে আমার!

আরেকটা স্কুল দেখা যাচ্ছে সামনে, ডানদিকের ফুটপাথে। এখানেও অনেক ছেলে। রিকশা, ট্যাক্সি ও গাড়ির ভিড়। বাবা-মায়েরা; দাদা, দিদিরা।

হঠাৎ আমার মনে হল, এইসব ছেলেদের অনেকের চেয়েই, বাড়ি থেকে পালিয়ে-যাওয়া আমার বোনপো শাস্তু অনেক অন্যরকম। আমরা যা পারিনি, শাস্তুরা হয়ত তা পারবে। আমাদের এই প্রাচীন ঘেরাটোপের মধ্যের ভীরু, একঘেয়েমির ক্লান্তিকর জীবনের নির্মোক

ছিঁড়ে ফেলে ওরা স্বমত, আত্মসম্মানজ্ঞান এবং স্বাধিকারের উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হবে।

একটা নতুন যুগ আসছে। সে যুগের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি। এই নানারকম ডুগডুগি-বাজানো বাঁদর-নাচের দেশে শান্তু, মিঠু এবং লক্ষ লক্ষ শান্তু-মিঠুরা নতুন আলো-হাওয়া, নতুন সাহস এবং প্রত্যয় আনবে। ওদের উপর অনেক ভরসা আমার।

আমি নিশ্চয়ই জানি, এবং জেনে অত্যন্ত গর্বিত যে ; শান্তুকে পাওয়া যাবে না।

শান্তুদের আর পাওয়া যাবে না।

শিঙাল



একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এক পশলা। এখনো গাছ পাতা থেকে টুপটাপ করে জল ঝরছে। মানুষদের আওয়াজটা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে এক সময় মিলিয়ে যেতেই একলা শম্বরটা আস্তে আস্তে ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে কোয়েল নদীতে নেমে এলো।

এখানে জঙ্গলের রাস্তাটা নদীর ওপর দিয়ে চলে গেছে। নদীতে জল বেশী নেই। মানুষদের গাড়িগুলো এলে নদীতে চির্‌চির্‌ করে জল ছিটে ওঠে দু পাশে। আর তার সঙ্গে গোঁ গোঁ করে একটা আওয়াজ। আওয়াজটা এখন একেবারে মিলিয়ে গেছে।

শম্বরটা ওর বিরাট ডালপালা সম্বলিত শিং পিঠের উপর শুইয়ে দিয়ে মুখ উপরে তুলে হাওয়া শুঁকল একবার। মিষ্টি গন্ধ। মহুয়ার। কাছাকাছি অবশ্য মহুয়া বেশী নেই। অসময়ের বৃষ্টিভেজা হাওয়ায় হাওয়ায় বাস আসছে। যে ক'টা মহুয়া ধারে পাশে আছে, সে সব গাছের একশ' গজের মধ্যেও যাবার উপায় নেই। মানুষগুলো কালো কালো লম্বা লাঠির মত কি একরকম জিনিস হাতে প্রায়ই গাছের উপর বসে থাকে। কাছাকাছি পৌঁছলেই গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হয়। আর এক ঝলক আগুন।

ব্যস্‌, আর সেখান থেকে ফিরতে হয় না।

ভোর রাতে যে এক দৌড়ে গিয়ে ভরপেট মহুয়া খেয়ে আসবে তারও উপায় নেই—। সেই অন্ধকার থাকতে কোথা থেকে মানুষদের মেয়েরা এবং বাচ্চারা ঝুড়ি হাতে এসে পৌঁছয়। মহুয়া কুড়িয়ে নিয়ে যায়। সে মহুয়া থেকে মদ তৈরী করে খায় ওরা। তারপর নাচ হয়, গান হয় ; মাদল বাজে।

সন্ধ্যারাতের মাদলের গুম্‌গুমানি পাহাড় ছাপিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জঙ্গলের প্রত্যেক শম্বরের বুকে এসে পৌঁছোয়। ওদের বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে।

এই রকম রাতে যখন সমস্ত বনে, পাহাড়ে, কোয়েলের কাঁচা করম্‌চা-রঙা বালিতে এক চমৎকার শান্তি বিছানো থাকে, যখন শুকনো পাতা উড়িয়ে বনের বুক মুচড়িয়ে, মচ্‌মচিয়ে হাওয়া বয়, দূরের পাহাড়ে ডুবে-যাওয়া চাঁদকে ধাওয়া করে কোনো টী-টী পাখি ডাকতে ডাকতে উড়তে উড়তে জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে যেতে থাকে—যখন জীরহুল আর ফুল দাওয়াইর গন্ধ ভাসে হাওয়ায়—তখন এই শিঙাল শম্বরটা একা-একা, বিস্তীর্ণ পাহাড়ী নির্জনে দাঁড়িয়ে অনেক কথা ভাবে।

মানুষেরা জীপ-গাড়ি চড়ে রাতের সহলে আসে। জানোয়ারদের রাহন-সাহানের খোঁজ নিয়ে এসে এদিকে ওদিকে আলো ফেলে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে যায়। তীব্র আলো ছুরির ফলার মত বনের বুক চিরে এফোঁড় ওফোঁড় করে। মানুষদের গাড়ির ধুঁয়োর বিচ্ছিরি গন্ধে শম্বরদের নাক জ্বালা করে।

শম্বরটা গাছের আড়ালে বোবা-মুখে শান্তির সবুজ আলোয় চোখ ভরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হয়ত দূরের দলের কারো গায়ে গুলি লাগে। সে পুরুষ শম্বরও হতে পারে ; মেয়েও হতে পারে। যার গায়ে লাগে, সে আচমকা পড়ে যায়। তারপর হয়ত উঠে পড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, পায়ের নীচের শুকনো পাতা খচ্‌মচ্‌ করে। পাথরে একটা আছাড় পড়ার শব্দ হয়। জিভটা দাঁতে কামড় খায়। তারপর হয় মানুষেরা জয়োল্লাসে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় নইলে ঐখানেই তাকে কেটে তার শরীরের সুস্বাদু অংশগুলো বয়ে নিয়ে যায়। পরের দিন ভোরে শকুনের ঝাঁক সেই মৃত শম্বরের ক্ষত-বিক্ষত শরীরের অবশিষ্টাংশ নিয়ে খাব্‌লা-খাবলি করে। তার জল-ভেজা অর্ধগলিত চোখ দুটিকে বড় বড় ঠোঁটে ঠা-ঠা রোদে ঠক্‌-ঠক্‌ করে ঠোক্‌রায়।

শম্বরটা, মানুষদের ঘৃণা করে।

যেদিন মানুষরা আসে না, সেদিন বাঘটা আসে। বড় বড় কালো পাথরের আর ঝুপড়ি গাছের ছায়ায় শুকনো পাতা এড়িয়ে পা ফেলে ফেলে গুঁড়ি মেরে বাঘটা একলা শম্বরটার পিছু নেয়। বাঘটা যেমনভাবে প্রায়ই ওর পিছু নেয় ; বেশী দিন ও পালিয়ে বাঁচবে বলে শম্বরটার মনে হয় না।

সব সময় ভয়, কখন কি হয়, কখন কি হয়। তার উপর এখন সে একা, একেবারে একা। ওর পুরানো দলটা দক্ষিণের পাহাড়ের নীচের গভীর নালায় শাকুয়া আর আসন্‌ গাছের ছায়ার নীচে থাকে দিনের বেলায়। ওখানে একদল শুয়োরও থাকে। শুয়োরগুলোর প্রত্যেকের মুখ চেনে শম্বরটা। দোষের মধ্যে শম্বরটা একদিন একটা আমলকী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সেই ফিকে পাটকিলে রঙা মেয়ে শম্বরটার গলায় একটু মুখ ঘষেছিল। মেয়ে শম্বরটা আরামে আনন্দে, একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ওরও খুব ভালো লেগেছিল। ঠিক অমনি সময় দলের সর্দার শম্বর প্রকাণ্ড শিং নিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর শিঙে শিঙে কি খট্‌খটি। সেই প্রচণ্ড লড়াইয়ের আওয়াজ শুনে টিয়ার দল ডানা ঝট্‌পটিয়ে উড়ে গেছিল। সবুজ টুঁই পাখিগুলো ঘাস ফড়িং-এর মত উত্তেজনায় টিঁ-টুঁই টি-টুঁই করে চারপাশে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, এখনো মনে আছে। শম্বরটা তারপর একসময় লড়তে-লড়তে লড়তে-লড়তে ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শিঙাল সর্দারের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠেনি ও। রক্ত চুঁইয়ে পড়েছিল ওর বড় বড় লোম-ভরা গায়ে। পায়ের নীচের লাল মাটির সঙ্গে রক্ত মিশে কাদা কাদা হয়ে গেছিল খুরের ঘায়ে ঘায়ে।

তারপর এক সময় শীতের বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে টলতে টলতে তার সুন্দরী সঙ্গিনীর গায়ের গন্ধ থেকে, তার দুঃখ সুখের দল থেকে, শম্বরের সমাজ থেকে সে চিরদিনের মত নির্বাসিত হয়েছিল। পুরুষ-শাষিত শম্বর সমাজে অন্য সমর্থ পুরুষের জায়গা হয়নি এক দলে।

তারপর থেকে শম্বরটা একা একাই ঘুরে বেড়িয়েছে। 'একরা' হয়ে গেছে। সমস্ত রাত নদীর চরে দৌড়ে বেড়িয়েছে। শক্ত শাল গাছের সঙ্গে প্রহরের পর প্রহর শিং ঠুকে পরীক্ষা

করেছে তার শিং শক্ত হয়েছে, কিনা। ও দাঁতে দাঁত চেপে বার বার বলেছে, একদিন না একদিন তাকে দলে ফিরে যেতেই হবে। তাকে লড়তেই হবে সর্দারের সঙ্গে। লড়ে, তাঁর শিঙের আঘাতে সর্দারকে ক্ষতবিক্ষত ভূলুণ্ঠিত করে সর্দার একদিন যেমন করে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দল থেকে, ঐ ক্ষমতাপিপাসু সর্দারকে ও নিজেও তেমনি করেই তাড়িয়ে নিজের শিঙেও ক্ষমতালিপ্সার মহার্ঘ মুকুট পরবে। ওর দলের উপর তখন কেবল ওর একারই অধিকার থাকবে। ওর সেই পাটকিলে-রঙা বান্ধবীকে তখন ও পাটরানী করবে।

এই রোজকারের ব্যায়াম, একা একা, সশব্দ মানুষকে এবং শব্দহীন বাঘকে বাঁচিয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করে করে শম্বরটা আগের থেকে অনেকটা সবল হয়ে উঠেছে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। যেদিন দল থেকে নির্বাসিত হয়েছিল, সে রাত জঙ্গলে পাহাড়ে একেবারে একা একা কি দারুণ ভয়ে আ: আশঙ্কায় যে কেটেছিল তা আজও শম্বরটার মনে আছে।

কোয়েল নদীর বালিময় বুকে চাঁদনী রাতে একা একা হাঁটতে হাঁটতে শম্বরটা প্রথম প্রথম দাঁতে দাঁত ঘষত। সর্দারের উপর ওর প্রথম প্রথম ঘৃণা হত। কিন্তু ইদানীং ও কেমন যেন বুঝতেও পারে সর্দারকে। একটু যেন শ্রদ্ধাও হয় সর্দারের উপর। শ্রদ্ধা হয়ত হত না যদি ও এতদিন তিল তিল করে সর্দারের প্রায় সমকক্ষ না হয়ে উঠতো। নিজে একা একা বাঁচার চেষ্টা করে আজ শম্বরটা বুঝেছে যে, নিজে বাঁচাই যদি এত কঠিন হয় তো অত বড় দল ; মেয়ে ও বাচ্চা শম্বরে ভরা দলকে বাঁচাবার দায়িত্ব কতখানি !

গরমের সময় সর্দারকে হাতির দলের পথের চিহ্ন দেখে কুটরা, বাইসন, চিতা সকলের সঙ্গে মরুভূমির মত লু-বওয়া বনে বনে যখন জলের সন্ধানে ঘুরতে হয় , জলের কাছাকাছি থাকতে হয় ; তখন জলের কাছাকাছি বাঘও থাকে। বাঘের হাত থেকে দলের সকলকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় প্রতি দিন, প্রতি রাত, প্রতি মুহূর্ত। আবার বর্ষার দিনে পাহাড়ী নদীর ঢল বাঁচিয়ে কোথায় কি খাবার আছে তার খোঁজে ফিরতে হয় সকলকে নিয়ে। বুনো কুকুরের দল যখন আসে, তখন দলের ছোট বড় সকলকে বাঁচাবার দায়িত্ব সর্দারের উপরই পড়ে। তারপরে একদিন যখন শীত আসে, পাহাড়ের উপত্যকার ক্ষেতে ক্ষেতে যখন গেঁহু বাজরা লাগে, কুলথী লাগে, সুরগুজা লাগে ; যখন অড়হরের ক্ষেতের গন্ধ শীতের শেষ রাতের কুয়াশায় ভাসতে থাকে, তখন পাহারাদার গাঁওয়ালাদের পাহারা এড়িয়ে, শিকারী মানুষের চোখ বাঁচিয়ে এতবড় দলকে সামলে নিয়ে ভালোমন্দ খাবার খুঁজে বেড়াতে হয়। যখন গরম অসহ্য হয়, যখন পাহাড়ে পাহাড়ে দাবানল জ্বলে, জঙ্গলকে জঙ্গল হু-হু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ; সেই সময় পোড়া গাছ, ধোঁয়া আর আগুনের তাপ ছাড়িয়ে দূরে—অনেক দূরে, কোনো ঠাণ্ডা ছায়ার উপত্যকায় সারা দলকে নিয়ে যাবার দায়িত্বও তখন সর্দারের উপরই পড়ে।

শম্বরটা ভাবে, তবু সর্দার হলে নিজের দায়িত্বে তার দলকে নিয়ে যা খুশিও করা যায়। কোনো সুন্দর ছবির মত শীতের দুপুরে পালামৌর জঙ্গলের আমলকী গাছের ছায়াভরা কোনো পাহাড়ী মালভূমিতে সমস্ত দলকে নিয়ে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়ানো যায় ; আরো কত কী, কত কীই করা যায়।

একদিন না একদিন শিঙাল শম্বরটা তার দলে ফিরে যাবেই। তার দলের সর্দার সে হবেই। প্রায়ই রাতে তাই শম্বরটা স্বপ্ন দেখে যে, ও টিলার উপরে শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,

আর সর্দার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত শরীর নিয়ে অপমানের বোঝায় মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে টিলা বেয়ে তার দল ছেড়ে কোনো অজানা বনের দিকে চলে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে এসব কথা ভাবছিল শম্বরটা। ভাবতে ভাবতে ও খুব রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। নিজের মনে একেবার হেসে উঠল: ঘ্যাক্ ঘ্যাক করে। নিস্তব্ধ রাতে নদীর কোলের সে আওয়াজ দুধারের উঁচু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুবের পাহাড়ের নিচের ঝোপেঝাড়ে একটা টীটী পাখি ডাকতে ডাকতে উড়তে লাগল। একটা কুটরা হরিণের ভয় পাওয়া ডাক কানে এল, ব্বাক্ ব্বাক্। শম্বরটা এক দৌড়ে নদীর এপারে এসে গাছের আড়ালে গিয়ে, ঐদিকে সাবধানে চেয়ে রইল বাঘের মতলব বোঝার আশায়।

২

সকাল থেকেই আজ আকাশ মেঘলা। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে একফালি চাঁদ উঁকি মারছে জঙ্গলের মাথায় তারপরই আবার কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাথুরে মাটিতে প্রথম জলপড়ার পর থেকে সেই মিষ্টি গন্ধটা মাটি ছেড়ে উঠে জঙ্গলময় ছড়িয়ে গেছে। একটা এলোমেলো ভিজে হাওয়া বনের শাখা-প্রশাখা ঘাস-পাতা উথাল-পাথাল করছে।

শম্বরটা ওদের পুরানো আস্তানার দিকে এগিয়ে চলেছে। দু'দুটো পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে।

কতক্ষণ চলেছে মনে নেই শম্বরটার, তবে এখন চেনা পটভূমিতে এসে গেছে। সেই বড় শাকুয়া গাছটা। আসন আর পিয়াশালের জঙ্গল। পশ্চিমের পিটীস ঝোপে ভরা টিলা। সব, সবই খুব চেনা মনে হচ্ছে।

শম্বরটার বাবার ঠিক নেই। ও কানীন।

যে-শিঙাল সর্দারকে পরাজিত করবে বলে ও আজ দলের কাছে ফিরে এসেছে, সে ওর বাবাও হতে পারে। যে মেয়ে-শম্বরটাকে ওর ভালো লেগেছিল। দলের সেই পাটকিলে শম্বরীটা ; সে তার বোন অথবা মাও হতে পারে। শম্বরদের সমাজে মা-বাবা মা-পুত্র ভাই-বোন কিছু নেই। শুধু বাচ্চা আছে আর ধাড়ি আছে। মরদ আছে আর মাদী আছে। যেখানে মেয়ে শম্বরেরা থাকে, সেখানেই ক্ষমতার প্রশ্ন থাকে, সেখানে একসঙ্গে দুজন মস্তান থাকতে পারে না। যার শিঙে জোর বেশী, শুধু সেই পুরুষই থাকে। মাত্র একজন।

এবার বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে শম্বরটা। আর একটু গেলেই সেই টিলাটায় পৌঁছে যাবে। তারপরই নালাটা। হঠাৎ শিঙালটার নাকে জীপ-গাড়ির পেট্রোলের এবং অন্য কিছু একটা বিচ্ছিরি পোড়া-পোড়া গন্ধ এল। শম্বরটার নাক জ্বালা করতে লাগল। ও সাবধানে আর একটু এগোতেই দেখল টিলার নিচে নালার পাশে, জঙ্গলের দিকে ওর পুরানো দলের প্রায় সব শম্বর শম্বরী অন্ধকারে গোল হয়ে কি যেন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ ঐখানে দাঁড়িয়ে সে সর্দারকে খুঁজতে চেষ্টা করল ভীড়ের মধ্যে। কিন্তু দেখতে পেল না। তখন তার শিং দুটোকে তার চওড়া কাঁধের উপর শুইয়ে, আত্মবিশ্বাসের ধীর পায়ে শম্বরটা ওর দলের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

ওকে দেখতে পেয়েই সকলে ওকে জায়গা করে দিল। শম্বরটা দেখল যে শিঙাল সর্দার

হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে আধশোয়া ভঙ্গীতে মাটিতে পড়ে আছে। সর্দারকে মানুষরা গুলি করেছিল। কিন্তু গুলিটা পেটে লেগেছিল বলে বড় রাস্তা থেকে এত দূরে পালিয়ে আসতে পেরেছে সে। সর্দারের নাড়ি-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে গেছে। শাল গাছের চারায় আটকে আটকে আছে। শিঙাল সর্দারের দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

শম্বরটা আস্তে আস্তে সর্দারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শম্বরটার মনে হল, সর্দার যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সর্দারের চোখে "তোমারই সব রইল, এদের মালিক তুমি" গোছের একটা ভাব ফুটে উঠল। পরক্ষণেই সর্দারের লম্বা গ্রীবা ও প্রকাণ্ড মাথা মাটিতে আছড়ে পড়ল। দলের সব পুরুষ ও মাদী শম্বর নিঃশব্দে মৃত শিঙালটার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শম্বরটা ওর চারদিকে চেয়ে দেখল। তার পুরনো দল, তার পাটকিলে রঙের বান্ধবী। ওরা সকলেই তার আদেশের প্রতীক্ষায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেন!

যে-দলের সর্দারী করার স্বপ্ন দেখেছে ও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ; যে-সুন্দরী শম্বরীর গায়ের গন্ধ পেয়েছে কল্পনায় সে, তারা সকলে প্রত্যেকে, তাদের নতুন সর্দারের কাছে বাধ্যতা, আনুগত্য ও শ্রদ্ধার শপথ নিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে।

শম্বরটা মেঘলা আকাশে নিচের এলোমেলো বৃষ্টি ভেজা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে টিলা ছেড়ে নেমে যেতে লাগল।

সেই সুন্দরী শম্বরী চোখ তুলে নরম করে চাইল। বোধহয় বলতে চাইল কোথায় চললে ?

শম্বরটা কান নাড়াল। বলল, জানি না।

ওরা সমস্বরে বলল, তার মানে। তুমি কী আমাদের সর্দার হবে না ?

শম্বরটা হাসল। তারপর বলল, নাঃ।

তবে আমাদের সর্দারী কে নেবে ?

শিঙালটা নামতে নামতে মুখ ঘুরিয়ে বলল, হয়ত নতুন কেউ আসবে অন্য কোনো দল থেকে বিতাড়িত হয়ে হয়ত তোমাদের দলেই কেউ সর্দার হয়ে উঠবে। আমি জানি না।

ওরা সকলে বলল, না! আমরা তোমাকে চাই।

শম্বরটা হাসল, ঘ্বাক্‌ঘ্বাক্‌ করে। বলল, চললাম। তোমরা সব ভালো থেকো। বাঘটা কাছাকাছিই আছে। মানুষরাও আবার আসতে পারে।

সেই পাটকিলে শম্বরী ওর পিছু পিছু অনেকখানি এল। ওকে বার বার শুধোল, তুমি কেন যাচ্ছ বলে যাও ; কোথায় যাচ্ছ বলে যাও।

শম্বরটা দাঁড়িয়ে পড়ে শম্বরীর গলায় জিভ দিয়ে চেটে একটু আদর করে দিল। তারপর বলল, নতুন দলের খোঁজে যাচ্ছি। যে-দলের শিঙাল সর্দার এখনও জীবিত আছে। যে আমাকে দেখেই রুখে দাঁড়াবে। যার রক্তে আমাকে রক্তাক্ত হয়ে তারপর সর্দারী পেতে হবে।

শম্বরী অবাক হয়ে বলল, কেন ? সর্দারী তো তুমি এমনিতেই পাচ্ছ। তার জন্যে মিছিমিছি রক্তারক্তি করবে কেন ?

শম্বরটা টিলার প্রায় নিচে নেমে এসে বলল, তুমি বুঝবে না। বিশ্বাস কর, বললেও তুমি বুঝবে না।

ততক্ষণে আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একফালি চাঁদ আবার উঁকি দিয়েছে। ঝোড়ো

বাতাসে শিঙাল শম্বরের তাজা রক্ত ও নাড়িভুঁড়ির গন্ধ ভাসছে।

শম্বরটা টিলা থেকে নেমে এসে যে পথে এসেছিল সে পথে আবার ফিরে চলল। কোথায়, তা ও জানে না।

বাঘটা পথের পাশের একটা বড় পাথরের আড়ালে এতক্ষণ সামনের দু'থাবার উপরে মুখ রেখে শুয়েছিল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে, এবার লাফিয়ে পথে নামল। তারপর গাছের ছায়ায় ছায়ায়, সাবধানী পা ফেলে ফেলে ; শিঙাল শম্বরটার পিছু নিল।

চেয়ার



ঈসস্ চেয়ারটা এত আন-কমফরটেবল্ যে বলার নয়!

রাজেন সেন সাইড-টেবল থেকে পোরসিলীনের সুদৃশ্য ডাবর তুলে পানের পিক ফেলে জর্দার গন্ধ ছড়ালেন।

তাঁর সামনে তখন গজেন আর রাধু বসেছিল। তারা সমস্বরে বলে উঠল, আরাম পান না বুঝি? বসে?

রাজেন সেন মিচকি হাসলেন একটু।

বললেন, সব কিছুতে বসেই কি আরাম হয়? না সব কিছুতে চড়ে? কি হে?

কথাটার মধ্যে অশালীনতা ছিল। কিন্তু রাজেন সেন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। এমনই একটা পদে তাঁর অধিষ্ঠান যে তিনি যে ভুল বা অন্যায় বা অশালীন কিছু করতে বা বলতে আদৌ পারেন এ ধারণাটাই তাঁর মোসাহেবরাই তাঁর মস্তিষ্ক থেকে মুছে দিয়েছে। তাঁর নিজের মনেও এমনই ধারণা জন্মে গেছে অনবধানে যে তাঁর মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। যে কোনো ব্যাপারেই তাঁর বিচারটাই শেষ বিচার। তাঁর মতটাই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য মত। তাঁর মত সৎ, মহৎ, পক্ষপাতিত্বহীন ভদ্র ব্যক্তিও আর নেই; তাঁর নিজের মতে। টেলিভিশানের দৌলতে, যে-বিষয় চর্চা করে তাঁর রুজিরোজগার, সে বিষয় ছাড়াও দুনিয়ার তাবত বিষয়েই তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য জন্মে গেছে, তাঁর নিজের মতে। সঙ্গীত, সাহিত্য, ফুটবল, ক্রিকেট, শিল্পকলা, কুস্তী এমনকি জুডোও এখন তাঁর 'পাণ্ডিত্যের' বিষয়। কিং ক্যানুটের মত তিনি যাইই মনে করেন তাইই ধ্রুব ও অভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাঁর টেবলের সামনে তাঁকে ঘিরে বসে-থাকা নিরন্তর স্তবকারী কৃপাপ্রার্থী স্তাবকের দল। তাদের দল বদলায়, বয়স বদলায়; রঙ বদলায় কিন্তু উঁচু চেয়ারে আসীন সেন সাহেব একটুও বদলান না। বদলাননি গত কুড়ি বছরে তাঁর নিজের মতে।

সূর্যও ইদানীং রাজেন সেনের কথাতেই ওঠে এবং ডোবে। রাজেন সেনের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অবহিত না থেকেও।

বেচারী সূর্য!

রামু একটা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢুকল।

—কি এটা?

—বাজেট।

—রেখে যাও। বিরক্ত গলায় বললেন সেনসাহেব। অফিসের কাজ ছাড়া আর সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর উৎসাহ। অফিসের কাজ তিনি দয়া করেই করেন।

স্যার। বড়সাহেব বলেছেন এটা আজই দেখে, বিকেলে ওঁকে ফেরত দিতে। খুব জরুরী।

রামু চলে যেতেই ইন্টারকম্ পিঁ-পিঁ করে উঠল।

পূর্ববাংলার সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্কহীন রাজেন সেন ঠাট্টা করে বললেন, হালায় কয় কি ?

টেবলের উল্টোদিকে বসা গজেন আর রাধু সেনসাহেবের গভীর ও বিস্ময়কর সেন্স অফ হিউমার অ্যাপ্রিসিয়েট করে হো হো করে হেসে উঠল। মোসাহেবদের অ্যাপ্রিসিয়েসনের কোনো ডিপ্রিসিয়েশান্ নেই।

সেনসাহেব ইন্টারকম-এর সুইচ টিপে রিসিভার তুলে নিলেন। এক মুহূর্ত শুনলেন। বললেন, আই সী। ঠিক আছে। বুঝেছি। বলেই, ফোন নামিয়ে রেখে বিরক্ত গলায় ওদের শুনিয়ে বললেন, ফুঃ। বাজেট।

গজেন ও রাধু আবারও হাসল। ওদের মুখের ভাব, রাম-ভক্ত হনুমানের মুখের ভাবের মতই স্থির। উজ্জ্বল প্রশস্তির সুরে বাঁধা তাদের মুখচ্ছবি।

অ্যান একসারসাইজ ইন আটার ফিউটিলিটি।

সেনসাহেব বললেন।

কি ? কেন ?

কি আবার ? গুজু হালদারের পি এ ফোন করেছিল। এই বাজেট-ফাজেট। প্রতি বছরই তো পরে ভ্যারিয়েশনের ঠেলায় অস্থির। তবে আর এত দামামা-ডংকা কেন ? আসলে, বুঝলে, এই ডিকটেটরের কোম্পানীতে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। মালিকের মন যারা রাখতে পারে তারা রাখুক। আমার কোয়ালিফিকেশান আছে। আমি দয়া করে এই চেয়ারে বসে আছি তাই। আমার কিসের কেয়ার ?

ইন্টারকম আবার পিঁ-পিঁ করল। রিসিভারটা তুলেই রাজেন সেনের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। গলার স্বর চিলের বাচ্চার মত সরু হয়ে গেল। চিঁচিঁ করে বললেন, না, না, কিচ্ছু ভাববেন না স্যার, পেয়েছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ। দরকার হলে রাত দশটা অবধিও থাকব। বাজেট তো আর রোজ পাস হবে না। না, না, আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান স্যার। আমরা তো আছিই। আমরা আছি কি করতে ?

কথা বলতে বলতে সেনসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে।

ওঁর দিকে তাকিয়ে রাধু আর গজেনের মুখ মুহূর্তে ম্লান হয়ে এল, মোসাহেবীতে সেনসাহেব যে তাদের চেয়েও বড়, তা দেখে। সেনসাহেব উঠে দাঁড়াতে তাঁরাও উঠে দাঁড়ালেন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে, নিজেও বসে পড়ে উত্তেজিত মুখে সেনসাহেব বললেন, গুজু হালদার। বলেই বললেন আরে, আমি তো দয়া করেই আছি এখানে। যেখানে স্বাধীন মতামতের দাম নেই, ব্যক্তিস্বাধীনতার দাম নেই, সেখানে আমার মত বর্ণ-ফ্রী মানুষ চাকরি করতে পারে না। ভাবছি, কোনো খবরের কাগজে জয়েন করব। সেখানে তো রিপোর্টার সম্পাদকরাই সব।- মালিকরা কোনো ব্যাপারেই ইন্টারফেয়ার করেন না। অবাধ, পূর্ণ

স্বাধীনতা। এখানে আমি একেবারেই মিস্‌ফিট। আরে এই তো সেদিনই, এস. পি. আই. কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা........

কোথায় স্যার ? ক্যালকাটা ক্লাবে ?

দুস্‌স্‌-স্‌স্‌। ক্লাব-ফ্ল্যাবে আমি যাই না। ল্যান্সডাউন মার্কেটে গেছি, দেখি উনি কুচোট্যাংরা কিনছেন। আমিও যা ভালোবাসি ; উনিও তাই-ই। একেই বলে র‍্যাঁপো, বুয়েচো। না বাবাঃ। বলব না তোমাদের। শেষে পাঁচকান হয়ে যাবে। আমার শত্রুর তো আর অভাব নেই।

আমরা কাউকেই বলব না স্যার।

প্রমিস ?

কিন্ডারগার্টেনের ছেলের মত মুখ করে বললেন।

প্রমিস।

এই গুজু হালদারের কোম্পানীতে যা পাচছি তার তিন গুণ। প্লাস পার্কস। বুয়েচো ? কি বুজলে ?

তাইই বলে সত্যিই চলে যাবেন না কি স্যার ? আমরা সকলে যে তাহলে রেফ্যুজী হয়ে যাব।

ন-না-না। তোমাদের ভয় নেই। ডান হাত তুলে অভয় দিলেন। যাবো না। কিন্তু আর কখনও আমার সামনে ঐ রেফ্যুজী কথাটা উচ্চারণ করবে না। সোনার শহরটার কী হাল করে দিল্যেরা শালারা। মরতে আসার আর জায়গা পেলি না ? আমার মামাশ্বশুরের পেনেটির বাগানবাড়িটা জবরদখল করে নিলে। সকলেরই নাকি জমিদারী ছেল সেখানে। জমিদারের পোইই বটে সব।

সেনসাহেবের এখনকার বাড়ি বর্ধমানে। অনেক পুরুষ আগে পূর্ব-বাংলা ছেড়ে পাটনাতে প্রবাসী হন। তিনপুরুষ হল বর্ধমানেই। রাজেন আর রাধু পশ্চিমবঙ্গীয় হযেও হতভাগ্য রাজনীতি-কবলিত নিরুপায় উদ্বাস্তুদের জন্যে যতখানি সহানুভূতি রাখে সেনসাহেব সেটুকুও রাখেন না।

সেনসাহেব একটু নড়ে বসলেন চেয়ারে। উ হু হু। কি রে, এ যে কাঁটা বেরিয়ে গেছে। দেকেচো। গোরা বাগটা চুরি করে দিলে ফাঁক করে। কত টাকা ঝেড়েছে শুধু এই চেয়ার সাপ্লাইয়ের ডীলে তাইই বা কে জানে ? চেয়ার তো আর অফিসে কম নেই। সবসুদ্ধ দেড়শ দু'শো তো হবেই। তারপরই বললেন, যা—ক এই চেয়ারটার আসল দামই বা কি ? আমি যতদিন এই চেয়ারে আছি, রিটায়ার না করছি ; ততদিনই দাম। তাছাড়া গুজু হালদারের অফিসে রিটায়ার তো কেউ করে না। চেয়ারে একবার জম্পেস্‌ করে বসে পড়লেই হল। চেয়ার তো হয় কাঠের, নয় লোহার, নয় ফাইবার গ্লাসেরই। গদীও হয় কতরকম। চেয়ারে কি এসে যায়। চেয়ারে যে বসে থাকে, সেইই আসল। চেয়ার তো স্রেফ্‌ জড়পদার্থ।

গজেন বলল, ঠিক বলেছেন স্যার। দ্যা পার্সন্‌ গ্লোরিফাইজ্‌ দ্যা চেয়ার, হু সীট্‌স অন ইট। চেয়ারের নিজের দাম কি ? ঠিকই বলেছেন।

রাজেন সেন চোখ দুটি ছোটো করে হেসে বললেন, আমি জেনারালী ঠিকই বলে থাকি।

রাধু বলল, ঠিক ঠিক্‌। টিক্‌টিকির মত।

ঠিক সেই সময়ই বিমল ব্যানার্জী কাঁচের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ওর পেছনে পেছনে অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের শৈলেন। মাস কয়েক আগে একটি প্রেস্ কন্‌ফারেন্সে গুজু হালদারের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক কিছু মন্তব্য করাতে, গুজু হালদার বিমলকে একেবারেই পুতুল করে রেখেছেন। ও কোম্পানীর প্রজেক্ট ম্যানেজার। কিন্তু ওকে কোনোরকম কাজই না করতে দিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিয়েছেন ম্যানেজমেন্ট। মাইনে পাচ্ছে, গাড়ি পাচ্ছে, পার্কস পাচ্ছে, পাচ্ছে না কেবল কাজ। বাইরের কনসালটেন্‌সী ফার্মকে সেই কাজের ভার দিয়ে বিপুল অর্থহানি সত্ত্বেও গুজু হালদার বিমলকে বসিয়ে রেখেছেন। এ অফিসে বিমলের যারা বন্ধু, তারা ওর আড়ালে বলছে ; কী হিউমিলিয়েটিং অবস্থা। ওর কি একটুও সেল্ফ-রেস্‌পেক্ট নেই ?

ওর শত্রুরা বলছে, খুব তেল হয়েছিল। এফ. এম. একেবারে মাথায় করে রেখেছিলেন তো এতদিন। ভেবেছিল, কী বুঝি হনু। চাকরীটা এখন ছাড়ছিস না কেন ? যার খাবি, যার পরবি, তারই মাথায় ডান্ডা মারবি এ কেমন সততা ? টাইট হয়েছে এবারে।

কি খবর ? বিমল ? পান চলবে নাকি একটা ?

পান ভদ্রলোকে খায় না। ওটা নির্বুদ্ধি আর ব্রাউজারদের খাদ্য। অবশ্য তুমি দাদা এক্‌সেপ্‌শান্। পান খাও অথচ সাহেব : তুমিই একা।

খুক্ খুক্ করে হাসলেন একটু রাজেন সেন। রাধুর সাদা টেরীলিনের জামায় পানের সূক্ষ্ম পিচ্‌কিরির পিক্ আল্‌পিনের মত গিয়ে বিঁধল দাঁতের ফাঁক দিয়ে। লাল হয়ে গেল জায়গাটা। রাধু দেখল।

ছরী। পান মুখেই বললেন সেনসাহেব।

না, না, ঠিক আছে স্যার। রাধু বলল, সবিনয়ে।

কি খবর বল বিমল ?

বিমল বলল, খবর এখন নেই। তবে, তৈরী করব। আমরা দুজনে। গুঁড়িয়ে ফেলব, ভেঙে ফেলব, এই এসটাব্লিশমন্টের মনোপলিস্টিক অ্যাটিটিউড্‌স। অসহ্য।

বিমলের ইংরিজী উচ্চারণ ভালো। গভীরতা না থাকলেও বিদেশী বইয়ের জ্যাকেট-নির্ভর অল্প-জ্ঞানের জলে পুঁটি মাছের ছর্‌ছরিয়ে সাঁতার কাটার মতই তার চতুর্দিকে জ্ঞানের জল ছেটানোর অভ্যেস আছে। তাছাড়া, আর্টফিল্ম-টিল্মও ও দেখে। বিমল হচ্ছে, যাকে বলে, "লা আঁতেল।"

শৈলেন নস্যির কৌটো বের করে, সবে নস্যি নেবার তোড়জোড় করছিল। বিমলের বক্তৃতা শুনে হঠাৎ বলে উঠল, আপনার জায়গায় আমি হলে অনেকদিন আগেই রেজিগ্‌নেশান দিতাম। আমার আত্মসম্মানে লাগত। ও বালাই বোধহয় আপনার নেই। আমার কেন, অনেকেরই নেই। আপনি মানুষ হলে অনেকদিন আগেই চাকরি ছেড়ে দিতেন।

বিমল একটু লজ্জা পেল। যদিও লজ্জা ব্যাপারটা তার চরিত্রে নেই। শৈলেনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, আরে ছাড়ব যখন তখন গুজু হালদারের গদী টলিয়ে দিয়েই ছেড়ে চলে যাব। "আই উইল গো উইথ আ ব্যাঙ্গ, নট উইথ আ হুইমপার।" মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাবার লোক আমি নই। অপমান আমি কখনই সহ্য করব না। গুজু হালদার অপমান করবে বিমল ব্যানার্জীকে, তা চলবে না। আরে তার পয়সা থাকতে পারে, তাকে চেনেটা

কে ? আমার মত তার পরিচয় ? সভা-সমিতি, চেম্বার অফ কমার্সে কাকে লোকে চেনে ? তাকে ? না আমাকে ?

হ্যাঁচ্চো ! করে হাঁচল শৈলেন।

নস্যির গন্ধে ঘর ভরে গেল। বলল, অপমানের আপনার বাকিই বা কি আছে ? তাছাড়া এত যে তড়পাচ্ছেন সবই ফালতু। আপনাকে সবাই-ই গুজু হালদারের চাকর বলেই জানে। আপনি যাইই ভাবুন। এয়ারকন্ডিশানড্ ঘরে উঁচু চেয়ারে বসে আপনার মত যারা কাজ করে তারাও চাকর আর যে বাসন মাজে, খিচুড়ি রেঁধে খাওয়ায় সেও-ও একইরকম চাকর। মিথ্যে বড়াই কেন করেন ? মানুষ হলে চাকরি ছাড়তেন। আপনি মানুষই নন। সেনসাহেবের ঘর বলে বেশি কিছু বললাম না। স্যার রাগ করবেন। নইলে...

বিমল, সুর নরম করে বলল, তুমি বুঝবে কি ? ব্যাচেলার, কোন্ দায়িত্ব কর্তব্যটা আছে তোমার ? গড়িয়াতে বাড়িটা সবে আরম্ভ করেছি। ছেলেপুলে থাকলে বুঝতে সংগ্রাম করা কি কঠিন। আমাদের মত নামী, যশস্বী কাজের লোকদেরই তো এস্‌ট্যাব্লিশমেন্ট অপদার্থ তোষামুদে চাকর বানিয়ে দেয়। কাজটাজ তো প্রায় ভুলেই গেছি বাঁদর নেচে নেচে। এখন ঝপ্ করে হঠাৎ এতগুলো টাকা মাসে মাসে বন্ধ হয়ে গেলে যে বউ-বাচ্চা নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। তাছাড়া গাড়িটা। গাড়িটা ছাড়া বারাক্‌পুরের ভাড়া বাড়ি থেকে গড়িয়াতে গিয়ে বাড়ি শেষ করা অসম্ভব। বাড়িটা শেষ করে তারপর শেখাব গুজু হালদারকে। ঝপ্ করে টাকা বন্ধ হলে......

শৈলেন বলল, তাহলে ঝপ্ করে মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নাও। নিমকহারামী মহাপাপ। হয় ঝপ্ করে চাকরি ছাড়ো নয় ঝপ্ করে ক্ষমা চাও। যারা বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার বুকনি ঝাড়ে, তাদের বউ-বাচ্চা, গড়িয়ার বাড়ির চিন্তা মানায় না।

রাজেন সেন ইন্টারাপট্ করে বললেন, শৈলেন, তুমি চুপ করো। বড় বাড়াবাড়ি করছ। কিছুই না বুঝে কথা বলাটা তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে। তুমি মনে করো তুমি একাই সব বোঝো।

সঙ্গে সঙ্গে গজেন আর রাধু সেনসাহেবকে সাপোর্ট করে শৈলেনের দিকে তাকিয়ে শ্লেষাত্মক হাসি হাসল। হুঁ। হুঁ। হিঁ। হিঁ।

বিমল ব্যানার্জী এবারে জোর পেয়ে বলল, আরে ভারী তো কাজ তোমার। লেখো তো তুমি খতিয়ান আর করো তো মালিকের দালালী। 'মনোপলী' কথাটার মানে বোঝো ?

বি-কম এ পড়েছিলাম।

নস্যির কৌটোটা নাড়াচাড়া করতে করতে শৈলেন বলল।

"রানেশাঁ ?" "অ্যান্টি এসটাব্লিশমেন্ট অ্যাকটিভিটি" ? বোঝো ?

শৈলেন দমবার পাত্র নয়। নাক থেকে নস্যি ঝেড়ে নোংরা রুমালে তাড়াতাড়ি মুড়ে সে বলল, রাকুন তো মশাই ! হরজাই-খাতে কথাটার মানে জানেন আপনি ? নাজাই-খাতে কাকে বলে জানেন ? ব্রেক-ইভিন্ পয়েন্ট ? বেশি জার্গন্ ঝাড়বেন না। জার্গনস্ সব লাইনেই থাকে। আমিও ঝাড়তে পারি।

সেনসাহেব এবারে ভেটো প্রয়োগ করলেন। বললেন, শৈলেন, বিহেভ ইওরসেল্ফ। সিনীয়র লোকেদের দাদা বলে ডাকো বলেই মনে কোরোনা যে, যা খুশী তাই-ই বলতে পারো।

রেসপেক্ট দেবে। অফিসে একটা ডিসিপ্লিন, ডেকোরাম রাখবে। এটা কাজের জায়গা। 'স্যার' বলে অ্যাড্রেস করবে সিনিয়রদের।"

২

তাঁর চেয়ারে, সেনসাহেব একা ঘরে। এয়ারকন্ডিশানটা মৃদু ফিসফিস্ শব্দ করছে। এই জড়পদার্থ চেয়ারটার জন্যে মাঝে মাঝেই দুঃখ হয় ওঁর। উনি যখন থাকবেন না, একজন গবেট, আনস্মার্ট, ইডিয়ট মার্কা লোক এসে বসবে এই চেয়ারে। অধীর রায়।

কাজকর্মর কিসসুই বোঝে না। ড্যাশ নেই, পুশ নেই ; পার্সোনালিটি নেই। অন্য কোনো বিষযেও কোনো ইন্টারেস্ট নেই। একটা ফাইল-ওয়ার্ম। এই চেয়ারটাকে উনি বিশেষ ইজ্জত দান করেছিলেন। লোকটা একেবারে বেইজ্জত করবে।

ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। অপারেটর বলল, গুড আফটারনুন স্যার।

"মর্নিং-এ" কখনও অফিসে আসেননি সেনসাহেব। তিনি যে দয়া করে অফিসে আসেন এই-ই গুজু হালদারের সৌভাগ্য। ওঁর যে কী এলেম, কত গভীর প্রতিভা, তার কীই বা বোঝে ঐসব ক্যাপিটালিসট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা। তিনি যখনই আসুন আর দয়া করে যতটুকু কাজই করুন তাতেই তো মালিকপক্ষ কৃতার্থ। তা নইলে তো কবেই বলতে পারতেন তাঁরা ; "এবারে আসুন।" উনি তো আর লেবারার নন যে, ইউনিয়ন ওঁকে বাঁচাবে। উনি কারোরই দয়া কোনোদিন চান নি। নিজের যোগ্যতা, মেধা, গভীর অন্তর্দৃষ্টির জোরেই আইসকাটারের মত এসটাব্লিশমেন্টের বরফ কেটে একাই চলেছেন সাফল্যর উত্তরমেরুর দিকে। তাঁর নিঃশব্দ নীরব গতির একমাত্র সাক্ষী বিমল ব্যানার্জী। ও একটা গ্রেট ইনটেলেকচুয়াল। স্বাধীনচেতা মানুষ। এসব ব্যাপার বোঝে এমন মানসিকতার মানুষ এই কোম্পানীতে বেশী নেই।

গুড আফটারনুন। ডাঃ সাধুখানকে দিন তো।

কে ?

ডাঃ সাধুখান। হ্যালো। কথা বলছি।

এই যে পিকু। তোমার বৌদির একটু জ্বরভাব হয়েছে। একবার আসবে ?

এক্ষুনি যাচ্ছি স্যার। বৌদি বাড়িতে আছেন তো ?

আছেন। তবে এই ভর দুপুরে তোমার মত সুপুরুষের আমার সুন্দরী স্ত্রীর কাছে একা না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সন্ধেবেলা এসো। আমি থাকব।

আচ্ছা স্যার। হেসে বললেন ডাঃ সাধুখান।

তারপর বললেন, স্যার, আপনার অন্তর আর মেধার যে গভীর সৌন্দর্য দিয়ে বৌদিকে মোহিত করে রেখেছেন সেই সৌন্দর্যের মোকাবিলা কি আমার শারীরিক সৌন্দর্য কখনও করতে পারে ? যাব। নিশ্চয়ই যাব।

আবার ফোন তুললেন। মিহির ঘোষকে দিন।

অ্যাই যে। তুমি যে খবরই নাও না কোনো। ব্যাপার কি ?

বড় ব্যস্ত ছিলাম স্যার।

আরে, আমি এই চেয়ারে আছি বলেই না তোমার ব্যস্ততা। ব্যস্ততা দেখাচ্চো কার কাছে ? তোমার সব ব্যস্ততা নিবিয়ে দিতে পারি আমার হাতের প্যাঁচ।

আপনি খুব রেগে গেছেন বলে মনে হচ্ছে।

ভয়-পাওয়া গলায় মিহির ঘোষ বললেন।

বলুন স্যার, কী করতে পারি আপনার জন্যে?

শোনো। উনিশে আমার ছোট শালীর মেয়ের অন্নপ্রাশন।

বুঝেছি। মাছ তো? কিঁ মাছ এবং কোয়ান্‌টিটি বলুন। সময়মত পৌঁছে যাবে।

রুই। পাকা। তিরিশ কে-জি।

ওকে।

পাবদা। টাটকা। মাঝারী। তিরিশ কে-জি।

ওকে। মাত্র তিরিশ কেজি?

ওতেই হবে।

একটা কথা বলি স্যার? কিছু তপ্‌সে পাঠাই। ফ্রাই জমবে ভালো। আফটার অল আপনার শালীর মেয়ের অন্নপ্রাশন। ভি আই পি-রা আসবেন। আপনার ইজ্জত তো রাখা চাই।

আমার ইজ্জত-এর ভার তোমার হাতে নেই। আমার ইজ্জত আমাকে অর্জন করতে হয়েছে মিহির। জীবনে সবকিছুই লড়ে নিতে হয়েছে। আমার জন্মদিন শনিবার। "স্যাটারডেজ চাইল্ড হ্যাজ টু ওয়ার্ক হার্ড ফর আ লিভিং"। গল্‌দা চিংড়ি হবে?

এ কি বলছেন স্যার? আপনার জন্যে তিমি মাছও যোগাড় করে দেব। চিংড়ি তো পোকা মাত্র। একেবারে ড্রেস-ট্রেস করে পাঠাব। কি হবে? মেয়োনীজ না কালিয়া।

কালিয়া।

কত পাঠাব?

তিরিশ কেজি।

সবই যাবে। তবে একটা প্রার্থনা আছে স্যার। দাম কিন্তু নিতে পারব না।

ঠিক আছে। প্রেয়ার গ্রান্টেড। কখন পাঠাবে?

সকাল সাতটার মধ্যে।

শোনো, কিছু মিষ্টির বন্দোবস্ত করতে পারো?

স্যার, আপনি বললে বাঘের দুধেরও বন্দোবস্ত করতে পারি।

বাঘের দুধ আমি বিনা পয়সাতে পেলেও খাই না। মিষ্টি হলেই চলবে।

জলযোগ? গাঙ্গুরাম? তিওয়ারী? না গুপ্ত ব্রাদার্স? কার মিষ্টি?

যার যেটা ভালো হয়।

আইটেম বলুন।

তোমার উপরেই ছেড়ে দিলাম। এমন পাঠাবে যে, লোকে যেন আহা! আহা! করে। চারশো লোকের মত। ঠিক আছে? ছাড়লাম।

ফোন নামিয়ে নিরুচ্চারে বললেন, ন্যাকা। পয়সা নিতে পারব না স্যার! পয়সাই দেব তো তোকে বলব কেন?

ডাইরেক্টরী বার করে দেখলেন। এখন ডেকরেটর, ফুল আর পানের বন্দোবস্ত করতে হবে। এবং গাড়িরও। কাজের বাড়ি। গোটা তিনেক গাড়ি দুদিনের জন্যে লাগবে। নেমন্তন্ন

করার জন্যে। আবার কাজের দিনও।

গজেন ঘরে ঢুকল উল্লসিত হয়ে।

বলল, হয়ে গেল স্যার।

কি ?

বিরক্ত গলায় সেনসাহেব বললেন।

এখনও অনেক ফোন করা বাকি। এই শালী তাঁর বিশেষ প্রিয়। শালীর বিয়ের আগে একদিন বৃষ্টির দিনে সিনেমা দেখে ফেরবার সময় গাড়িতে চুমু খেয়েছিলেন। পরশটা এখনও ঠোঁটে লেগে আছে যেন।

গাভাস্‌কারের টুয়েন্টিনাইনথ্‌ সেঞ্চুরি হয়ে গেল স্যার।

মুখোজ্জ্বল হল সেনসাহেবের। গাভাস্‌কারের কথা না তুলেই বললেন, এই একটা খেলা, আমার বিশেষই প্রিয়। দ্যাখো, তোমরা বলেছিলে যে, হবে না। ছোকরাটাকে তোমরা কম অপমান করেছ ?

জীবনে সেনসাহেব চোর-চোর আর ডাংগুলি ছাড়া কিছুই খেলেননি। বটতলার বই এবং কোকশাস্ত্র ছাড়া কিছুই পড়েন নি। কিন্তু তিনি আজ যে পজিশানে আছেন, সে পজিশানে তাঁর সর্বজ্ঞ না হয়ে কোনোই উপায় নেই। উনি না হতে চাইলেও ওঁর কৃপাপ্রার্থীরা করিয়েই ছাড়বে। বিনা চেষ্টাতেই তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে গেছেন। এবং সকলেই তাঁকে সর্বজ্ঞ বলে নির্বিবাদে মেনেও নিয়েছে।

রাধু ঢুকল। হাতে পুজো সংখ্যা নবকল্লোল। পড়েছেন ? উপন্যাস ? সমরেশ বসুর ? জুতো, স্যার, জুতো।

বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব করে সেনসাহেব বললেন, রাম্বা-সাম্বার লেখক তো ?

অলমোস্ট। তবে ; সাম্বা নয়, শাম্ব। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব। অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড উইনার।

ঐ হল। যে লেখার কথা বললে, তাও পড়ে দেখেছি। তবে, এক্ষুনি অ্যানালীটিক্যাল ক্রিটিসিজম্‌ করতে ইচ্ছে করছে না। গাটা বড় ম্যাজম্যাজ করছে হে।

স্যার, আমার বাড়িতে আগামী শনিবার ঝুনঝুন্‌ সেন আসবেন। রেডিওর সোনালী চ্যাটার্জী, এমন কি দুর্যোধন দাঁ ও গুগগুল গাঙ্গুলি। সাহিত্য-সঙ্গীত-আবৃত্তির সন্ধ্যা। আপনাকে কিছু বলতেই হবে। এবং সভাপতিত্বও করতে হবে।

বলছ ?

বলছি কি স্যার ? আপনার নাম করেই তো সকলকে একসঙ্গে করা, নইলে এই অধমের বাড়িতে কি ওঁরা কেউ আসতেন। সেলিব্রেটিজ সব।

তাহলে আমার ছোট মেয়ের একটা নাচের আইটেমও জুড়ে দাও। দারুণ নাচে। অসম্ভব ট্যালেন্টেড্‌।

নো ওয়ান্ডার স্যার। লাইক ফাদার লাইক ডটার। দারুণ হবে। তা কি নাচ নাচেন আপনার ছোট মেয়ে ? কত্থক না ওড়িশী না ভরতনাট্যম্‌ না রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্যর নাচ ? কি ? তবলচি, সারেঙ্গীওয়ালার যোগাড় রাখব তো ?

না, না, ওসব গর্জাস ব্যাপারের মধ্যে ও নেই। পপ্‌-সংগ্‌স্‌-এর সঙ্গেই ও নাচে ! অনেকই সুবিধে। হাটে, মাঠেও নাচা যায়। গান রেকর্ড করা আছে টেপ্‌-এ। টেপ্‌ বাজিয়েই ও নাচবে।

একটু শুধু সাইকেডেলিক আলোর বন্দোবস্ত রেখো। তা ওঁরা কিছু মনে করবেন না তো?

কী যে বলেন স্যার। ভালো মাল খাওয়ালে ওঁরা নরকেও যেতে রাজী।

কোনো চিন্তা নেই। দারুণ লোককে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে আসব। দেখবেন, কী এফেক্ট হবে। পপ্‌-ডান্সের পরিবেশের জন্যে আইডিয়াল।

ক'টার সময় যেতে হবে। তোমার বাড়ি তো আমি চিনি না।

আপনি স্যার কি করে চিনবেন? অলি-গলিতে তো আপনার যাওয়ার কথা নয়। আমিই গাড়ির বন্দোবস্ত করে আপনাকে নিয়ে আসব। বৌদি, থুড়ি মেমসাহেব কি আসবেন? এলে, আমরা সকলেই ধন্য হই। রাতে আমার ওখানেই দুটি ডাল-ভাত খেয়ে যাবেন।

উনি, মানে, আমার মিসেস, আমার মত অতটা সোস্যাল নন। তাছাড়া, সেদিন ওঁর নীলের উপোসও আছে। আসতে পারলে ভালোই হত। মেয়ের নাচের সঙ্গে উনি তালি বাজান।

কি বাজান?

তালি।

অ। তাহলে আর কি করা যাবে। কিন্তু তালি বাজাবার লোকের অভাব হবে না স্যার। তালি বাজাবার লোক অনেক আছে।

৩

প্রায় মাসখানেক হলো রাজেন সেন রিটায়ার করে গেছেন। ভেবেছিলেন, এক্সটেন্‌শান পাবেনই। সেলস-এর স্যান্যাল, মেনটেন্যান্সের ঘোষাল তো এক্সটেনশানের পর এক্সটেনশান্‌ পেয়ে ষাট পার করে দিল। এই কোম্পানীতে সীনিয়র পোস্ট এক্সটেন্‌শান্‌টা একটা "ম্যাটার অফ্‌ কোর্স" হয়ে গেছিল। এবং একটা ম্যাটার অফ রাইটও বটে। এক্সটেন্‌শানটা পাবার পরই একবার ফরেনে যাবেন ভেবেছিলেন। নইলে আজকাল 'স্ট্যাটাস' হয় না। সবই ভেস্তে গেল। এ একেবারে বোল্ট ফ্রম দ্যা ব্লু। হালদার যে অপ্রস্তুত তাঁকে এমন নিঃশব্দে ল্যাং মারবেন ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেন নি। উনি ছাড়া ওঁর ডিপার্টমেন্ট কি করে চলে দেখতে খুব ইচ্ছা করে ওঁর। উনি ভেবেছিলেন, ওঁকে এক্সটেনশান্‌ না-দেওয়াতে ওঁর সাবর্ডিনেট্‌ স্টাফ গজেন, রাধু এবং অন্যান্য অনেকেই পেন-ডাউন স্ট্রাইক করবে প্রতিবাদে। সাপ্লায়াররাও রিপ্রেজেনটেশন দেবে।

ভেবেছিলেন।

আশ্চর্য।

কেউই ট্যাঁ-ফোঁ করল না!

কিছুদিন আগে একটা চিঠি পেয়েছিলেন ডাকে। নিচে লেখা, "আপনার অনুগত অধস্তন কর্মচারিবৃন্দ।" হাতের লেখাটা চেনেন না। কাউকে দিয়ে লিখিয়ে থাকবে। এই এরাই তাঁকে অনেক ভাল ভাল কথা আর্টিস্টকে দিয়ে লিখিয়ে বাঁধিয়ে ফেয়ারওয়েল দিয়েছিল যেদিন রিটায়ার করেন সেদিন। চিঠিটা খুব বড় নয়, তবে প্রচন্ড ডিস্‌টার্বিং। এবং নিষ্ঠুর।

রাজেন সেন খচ্চর-শ্রেষ্ঠ,

যে ক'বছর ছিলে অনেকই জ্বালিয়েছো আমাদের। রিটায়ার করেছো। এবার মরলে বাঁচি।

তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমরা তোমাকে চিনব না পর্যন্ত। তোমার একতরফা জ্ঞানের বুক্‌নি আর যে সহ্য করতে হবে না আমাদের এই ভেবেই খুব আনন্দ হচ্ছে। তুমি যে কী একখানি মাল এবং তুমি যে কোন ব্যবহারের যোগ্য তা নিশ্চয়ই চেয়ার ছাড়ার পর থেকেই বুঝতে আরম্ভ করেছো। না-বুঝে থাকলে বুঝবে। শনৈঃ শনৈঃ।

আমাদের সমবেত প্রার্থনা এইই যে, তুমি এবার টেঁসে যাও। তুমি যে কত বড় কাজের লোক, কত বড় খেলোয়াড়, কবি, গায়ক, ফিলসফার এবার তা তোমার বেচারী স্ত্রী এবং তোমার পাড়ার কাকদেরই বুঝিও।

সব ভালো, যার শেষ ভালো। তোমার শেষে, দেশেরই মঙ্গল।

—ইতি—তোমার "অনুগত" (হাঃ। হাঃ!)

কর্মচারিবৃন্দ।

রাজেন সেন সেদিন খাওয়া-দাওয়া করে অফিসের দিকেই বেরুলেন। অফিসের গাড়ি, অফিসের টেলিফোন সবই তাঁর নিজেরই বলে জানতেন। সবই ফেরত নিয়ে গিয়েছে অফিস। এই আকস্মিক ধাক্কাতে সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হয়ে গেছে আজ।

সকালে নিজেই বাজারে গিয়ে ছোট ট্যাংরা মাছ কিনেছিলেন। এবার থেকে অনেক কাজই করতে হবে। আগে যখন সখ করে বাজার করতেন তখন ব্যাপারটা অন্যরকম ছিলো। এখন মনে হয় জানা-শোনা লোকেরা যেন অনুকম্পার চোখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। ট্যাংরার দামের কাঁটায় বুকের পাঁজর ফুটো হয়ে গেছে। সাপ্লায়াররা, এই হৃদয়হীন পৃথিবীর স্বরূপ এতদিন তাঁকে বুঝতেই দেয়নি। সাপ্লায়ারগুলো হারামি এক নম্বরের।

মনে মনে বললেন, রাজেনবাবু।

মিনিবাসের জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রায় পঁচিশ মিনিট পর খুব ভীড়ের একটি বাসে উঠলেন। বকা ছেলেটা পা মাড়িয়ে দিল। উনি আপত্তি করতেই বলল, অতই অসুবিধে তো ট্যাক্সিতে গেলেই হয়। এখানে কেন?

ট্যাক্সি করবার কথা এখন দুবার ভাবতে হয়। তাইই কথাটা বাজল। উনি ভেবেছিলেন তাঁর চাকরি আরও বছর পাঁচেক থাকবে। অন্য সকলেরই তো আছে। পেন্‌সানও চালু হবার কথা ছিল। ওঁর চাকরিতে থাকাকালীন হলো না। ঐ ইডিয়ট রায়টার কপালেই পেন্‌সান জুটবে অথচ ও কাজের জানেটা কি?

এতদিন গাড়ির জানালা থেকে দোকান-পাট লোকজন একরকম দেখাত। অনুকম্পার চোখেই দেখতেন তিনি। সাপ্লায়ারের দেওয়া বেনারসী-জর্দা এবং ফাইভ-ফাইভ-ফাইভ খেতে খেতে। ভেবেছিলেন, জীবনটা এমনি করেই কেটে যাবে।

খোকাটাও আলাদা হয়ে গেল ছ'মাস আগে। বলতে গেলে, ছেলের বৌয়ের সঙ্গে বিশেষ করে তাঁর দুর্ব্যবহারেই। ছ'মাস আগেও অনেক গরম ছিল তাঁর। ঠান্ডা মেরে গেছেন। ছোট মেয়ের এখনও বিয়ে বাকি। বড় মেয়ে খুকুর স্বামী সুধীর নাকি তার অফিসের একটি মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করছে। কী দিনকাল হল। মেয়ে প্রায়ই এখানে এসেই থাকে। মিনিবাসের খাঁচা থেকে ঘাড় হেঁট করে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যেতে যেতে সমস্ত পৃথিবীটাকেই আশ্চর্য অন্যরকম মনে হচ্ছে আজকে। এ পৃথিবী ওঁর চেনা নয়। কারা যে তাঁর ঘাড়ে শক্ত হাত

রেখে তাঁকে এমন করে মাথা নোয়াতে বাধ্য করল কিছুই বুঝতে পারছেন না রাজেন সেন। মাথাটার গোলমাল হয়ে যাবে বোধহয়। মেন্টাল কেস্ হয়ে যাবেন শীগগিরি।

অফিসে ঢোকবার সময়ই প্রথম ধাক্কাটা খেলেন। দারোয়ান মিশির হাতে খৈনি মারছিল। ওঁকে দেখে সেলাম করল না। দাঁড়িয়ে উঠলো না পর্যন্ত। কিছু বললও না! খৈনি টিপে ঠোঁটের নিচে দিল। ওঁর দিকে নৈর্ব্যক্তিক চোখে তাকিয়ে।

উনি ভাবলেন, বাড়িই ফিরে যাবেন। তারপর ভাবলেন, এসব অশিক্ষিত আনকালচারড লোকেদের কাছে কীইবা প্রত্যাশার?

করিডোরে ঢুকেই গজেনের সঙ্গে দেখা। তার গ্রেটেস্ট চামচে ছিল একসময়! ওঁকে দেখেই গজেন ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠে তুত্‌লে বলল, ভালো?

ব্যস্‌স্‌। ঐটুকুই। বলেই, ডিপার্টমেন্টে ঢুকে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজেন সেন। আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। পা টেনে টেনে। খোঁড়া গরুর মত। একদিন ওয়েলার ঘোড়ার মতই টগ্‌বগিয়ে যেতেন। হঠাৎ শৈলেনের সঙ্গে দেখা করিডরে। শৈলেন বসু। বলল, আরে! সেনসাহেব যে! কেমন আছেন? অন্য কিছু কি করছেন? কোথাও জয়েন করলেন? চলুন, চলুন, চা খাবেন আমার টেবল-এ চলুন।

গেলেন। শৈলেনের ছোট্ট টেবলে বসলেনও। ওঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অফিসের এ দিকটাতে উনি একদিনও আসেন নি। ভাব দেখে মনে হল অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য টেবলের কেউ ওঁকে বোধহয় চেনেই না। কে একজন তাঁর পেছন থেকে বলে উঠলো, "মাল।"

ওঁর বুকের ভিতরটাতে ধড়ফড় করতে লাগল। উঠে পড়ে বললেন, চা নাইই বা খেলাম। শরীরটা ভালো লাগছে না। অধীর আছে নাকি?

কে.অধীর? ও রায়সাহেব? ডি-পি-এম্ কি আছেন ঘরে? মনি?

মনি বলে একটি ছেলে বলল, আছেন। তবে খুবই ব্যস্ত। আজ ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে মীটিং আছে। এফ-ডি নিজে যাবেন ব্যাঙ্কে। তাই কাগজপত্র দেখছেন ডি-পি-এম।

তবু সেনসাহেব উঠলেন। আবার পা-টেনে টেনে তাঁর নিজের পুরোনো ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। ইডিয়ট অধীর রায়, চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দরজা খুলে ওঁকে নিয়ে গেল ভিতরে। নিজে পাশের ছোট শোফায় বসে বলল দাদা, আপনি আপনার চেয়ারেই বসুন। যতক্ষণ আপনি এই ঘরে, এই চেয়ার আপনারই।

দুঃখে, হাসি পেল রাজেন সেনের। ভাবলেন, "আয়না তুমি কার?"

মুখে বললেন, না না, তুমি বোসো। আমি এইখানেই বসি।

চা খাবেন দাদা?

না।

ঠান্ডা কিছু।

বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে পার্স বের করে কোল-ড্রিঙ্কস্ আনতে দিল অধীর। একটা এনো। আমি খাবো না। এফ-ডির সঙ্গে ব্যাঙ্কে যেতে হবে এক্ষুনি। ইন্টারকম্-এ ডেকেছেন উনি। আপনি বসুন ঠান্ডা খান, আমি না আসা অবধি এখানে রিল্যাক্স করুন। যাবেন না কিন্তু। ব্যাঙ্কতো পাশেই। যাবো আর আসবো।

বুকটা আবার ধড়ফড় করে উঠল রাজেন সেনের। বললেন, না, অধীর। ওটা খেয়েই চলে যাব। শরীরটা ভালো নেই।

অধীর বলল, সো-ফার আই অ্যাম কনসার্নড ইউ আর মাই বস্। ইয়েস্। ফর দ্যা রেস্ট অফ মাই লাইফ। আপনার কোনো প্রয়োজন বা অসুবিধা হলে একটা ফোন করবেন শুধু। আমি আপনার ছোট ভাইয়েরই মত। আপনার তো নিজের ভাই নেই। ফোন নাম্বারটা মনে আছে নিশ্চয়ই।

এ জীবনে কি আর ভুলব ?

রাজেনবাবু বললেন, অবশ্য বদলে যদি না যায়।

আর এই রইল আমার বাড়ির নাম্বার। কার্ড বের করে দিল অধীর। হেসে বলল, আসলে, আপনার টেলিফোনটাই আপনার বাড়ি থেকে খুলে আমার বাড়িতে লাগিয়েছে। কোম্পানীর ফোন তো। পাড়া এক বলে, নাম্বারটা পর্যন্ত বদলায় নি। সে নাম্বারও আপনার তো মুখস্থই। চলি দাদা! ব্যাঙ্কে যাব এফ ডির সঙ্গে।

যেতে যেতেও দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে অধীর বলল, দাদা, আমার আর আপনার দাম আসলে কিছুমাত্রই নেই। দামী যা, তা হচ্ছে ঐ চেয়ারটাই।

অধীর চলে যেতেই বেয়ারা কোল্ড ড্রিঙ্কস্ এনে দিল। ওর নাম যদু। আগে লম্বা লম্বা সেলাম করত। আজ কোনো কথাই বলল না।

উনি, মানুষটা কি খুবই খারাপ ছিলেন ? কারো উপর কি উনি অন্যায় করেছিলেন ? সবাইকে কি যথাযোগ্য মর্যাদা দেননি ? আশ্চর্য ? একবারও সে কথা ওঁর মনে হয়নি কেন যতদিন চেয়ারে ছিলেন ?

কোথায় যেন কী গোলমাল হয়ে গেছে! বড় গোলমাল।

কোল্ড ড্রিঙ্কস্-এর বোতলটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়ালেন রাজেন সেন। সেই কাঁটাটা এখনও উঠে আছে চেয়ারের ফ্রেম থেকে। তাঁর ট্রাউজার একবার ফুটোও হয়ে গেছিল। অধীরকে বলেও গেছিলেন কাঁটাটার কথা।

আশ্চর্য।

তবুও অধীর ... ...।

ছানি



আজ মহাষ্টমী। এবারে রবিবার পড়ে গিয়ে সপ্তমীর ছুটিটাই মারা গেল।

কাল রাতে মা বললেন, বড় মাসীমা—মেসোমশায়রা দিল্লী থেকে এসেছেন। আমার মাসতুতো ভাই স্টেট ব্যাংকের বড় অফিসার। মাসীমার একই ছেলে। ওঁর কাছেই উঠেছেন ওঁরা। ওঁদের ফোন থাকলেও আমাদের নেই বলে যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। একবার যেন যাই, খোঁজ করে আসি।

বাড়ি থেকে যখন বেরুচ্ছি, ঠিক তখন, আমার ছ'বছরের মেয়ে শ্রী বলল, বাবা ! আমিও যাবো।

বললাম, পুজোর দিন বাসে-ট্রামে ওঠা যাবে না, ভীড় ভীষণ। তুমি কী অতদূরে হেঁটে যেতে পারবে ?

মেয়ে বলল, বাঃ রে। সেই তোমার সঙ্গে সেবারে তারা দেখতে গেছিলাম না, সেখান থেকে ট্রাম-বাস কিছুই না পেয়ে সেদিন হেঁটে আসিনি বুঝি ?

আমার মনে পড়ল, সত্যিই তো। প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে একবার হাঁটতে-হাঁটতে ল্যান্সডাউন রোড অবধি এসেছিলই তো শ্রী।

বললাম বেশ, চলো তাহলে।

রুণা বলল, রোদ উঠেছে কড়া, পুজোর দিনে রোদে হেঁটে অসুখ-বিসুখে পড়বে। না, তুমি যাবে না শ্রী।

মেয়ের মুখ করুণ হয়ে এলো।

তবু বললাম, চলুকই না। পথে অনেক ঠাকুর দেখাও যাবে। আর তেমন মনে করলে, রিকশা করে চলে আসবে।

রুণা বিরক্ত গলায় বলল, বিকেলে আমি বাপের বাড়ি যাব। দাদারা গাড়ি পাঠাবে। তখন যদি পড়ে পড়ে ঘুমোয় তাহলে পিটুনি খাবে আমার কাছে।

নিস্পৃহ গলায় বললাম, ঘুমোলে ঘুমুবে। আমি তো যাবো না। না-হয় আমার সঙ্গেই অন্য কোথাও যাবে ও। হেঁটে হেঁটে, কাছাকাছিই যাবো।

রুণা বলল, যা ভালো মনে করো ; করো।

আর দেরী না করাই ভালো মনে করে মেয়ের হাত ধরে বেড়িয়ে পড়লাম।

এদিকে মেয়ে হাঁটতেই পারছে না। কী একটা জগঝম্প পরেছে। দু'হাতে দুদিক উঁচু করে

ধরে নতুন জুতো পায়ে আমার পাশে পাশে হাঁটছিল শ্রী

বললাম, এটা কী পরেছ তুমি ?

শ্রী তার বোকা বাবার চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি তাও জানো না ? এটাকে ম্যাক্সি বলে।

বললাম, যে-জামা পরে হাঁটা যায় না সেটা পরার দরকার কি ?

দ্যাখো না। শ্রী অনুযোগের সুরে বলল, মা এমন বড় করে বানালো, যাতে সারা শীতে পরতে পারি, ছোট না হয়ে যায়।

বললাম, ক'টা জামা হল এবারে পুজোয় ?

শ্রী চোখ নাচিয়ে বলল, তা, অনেক। তারপর বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, গুনে বলি। মা বানিয়েছে একটা। চার মামা চারটে। দু মাসী দুটো। মা-দাদুও একটা দিয়েছে।

ক'টা হল সবসুদ্ধু ?

ছ'টা। গুনেটুনে শ্রী বলল।

আমি বললাম, ভুল হল। আটটা।

শ্রী যোগের ভুলের পাপ স্খালন করে, কী মজা, না ?

আমি ভাবছিলাম, এতগুলো জামার কী দরকার ছিল কোনো ? একজন শিশুর, পুজোর আনন্দের পরিপেক্ষিতেও ? এতগুলো জামা কী বাড়াবাড়ি নয় ? বিশেষ করে এ-বছরের প্রলয়কারী বন্যা ও বৃষ্টির পর ? বড়লোক মামাবাড়ির ব্যাপার। গরীব জামাই-এর চুপ করে থাকাই শোভন। মেয়ের ভালো মন্দ ঠিক করার আমি কে ?

শ্রী হঠাৎ আমার হাত ধরে টানল।

ওর দিকে চাইতেই স্টেশনারি দোকানের দিকে চোখ দিয়ে ইশারা করল।

শুধোলাম, কি ?

আহা। তুমি যেন জানো না।

শ্রী, পাকামি করে বলল।

যা শোনে, তাই শেখে ও। বলল, বড়মামা সবসময় কিনে দেয়।

আমি একটা বড় চকোলেটের বার কিনে দিলাম। বাবা হিসেবে কোনো কর্তব্যই প্রায় করি না মেয়ের প্রতি। সামর্থ্যর অভাবও যে নেই, এমনও নয়। আমার মাধ্যমে আনন্দ, ভালো লাগা কিছুরই স্বাদ পায় না মেয়েটা। পুজোর দিনে ওকে নিজে হাতে ওর অনুরোধে একটা চকোলেট কিনে দিয়ে ভারী খুশী হলাম। বাবা হওয়ার যেমন ঝক্কি অনেক, তেমন আনন্দও অনেক। যে বাবা না হয়েছে, সে বুঝবে না এর দুঃখ। এবং আনন্দও। আমার সঙ্গে একা থাকলে মেয়েও বেশ স্বাধীনতার স্বাদ পায়। মায়ের কড়া শাসনের হাত থেকে তখন ওর ছুটি।

বড় প্যান্ডেলে পুজো হচ্ছে সামনে। দামড়া দামড়া বয়স্ক ছেলেগুলো হিন্দী ছবির নায়কদের মত দামী ও অন্য গ্রহের পোশাক পরে প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়ে দেখছে। পুজোর আসল মজাই তো ওখানে ; এ বছরও এদের সাজ-সজ্জা আমাকে আশ্চর্য করছে। এদের দেখে কে বলবে যে কোলকাতায় ও বাংলায় অল্প ক'দিন আগেও এত বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে। পুরুষরাও যে এমন মেয়েদের মত পোশাক সচেতন হতে পারে। অন্তঃসারশূন্য শরীর ও ষাঁড়ের গোবরময় মস্তিষ্কের জন্যে যে এতরকম বাহারী জামা কাপড় এবং হাই-হীল জুতোর

দরকার হয় এ ভিখিরীদের শহরে, তা ভাবলেও অবাক লাগে। এই হচ্ছে কোলকাতার প্রাণকেন্দ্র। এর নাম সাউথ-ক্যালকাটা। তার মধ্যেও এ পাড়া হচ্ছে জাত পাড়া। এইসব পাড়ার পুজো দেখতে দূর দূর জায়গা থেকে মানুষে আসে। রাত জেগে পায়ে হেঁটে পুজো দেখে। হাঁ করে বড়লোকী দেখে। বড়লোকের সুন্দরী মেয়েদের কৃত্রিম মুখ দেখে। ছেলেদের চুল আর পোশাক দেখার পর গ্রাম গঞ্জে গিয়ে সেখানের নির্মল ও সুস্থ পরিবেশকে বিকৃত ও দূষিত করে তোলে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে পটল দৌড়ে এলো। এসেই আমাকে বলল, তোমার ভাই ডুবিয়ে দিলে এক্কেবারে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি ?

আমাদের পুজো কমিটির চাঁদা থেকে পাঁচশো সাঁইত্রিশ টাকা যে বন্যাত্রাণে দিলাম হাবুদা সে খবরটা একটু কাগজে ছাপিয়েও দিতে পারলে না। নিউজ আইটেম হিসেবে। এত বড় একটা দান।

পটলের বাবা, অর্থাৎ আমার প্রতিবেশীর সর্ষের তেলের কল আছে। কীসের সঙ্গে কী মিশিয়ে তাঁর কলের ঘানি চলে তা ভগবানই জানেন। কিন্তু অর্থের অভাব নেই কোনো। এও আমার জানা যে, কোনো অপ্রাকৃত কৌশলে এ পর্যন্ত জীবনে তিনি ঠকাননি সরকারকে একটি পয়সাও। পটলের নিজের সিগারেটের খরচই মাসে চারশো। পুজো কমিটির পাঁচশো সাঁইত্রিশ টাকা। পটল এবং পটলের সমগোত্রীযরা কোলকাতার এই বড়েলোকতম পাড়ার পুজো কমিটির মোট তহবিল থেকে ঐ টাকা দিয়েছে এবং সে জন্যেই কাগজে সেটা ফলাও করে প্রচার করতে হবে এই দাবীতে আমার রক্ত মাথায় চড়ে গেল। সীমাহীন লজ্জাহীনতা।

হাবু আমার ভাই। একটা খবরের কাগজের একজন সামান্য কর্মচারী সে। কাগজটা তার বাবার নয় যে পটলের মত দাতাকর্ণদের অকিঞ্চিৎকর দানের খবর নিউজ আইটেম হিসেবে ছাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা হাবু রাখে।

যাই-হোক, পটল বড়লোকের ছেলে। বড় বড় ব্যাপার। বড় বড় বন্ধুবান্ধব। ওকে চটিয়ে আমার মত চুনোপুঁটির ক্ষতি ছাড়া ভালো হবার নয়। তাই, কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, হাবু চেষ্টা করেছিল ; পারেনি।

পটল বলল, বুলশিট।

এমন সময় রমেন, আমাদের পাড়ায় সবচেয়ে অবস্থাপন্ন মানুষ হরেন ঘোষের ছেলের সঙ্গে দেখা। শুধোলাম, মা-বাবা কি এখানে ?

রমেন পকেট থেকে ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট বের করে ধরিয়ে, কায়দা করে বলল, দূর। মা-বাবা কখনও এখানে থাকে না পুজোয়। গত বার ফরেন ট্যুরে গেছিল, এবার কাশ্মীরে।

আমি মুখ ফসকে বলে ফেললাম, এ বছরেও ?

তারপর বললাম, কাশ্মীরে আগে একবার গেছিলেন না ?

রমেন বলল, আগে চারবার গেছে। এই নিয়ে, ফিফ্‌থবার।

বললাম, বাঃ।

রমেন বলল, তুমি গেছ নাকি কালুদা, কাশ্মীরে ?

আমি বললাম, নাঃ। আমি কোথায়ই বা গেছি ? মধুপুর গেছিলাম একবার অনেকদিন

আগে।

রমেন সিগারেটটা বিলিতী লাইটারের উপর ঠুকে বলল, যাও, ঘুরে এসো। লাইফটা এনজয় করো। তুমি কেমন ম্যাদামারা হয়ে যাচ্ছো।

আমি পা বাড়ালাম। ভাবলাম, বলি, এনজয়মেন্টের সংজ্ঞা সকলের কাছে সমান নয়। আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই বলেই শুধু নয় ; ছুটিতে বাড়ি বসে বই পড়েই আমি সবচেয়ে বেশী এনজয় করি। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের এনজয়মেন্টের মধ্যে তফাত আছে। রমেনের নিজের বা তার মা-বাবার বিবেক বা রুচি আমার উপর জোর করে রমেন চাপাতে চাইছে কেন জানি না। আমি এগোলাম।

পটল পিছন থেকে বলল, হাবুদাকে বোলো যে, হাবুদা নিজেকে যত ইম্পর্ট্যান্ট মনে করে ততটা সে নয়। আমরা অন্য লোক ধরে অন্য কাগজে খবরটা ছেপেছি। আমাদের নিজেদেরও সোর্স কিছু আছে।

আমি হাবুর জন্যে দুঃখিত হলাম। খবরের কাগজে কাজ করা বা তার সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত থাকা যে কতবড় বিড়ম্বনার ব্যাপার তা হাবুর দাদা হয়েই আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। বেচারা হাবু।

গড়িয়াহাটের মোড়ে পৌঁছে, এক খিলি জর্দা পান খেলাম।

শ্রীকে বললাম, তুমি চকোলেটটা খেলে না শ্রী ?

ও বলল, দু হাতে ম্যাক্সি ধরে আছি দেখছো না ? পরে খাবো।

গড়িয়াহাটার মোড় ছাড়িয়ে বালীগঞ্জ নিউ মার্কেট পেরিয়ে বাঁদিকের ফুটপাথ ধরে ফাঁড়ির দিকে হাঁটছি। একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি। তারপরেই রাস্তা এবং তারপরই একটা তেকোণা পার্ক। পার্কটার সামনেই বাস স্টপেজে একটা সিমেন্টের শেড। দেখা যাচ্ছে দূর থেকে।

কত গাড়ি, কত শাড়ি, কত আনন্দ, কত অপচয় চারিদিকে। এমন কী আমার মত সাধারণ অবস্থার মানুষের মেয়েও সব মিলিয়ে আটটা জামা পায় এবং পরেও পুজোতে। ভাবতে ভাবতেই চোখ পড়ল সেই শেডের নিচে। তখন পৌঁছেই গেছি সেখানে।

একটি লোক, পরনে শতচ্ছিন্ন খাটো ধুতি। মালকোঁচা মারা। শুয়ে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে সকাল এগারোটায়, মহাষ্টমীর দিনে। গড়িয়াহাট মোড়ের দুশো গজের মধ্যে। তার পাশে তার স্ত্রী। ভীষণ নোংরা ও ছেঁড়া একটা সায়াবিহীন লালপেড়ে মোটা শাড়ি তার পরনে। হাঁটু অবধি ওঠা। গায়ে একটা জামা আছে বটে কিন্তু বুকের বোতাম নেই। মেয়েটির একটি স্তন আঢাকা। স্তনের বৃন্তটি ফুটপাথের ধুলোয় লাগা। আর সেই বৃন্ত থেকে এক চুল দূরে একটি ক্ষুধার্ত, বড় ক্লান্ত ; ঘুমন্ত শিশুর হাঁ-করা মুখ।

কেন জানি না, আমার পা আটকে গেল সেখানে। মেয়েটির উন্মুক্ত বুকের জন্যে নয়। আমি একজন সাধারণ মানুষ বলে। মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করি বলে। পুজোর সব আনন্দ, এই সুন্দর শরৎ সকালে হঠাৎই লোডশেডিং এর মত নিভে গেল।

শ্রী হাত ধরে ঝাঁকি দিলো। বলল, বাবা, ঠাকুর দেখাবে বললে, কী হল ? মোটে-তো চারটে দেখলাম।

আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। ম্যাক্সি-পরা চক্‌চকে-চামড়ার নতুন জুতো পরা আমার ছোট্ট অবোধ মেয়েকে বললাম, ঠাকুর দেখাবো মা। তোমায় ঠাকুর দেখাবো।

ভাবছিলাম, এই পরিবারটি কী বন্যাপীড়িত? এরা কোত্থেকে এসেছে? গোসাবা, বাগনান? নবদ্বীপ? না বীরভূম? এরা কী অনেকই দূর থেকে হেঁটে এসেছে? কতখানি ক্লান্ত ও কতখানি ক্ষুধার্ত এরা? যে মহাষ্টমীর দিনের রবরবাময় গড়িয়াহাট মোড়ের দুশো গজের মধ্যে থেকেও এরা সমস্ত পরিবার এমন মরণ ঘুম ঘুমোচ্ছে? এমন সকালে!

শ্রী বলল, কী দেখছ বাবা?

আমি বললাম, দেখেছো?

কি? শ্রী বলল, অবাক হয়ে।

শ্রী দেখার মত কিছুই দেখেনি। ওর দেখার কথাও নয়।

যে লক্ষ-লক্ষ লোক গাড়ি চড়ে, বাসে-ট্রামে মিনিবাসে, পায়ে হেঁটে ওদের পাশ দিয়ে আজ ভোর থেকে হেঁটে গেছে তারা কেউই ওদের দেখেনি। শ্রীর দোষ কি? ও তো একটা ছোট মেয়ে।

হঠাৎ একটা কালো অ্যাম্বাসাডার এসে দাঁড়াল শেডটার সামনে। কে যেন বলল, কীরে কালু? কোথায় যাবি? চল্ নামিয়ে দিচ্ছি।

তাকিয়ে দেখলাম, আমার কলেজের বন্ধু রাজীব। অ্যালয় স্টীলের কারবার করে খুব বড়লোক হয়েছে। নিউ আলিপুরে বিরাট বাড়ি করেছে। ফারসট ইয়ারেই বকামি করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। এদেশে পড়াশুনা করে কিছুই হয় না। পড়াশুনা করে রাজীবদেরই চাকর হতে হয়।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য। দরকার নেই। কাছেই যাবো।

রাজীব বলল, চল্ না আমার সঙ্গে। মহাষ্টমীর ভোগ খাবি আমাদের পাড়ায়। বীয়ার-সেশান চলেছে সকাল থেকে। জমবে ভালো, চল্।

ওকে বললাম, না রে। তুই যা। আমি তো কাছেই যাবো। এক আত্মীয়ের বাড়ি।

হঠাৎ রাজীবের চোখ গেল ঐ পরিবারটির দিকে।

চোখ বড় বড় করে আমাকে বলল, তুই কি দেশের কাজ করছিস না কি? আরে! ক'টা লোককে দেখবি তুই এ পোড়াদেশে? এসব সরকারের ডিউটি। আমি নিজে যা ট্যাক্স দিই, তাতেই বন্যাত্রাণে নিজেই একটা লঙ্গরখানা খুলতে পারতাম। কিন্তু করব কেন বল্? সরকার কী দেয় বদলে? হার্ড-আর্নর্ড মানির ট্যাক্সের বদলে?

তারপর ভালোবেসে বলল, পুজোর দিনে, একটু আনন্দ কর। এই তো তিনটে দিন বছরে। নিজেকে রাস্তার লোকের সঙ্গে ইনভল্ভ্ করিস না। কতজনের দুঃখ নিজের করবি? এর শেষ নেই। বোকার মত বিহেভ করিস না। ফালতু!

এত কথা জোরে জোরে বলে রাজীব চলে গেলো। আশ্চর্য! পরিবারটি তবুও অসাড়ে ঘুমোচ্ছিল। কী মরণ ঘুমই না ঘুমোচ্ছে।

রাজীব না হয় অনেক ট্যাক্স দেয় কিন্তু পটলের বাবা? আমার মামা শ্বশুর? তিনি তো এক পয়সাও দেন না। তাঁরও কী কোনো কর্তব্য নেই? ছিল না? আজ অথবা গতকাল? অথবা থাকবে না আগামী কালও? দেশের প্রতি, এদের প্রতি?

এতক্ষণে শ্রী কথা বলল।

বলল, বাবা, বাচ্চাটার খুব খিদে পেয়েছে, না? আমি আমার চকোলেটটা ওকে দিয়ে

দিই?

আমি শ্রীর মুখের দিকে তাকালাম। আমার বুকের মধ্যেটা যেন কীরকম করে উঠল। বললাম, তুমি খাবে না?

শ্রী বলল, আমি তো খাই; প্রায়ই খাই; কত্ত খাই। ও যে কিছুই খেতে পায় না।

বললাম, দাও।

কী নোংরা জায়গাটা, কী নোংরা ওদের কাপড়-চোপড়, শরীর। ঘৃণা থাকলে মুখে আঁচল দিত, শ্রীকে কিছুতেই কাছে যেতে দিত না। কিন্তু শ্রী যখন এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে হাত দিয়ে ওঠালো তখন আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাচ্চাটা চোখ খুলেই অবাক হল। শ্রী চকোলেটা ওর হাতে দিল। বাচ্চাটা জীবনে ক্যাডবারী দেখেনি। ও ওটা নিয়ে কী করতে হয় বুঝতে পারল না। ভাবল, খেলনা বুঝি।

আমি ডাকলাম মানুষটাকে, এই যে, শুনছো। শুনছো গো।

আমার ডাকেও উঠলো না মানুষটা। বাচ্চাটা তার মায়ের বুকে আঁচড়াতে মেয়েটি চোখ খুলল। চোখ খুলে আমাকে দেখেও বুক ঢাকার চেষ্টা করল না। আমার মনে হল, ওদের খিদেরই মত লজ্জাও; অপেক্ষা করে করে মরে গেছে বহুদিন আগে। এসব লজ্জা-টজ্জার বাবুয়ানী ওদের [illegible]।

মেয়েটি কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল আমার আর শ্রীর দিকে। তারপর কনুই দিয়ে ঠেলা মারল প্রায় মৃত মানুষটাকে।

মানুষটা উঠে বসল। মুখে একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল।

বলল, বাবু কিছু বলছেন?

তারপরই বলল, আমরা একটু পরই এখান থেকে সরে যাবো, আপনাদের দাঁড়াতে অসুবিধা হবে না। দোষ করেছি বাবু?

মনে মনে বললাম, দোষ তো করেইছ। অনেক দোষ। অনেকরকম দোষ।

মুখে বললাম, বন্যায় কী সবই ভেসে গেছে তোমাদের?

লোকটা অবাক চোখে বলল, বন্যা?

মেয়েটি বলল, না তো।

শুধোলাম, তোমার বাড়ি কোথায়?

লোকটা বলল, নক্কীকান্তপুর।

অবাক হলাম। লক্ষ্মীকান্তপুর? সে তো কাছেই। সেখানে আবার বন্যা কিসের?

লোকটা আরো ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে রইল। বলল, আমি তো বন্যার কথা বলিনি বাবু।

আমি আবার শুধোলাম, তুমি কলকাতায় কতদিন?

তা বছরখানেক।

বছরখানেক? কি কর তুমি?

কাগজ কুড়োই।

কোথায় থাকো?

এখানেই।-রাতে বৃষ্টি বাদলের জন্যে এখানে শুই। দিনে কাগজ কুড়োই।

খাও দাও কোথায় ?

মানুষটা বলল, ঐ পার্কের মধ্যেই সন্ধের পর মাটির হাঁড়িতে কিছু ফুটিয়ে নিয়ে খাই।

এক বেলাই খাও ?

এক বেলা জুটলেই কত !

মাসীমা মেসোমশায়ের জন্যে একটু মিষ্টি কিনে নিয়ে যাবো বলে দশটা টাকা বেশী এনেছিলাম। ওদের দিয়ে বললাম, তোমরা আজ ভালো করে খাও। আজ পুজোর দিন।

আমার অবস্থানুযায়ী এই বড়লোকী বেমানান হল, বুঝলাম। কিন্তু না ভেবেই, টাকাটা দিয়ে দিলাম।

মেয়েটাও উঠে বসল। এমনকি বাচ্চাটাও। ওরা তিনজনে এমন করে আমার ও শ্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইল যে, কী বলব। লজ্জায়, দুঃখে হতাশায় আমার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল।

শ্রী উত্তেজিত গলায় বলল, তোমরা আমার বাবাকে কী দেখছো ? অমন করে ?

মানুষটা আমাকে বলল, তোমার মুখটা দেক্‌তিচি বাবু। আজ পুজোর দিনে ভগমানের দর্শন পেনু। মুখটা চিনে রাক্‌তিচি। যদি পারি তো কোনোদিন এই ঋণ শুধব। ঠাকুর তোমার মঙ্গল....।

লজ্জায় দাঁড়ালাম না।

কী বলব, ভেবে না পেয়ে বললাম, চলি।

শ্রীও বলল, আমার দেখাদেখি ; চলি।

মানুষটার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এ তবে বন্যার্ত নয় ? বন্যার্তরা আসেনি এখনো কেউ ? পৌঁছতে পারে নি ? এ যে কোলকাতারই বাসিন্দা। এরই এই দশা। এ তো মাত্র একজন। কত আছে এ রকম ! ফুটপাথের মানুষ-এ। এইই এর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। বড়লোক কোলকাতার গর্ব গড়িয়াহাটার মোড়ের দুশো গজের মধ্যে এমন করেই ওরা বেঁচে থাকে। ভিক্ষা চায় না, দয়া চায় না কারোর। পটল, পটলের বাবা অথবা রাজীবের, এমন কি আমার মত নগণ্যজনেরও করুণা চায় না, ওরা শুধু বেঁচে থাকতে চায়। পরিশ্রমের বিনিময়ে।

চলতে চলতে ভাবছিলাম, এই দারুণ শহরে আটাত্তরের বন্যাপীড়িত, ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়া আপনজন হারানো মানুষগুলো এসে পড়লে তাদের অবস্থাটা কী হবে ?

বড় মাসীমা আমাকে আর শ্রীকে দেখে খুব খুশী হলেন। দিল্লী থেকে অনেকদিন পর এবারে এসেছেন আমার মাসতুতো দাদার ওখানে।

বড় মেসোমশায় বললেন, ও কেরে কালু ?

রানীর মেয়ে ?

আমি বললাম, না। ও আমার মেয়ে !

ওঃ। তোর মেয়ে ? কী যেন নাম ? শ্রী না ?

তারপর বললেন, চোখে কিছু দেখি না আজকাল। ক্যাটারাকট্‌ ফর্ম করছে।

বড়মাসীমা বললেন, এ পাড়াতে খুব জাঁকজমকের পুজো। সুন্দর ঠাকুর। দেখে যা।

নাঃ থাক। পথেই দেখলাম ঠাকুর।

মাসীমা মিষ্টি খাওয়ালেন জোর করে। বললেন, তোর মাকে বলিস, নবমীর দিন সারাদিন তোদের ওখানে গিয়ে থাকব।

খুব ভালো হবে। মা সবসময়ই আপনাদের কথা বলছেন।

মাসীমা বললেন, অনুকে বলিস যে, বড় বড় কই আনাতে। তেল কই খাবো।

বললাম, আচ্ছা।

ভাবলাম, বড় কই কতদিন আমরা নিজেরাই চোখে দেখিনি। তবে মায়ের আনন্দের জন্যে যে করে হোক মাসীমা মেসোমশায়ের জন্যে অন্তত যোগাড় করতে হবেই।

একটু পর উঠলাম শ্রীকে নিয়ে। বেলা বাড়ছে। রোদ কড়া হচ্ছে ক্রমশ।

পথে নেমেই শ্রী বলল, ক্যাটারাকট্ মানে কি বাবা?

ছানি।

ছানি কি বাবা?

বললাম, চোখের উপরে সরের মত পর্দা পড়ে যায়, চোখে আর দেখা যায় না।

শ্রী বলল, কই? মেসো-দাদুর চোখ তো ঠিকই আছে দেখলাম।

আমি একটু চুপ করে রইলাম।

তারপর বললাম, বাইরে থেকে দেখে তাই-ই মনে হয়।

টিটিচিকোরি

ভবানীপুরের গঙ্গাপাড়ের একটি জরাজীর্ণ ভাড়াবাড়িতে রায়পরিবার থাকতেন আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। ছোটবাবু ছিলেন জগৎ রায়। অবিবাহিত, উপার্জনহীন। বাড়ির ভাইপো-ভাইঝি বোনপো-বোনঝি তাঁকে ডাকত, 'ছোটকামা' বলে। মামা এবং কাকা মিলিয়ে।

ছোটকামা বললেন, "অ্যাই পাপা, পা'টা একটু টিপে দে তো। বড্ড ফাঁকিবাজ হয়েছিস তুই।"

পাপা পায়ের কাছে গিয়ে বসল তক্তপোশে। দু'হাতে ছোটকামার পা টিপতে লাগল।

বাড়ির উঠোনের মস্ত বিলিতি আমড়াগাছটাতে পাতার আড়ালে বসে দাঁড়কাক ডাকছিল লাল টাগরা বের করে। গরমের দুপুর। ঝাঁঝাঁ করছিল সাদা রোদ। কা-খ্‌বা-খ্‌বা করছিল কালো কাক।

ডুনা জল নিয়ে এল। ছোটকামা কনুইতে ভর দিয়ে একটু উঠেই ঢকঢক শব্দ করে জল খেলেন।

"কোথায় ছিলাম রে?" ছোটকামা শুধোলেন গল্পের খেই ধরিয়ে দেবার জন্যে।

"ঘনুমামা এখন তাঁর টাট্টু ঘোড়ায় করে চলেছেন বাড়েখাঁনের জঙ্গলে," টুলু বলল।

"হ্যাঁ, বাড়েখাঁনের জঙ্গলে," ছোটকামা শুরু করলেন, "ঘনু চলেছে। গরমের দুপুর। গা-পোড়ানো হাওয়া বইছে বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে। সাপেরা সব গর্তের মধ্যে। জংলী ইঁদুর পাহাড়ী নালার ভিজে বুকের পচা পাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে। বনমুরগি আর তিতির, আসকল, বটেরদের সরু-সরু গলা তিরতির করে কাঁপছে তখন, গান গাইতে থাকা গায়িকার গলার শিরার মতো ঝরঝর শব্দ করে বয়ে চলেছে পথের দু'পাশ দিয়ে প্রমত্ত ঝরনার মতো লাল, হলুদ, খয়েরি, কালো শুক্‌নো পাতা, হাওয়ার স্রোতের সওয়ার হয়ে কালো কালো নানা আকৃতির পাথরের আর গেরুয়া মাটির উপর দিয়ে। তেষ্টায় ছটফট-করা ময়ূর ডেকে উঠছে বনের গভীর থেকে 'কেঁয়া-আ, কেঁয়া-আ-আ' করে। ডাকছে কালী-তিত্তর জঙ্গলের বুকের গভীরের মধ্যে লুকনো টাঁড় থেকে। নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যাচ্ছে কোনাকুনি পথের উপর দিয়ে মত্ত হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে-খেতে, লাট-খাওয়া ঘুড়ির মতো। ঘনু চলেছে বিলিতি ক্যালেণ্ডারের বহুরঙা ছবির মতো সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তার টাট্টু ঘোড়ায় চেপে, টগবগ....টগবগ....টগবগ। শব্দ উড়ছে ঘোড়ার খুরে হাওয়ার খুরে। হাজার হাজার অদৃশ্য সব ঘোড়সওয়ার যেন হাওয়ার সওয়ার হয়ে কী এক লড়াইয়ে মেতেছে সেই মর্মরিত বনে-

বনে।"

"কোথায় যাচ্ছেন ঘনুমামা আজকে, ছোটকামা ? পাহাড়ী গ্রামের অত্যাচারী টিকায়েতের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে কি ? না, গত রাতে যে ভালুকমায়ের ছানাকে খাদের কুলিরা চুরি করে এনেছিল, তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে ?" ভুনা শুধোল উৎকণ্ঠিত গলায়।

"না না, ওসব নয়। আজ ঘনু চলেছে এক দারুণ জায়গায়। এক অবাক পৃথিবীর গভীরের এক অবাক ছবিতে। বলতে পারিস, চলেছে তীর্থযাত্রাতেই। সেই জঙ্গলের গভীরের নীল ঝিলের জল যদি কেউ খায়, কেউ চান করে সেখানে, তবে তার খিদে-তেষ্টা, দুঃখ-কষ্ট কিচ্ছু থাকে না। ছেলে হলে জিন, মেয়ে হলে পরি হয়ে যায় সে," ছোটকামা বললেন।

খুকু হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছিল। ছোটকামা'র মাথার চুল থেকে হাল্কা আর্নিকা তেলের মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ ভাসছিল ঘরে। আলতো হয়ে।

"কোথায় সে জায়গা গো ছোটকামা ? নাম কী সে জায়গার ?" তিমির শুধোল চোখ বড়-বড় করে।

"বনেরই বুকের দামি ঝিনুকের মধ্যে লুকিয়ে-রাখা দুর্মূল্য মুক্তোর মতো সেই ঝিল। নাম তার টিটিচিকোরি।"

"কী বললে, কী বললে ? কী ? কী ?" ওরা সমস্বরে শুধোল অদ্ভুত শব্দটা শুনে।

"টিটিচিকোরি।"

"টুমি ডাওনি ককনও ছোটকামা ? টুমি নিডেও ডাওনি ?" পিতৃমাতৃহীন গাগা বলল। গাগার বাবা ছিলেন রায়বাড়ির ন'ভাই। স্বামী-স্ত্রী বিয়ের দু'বছরের মাথায়ই ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। গাগার তখন এক বছর বয়স। এখন গাগার বয়স দশ। পাপার চেয়ে বছরখানেকের ছোট সে। এখনও ওর মুখে এরকম আধো-আধো বুলি। কাককে বলে টাক, ভাতকে বলে ভাট।

"না, আমি নিজে যাইনি কখনও। একবার যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারি," বলেই ছোটকামা হঠাৎ নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে গেলেন।

গল্পের স্রোতে বাধা পড়ায় টুলু বকল গাগাকে। বলল, "বড় বেশি কথা বলিস তুই।"

গাগা বলল, "বেঠ, আমি আড এড মড্যে নেই।" রাগ করেই উঠে যাচ্ছিল ও।

ছোটকামা বললেন, "বোস, বোস। তোর দোষ কী ? দোষ তো আমার। শোন বলি। টিটিচিকোরি ঠিক যে কোথায়, তা ঘনুই জানত। তবে শুনেছি বাড়েষাঁনের জঙ্গলের মধ্যে। তার মুখেই শুনেছিলাম তো আমি। মারুমার, গাড়ু, লাত, মুণ্ডু, চাহালচুঙরু,, বাড়েষাঁন, লাতেহার, লোহারডাগা, রাংকা এমনি সব কত জঙ্গলেই না যেত ঘনু। আমাকেও নিয়ে যেত মাঝে-মাঝে ডালটনগঞ্জ থেকে। কিন্তু কোনও জঙ্গলের সঙ্গেই টিটিচিকোরির তুলনা হয় না। গা-ছমছম ভয়ের, গা-রিমঝিম ভালো লাগার এমন জায়গা পালামৌ জেলার আর কোথায়ই ছিল না। এমনই বন যে, সূর্যের আলো পৌঁছ্য না সেখানে। সেই বনের মধ্যে কতরকম যে গাছ, ফুল, ফল, পাখি। কত জানোয়ার, পোকা, প্রজাপতি। আর তার ঠিক মধ্যিখানে এক ছোট্ট ঝিল। আয়নার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছোট আয়নারই মতো। আর শীতের কোয়েল নদীর চেয়েও তার জল পরিষ্কার। কচি কলাপাতা-রঙা উপত্যকার মধ্যে-মধ্যে ঝিঙে-রঙা পাহাড় পেরিয়ে পথ। একটি নয় রে, পরপর সাতটি পাহাড় ; ঝিলের

পাশে। সাত বোনের মতোই ঘিরে রয়েছে ঝিলটিকে হাতে হাত ধরে। তাদের একজনের গায়ে শালবনের শাড়ি, অন্যজনের সেগুনবনের। কারও শিমুলের লালে লাল, কারও করমের, কারও-বা সিসুর। আলাদা-আলাদা বন, এক-এক বোনের গায়ে। সেই যে সাত পাহাড়ের পাহারা-ঘেরা ঝিল, তারই নাম টিটিচিকোরি। বুঝলি গাগা, জ্যোৎস্নারাতে জিন-পরিরা চান করতে নামে সেই ঝিলে। যদি তাদের কেউ দেখে ফ্যালে, তবে তার মৃত্যু নির্ঘাত। তাই যদি-বা কেউ যায়ও টিটিচিকোরিতে, সন্ধের পর থাকে না মোটেই।"

"তা হলে ? ঘনুমামা যাচ্ছেন কেন ? যেতে-যেতে যদি রাত হয়ে যায় ?" উদ্বিগ্ন গলায় শীলা বলল।

"আজকে রাতের বেলা তো সে থাকবেই সেখানে। ঘনু একটা ডেয়ার-ডেভিল পাগল। জিন-পরিদের চান করা দেখবে নাকি চাঁদের আলোয়। চাঁদের সাপেরা খেলা করবে তখন জলে, তারার ফুল ভেসে বেড়াবে, আর তারই মধ্যে পরিরা জলের সূঁচ জলের সুতো দিয়ে জলেরই মধ্যে নকশি-কাঁথা বুনবে।"

"আররে, মলে ডাবে ডে। ডুবে ডাবে না ?" গাগা বলল, "ঘনুমামা মলে ডেলে আমাডের কী হবে ? কাড গড়প ঠুনব আমডা ?"

"মরতে যে পারে, তা ভালো করেই জেনেশুনে তো যাচ্ছে রে। মরতে যে ভয় পায়, সে কি টিটিচিকোরিতে যেতে পারে কোনওদিন ?"

"তাডপড ?" গাগা আবার শুধোল।

শীলা বলল, "ঘনুমামার কি ভয়ডর নেই ?"

"ভয় তো আমাদের জন্যেই। ঘনুর অভিধানে ভয় বলে কোনও কথাই ছিল না। ঘনু কী বলত জানিস ?"

"কী ?"

"বলত, ভয় কথাটা মুছে দেওয়াই উচিত অভিধান থেকে।"

"কেন ?" খুকু বলল গোলাপী ঠোঁট ফাঁক করে।

"ভয় বলে আসলে কোনও জিনিসই নেই। তা থাকে শুধু ভীরুদেরই মনে। না-জানারই আর-এক নাম ভয়। যা-কিছুই আমরা জানি না, যা-কিছুই আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, তাতেই আমাদের ভয়।"

"বলো, বলো।" নীলা বলল।

"হ্যাঁ," ছোটকামা বললেন, "চলেছে তো চলেইছে ঘনু। দুপুরের খাওয়া বলতে একটি বাখরখানি রুটি, দুটি ল্যাংড়া আম আর একটু আমলার আচার। ঘোড়াকেও ঘাস খাইয়েছে। কিন্তু জল পায়নি একটুও। ঘোড়ার পিঠে বাঁধা যে ছাগল ছিল, মানে ছোট্ট ভিস্তি, তার জলও শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। টিটিচিকোরিতে না পৌঁছলে আর জলের আশা নেই।"

"তারপর ?"

"বেলা পড়ে আসছে। রোদটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। গাছের ছায়াগুলো লম্বা থেকে আরও লম্বা হয়ে লুটিয়ে পড়ছে পুবের জঙ্গলের পায়ে কালো আঁচলের মতো, সূর্য যতই হেলছে পশ্চিমে। সামনে দেখা যাচ্ছে জানোয়ারের আর জংলী মানুষদের পায়ে চলা সরু শুঁড়িপথ। ফরেস্ট ডিপার্ট-এর পথ ছেড়ে হঠাৎই বাঁ দিকের গভীর বনের মধ্যের উপত্যকায়

হুমড়ি খেয়ে নেমে গেছে সেই শুঁড়িপথটি। যেন ভয়ে-ভয়েই।

"ঘনু তার ঘোড়ার লাগামে টান দিল। তারপর দু'হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পেটে একটু চাপ দিয়ে ডান দিকের লাগাম ঢিলে করে বাঁ দিকের লাগাম সামান্য টাইট করেই ঘোড়াকে নামিয়ে দিল সেই উপত্যকায়।

"গাছগুলোতে একটিও পাতা নেই। শূন্য ডালপালাগুলো মাথার উপরে হাত উঁচু করে বৃষ্টির প্রার্থনা জানাচ্ছে যেন মেঘহীন নীলিমার কাছে। বন তো নয়, যেন হাজার-হাজার নাগা-সন্ন্যাসীই শোভাযাত্রা করে চলেছে দ্রুতপায়ে, স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই।"

"তারপর বলো ছোটকামা, বলো," রুদ্ধশ্বাসে বলল আবার খুকু। তার ফরসা সুন্দর বালা-পরা, সুগোল ডান হাতখানিতে ধরে থাকা তালপাখাটি থেমে গেল উত্তেজনায়। ছোটকামাও থেমে গেছেন। টিটিচিকোরির পথের বর্ণনা স্তব্ধ করে দিয়েছে সকলকেই। গ্রীষ্মের দুপুরের গরম ও অস্বস্তির কথা বেমালুম ভুলে গেছে ওরা সকলে। ছোটকামার পিছনে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি মন্থনের সঙ্গে-সঙ্গে একদল কিশোর-কিশোরীও যেন চলে গেছে অনেক বছর আগের এক অদেখা গহন জঙ্গলের গভীরের আশ্চর্য ভয়ঙ্কর, সুন্দর সেই অদেখা টিটিচিকোরির পথে। ছোটকামার জঙ্গলের বন্ধু ঘনুমামার টাট্টুঘোড়ার খুরের শব্দর প্রতিধ্বনি উঠছে তাদের প্রত্যেকেরই ক... ...। উত্তেজনা ফুটছে অন্ধকার রাতের সারসার তারার মতো উজ্জ্বল চোখে। ধুকপুক করছে বুক।

"তারপর?" একটু ভয় পেয়েই ছোটকামার বুকের কাছ ঘেঁষে বসে বলল খুকু।

'তারপর কিছুটা এগোনোর পরেই ঘনু ঘন বাঁশের জঙ্গলে পৌঁছে গেল। যেখানে বড় বাঘ, বাইসন আর হাতিদের আড্ডা। বড়-বড় শঙ্খচূড় সাপ যেখানে ছায়াতে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে শুকনো পাহাড়ী নালার ভেজা-ভেজা বালির মধ্যে। এরা রেগে গেলে মাইলের পর মাইল তাড়া করেও লেজের উপর সটান দাঁড়িয়ে মানুষকে মুখে-মাথায় ছোবল মারে, দড়ি বাঁধারও উপায় থাকে না কোনও। সেই জঙ্গলও একসময় পেরিয়ে এল ঘনু। তারপর পৌঁছল গিয়ে চিলবিল গাছেদের বনে। মেমসাহেবদের মতো গায়ের রঙ তাদের। একটিও পাতা নেই এখন কারও গায়েই। মেমসাহেবদের গা থেকে মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। শেষ সূর্যের আলো সিঁদুরে করে তুলেছে তাদের শরীর। পাতার ঝরনা-বওয়ানো হাওয়ায় ভেসে গরমের শেষ বিকেলের গায়ের পাঁচমিশেলি তীব্র ঝাঁঝালো কটু গন্ধ আসছে দূরের হরজাই জঙ্গলের গা থেকে। মিশে যাচ্ছে মেমসাহেবদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে। পথের দু'পাশের ঝাড়ে-ঝাড়ে হাজার-হাজার লাল-রঙা ফুলদাওয়াই ফুটে উঠে বনপথকে এক লালচে আভা দিয়েছে। তেমন আভায় শুধুমাত্র কোনও বনপথই আভাসিত হতে পারে।"

"ঘনুমামা?"

"হ্যাঁ, ঘনু চলেছে সেই লালিমাতে আভাসিত পথ বেয়ে টগবগ....টগবগ.. .টগবগ....। তবে ওর টাট্টুর চালও যেন বদলে গেছে এখন। তা. খুরের শব্দ অতি সাবধানে 'আর যাওয়া ঠিক হবে কি হবে না' সেই প্রশ্ন এবং উত্তর করতে করতে চলেছে নিজের সঙ্গে নিজেই। যেন বাঁয়ার সঙ্গে ঢিমেতালে কথা বলছে বাঁয়া। সেই মেমসাহেবদের বন পেরিয়ে সবে হরজাই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে ও, আর সঙ্গে-সঙ্গে বনের মধ্যে থেকে তৃষ্ণার্ত গলায় ডাকতে থাকা ময়ূর-ময়ূরী, তিতির, আসকল, বটের, টিয়া, ময়না, টুনটুনি, বুলবুলি, সবাই কোন্ মন্ত্রবলে

হঠাৎই চুপ করে গেল। থেমে গেল জোরে-জোরে আওয়াজ করে কাঠ ঠুকতে থাকা কাঠঠোকরাও হঠাৎ। লেজ তুলে-তুলে চিঁহর-চিরি-র-রচিরি চিঁহর-র-র করে ডাকতে থাকা কাঠবিড়ালিরাও থেমে গেল। ঠিক সেই সময়েই বনের অণু-পরমাণু, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ভরে দিয়ে গম্‌গম্‌ আওয়াজ করে ডেকে উঠল কেঁদো বাঘ। পালামৌয়ের বাঘ। হুঁ-আঁ-ও। ঘোড়াটার শরীরে কাঁপুনি এল ম্যালেরিয়া জ্বরের মতন। ঘনু তার গলায় আদর করে হাত বোলাল। কিন্তু ঘোড়া সামনের দু'পা জোড়া করে একবার শূন্যে তুলে পরক্ষণে নামিয়ে নিয়েই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নটনড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। কয়েকবার ডেকেই কিন্তু থেমে গেল বাঘটা। বোধহয় জল খেতেই যাচ্ছে।"

"টিটিচিকোরিতে? তা'পর?"

"শোন্‌। টিটিচিকোরিতে ঘনু যখন পৌঁছল গিয়ে, তখন সূর্য নামছে পাটে। তার গোলাপি আভায় টিটিচিকোরি ঝিলকে মনে হচ্ছে যেন এক গোলাপি সায়র। সাত-বোন পাহাড়েরা হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে গোলাপির মধ্যে সবুজের ছায়া ফেলে। প্রত্যেকের গায়েই গভীর জঙ্গলের শাড়ি। পাতাঝরা বনই সব। অথচ আশ্চর্য, পাতা ঝরেনি তাদের একটিও। চারদিক থেকে ঘন বনের সবুজ আঙুলগুলি নেমে এসে ঝিলের গায়ে হাত ছুঁইয়েছে সযতনে। টিটিচিকোরির ঝিলের একপাশে সেগুনবনের পাহাড়ের একটু উঁচুতেই একটা গুহা। তার উপর বসে আছে সাদা-মাথা মেছো বাজ।

"ঘোড়া নিয়েই উঠতে লাগল ঘনু সেদিকে। খুব আস্তে আস্তে। একটু বাদেই সন্ধে নামবে। গুহার মুখের কাছে এসেছে, ঠিক সেই সময়ে একটা মস্ত ভালুক গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এসেই পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে যে কত্তবড় তাই-ই দেখাল ঘনুকে। ভাবখানা, দেখেশুনে বাহাদুরি কোরো বাহাদুর। তার বুকের উপরের দিকে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মতো একটি মোটা সাদা দাগ। হিমালয়ান বেয়ার। কী রে, পা টেপা থামালি কেন রে পাপা?" ছোটকামা বললেন।

টিটিচিকোরির পাশ থেকে বড় কষ্ট করে পাপা ভবানীপুরে ফিরে এসে আবার ছোটকামার পা টেপা শুরু করল।

"তারপর," খুকু বলল, "বলো ছোটকামা।"

"আজ আর নয়। আবার এর পরের রবিবার। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। যা, তোরাও ঘুমিয়ে নে একটু," বলেই অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো ছোটকামা কোলবালিশটা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ওরা সকলেই হতাশার গুঞ্জরণ তুলে হয় লুডো, নয় ক্যারাম, নয়তো কলের গানের কাছে ফিরে গেল।

কাদের বাড়ির রেডিওতে তখন 'অনুরোধের আসর'-এর গান হচ্ছিল : 'হারা মরু নদী শ্রান্ত দিনের পাখি....' খুব কম লোকের বাড়িতে রেডিও ছিল তখন। কলকাতার সব মানুষই তখন এত বড়লোক হয়ে যায়নি। আরাম ছিল না, টিভি ছিল না, কিন্তু বড় শান্তি ছিল। আরামের সঙ্গে শান্তিকে গুলিয়ে ফেলেনি তখনকার মানুষ।

পরের রবিবারও কিন্তু ছোটকামা, রাতের বেলা টিটিচিকোরিতে ঘনুমামা কী দেখলেন, তা কিছুতেই বলেননি। না, তারপরের বা তারও পরের রবিবারও নয়। ঘনুমামা সত্যি-সত্যিই পরিদের চান করতে দেখেছিলেন কি না, তাঁর কোনও বিপদ হয়েছিল কি না, সে সবও নয়।

প্রতিবারেই ছোটকামা টিটিচিকোরিতে ঘনুমামার পৌঁছনোর বর্ণনাই দিতেন নতুন করে, নতুন ভাষায়। যেন টিটিচিকোরিতে পৌঁছনোর অনেকগুলিই পথ ছিল বিভিন্ন দিক দিয়ে। তাঁর স্মৃতি আর কল্পনার মধ্যে তো নিশ্চয়ই ছিল। যে যাত্রী যে পথ বেছে নেবে, নেবে। তার খুশিমতো। তখন বলাতেও বড় খুশি ছিল। বলতেন 'জানিস ওখানে পৌঁছলে মানুষের আর খিদে পায় না, ঘুম পায় না, ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না কারও সঙ্গেই। ছেলেরা জিন এবং মেয়েরা পরি হয়ে যায় টিটিচিকোরিতে পৌঁছেই। কোনও দুঃখই তাদের আর ছুঁতে পারে না। খাওয়ার কষ্ট, পরার কষ্ট, আমার মতো একা-একা জীবন কাটানোর কষ্ট, কোনও কষ্টই না।'

পাপা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি নিজে তো যাননি কখনও ? একদিনও না ?'

'নাঃ, হয়নি যাওয়া। হলে তো....।' খুবই হতাশার সুরে বলেছিলেন ছোটকামা।

ছোটকামা তিরিশের দশকের ডালটনগঞ্জ, বারোয়াড়ি, লাতেহার, বেতলা, ছিপাদোহরের জঙ্গলে কাঠ আর বাঁশের ব্যবসার স্মৃতি, ঘনুমামার মতো সঙ্গীর সঙ্গ, এই সবই পিছনে ফেলে এসেছিলেন চিরদিনের মতো, ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে। ওরা যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, 'যেতে ইচ্ছে করে না ওখানে ফিরে আপনার ? দেখতে ইচ্ছে করে না রাতের বেলার টিটিচিকোরিকে ?' ছোটকামা মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বলতেন, 'নাঃ।' বলেই সেই প্রসঙ্গ চাপা দিতেন সঙ্গে সঙ্গেই। এ-সব প্রসঙ্গ মানে টিটিচিকোরি বা কোয়েল নদীর বা লাতেহারের পণ্ডিতজির দোকানের অথবা ছিপাদোহরের হাটের প্রসঙ্গ, এমনকি ডালটনগঞ্জ সংক্রান্ত কোনও কথা উঠলেও উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক হয়ে নিচু গলায় বলতেন, 'অন্য কথা বল। অন্য কথা। পাপা, গাগা, খুকু, তোদের পড়াশুনো নেই ? তোরাও কি আমার মতো অপদার্থ হয়েই থাকবি ? বেকার ? পরের বোঝা ?'

৩

অনেক দিন, চল্লিশটি বছর পেরিয়ে এসেছেন ছোটকামা। পেরিয়ে এসেছে পাপা এবং গাগাও, এই কলকাতা শহরও। দেখতে দেখতে।

বদলে গেছে কলকাতা, বদলে গেছে জীবন। বদলে গেছে মানুষের সফলতার সংজ্ঞা, চাওয়া-পাওয়ার ধরন-ধারণ। ছোটকামা, পাপা এবং গাগারও এখন বড় কষ্ট। স্বপ্নবিলাসীদের জায়গা নেই এই শহরে আর। বেঁচে থাকা সত্যিই বড় কষ্টের হয়ে গেছে। রোজগার নেই, স্বজন নেই, দু'বেলা ডাল-ভাতেরও সংস্থান নেই। তা ছাড়া বেঁচে থাকার মানে তো শুধুই খাওয়া-পরা-থাকার সুখ নয়। ছেলেবেলার সেইসব দুপুর এখন স্মৃতির মণিকোঠায় দুর্মূল্য আতর-মাখানো পশমিনা শালই হয়ে আছে।

অকলুষিত রোদ মাথায় করে চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকের কলকাতার স্তব্ধ, সুন্দর

নির্জন, ঝাঁঝালো দুপুরে ট্রাম যেমন দৌড়ে যেত, তেমন করে দৌড়ে যায় না আর ফাঁকা পথ দিয়ে গাঁগাঁ শব্দ করে লাইনের উপর হেলতে-দুলতে। গল্প বলার আর গল্প শোনার মতো পরিবেশ, সময় আর শান্তি আজকের কলকাতার দুপুরে আর একটুও নেই। সকালবেলায় ফটফট শব্দ করে রাস্তা ধোয় না আর করপোরেশনের লোকেরা। অলিগলিতেও হাঁটা যায় না আর স্বচ্ছন্দে। কোনও পথেই। কাবুলিওয়ালা হেঁকে যায় না সকালের চিলের কান্নার মধ্যে, 'হিং চাই, হিং....' বলে। বিকেল হলেই বেলফুল আর কুলফি ফেরি করে যায় না ফেরিওয়ালা। সারা শহরের লোকই আজ ফেরিওয়ালা হয়ে গেছে। কিছু না কিছু বেচার আছে প্রত্যেকটি মানুষেরই। হারিয়ে গেছে সেই সব দিন, পরিবেশ, অনুষঙ্গ।

রবিবারের দুপুবে আর কোনও ঘরেই মামা-মাসি, কাকা-পিসিদের ঘিরে শিশু আর কিশোরেরা গল্প শোনে না। টিটিচিকোরির পথের বাঘের মতো হুঁয়াউ....হুঁয়াউ করে হুঙ্কার দেয় এখন ঘরে-ঘরে টিভি, নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে। যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেকই বেশি জানা হয়ে গেছে যেন এখনকার কিশোর-কিশোরীদের। শৈশবের সব শিউলীগন্ধী বিস্ময়ই আজ মরে, পচে, ফুলে, গাড়ি চাপা-পড়া পথের কুকুরের মতো জীবনের পথপাশে পড়ে আছে। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের শকুনেরা ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে।

বড়ই লোভ জমেছে সকলের মনে। নানারকম, অঢেল, অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু, অবাস্তব সব বিজ্ঞাপনে। চাই, চাই, এটা চাই, ওটা চাই, সবই চাই। নিজের নিজের যোগ্যতার অথবা প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়ে প্রত্যেকেরই পেতে ইচ্ছে করছে সমস্ত কিছুই। যা-কিছু প্রতিবেশীর আছে, অথবা আছে আত্মীয়-স্বজনের, সহকর্মীর। 'নেই, নেই,' আর 'চাই, চাই,' করে দৌড়তে-দৌড়তে মুখে রক্ত তুলে আছড়ে পড়ে মরে যাচ্ছে তারা এক সময়, অলক্ষ্যে।

পিপাসা, বড়ই পিপাসা। বড় খিদে এখন চারদিকে। সত্যি খিদে, মিথ্যে খিদেও। যা তারা চায়, তার কত সামান্য পেয়েই এই একটা মাত্র ছোট্ট জীবনে কী দারুণ খুশি হওয়া যেত, সুখী থাকা যেত, তা একবারও ভাবার সময়টুকু, অবকাশটুকু পর্যন্তও আজকের কলকাতার বাবা-মায়েদের নেই। অথচ পাপা-গাগাদের কৈশোরে ছিল। তাদের শৈশব ও কৈশোরকে দারিদ্র্যের মধ্যেও রাজকুমারের মতোই উপভোগ করেছিল তারা।

সেই সব স্নিগ্ধ, শান্ত দুপুরের, ছোটকামার গল্প-শোনা সরল পবিত্র শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা এখন সকলেই প্রায় প্রৌঢ়। টুলু নাম-করা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। ডুনা বিলিতি কমার্শিয়াল ফার্মে মোটামুটি ভালো চাকরি করে। কাপি স্টেটস-এর নেভাডাতে সেটল করেছে। চারখানা গাড়ি ও বাড়ির মালিক এখন। শীলা ইংল্যান্ডে। ওর স্বামী নিউক্লিয়ার মিসাইল বানায়। পৃথিবী ধ্বংস করবে তো, তাই খুব ভালো থাকে। তিমির কলকাতাতেই বড় ব্যবসা করে। খুকু থাকে বোম্বেতে। তার বর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পাঁচ বছর পরপর আসে একবার কলকাতায়। ওর ছেলেমেয়েরা বাংলা বলতেও পারে না। মারাঠি বলে মারাঠাদের মতন।

সকলেরই বিয়েও হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েও। কারও-কারও ছেলেমেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। অপদার্থ রয়ে গেছে শুধু পাপা আর গগাই। ভ্যাগাবন্ড ওরা। ইনস্যুরেন্স-এর এজেন্সি, জমি-বাড়ির দালালি, ছুটকোছাটকা কাজ করেছে পাপা জীবনের বিভিন্ন সময়ে। ইন্টারমিডিয়েটের পর আর পড়েনি।

গাগারও বয়স বেড়েছে আরও, চল্লিশ বছর। কিন্তু মনে সে একটুও বাড়েনি। শিশুর মতোই কথা বলে এখনও ট-ট করে। আজকের কলকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে গাগা-পাপাদের কোনওই জায়গা নেই। ছোটকামার বন্ধু, ধুতির উপর নীল টুইলের শার্ট পরা, টাট্টুঘোড়ায় চড়া ঘনুমামাই এখনও ওদের স্বপ্নের হিরো। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। চল্লিশটা বছর যে পেছনে ফেলে এসেছে সেই গল্প শোনার দিনগুলো থেকে, তা যেন মনেই পড়ে না ওদের।

মনের বয়স হয়নি ছোটকামারও। ব্যবসা ডুবে যাওয়ায় তিরিশ দশকের শেষের দিকে সেই যে পালামৌয়ের স্বপ্নময় কাব্যিক পরিবেশ ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে, তখন থেকেই ভাগ্যের হাতে মার খেতে-খেতে-খেতে একেবারেই ডানা ভেঙে পড়ে আছেন। এখন সম্পূর্ণই সমাহিত। প্রত্যেক পরাজয়ের মধ্যেও জয়ের মুহূর্ত নিহিত থাকে। আর কিছুই হবার নেই, হবেও না। তবুও প্রায় বিনা-রোজগারেই যে এই নিষ্ঠুর শহরে কী করে এত দীর্ঘদিন হাসিমুখে বেঁচে থাকা যায়, তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ ছোটকামা। হয়তো পাপা এবং গাগাও। টিটিচিকোরি ওদের চোখকে স্বপ্নের অঞ্জন দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। নির্লোভি, সরল, উচ্চাশাহীন এক আশ্চর্য জীবনযাপন করে যাচ্ছে এখনও এই তিনজন মানুষ, এই লোভসর্বস্ব ভণ্ডামির শহরে।

ভাই-বোনেদের মধ্যে অনেকেই বাড়ি করেছে। গাড়িও করেছে প্রায় সকলেই। তারা ভালো থাকে, ভালো খায়। তাদের ছেলেমেয়েরা দারুণ ইংরেজি গান গায়, কবিতা লেখে ইংরেজিতে।

গাগা একদিন বলেছিল, 'কী লে পাপা, একটা গাডি ঠাকলে বেঠ হট, না লে ? নিজেড গাডি। বেঠ, ভাবটি গাডি কিনব একডা।'

'বেশ তো', পাপা বলেছে।

গাগা মাঝে-মাঝেই ভাবে একটা গাড়ির কথা। এত লোকের গাড়ি আছে। তবে, গাড়িই যদি কেনে ও কোনওদিন, তবে একটা লাল-রঙা দোতলা বাসই কিনবে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার মোড়ের মুদিটি, বিহারের দ্বারভাঙা জেলায় যার বাড়ি, হাজারিবাগ জেলার সিমারিয়া গ্রামের পরামানিক, ভিখিরি বুড়ি মোক্ষদা, পাড়ার মুড়ি-তেলেভোজার দোকানি পুলিনদা, যে তাকে প্রায়ই ধারে সিগারেট দেয় এবং অনেক সময় পয়সাও নেয় না, তাদের সকলকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাবে, আর সকলে মিলে ফুচকা খাবে। এখন ফুচকার দাম কত হয়েছে কে জানে। কত্ত বছর খায়নি। ওদের ছেলেবেলায় পুরনো দু'পয়সায় দশটা করে ছিল।

জগৎ রায় মানে ছোটকামার খোঁজ এখন শুধুমাত্র গাগা ও পাপাই রাখে। রায়-পরিবার বড় হয়ে ওঠার পর ছোটকামাকেও সেই আশ্রয় ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। পরিবার বড় শুধু আয়তনেই হয়নি, বিত্তের মাপেও মস্ত বড় হয়েছে। অর্থ আসার সঙ্গে-সঙ্গেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যে-সব মূল্যবোধ মাখামাখি হয়ে থাকে, তা উধাও হয়ে গেছিল রায়-পরিবার থেকে, অন্য অনেক পরিবারের মতো। ছোটকামা ভেবেছিলেন, সারাটা জীবনই অমন গল্প বলেই কাটিয়ে দেবেন। মাত্র একজনের তো পেট। চলেই যাবে কোনও না কোনও দাদার সঙ্গে থেকেই। চাহিদাও তো ছিল না তেমন কিছু। খদ্দরের পাজামা আর পাঞ্জাবি, তাও নিজের হাতেই কাচতেন। যা খেতে দেওয়া হত, তাই-ই খেতেন। কিন্তু হয়নি তা।

বারাসাত ছাড়িয়ে একটি গ্রামে কলকাতার এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ির আউটহাউসে থেকে তাঁর আম-বাগান দেখাশোনা করার ভার নিয়েছেন ছোটকামা বছর-পাঁচেক হল। অনেক কিছুই ধরা-ছাড়ার পর। টিনের ছাদের একটি কামরা। গরমে বড়ই গরম এবং শীতে খুবই ঠাণ্ডা হয়। তবু গাছগাছালি, পাখপাখালি, বর্ষায় ব্যাঙের-ছাতা, ব্যাঙ, লজ্জাবতী লতার ঝাড়। ছোটকামা বলেন, 'চমৎকার। বেশ জঙ্গল-জঙ্গল ভাব। দারুণ লাগে রে গাগা, বুঝলি? পালামৌ-পালামৌ গন্ধ আছে বেশ।'

প্রতি রবিবারেই গাগা আর পাপা এখনও ছোটকামার কাছে আসে। যদিও ওদের রোজই রবিবার। ছোটকামা তেমনই গল্প বলেন বোনপো আর ভাইপোকে।

বাগানের মালী ওড়িশাবাসী গণেশ চমৎকার মসুর ডাল রাঁধে। সেও থাকে পাশের ঘরে, একা। বৃষ্টি ও শীতের দিনে ছোটকামার হট ফেভারিট খিচুড়ি রেঁধে দেয় গণেশ। বোনপো, ভাইপো আর কামার পকেট হাতড়ে যা বেরোয় তাই দিয়েই রান্না হয়। ভালোবেসে খিচুড়ি খেয়ে আটচল্লিশ বছরের গাগা আর উনপঞ্চাশ বছরের পাপা পঁয়ষট্টি বছরের ছোটকামার গল্প শোনে ছেলেবেলার মতোই। হাতে তালপাখা নিয়ে শুয়ে থাকা ছোটকামা আজও তেমনই চমৎকার করে গল্প বলে যান, ক্লান্তিহীন।

চেহারা ওদের তিনজনেরই বড়ই জীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু মন তেমনই সজীব আছে। এখনও ওদের কল্পনায় নিস্তব্ধ কাঁচপোকা-ওড়া গ্রীষ্ম-দুপুরের বাড়েষাঁনের গহন অরণ্যে ঘনুমামা তাঁর টাট্টুঘোড়ার পিঠে চেপে টিটিচিকোরির দিকে চলেন। টগবগ....টগবগ....টগবগ....শব্দ হয় ঘোড়ার খুরে-খুরে। শেষ বেলার সিঁদুরে লাল রঙ লাগে আজও দীর্ঘাঙ্গী মেমেদের মতো চিলবিলের পাতা-ঝরা জঙ্গলে। এখনও কল্পনায় নাগা-সন্নিসিদের মতোই বৃষ্টি নীরব প্রার্থনায় হেঁটে যায় পত্রশূন্য গাছেরা স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জন্মাবধি কলকাতা শহরের বাইরে একদিনের জন্যেও না-যাওয়া পাপা আর গাগাকে ছোটকামার গল্পের জাদু যেন ভবঘুরেই করে দিয়েছে। ওদের মনের চোখে গত চল্লিশ বছরে একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি সেই মেমেদের মতো জ্যৈষ্ঠের চিলবিল বনের নরম সৌন্দর্য।

ছোটকামা সবসময়ই হাসেন। হাসির আগে জিভ আর টাগরা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করেন। বোঝা যায় যে, এবার কোনও হাসির কথা বলেই নিজেও হাসবেন। এতরকম কষ্টের মধ্যেও হাসতে একটুও কষ্ট হয় না ছোটকামার। অবাক হয়ে পাপা ভাবে। এতদিনেও কিন্তু ক্লান্তি আসেনি ছোটকামার কল্পনার অরণ্যচারণে। সেই পঞ্চাশ বছরের আগের ডালটনগঞ্জ, লাতেহার, বারোয়াড়ি, গাড়ু, মুণ্ডু অথবা লোহারডাগার দিনগুলি এখনও জ্বলজ্বল করে তাঁর স্মৃতিতে।

খাওয়াদাওয়ার পর গেঞ্জিটাকে পেটের উপরে গুটিয়ে তুলে খাটের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে খয়েরি লুঙ্গি পরে আরামে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ছোটকামা বললেন, "গাগা, পা'টা টিপে দে তো একটু।"

আটচল্লিশ বছরের গাগা পঁয়ষট্টি বছরের ছোটকামাকে বলল, "বিঠানাতে ঠোও তুমি আগে। তাপ্পড ডেব। বঠে-বঠে কি পা টেপায় কেউ? গল্প বলটে হবে কিণ্টু।"

ছোটকামা হাসেন। বলেন, "আমাদের গাগাটা ঠিক একই রকম রয়ে গেল।" নিজেও যে সেই একই রকম রয়ে গেছেন, সে-কথা একবারও মনে হয় না তাঁর।

দশ বছরেই থেমে আছে গাগা। অনেকেই ভাবে এবং বলে যে, গাগা স্বাভাবিক নয়। ওর বুদ্ধি জড়। একসময় তো সাইকিয়াট্রিস্টও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পাপা আর তার ছোটকামা জানেন যে, গাগা প্রকৃতই ভাগ্যবান। এর চেয়ে বড় স্বাভাবিকতা আর কিছুই হয় না। সারাজীবন শৈশবে বেঁচে থাকার মতো সুখ কি আর কিছু আছে?

ছোটকামা শুরু করলেন, "সেদিন বিকেলে খুব দুর্যোগ, বুঝলি। সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। জানুয়ারির শেষ। ওই সময়টায় প্রতি বছরই জঙ্গলে ওরকম হয়। পালামৌতে যা শীত দেখেছি, ওয়ার্লডেও তা দেখিনি।"

পাপা ভাবছিল, ছোটকামার ওয়ার্লডের বিস্তৃতি পশ্চিমে পালামৌ আর পুবে কলকাতা!

"তাডপড ?" গাগা বলল।

"মুগের ডালের ভুনি-খিচুড়ি হাতা-হাতা, ফার্স্টক্লাস গাওয়া ঘি, আর একেবারে কড়কড়ে করে ভাজা আলু আর শুকনো লঙ্কা খেয়েই সন্ধে লাগতে না লাগতেই তো আমি আর ঘনু বিশ্বাসবাবুদের হুলুক পাহাড়ের নিচের মারুমারের ক্যাম্পের কাঠের ঘরে দরজায় আগল দিয়ে শুয়ে পড়েছি পাশাপাশি খাটিয়া লাগিয়ে। খাটিয়ার নিচে জ্বলন্ত কাঠকয়লার আগুন কালো-রঙা মাটির কালো মালসাতে। গায়ের ওপর দু'আঙুল মোটা দেহাতি কম্বল। ঘনু বলেছিল, "আঃ, দু'কমলিবা ঠান্ডা পড়েছে রে আজ জগা।' সবে ঘুমটা এসেছে, বুঝলি, ঠিক সেই সময়েই দরজাতে কারা যেন ধাক্কা দিতে লাগল খুব জোরে-জোরে।"

"তাডপড ?" গাগা বলল।

"আমি তো ভয়েই বাঁচি না। ভয়ে আর শীতে দাঁত খটখটিয়ে বললাম, কোনওমতে, 'কোন হ্যায় হো?' তারা কী বললে জানিস?"

"টি ? টি ? বড কামা।" গাগা আবার বলল চোখ বড়-বড় করে।

"তারা বলল, 'তেরা বাপ হ্যায় হো'। তখন ঘনু ফিসফিস করে বলল, 'জগা, । ডাকাত। দিগা পাঁড়ে', বলেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা বন্দুকটা টেনে নিল নিজের দিকে।"

গাগা রুদ্ধশ্বাসে বলল, "তাডপড ?"

"তারপর ?"

৪

ওই রকমই এক রবিবারের দুপুরে গাগা আব পাপাকে গল্প বলতে বলতেই ছোটকামার খুব ঘাম দিতে লাগল। বুকে খুব ব্যথা। বর্ষার দিন ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল বেদম। গরম ছিল না একটুও। অথচ ঘেমে চান করে যাচ্ছিলেন।

পাপা দৌড়ে গেল ডাক্তার আনতে। মোড়ের মুদির দোকানি রাধাবাবুর কাছে হাতঘড়িটা বন্ধক রেখে সাইকেল-রিকশা করে ডাক্তারকে নিয়ে এল পাপা। বুকে স্টেথিস্কোপ বসিয়ে ধপধপে সাদা পোশাক-পরা বিলেত-ফেরত ডাক্তার খুব ভালো করে পরীক্ষা করলেন ছোটকামাকে। মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে শুধোলেন, "কী হল গো মালী তোমার? ও মালী, কথা বলো।"

ছোটকামা কথা বলতে পারছিলেন না। মাথা নাড়ালেন বালিশের দু'পাশে। মুখ দিয়ে একটু লালা গড়াল। হাত দিয়ে বুক দেখিয়ে ইশারাতে বললেন, বুকে খুব ব্যথা।

ঝোড়ো-কাকের মত ভিজে, ওষুধ কিনে যখন ফিরল পাপা, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। ভবানীপুরের গঙ্গার পাড়ের একটি বাড়িতে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যেমন জ্বলত। ছোটকামার মাথার কাছে তাঁর প্রাণের প্রহরীরই মত গাগা বসেছিল।

ছোটকামা মুখ হাঁ করলেন একবার। গাগা মুখে জল ঢেলে দিতে-দিতে বলল, "এইবাডে কোয়েলেড পাডের ঠটানে ডাহ করটে নিয়ে ডেটে হবে, বুডলি পাপা ? টময় হয়ে গেটে।"

মনে পড়ল পাপারও। ছোটকামা বলতেন, ডালটনগঞ্জের ওই শ্মশান ছাড়া আর কোথাওই তাঁকে যেন দাহ না করা হয়।

জ্ঞান যেন একটু একটু করে ফিরে আসছে। ঘুমের ইনজেকশানের কাজ শেষ হয়ে এসেছে।

ছোটকামা বললেন, "জল।"

আবার জল দিল পাপা।

জল খেয়ে চোখ মেললেন, হাসলেন। ফিসফিস করে বললেন, "টিটিচিকোরি।"

তাঁর চোখের সামনে হুলুক পাহাড়ের নিচের শীতের রাতের নীল কুয়াশা, কোয়েলের ওপারের কুট্‌ক, হুটার, খোড়োয়াই, কুজরুম ; ঔরঙ্গা আর কোয়েল নদীর সঙ্গমের কেচকির, সব ছবিগুলো যেন এক-এক করে ফুটে উঠতে লাগল। ট্রেন যাচ্ছে ঔরঙ্গার ব্রিজের উপর দিয়ে। গুম-গুম-গুম-গুম....। মাথার মধ্যে অনেকগুলো বছর গুঁড়ো-গুড়ো হয়ে গেল।

"নিয়ে যাবি রে ?" ছোটকামা বললেন।

"কোথায় ?" ওরা দুজনে খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ির মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল।

"টিটিচিকোরি", আরো-একবারও উচ্চারণ করলেন অস্ফুটে ছোটকামা। তারপরই থেমে গেলেন। আর কথা বলেননি। ওই অবস্থাতেই যদিও ছিলেন তিনদিন। ওই আমবাগানের টিনের ঘরেই।

না, কোয়েলের পারের শ্মশানে নয়। এই সভ্য শিক্ষিত মানুষদের শহর কলকাতার অত্যন্ত নোংরা, লজ্জাকর গুণ্ডামি এবং চরম-অশান্তির পরিবেশের এক শ্মশানেই ছোটকামাকে পোড়াল গাগা আর পাপা। শ্মশানের যা ছিরি, এই শহরে মৃত্যুর পরেও শান্তি নেই মানুষের।

শ্মশানে কেউই আসতে পারেনি, এক ডুনা ছাড়া। যদিও ওই তিনদিনে সব বাড়িতেই ঘুরে ঘুরে খবর দিয়েছিল গাগা। পাপা সবসময়ই ছিল ছোটকামার কাছেই। কেউই আসতে পারেনি। একজন ভ্যাগাবণ্ডের জন্যে নষ্ট করার মতো সময় কলকাতায় কারও নেই। সকলেই ব্যস্ত, সাকসেসফুল। অনেক রকম কাজ তাদের প্রত্যেকেরই। যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধেও আজকাল। ডুনাই এসেছিল একমাত্র। কিন্তু তারও সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল একটা। একটা পা টেনে-টেনে হাঁটে। গাগা প্রত্যেককেই বলেছিল বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, তার ছেলেবেলার খেলার আর গল্প শোনার প্রত্যেক সঙ্গীকে, তাদের স্ত্রী এবং স্বামীদের, ছেলেমেয়েদেরও বলেছিল, 'ঠোটোকামা টলে ডাচ্ছেন টিট্টিচিকোরিতে, টোমরা ঠেট ডেকা ডেকে ডেও।'

তবুও আসেনি কেউ। ছেলেবেলার সঙ্গীরা ছেলেবেলা ফুরোলেই বড় দূরে চলে যায়। মস্ত করে হাত বাড়ালেও তাদের ছোঁয়া যায় না পরে।

পাশের পূতিগন্ধময় গঙ্গায় চান করে শেষ বিকেলে শ্মশানের বাইরে বেরিয়েই পাপা বুঝতে পারল যে, গাগার সঙ্গে তার বন্ধনটাও এবার ছিন্ন হয়ে যাবে। যোগসূত্র ছিলেন ছোটকামাই। ছোটকামার বেহালাটা, একমাত্র সম্পত্তিটা কাঁধে নিয়ে আগে-আগে চলছিল বেঁটে গাগা।

একটু কুঁজো হয়ে। এই নিষ্ঠুর আধুনিক পৃথিবীতে আটচল্লিশ বছরের শরীরের নিঃসহায় বিত্তহীন শিশুটি কী করে যে একা-একা বেঁচে থাকবে তা ভাবতেও পারে না পাপা। ওর নিজের তো কোনও....। গাগার জন্যে ভারী চিন্তা হতে লাগল।

অবশ্য পরমুহূর্তে ভাবল, প্রতিদিন তো গাগা একা-একাই বেঁচে এসেছে। ওর জন্যে পাপা তো বটেই অন্য কেউও কিছুমাত্র করেনি। শুধু গাগাকেই নয়, এই আধুনিক পৃথিবীতে বিত্তবান-বিত্তহীন, প্রাপ্তমনস্ক-অপ্রাপ্তমনস্ক প্রত্যেকটি মানুষকেই একা-একাই বাঁচতে হয়। সংসার থাকলেও তারা এমনি একাই থাকত। একাই বাঁচতে হত। ভাবার মতো মন নিয়ে যে মানুষই জন্মেছে, সে সবসময়ই একা। চিরদিনের।

বাস থেকে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে নেমেই প্রচণ্ড শোরগোলের মধ্যেই পাপা, গাগার গায়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "কী করবি এখন তুই?"

পাপার কথার উত্তর না দিয়েই ও বলল, "টুই?"

"আমার মেস তো ছেড়ে দিচ্ছি। না ছাড়লে এবারে তাড়িয়েই দেবে। বলেছে তাই। আট মাসের টাকা বাকি। ওদের দোষ নেই।"

"আলে, আমি টো আড মডিনি এখনও। টোড কোনওই চিন্টা নেই। আমি ঠাকলে টুইও ঠাকবি। ঠিক ডেকিস।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তো ঠিকানাও লাগে একটা, না কি?"

গাগা হেসে ফেলল শিশুরই মত। বলল, "যে মানুটডের কোটাও ডাওয়ার ঠাকে, যাডের কেউ টিটি লেকে ককনও, টাডেরই ডরকার টিকানার। আমাডের কোন্ ডরকার? টুই একটা বোকা।"

'বাঁশদ্রোণীর ওই সাধুর আখড়াতে আর ক'দিন বাঁচবি? কী করে বাঁচবি? তার উপরে আমাকেও নিয়ে যাবি বলছিস। পাগল তুই।"

গাগা চারধারের অগণিত ঘর্মাক্ত, ডিজেলের ধোঁয়ার মধ্যে কুঁজো হয়ে হেঁটে যাওয়া ক্ষুধার্ত মানুষদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল পাপাকে, "ড্যাক্, ডাক্, এডা ডা্মন কলে বাঁটটে, আমডাও টেমন কলেই বাঁটব। অটো চিন্টা কলিস না। আমাডেল কী? ঝাে হাট-পা টো। টল্, টুই আমাড ঠঙ্গেই টল।" পাপার হাত ধরে টানল ও।

ঘোরের মধ্যে একটু এগিয়েও গেল পাপা। কিছুটা ভিড়ের ঠেলাতেও। গাগার কানে মুখ ঠেকিয়ে পাপা বলল, "গাগা, একটা জায়গায় যাবি?"

"কোটায়? কোটায় ডে?" শিশুর সারল্যে আর ঔৎসুক্যে বলল গাগা।

"টিটিচিকোরি।"

গাগা সঙ্গে-সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়ে একগাল হেসে বলল, "ভেলি গুড আইডিয়া। টল, টল। আমলা টিটিচিকোলিটেই ডাই। পডিদের টান করা ডেকি গিয়ে।"

পাপা একদৃষ্টে গাগার দিকে চেয়ে রইল।

পাপা এবং গাগা ভিড়ের ধাক্কায় এলোমেলো হতে হতে ঝড়ে পড়া পাখির মতো পালক খসাতে খসাতে সাত-বোন পাহাড়ের সাত বনের শাড়িপরা পাহাড় ঘেরা পরিদের আবাস টিটিচিকোরির দিকে চলতে লাগল। মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের খয়েরি আলোর মধ্যে ওদের অন্য গ্রহের দুটি জীব বলেই মনে হচ্ছিল।

পাপাকে ঘিরে রাখা হাজার-হাজার মূক, মাথা-নিচু মানুষের বিভিন্নমুখী স্রোতের মধ্যে বৃষ্টিভেজা, কাদাময় পথের মধ্যে পা হড়কে-হড়কে দূরগামী বাসের জন্যে দৌড়তে থাকা বৃষ্টিভেজা মানুষদের ভ্যাপসা ঘামের গন্ধের মধ্যে পাপার মনে হচ্ছিল যে, ওর চারধারের প্রতিটি মানুষই জীবিকার জন্য দৌড়োদৌড়ি করছে, সকাল থেকে সন্ধে অবশ্যই কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই আসল গন্তব্য বোধহয় ছিল টিটিচিকোরি। জীবিকা কখনওই জীবন নয়। টিটিচিকোরিই আসল জীবন।

হঠাৎই গাগা বলল, "সত্ত্রি বলটি পাপা, বড্ডই খিডে পেয়েটে ডে। ঠেই ভোডবেলা এক কাপ টা খেয়েটি ঠুডু। আড কিটু খাইনি।"

পাপা মুখে ওকে কিছু না বলে মনে-মনে বলল, 'চল চল গাগা, দেবশিশু ভাই আমার, তাড়াতাড়ি চল। পা চালিয়ে যাই, যেখানে খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, ঈর্ষা নেই, লোভ নেই, পরশ্রীকাতরতাও নেই। সাত-বোন পাহাড় ঘেরা সাত-রঙা জঙ্গলের শাড়ি গায়ে জড়িয়ে সেই নীল ঝিলকে পাহারা দেয় যেখানে, রাতের বেলায় রুপোলি চাঁদের সাপেরা কিলবিল হিলহিল করে জলে খেলা করে বেড়ায়, তারারা রাশি-রাশি সবুজাভ নরম ফুল ফুটিয়ে তোলে উড়াল ভিজে চুলে সাঁতরে যাওয়া পরিদের নাভিতে ; আর সেই পরিরা জলের সূঁচ, জলের সুতো দিয়ে জলেরই মধ্যে নকশিকাঁথা বোনে।

'চল, চল গাগা, যাই, সেইখানে যাই ....সেই....পরিদের দেশে....যাই চল....।'



বিড়াল

এ ঘরটার অবস্থা শোচনীয়। মাঝে মাঝেই দেওয়াল থেকে পলেস্তারার চাপড়া খসে পড়ে। বর্ষার দিনে পশ্চিমের দেওয়াল জুড়ে ড্যাম্প, ভেজা ভেজা স্যাঁতসেতে সব সময়। শীতের দিনে রুখু উত্তুরে বাতাস পাশের নতুন ওঠা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি হয়ে গোঁত্তা মেরে ঢুকে পড়ে পশ্চিমের জানালা দিয়ে।

পঁচিশ বছর আগে শোচনীয় ছিল। এখন অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এই ঘরেই ঘোষ অ্যান্ড দাশগুপ্ত কোম্পানীর ক্যাশিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, বিল ক্লার্ক ও টাইপিস্টদের বসার জায়গা। বছর পনেরো আগে এ-ঘরে সিনিয়ার পার্টনার ঘোষ সাহেব বসতেন। পাশেই তাঁর বাথরুম ছিল।

তারপর সব বদলে গেছে। ঘর পাল্টাপাল্টি হয়েছে।

মেসিনে নতুন করে কার্বন চাপালেন খেয়ালবাবু। বড় সাহেব হাতের লেখা ড্রাফট-এর উপর ছোট্ট করে লিখে দিয়েছেন, ওয়ান প্লাস ফোর, অন লার্জ প্যাড।

কার্বনটা চাপাতে চাপাতে, আড়চোখে হাতঘড়িটা দেখলেন একবার উনি। সাড়ে সাতটা বাজে। আজ মনোর মাকে নিয়ে গায়নাকোলজিস্টের কাছে যাওয়ার কথা ছিল।

এমন সময় ছোকরা বিল ক্লার্ক সমীরণ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, খেয়ালদা, আজ সাহেবদের কাছে একজন লোক এসেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম আজকাল বিদেশে একরকম কাগজ বের হয়েছে তাতে কপি করার জন্যে কার্বন পেপারের আর দরকারই হচ্ছে না। নিচে রেখে টাইপ করলে এমনিতেই কপি হয়ে যাচ্ছে।

খেয়ালবাবু হাত থামিয়ে বললেন, বলো কি? সত্যি?

সত্যি নয় তো মিথ্যা। তবে, তবুও টাইপিস্টদের দরকার হচ্ছে। কিন্তু ফোটো-কপি বা জেরোক্স মেশিনের এদেশে যদি তেমন চল হয় তবে টাইপিস্টরা তো সব না-খেয়েই মরবে।

খেয়ালবাবুর বুকটা ধক্ করে উঠল। খেয়ালবাবু ইংরিজিতে এম এ, জোতদার ছিলেন। দেশ ভাগের পর তাই টাইপ শিখে এই লতায়-পাতায় আত্মীয়র অফিসে ঢুকেছিলেন। পুরোনো লতায় আর জোর নেই। ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গাতেই।

সমীরণকে ধমক দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। সকলেই যেন জেরোক্স আর ফোটোকপি বসাচ্ছে। তাহলে তো কথাই ছিল না। ওসব বিদেশেই চলে। যে দেশে এত লোক বেকার, সে দেশে চলবে না।

সমীরণ সিগারেটে বড় একটা টান দিয়ে বলল, তা কুকুর বেড়ালের মত মানুষ পায়দা হলে আর বেকারত্ব ঘুচবে কী করে?

সে যাই-ই হোক।

বলেই, খেয়ালবাবু কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন, কারণ সমীরণের এই জেনারাল স্টেটমেন্টে ওঁর প্রতি একটা কটাক্ষ ছিলো। খেয়ালবাবুর ছেলে মেয়ে ছয়। অবশ্য একটি নেই। আর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এক ছেলে চাকরি করছে। বাকী তিনজন।

বললেন, ওসব বসাতে পয়সাও তো লাগে। ওসব বড় বড় কোম্পানীই বসাতে পারে। টাটা-বিড়লারা। তোমার এই ছাতার ঘোষ অ্যান্ড দাশগুপ্তের এত টাকা কোথায়? মাসের দশ-বারো তারিখের আগে তো মায়নাই হয় না কোনোদিন, তার আবার ফোটো কপি।

উষ্মার সঙ্গেই বললেন কথাটা খেয়ালবাবু।

বলেই, ঘাবড়ে গেলেন।

ঐ সমীরণ ছোকরা, দাশগুপ্ত সাহেবের কীরকম যেন আত্মীয় হয়। যদিও মাখামাখি নেই। রাজা-প্রজারই সম্পর্ক। কিন্তু তবুও ছোকরা কুচুটে আছে। যদি বলে দেয়।

তারপর আবার বললেন, বসায়ও যদি কোম্পানী, তাহলেও আমাদের জীবদ্দশায় বসাবে না।

সমীরণ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে খেয়ালবাবুর চোখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর হেঁয়ালী করে, সিগারেটের ধোঁয়াব কুণ্ডলী পাকিয়ে বলল, কে বলতে পারে?

২

খেয়ালবাবুর ভালো নাম অদ্বিজা রায়। আদি বাড়ি বরেন্দ্রভূমি। পাবনা জেলায়। ছোটখাট জোতদারী ছিল একটা চলন বিলের কাছাকাছি। ছোটবেলায় মাথায় কাসাঁর জামবাটি উপুড় করে গামছা দিয়ে কষে বেঁধে নিয়ে, হেলমেটের কাজ চালিয়ে কত চিতাবাঘ মেরেছেন। চলন বিলে পাখি শিকার। খাওয়া-দাওয়া, দোল-দুর্গোৎসব। তখন একটা টইটম্বুর ভুঁড়িও ছিল। জমিদারী আছে এবং থাকবে এই শাশ্বত বিশ্বাসে ভুঁড়িটাকে বর্ধমান হতে বাধা দেন নি। কিন্তু হঠাৎ দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় সর্বনাশ হয়েছিল।

জোতদারী চলে গেছিল ; ভুঁড়িটা রয়ে গেছিল।

এই গল্প, খেয়ালদা সকলকে বেশ রসিয়েই করেন, মানে, আগে করতেন। আজকাল রসের গল্প করার মত মন বা শারীরিক অবস্থা আর তাঁর নেই। আগের আগের তুলনায়, অনেক কষ্টে থাকেন এবং এই কষ্টতেই অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রসবোধ এবং রসিকতা করার ক্ষমতা তাঁর অনাবিল ছিল বহুদিন।

একসময় নামকরা খেয়ালী ছিলেন তিনি। তাঁর গলায় ধ্রুপদ ধামারও যাঁরা শুনতেন, তাঁরাও মুগ্ধ হতেন। তবে খেয়ালেই তাঁর নাম বেশি ছিল। অফিসের সহকর্মীরা এবং অন্যান্য জানাশোনা অনেকেই বলতেন যে, খেয়ালদা গান ছেড়ে না দিলে কী হতেন আর কী হতেন না ; তা বলা মুশকিল। বয়সে তিনি বড়ে গোলামের চেয়ে ছোট এবং আমীর খাঁর চেয়ে বড় ছিলেন। প্রাচুর্য, অবকাশ ভাবনাহীন এবং ক্লেশহীন আয়ের জগৎ থেকে হঠাৎই নির্বাসিত হয়েছিলেন। এই ঘোষ অ্যান্ড দাশগুপ্তের টাইপিস্টের চাকরীটা পেয়ে মরতে মরতেই বেঁচে

গেছিলেন। সে কারণেই, এই পঁচিশ বছর কোনোক্রমে বেঁচে আছেন এখনও না-মরে। অতি-কষ্টে সংসার প্রতিপালনের গ্লানিতে ন্যুব্জ হয়ে না পড়লে খেয়ালদা গান-বাজনার জগতে সত্যিই হয়ত একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হতেন।

খেয়ালবাবু ঘড়িটা আর একবার দেখলেন, তারপর বেয়ারা হিতেনকে বললেন, ছোট সাহেবকে একবার জিগ্যেস করে আয় আর কোনো কাজ বাঁকি আছে কী না। এই, হিতেন।

খেয়ালবাবু বাঙালত্ব প্রায় বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু এখনও উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে পাবনা জেলার এই চন্দ্রবিন্দুর প্রতি পক্ষপাতিত্বকে বিসর্জন দিতে পারেন নি।

হিতেন একটু পর ফিরে এসে বলল, আছে বাঁকি। আজ গঁদাধরবাঁবু আঁসেন নিঁ তোঁ।

খেয়ালবাবু দাঁত কিড়মিড় করলেন।

হিতেনটা বহুদিনের লোক। সমানে ইয়ার্কি করে ওর সঙ্গে।

গদাধর এ অফিসের পার্টটাইম স্টেনোগ্রাফার। সরকারী অফিসে কাজ করে, সেখানে মাইনে, প্লাস ডি-এ, পি-এফ, গ্র্যাচুইটি ; পেনশান। কাজের বেলা কিছুই নয়। এদিকে সন্ধের পর এখানে ঘন্টা দেড়-দুই ঘুরে গিয়েও মন্দ হয না।

খেয়ালবাবু প্রায়ই ভাবেন যে জীবনে একটা বেসিক মিস্টেক হয়ে গেছে। মাঝবয়সে চাকরিতেই যখন ঢুকতে হলো তখন সরকারী চাকরির চেষ্টা করাই উচিত ছিল। কিন্তু ফর্ম্যাল এডুকেশন যে তেমন ছিল না। তখন তো মধ্যবিত্তরাই বি-এ—এম-এ পাশ করত কেরানী হবার জন্যে। জমিদারের ছাওয়াল। কেডা আবার চাকরির জন্যে পড়াশুনা করত? যাই-ই হোক, খেয়ালবাবু ভাবতেন যে, এদেশের সরকারী কেরানীর মত সুখের চাকরি বোধহয় আর কোথাওই নেই।

ম্যাটারটা টাইপ করা শেষ করে সবে একটা বিড়ি ধরিযেছেন। তাঁর রঙচটা "সাইমা" হাতঘড়িটাতে তখন পৌনে আটটা বেজে গেছে। এমন সময় হিতেন এসে বলল, খেয়ালবাবু ; তলব।

আধ-ফোঁকা বিড়িটা তাড়াতাড়ি অ্যাশট্রের ওপর ব্যালান্স করে রেখে তিনি দৌড়ে করিডর পেরিয়ে ওঘরে গেলেন। তারপর ঘর পেরিয়ে ছোটসাহেবের চেম্বারে। দুটো এয়ার কন্ডিশনার চলছে দুপাশে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার জোগাড়। ছোটসাহেব সত্যিই সাহেব মানুষ।

ছোটসাহেবের সামনে স্যুট পরা এক ভদ্রলোক বসেছিলেন।

খেয়ালবাবুকে ছোটসাহেব হাত দিয়ে বসতে বললেন।

ভদ্রলোক ছোট একটা পকেট-ক্যালকুলেটর বের করে কী সব অঙ্ক কষছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, নো প্রবলেম্।

নো প্রবলেম? ছোটসাহেব উজ্জ্বলমুখে শুধোলেন ভদ্রলোককে।

আই সেইড সো। গো অ্যাহেড। ভদ্রলোক বললেন।

ছোটসাহেব দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

বললেন, ইটস আ ডীল দেন।

ইয়া। ডীল্।

ভদ্রলোক বললেন।

তারপর দুজনেই বেরিয়ে গেলেন। বোধহয়, ভদ্রলোককে লিফট্ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে

গেলেন ছোটসাহেব।

খেয়ালবাবু ভাবছিলেন যে, এত ঠাণ্ডায় মানুষ বসে থাকে কী করে ? হারেম-টারেম আছে বোধহয় ছোটসাহেবের, নয়ত রোজ আন্ডেকা রোশান হালুয়া এবং বিরিয়ানি পোলাউ খান। তাও তো ছোটসাহেবের বয়স চল্লিশ-টল্লিশ হবে। কিন্তু বড় সাহেব ? বড় সাহেব তো তাঁর নিজের চেয়েও অনেক বড় হবেন বয়সে। কিন্তু তাঁর ঘর যেন আরও ঠাণ্ডা। ষাট বছরের লোকের পক্ষে চেহারাটা যথেষ্ট ইয়াং রেখেছেন বলতে হবে। সিলভার-টনিকে জরা ভরা আতুরেরাও নবীন হয়ে ওঠে বোধহয়। তিনিও হতেন। জোতদারী থাকলে।

এমন সময় ছোটসাহেব দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন।

খেয়ালবাবু উঠে দাঁড়ালেন। যেমন করে খেয়ালবাবুকে দেখে চরের মুসলমান প্রজারা, হিন্দু প্রজারা উঠে দাঁড়াতো। আজকে দেশে জাতিভেদ প্রথা উঠে গেছে। শিডিউলড কাস্ট আর শিডিউলড ট্রাইবরা কত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু নতুন জাতিভেদ তৈরি হয়ে গেছে, যার শিকড় চলে গেছে অনেক গভীরে। যেখানে উঁচু নিচু সব জাত একাসনে। ছোটসাহেব বড় সাহেব এখন ব্রাহ্মণ, এবং খেয়ালবাবু, সমীরণ, হিতেনরা সব ছোট জাত। এক দলদের দেখে অন্যদের তখনও উঠে দাঁড়াতে হত ; এখনও হয়। খেয়ালবাবু যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তো দাঁড়িয়েই রইলেন।

ছোটসাহেব বড় অন্যমনস্ক। এই তো সেদিন হায়দ্রাবাদে বেলে-ভিস্তাতে দশ হাজারী ম্যানেজমেণ্ট কোর্স শেষ করে এলেন। তারপর থেকে অফিস মডার্নাইজেশান, খরচ-কমানো, সিমপ্লিফিকেশান অফ অপারেশানস্ টাইম-ম্যানেজমেণ্ট এসব নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন। মাথায় যে কত শত ক্রিয়েটিভ ভাবনা ঘুরছে তা বলার নয়।

অনেকক্ষণ পর ছোটসাহেবের খেয়াল হল। বললেন, বসুন বসুন। একটা ডিকটেশান্ নিনতো।

খেয়ালদা খাতাটা বাগিয়ে ধরলেন। তিনি তো আর স্টেনোগ্রাফার নন, তবু। পেনসিলটাও ঠিক-ঠাক করে নিলেন।

ছোটসাহেব বললেন, দ্যা এজেণ্ট, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ। হাইকোর্ট ব্রাঞ্চ।

খেয়ালবাবু হাইকোর্টে এসে পেন্সিল ভেঙে ফেললেন। পটাং করে আওয়াজ করে শীষটা তিন টুকরো হয়ে গেল।

সব বাঙালেরই হাইকোর্টের নামেই হয়তো ভীতি থাকে।

ছোটসাহেব বললেন, ওয়ার্থলেস।

খেয়ালবাবু বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে বাঁ চোখের অঞ্জনীটাকে একটু ঘষে নিলেন। কুট্ কুট্ করছে বড়।

ছোটসাহেব বললেন, একদিনও কী একটু কাজটা চালিয়ে নিতে পারেন না ? আপনারা সব আউট-ডেটেড্, ইউসলেস্ হয়ে গেছেন। একেবারে ফসিল্। যান। বাড়ি যান্।

খেয়ালবাবু আগে আগে ছেলেমানুষ অবস্থায় উত্তেজিত হতেন। শনৈঃ শনৈঃ জেনেছেন যে, বেসরকারী অফিসে উত্তেজনা মানে ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি, মালিকের কু-দৃষ্টি এবং বরখাস্ত। যেসব সরকারী, আধা-সরকারী ও ব্যাঙ্ক-ইনসিওরেন্স ও বড় বড় মার্চেন্ট অফিসের কর্মচারীরা মিছিল করে লাল শালুর ওপর বক্তৃতা লিখে ড্যালহাউসী-চৌরঙ্গী গম্‌গম্ করে ফেরে। তারা

যা মাইনে ও সুযোগ সুবিধা পায় তা পেলেও খেয়ালবাবু বর্তে যেতেন। তার উপর খেয়ালবাবু জানেন যে তাদের চেয়ে কাজও চারগুণ বেশী করেন খেয়ালবাবু। ঐসব মিছিলকারী মানুষগুলো মদ্‌নার, মানে খেয়ালবাবুর নক্‌শাল ছেলের ভাষায় ছিল ; পাতি বুর্জোয়া।

ছোটসাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে খেয়ালবাবু ভাবছিলেন, ঐ মদ্‌নারাই ওষুধ ছিল এদেশের। সব অসুখের ওষুধ। মদ্‌নার কথা মনে হলো খেয়ালবাবুর। মদ্‌নাকে একটা রাজনৈতিক দলের ছেলেরা প্রায় তার বাড়ির উপরেই কুড়িজন মিলে রেক্‌টামে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছিল। আত্মীয় স্বজন, অফিসের প্রায় পনেরোজন লোক রক্ত দিয়েও মদ্‌নাকে বাঁচাতে পারেন নি। ওখানে স্টিচ থাকে না। রক্ত, সকলের রক্তই ; বেরিয়ে গেছিল। মাঝে মাঝে অফিসফেরতা লাস্ট ট্রাম কী বাসের জানালায় হাত রেখে বসে, হাই তুলতে তুলতে শ্যামবাজারের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ মদ্‌নার মুখটা ভেসে ওঠে। ওকে যখন মারে ঐ ছেলেগুলো, তখন ওর বয়স ষোলো।

আটটা ষোলো। সমীরণ বলল।

খেয়ালবাবু তাড়াতাড়ি মেসিনটা গোছগাছ করে রাখলেন, ছাতাটা কোণা থেকে তুলে রাবারের জুতোটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে কসরৎ করে পরতে লাগলেন। জুতোটা একজন তাঁকে দান করেছে. এক সাইজ ছোটো। একটু কষ্ট করে পরতে-খুলতে হয়। হলেও এই বাজারে বাঁচানো কুড়িটা টাকা! চারটিখানি কথা নয়।

বেরিয়ে যেতে যেতেই কী মনে হওয়ায়, হিতেনকে বললেন, যা, বড়সাহেব ছোটসাহেব দুজনকেই জিগ্যেস করে আয় বাড়ি যাব কী না।

হিতেন এক দৌড়ে চলে গিয়েই ফিরে এল। বলল, যেতে পারেন। তবে কাল সকাল সকাল আসবেন।

সকাল সকাল মানে, কখন?

হিতেন বলল, ন'টার মধ্যে।

আজ বিকেল থেকে নিচের ব্যস্ত পথের গাড়ি, বাস, ট্রামের যন্ত্রমর্মর ছাপিয়েও মেঘের গুড়গুড় শোনা যাচ্ছিল। কাগজে লিখেছিল, রাতের দিকে ঝড়-বৃষ্টি হবে.

দুগগা দুগ্‌গা বলে খেয়ালবাবু সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তরিয়ে নামতে লাগলেন। লিফটের জন্যে অপেক্ষা করার তর তাঁর আর সইলো না।

ট্রামের বাঁদিকে একটা জানালার পাশে বসার জায়গা পেয়ে বসতেই হঠাৎ খেয়ালবাবুর ছোটসাহেবের মুখে শোনা "ফসিল্‌" কথাটা মনে পড়লো। ফসিল্‌ এর মানে জানেন না খেয়ালবাবু। কথাটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। বাড়ি গিয়েই তাঁর পার্ট-ওয়ান্‌ পড়া মেয়েকে জিগ্যেস করতে হবে। ও না জানলে, বাড়িতে বহু পুরোনো একটা ইংরিজি থেকে বাংলা ডিক্‌শনারী আছে, সেটাকে খুঁজে বের করে দেখতে হবে।

এখনও বৃষ্টি নামেনি। তবে অদূরে কোথাও হচ্ছিল। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। গা-শিরশিরে হাওয়ায় বসে ফসিল্‌ কথাটার এবং ছোটসাহেবের মুখ বিকৃতি করে সে কথা বলার ভঙ্গীর কথাও হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে খেয়ালবাবুর শীত শীত করতে লাগল। এখনও তিনটে ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব। দুটি মেয়ের বিয়ে বাকি। নিজের শরীরেও আর দেয় না।

শ্যামবাজারের মোড় থেকেও অনেক দূরে মধ্যমগ্রামের মোড় থেকে যে রাস্তাটি বাদুর

দিকে চলে গেছে সেই রাস্তায় খেয়ালবাবুর বাড়ি। অফিস থেকে লোন নিয়ে উনিশশ পঞ্চাশে টালির ছাদের ছ্যাঁচা বাঁশের উপর চুনবালির পলেস্তারা দিয়ে তিনখানি ঘর করে নিয়েছিলেন। একটা ছোট পুকুর। মাঝে মধ্যে গলায় দড়ি বেঁধে কাউঠা রাখেন তাতে। পালা-পার্বণে অতিথি কুটুম এলে দড়ি ধরে তুলে উপুড় করে কেটে খাওয়ান। একটা টিউবওয়েল, পেঁপে গাছ, নারকোল গাছ, একটা লিচু, দুটো আম এবং একটা কাঁঠাল। যজ্ঞি ডুমুরও আছে একটা। রঙ্গনের ঝাড়, টগর আর হাসনুহানা।

মনোরমার ভারী গাছ-গাছালির শখ। বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি-গয়নার শখ তো এজন্মে মিটলো না। তাইই শুধু গাছের শখটা মিটিয়েছেন বছর বছর রথের মেলায় শেয়ালদার সামনে থেকে চারা কিনে এনে।

বাড়ি যখন ঢুকলেন খেয়ালবাবু, তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। লণ্ঠনের আলোতে ডুরে শাড়ি পরা মেয়ে রমা পড়াশুনা শেষ করে বালিশের ওয়াড় রিপু করছিল। ছোটটা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেজ ছেলে আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। ফেরেনি এখনো। বারাসতের মোড়ের করুণাময়ী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গিয়ে রোজ সন্ধেবেলা আড্ডা না মারলেই নয়। ইংরিজি তো দূরের কথা, বাংলাতেও একটা চিঠি লিখতে পারে না ; অথচ জানে না এমন বিষয় নেই। জনতা সরকার কেন ভেঙে যাবেই, ইন্দিরার আসল দোষ কি, কেস্পেস কী করলে ওয়ার্লডি কাপে আরো গোল দিতে পারত, অথবা শত্রুঘ্ন সিনহার ক' ভাই বোন এ সমস্তই তার জানা।

পুকুরে ডুব দিতে দিতে খেয়ালবাবু বললেন, হারামজাদা। সব হারামজাদা। অকৃতজ্ঞর ঝাড়। বড় ছেলে খগেনের চাকরি বড় সাহেবকে ধরে করে তিনিই করে দিয়েছিলেন। এখন মাইনে পায় তাঁর দু গুণ। কিন্তু পেলে কী হয় ? হাত-কাট্টি পেট-কাট্টি ব্লাউজপরা বউ নিয়ে সে আলাদা হয়ে গেছে। সংসারে আধলা দিয়েও সাহায্য করে না। মাঝে মাঝে খেয়ালবাবুর সন্দেহ হয় যে, এরা সব তাঁর নিজেরই ছেলে কী না। মেয়েগুলোর তবু একটু টান আছে। বড় মেয়েটির তো আছেই। কিন্তু এই বাজারে সকলেরই টানাটানি। টান থাকলেও দেখাতে পারে না।

কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে মাটির মেঝেতে খেতে দিলেন মনোরমা খেয়ালবাবুকে। মেয়ে রমা পাশে বসল হাতপাখা নিয়ে। পুকুর পাড়ে ব্যাঙ ডাকছে। জোনাকী জ্বলছে দূরের বাঁশ ঝাড়ে। লম্ফর শিখাটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে হাওয়া'য়। ছায়া নাচছে দেওয়ালে। খেয়ালবাবুর সরু সরু হাত দুটোকে মোটা শক্ত সমর্থ মনে হচ্ছে ছায়াতে। খেয়ালবাবু ভাবলেন, সত্যি হাতদুটো এমন হলে, কী ভালোই না হয়।

মনোরমা স্বগতোক্তি করলেন, বৃষ্টির দেখা নেই। সন্ধ্যার দিকে দু এক ফোঁটা চিড়বিড়িয়ে পড়েছিল। ব্যসস্।

মুসুরির ডালে একটা কাঁচা লঙ্কা ডলে নিয়ে লাল লাল ভাত মাখলেন খেয়ালবাবু। দাঁতে কাঁকর লাগল একটা কট্ করে। কুমড়োর সঙ্গে বেগুনের ঘ্যাঁট পাটপাতা দিয়ে কাঁঠালের বিচির লোত্-লোত তরকারি একটা।

জল খেলেন কোঁত কোঁত করে। রমা জল ভরে দিল ঘটি করে গ্লাসে। একটা তেলাপোকা উড়ে এল পাতের দিকে। মনোরমা ধরতে গেলেন। রমাও। তাড়াতাড়িতে রমার হাতে লেগে গ্লাসটা উল্টে পাতে পড়ল। কুমড়োর ঘ্যাঁট, মুসুরির ডাল, পাটপাতার তরকারি জলে ভেসে

গেল।

মনোরমা ঠাস্ করে মেয়ের গালে চড় লাগালেন।

এমন সময় বেড়ার ধার থেকে কে যেন ডাকল, রমা।

খেয়ালবাবু উৎকর্ণ হলেন। মনোরমা ইশারায় মেয়েকে যেতে বললেন। রমা উঠে গেল

মনোরমাও উঠে রান্না ঘরের কোণা থেকে একটা কাসুন্দির শিশি বার করে নিয়ে এলেন। নিচে একটু তলানি পড়ে ছিল। তাই দিলেন ঢেলে, খেয়ালবাবুর পাতে ঝাঁকিয়ে নিয়ে। জলে-ভেজা ভাতে-ডালে একটু স্বাদ হলো।

খেয়ালবাবু নরম ভাত খেতে খেতে বললেন, ছেলেটাকে তুমিও তাহলে প্রশ্রয় দিচ্ছো ?

প্রশ্রয়ের কী আছে ? মেয়েকে কি তুমি ভালো বিয়ে দিতে পারবে ? ওরা কত বড়লোক। ঝন্টু বলেছে টালিগুলোর ওপরে টার-ফেল্ট না কী যেন বিছিয়ে দেবে। বর্ষা এসে গেছে। সারা রাত তো সব ক'টা ঘরেই জল পড়ে। সমস্ত রাত তো ঘটি বাটি পেতে আর খাট সরিয়ে সরিয়ে জেগেই কাটাতে হয়। তোমার কি ? সারাদিন অফিসে থাকো। কাপের পর কাপ ভালো চা খাও আর মাঝরাতে এসে আমার উপর মেজাজ করো।

হুঁ।

খেয়ালবাব বললেন।

তারপর বললেন, তুমি কি ভাবছ, ঝন্টু বিয়ে করবে ? ওরা মজা লুটতে আসে। বিয়ে করার সময় ঝন্টু ঠিক জাত মিলিয়েই বিয়ে করবে। বিয়েতে কত কী দান পাবে। রেডিও, টেলিভিশান, স্কুটার। তুমি কী বুঝবে ওসব শয়তান ছেলেদের কারবার।

মনোরমা ঠোঁটে আঙুল দেখিয়ে বললেন, চুপ। শুনতে পাবে।

এমন সময় রমা এসে রান্নাঘরে ঢুকল। রমার হাতে একটা বিরাট দেড়-কেজি সাইজের ইলিশ। রূপোলী আঁশগুলো লম্ফর আলোয় চকচক করে উঠল।

খেয়ালবাবুর গলায় ভাত আটকে গেল। কাঁচা ইলিশের গন্ধটা যে কী মিষ্টি। কাঁচা-লঙ্কা কালো-জিরে দিয়ে ঝোল ? না, না, সর্ষে-বাটা দিয়ে। না কি দই ইলিশ ? ভাজা-মাছ, আর মাছ-ভাজা তেল দিয়ে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে একথালা ভাত খেতে পারেন খেয়ালবাবু। ইলিশের মাথা দিয়ে কচুর শাক ? সঙ্গে, একটু ছোলা।

মনোরমা বললেন, কে দিলো ?

রমা গর্বের সঙ্গে বলল, ও।

গর্বে, রমার নাকের পাটা ফুলে উঠল।

খেয়ালবাবু বললেন, ওরে, ডাক ঝন্টুকে। ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলি কেন ?

ঝন্টু হাসনুহানার ঝোপের পাশ দিয়ে এসে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল।

মনোরমা বললেন, এত বড় মাছ, কোথায় পেলে বাবা ?

ঝন্টু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, গেছিলাম রাণাঘাটে গুড় কিনতে মহাজনের গদীতে। সাড়ে তিনটের পর লালগোলা প্যাসেঞ্জার এলো। নিয়ে এলাম লালগোলার ইলিশ। টাটকা মাছ। বরফ দেওয়া নয়।

খেয়ালবাবু বললেন, কত করে নিলো বাবা ?

আঠারো টাকা। ঝন্টু বলল।

আঠারো টাকা ? এই মাছটা ? আতঙ্কিত গলায় বললেন খেয়ালবাবু।

ঝন্টু হাসল। বলল, না মাছটার দাম ছাব্বিশ টাকা। আঠারো টাকা কেজি।

ছাব্বিশ টাকা। উস্ কইস্ কীরে তুই ! ইতো চিন্তা করনও যায়না। বলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন খেয়ালবাবু।

রমা বলল, মা আমি আসছি একটু।

মনোরমা বললেন, বেশী দেরী করিস না।

আচ্ছা। বলে, রমা চলে গেল ঝন্টুর সঙ্গে।

খেয়ালবাবু বুঝলেন এখন ওরা অন্ধকারে পুকুরধারে গিয়ে কাঁঠাল তলার নিচের অন্ধকারে শান বাঁধানো জায়গাটায় বসবে। তারপর...

হঠাৎ ইলিশটার গা দিয়ে একটা বিজাতীয় অপমানকর গন্ধ বেরোল বলে মনে হল।

মনোরমা অস্ফুটে বললেন, তেল আছে একরত্তি ? সাঁতলিয়ে যে রাখব, তারও উপায় নেই।

তারপর নিজেই গেলেন পাশের বাড়ির পরেশের মার কাছে একটু তেল ধার করতে।

খেয়ালবাবুর খাওয়া শেষ হবার আগেই ফিরে এলেন মনোরমা। বললেন, ছোটলোক।

কে ? খেয়ালবাবু শুধোলেন।

ঐ যে। পরেশের মা।

কেন ? খেয়ালবাবু ঘটির জল নিয়ে রান্নাঘরের পাশে আঁচাতে আঁচাতে শুধোলেন।

মনোরমা বললেন, বলল ; "আমার ঘরে অমন ডাগর মেয়ে থাকলে আমারও ইলিশ খাওয়ার ভাগ্য হতো রে মনো, রোজ রোজ।"

খেয়ালবাবু চটে গেলেন ভীষণ। বললেন, তুমি কিছু বললে না ? ছেড়ে দিলে ?

মনোরমা অনেকক্ষণ খেয়ালবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আঁচলটা খসে গেছিল মাথা থেকে। চোখের নিচে গভীর কালি। ক্লান্তি, বড়ই ক্লান্তি চোখেমুখে, যেন কাজল পরিয়ে দিয়েছে কেউ কচি কলাপাতায় নতুন কাজল তুলে।

কী বলব ?

খেয়ালবাবু একটুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিলেন না।

বললেন, মাছটা আগে কেটো না। মেজ-ছোট ফিরে এসে দেখুক। এত বড় মাছ কত বছর চোখে দেখে নি। তারপর সুর টেনে বললেন, আ—ঠারো টাকা কেজি ? কত বছর বড় মাছের দোকানে যাই না। কিন্তু ইলিশের দোকানে তো ভীড়ও কম থাকে না। আঠারো টাকা কেজির মাছ কেনার লোকও তো দেখি কম নেই।

মনোরমা ঠেস দিয়ে বললেন, থাকবে না কেন ? সবাই তো আর তোমার মত বড়লোক নয় !

তারপর খেয়ালবাবুর হাতে আরেক গ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে একটু মৌরী দিলেন।

জলটা খেয়ে নিয়ে মৌরী মুখে ফেলে খেয়ালবাবু বললেন, এখন এত রাতে এই এতবড় মাছটা কাটাকুটি করে সাঁত্লানোও তো কম ঝামেলার নয়। রমাও তো সময় বুঝে চলে গেল।

মনোরমা জ্বলন্ত চোখে তাকালেন খেয়ালবাবুর দিকে।

খেয়ালবাবু বুঝলেন যে, যার কারণে এত বড় ইলিশ, তাকেই হেনস্থা করাটা ঠিক হলো না।

ঘরে এসে খেয়ালবাবু খাটে শুয়ে পড়লেন। ঠিক শোয়া নয়, তাকিয়া হেলান দিয়ে আধশোয়া। শালকাঠের তক্তপোষ। পাশাপাশি দুটি। একটিতে উনি শোন, অন্যটিতে মেজ। মনোরমা রমাকে ও ছোটকে নিয়ে পাশের ঘরে শোন। দেওয়ালে, সাদা কাপড়ের উপর লাল সুতোয় লেখা : "গড ইজ গুড।" "অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি"। ঘরের কোণে একটা টেবল কভার। বড় মেয়ে বিয়ের আগে বুনেছিল। তার উপর পরমহংসদেব এবং বড় মেয়ে-জামাই-এর একটা ফোটো। বড় ছেলে ও বৌমার ফোটোও ছিল। কিন্তু ওরা আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে মনোরমা টিনের ট্রাঙ্কে ভরে ফেলেছেন ওদের ফোটোটা।

বাইরে একটা বিড়াল ডাকছিল। একটা হুলো। ব্যাঙও ডাকছিল ক্রমাগত। একবার মেঘ-গর্জন হল। বিদ্যুৎ চমকালো হঠাৎ। তারপরই ঝোড়ো হাওয়া দিল। নারকোল গাছের আর আম কাঁঠালের পাতায় ঝরনার মতো ঝর ঝর শব্দ উঠল। লাল-হলুদ রঙা কাঁঠাল পাতা ঝরে পড়ল বাতাসে।

রান্নাঘর থেকে ইলিশ মাছের রক্তের গন্ধ আসছিল। বেড়ালটাও বোধহয় গন্ধটা পেয়ে থাকবে। রান্নাঘরের আশেপাশে ওঁয়াও। ওঁয়াও। করে বেড়াচ্ছিল বেড়ালটা। টুপ্‌টাপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হল। মনোরমা ডাকলেন ছোটকে। বললেন, দ্যাখ তো রমা কোথায়? বৃষ্টিতে বাইরে কেন? ওদের এসে মধ্যের ঘরে বসতে বলনা কেন?

তারপর কী ভেবে বললেন, তোর এই অন্ধকারে কাঁঠালতলায় যাওয়ার দরকার নেই। প্রথম বৃষ্টি। সাপ খোপ থাকবে। তুই নারকোল গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে দিদি বলে ডাক।

দূরে কোনো বাড়িতে ট্রানজিস্টর রেডিও বাজছে। পাশের বাড়িতে কেউ টিউবওয়েলে কিচ্ কিচ করে জল তুলছে। ব্যাঙের ডাক। বৃষ্টির শব্দ।

ছোট ডাকলো, দিদি। অ্যাই দিদি—ই-ই-ই।

মনোরমা বললেন, পাড়া মাথায় করছিস কেন? বল, মা খেতে ডাকছে।

খেয়ালবাবুর হঠাৎ মনে হল রেডিওতে কে যেন বিলমপদ আস্থাইতে মন্থরগতিতে আলাপ করছে। আরাম লাগল খেয়ালবাবুর। একটি বিড়ি ধরিয়ে ঐ বিলমপদ আস্থাইতে ভাসমান হয়ে, ইলিশের গায়ের গন্ধে বুঁদ হয়ে খেয়ালবাবু আধো ঘুমে, আধো জাগরণে বড় সুখের মধ্যে ভাসতে ভাসতে কোন গন্ধর্বলোকের দিকে যেন এগোতে লাগলেন। কতক্ষণ এমন ঘোরের মধ্যে ছিলেন, জানেন না, হঠাৎ গায়ক যেন দরবারী রাগের তারানা গেয়ে সমস্ত ঘুমন্ত গ্রামীণ রাতকে চমকে দিলেন।

হঠাৎ খেয়ালবাবু দেখতে পেলেন বেড়ালটাকে।

একটা কালো বেড়াল।

বাইরে ওয়াঁও ওয়াঁও করে ডাকছিল। কালো বেড়াল বড় অলুক্ষণে। বারাকপুরে ইছামতীর ধারে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ির উঠোনে কে যেন একটা কালো বেড়ালের হাড় পুঁতে দেওয়ায় তারা নির্বংশ হয়েছিল। একবার ভাবলেন, বেড়ালটাকে লাঠি মেরে তাড়ান। তারপর ভাবলেন, ইলিশ মাছ সাঁতলানোর গন্ধে তাঁরই এমন নেশা নেশা লাগছে, আর বেড়ালটার দোষ কি? বেড়াল তো শুধু কাঁটাই পাবে, তিনি তো মাছ খাবেন। গাদা-ভাজা,

কোলের ঝোল। ডিম থাকলে, ডিম-ভাজা। ডিম না থাকলে, মাছটায় কেমন তেল হবে ভাবছিলেন খেয়ালবাবু।

ততক্ষণে দরবারীর তারানা জমে গেছিল। খেয়ালবাবু টিপ্‌টিপে বৃষ্টি আর মৃদু মৃদু হাওয়ায় হাসনুহানার গন্ধে ঘুমিয়ে পড়লেন।

৩

অফিসে এসেই দেখেন হিতেন এবং জমাদার তাঁদের ঘর ঝাড়পোছ করছে ভালো করে সাত সকালে। সমীরণও আছে।

খেয়ালবাবু বললেন, কী ব্যাপার?

সমীরণ চুপ করে রইল। বলল, মেশিন বসবে এখানে কাল।

খেয়ালবাবুর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। বললেন, কী মেশিন?

ফোটো-কপি। সমীরণ বলল।

ফোটো-কপি? খেয়ালবাবু আস্তে আস্তে বললেন।

কাজ শেষ করে হিতেন টাইপ মেশিনটা বের করে দিল। খেয়ালবাবু সেদিন বিশেষই নরম গলায় বললেন, ছোটসাহেব বা বড়সাহেব এলেই খবর দিস।

ছোটসাহেব এসে গেছিলেন আগেই। চেম্বারটা কাঠের। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। আছেন কী নেই। বড় সাহেব এলেন। কিন্তু কোনো সাহেবই খেয়ালবাবুকে ডাকলেন না। খেয়ালবাবু কপির কাজ যা ছিল অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে করতে লাগলেন।

বিকেলের দিকে সমীরণকে একবার ছোটসাহেব ডেকেছিলেন। তার ঘর থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বেরোল সমীরণ। মুখটা গম্ভীর।

খেয়ালবাবু বললেন, হিতেন এক কাপ চা খাওয়া বাবা।

চা-টা অফিসের ক্যান্টিনেই হয়। ফ্রি। এই চা-টা ভালো লাগে খেয়ালবাবুর। বাড়ির চা মুখে দিতে পারেন না।

সমীরণ হঠাৎ গায়ে পড়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো করে চা খাওয়া হিতেন, খেয়ালবাবুকে। তারপর বলল, ভেজিটেবিল চপ খাবেন খেয়ালদা?

খেয়ালবাবু অবাক হলেন। সমীরণ গত তিন বছরে কখনও কিছু খাওয়ায়নি খেয়ালদাকে। যার ফেরত দেবার ক্ষমতা নেই কিছু; তাকে কে আর খাতির করে?

কী ব্যাপার সমীরণ?

সমীরণ লজ্জা পেলো। বলল, না, আমি আনতে দেবো ভাবছিলাম, আপনিও যদি খান; তাইই।

না থাক। আজ আর খাবো না। কাল খাবো।

আজ বাড়িতে মনোরমা ভালো করে মাছ রান্না করবেন। সকালে শুধু ডাল আর বেগুনভাজা দিয়ে খেয়ে এসেছেন খেয়ালবাবু। আজ রাতের খাওয়াটা তিনি ভেজিটেবল চপ খেয়ে নষ্ট করতে রাজী নন। ক্যাশিয়ার মদনবাবু অন্য দিন কাজকর্মের ফাঁকে মালিকদের শ্রাদ্ধ করেন। তিনি ব্যাচেলর। একটা মেসে থাকেন। কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন। মালিকদের শ্রাদ্ধ না করলে তাঁর কোষ্ঠকাঠিন্য বাড়ে। কিন্তু মদনবাবু আজ একেবারেই চুপচাপ। মাঝে

মাঝে খেয়ালবাবুর দিকে তাকাচ্ছেন কিন্তু চোখে চোখ রাখতে পারছেন না।

অন্য টাইপিস্ট হরেন কী যেন একটা কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল চিঠি টাইপ করে সাহেবদের ঘরে নিয়ে গেল। খেয়ালবাবু অবাক হলেন। কারণ, কনফিডেনসিয়াল ম্যাটারস সাহেবরা ওঁকে ছাড়া কাউকেই দেন না সচরাচর।

সেদিন সন্ধ্যা ছ-টা বাজতে না বাজতে হিতেন এসে বলল, খেয়ালদা, আর কোনো কাজ বাকি নেই। বড়সাহেব আপনাকে চলে যেতে বললেন, আর যাওয়ার সময় ছোট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাবেন একবার।

খেয়ালবাবু অবাক হলেন হিতেনের ব্যবহারে। গত দশ বছরেও জয়েন করার দু বছর পর থেকে ও কখনও খেয়ালবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময় বাঁকি কে "বাকি" বলেনি।

খেয়ালবাবু জুতোটায় পা গলালেন দেয়ালে হেলান দিয়ে, কষ্ট করে। ছাতাটা এ ঘরেই রাখলেন। তারপর ছোটসাহেবের ঘরে গেলেন।

ছোটসাহেবের ঘরে কালকের ভদ্রলোক বসেছিলেন। আজ একটা অন্য টাই। টেবলে ইন্ডিয়া কিংস-এর প্যাকেট। মুখে গর্বিত ও কৃতী একটা ভাব।

ছোটসাহেব বললেন, খেয়ালবাবু আপনিই এখানে একমাত্র সুপার-অ্যানুয়েটেড। আমরা কাল একটা ফোটো কপি মেশিন বসাচ্ছি। অনেকই দাম। মেইনটেনান্স-এর খরচও অনেক। এই বাজারে আপনাকে রেখেও আপনার চেয়ে অনেক কমপিটেন্ট মেকানিক্যাল সাবস্টিটিউট মেইনটেন করা বেশ মুশকিল। আমরা জানি যে, আপনার দুই মেয়ের বিয়ে এখনও বাকি। যখন মেয়ের বিয়ের ঠিক হবে তখন জানাবেন। উই উইল সী, হোয়াট ক্যান উই ডু বাউট ইট। তবে একজনের বিয়েই।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি অনেকদিন এখানে কাজ করেছেন, এবং উই আর থ্যাঙ্কফুল টু উ্য। সেই জন্যেই হঠাৎ 'না' করার আগে আমরা একটু ভেবে দেখছি। আপনাকে আগে থাকতে বলে রাখা দরকার বলেই বলে রাখলাম।

তারপরেই বললেন, এখন আপনি আসুন। মামা আজ তাড়াতাড়ি চলে গেছেন। পরে সময় করে একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করে নেবেন।

খেয়ালবাবু তাকিয়ে দেখলেন বড়সাহেবের ঘরখানি।

খেয়ালবাবু নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ও ঘরের সহকর্মীদের মুখে তাকাতেই বুঝতে পারলেন যে, ওঁরা আগেই খবরটা জানতেন। এবং জানতেন বলেই, সকলেই অস্বাভাবিক আজ। সকলেই গম্ভীর।

খেয়ালবাবু কথা বলতে পারলেন না প্রায় কারো সঙ্গেই। চোখটা বোধহয় ভিজে এসেছিল। বললেন, চলি।

অন্য সকলেই, মদনবাবু, সমীরণ, হিতেন প্রায় সমস্বরে বলে উঠল ; যাওয়া নেই, আসুন। কাল থেকে আর অত সকালে আসবেন না! এগারোটা নাগাদই আসবেন।

মনে হলো যেন ওরাই খেয়ালবাবুর মালিক।

খেয়ালবাবু যাওয়ার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে সমীরণকে শুধোলেন, আচ্ছা হিতেন, সুপার-অ্যানুয়েটেড কথাটার মানে কি?

হিতেন বলল, যাদের রিটায়ারমেন্টের বয়স হয়ে গেছে। পঞ্চান্ন বছর বা আটান্ন বছর কোথাও কোথাও।

খেয়ালবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। মদনবাবু বললেন, চাকরি তো যায়নি রে এখনও বাবা। এখন থেকেই এত ভাবনা কিসের?

খেয়ালবাবু ভাবছিলেন যে গত পঁচিশ বছর সকাল ন'টা থেকে রাত আটটা অবধি রোজ কাজ করেছেন তিনিও। কিন্তু তখন সময়ের দাম ছিলো না কোনোই। এখনই হঠাৎ বড় দামী হয়ে গেছে সময়।

মুখে কিছু বললেন না। বলবেনই বা কাকে?

লিফটের সামনেই সেই টাই-পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

খেয়ালবাবু ভক্তি ভরে তাঁকেই নমস্কার করলেন। বললেন, স্যার আপনি? ভদ্রলোক বাঁ হাতে টাইয়ের নটটা ঠিক করতে করতে বললেন, আমি ফোটোকপি মেশিন নিয়েই ডিল করি।

খেয়ালবাবু বললেন ব্যাপারটা কী যদি জানতাম স্যার। জিনিসটা কেমন দেখতে? আমিও তো টাইপিস্টই। ফোটো-কপি মেশিনটা কী ব্যাপার, যার জন্যে বহু টাইপিস্টের চাকরি চলে যাবে? বড় জানতে ইচ্ছা করে।

ভদ্রলোক হাসলেন ইডিয়ট খেয়ালবাবুর কথা শুনে। এই ওল্ড আইডিয়াজএর লোকগুলোই দেশটাকে খেলো। তারপর হাঁটুটা দেওয়ালে ঠেকিয়ে, তার উপর ব্রিফকেসটা রেখে; এক কপি লিটারেচার খেয়ালবাবুর হাতে দিলেন।

সুন্দর ঝকঝকে ছাপা, চকচকে কাগজের পাতলা বইটা নিয়ে খেয়ালবাবু পাঞ্জাবির পকেটে রাখলেন।

বাড়ি যখন পৌঁছলেন সেদিন, দেখলেন যে, তাঁর নিজের স্ত্রী, ছেলেরা, মেয়ে কেউই তাঁকে ঐ সময় বাড়িতে আশা করে না বলে তাঁর হঠাৎ না বলে কয়ে সন্ধে লাগতে না লাগতে ফিরে আসাতে অনেকেরই বিলক্ষণ অসুবিধা হলো। খেয়ালবাবু অপরাধী বোধ করলেন নিজেকে।

মনোরমা বললেন, কি? ইলিশ মাছের লোভেই এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?

খেয়ালবাবু জবাব দিলেন না।

রমা সাজগোজ করে ঝণ্টুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল, বারাসতে নতুন সিনেমা হল হয়েছে সরমা, সেখানে সিনেমা দেখতে। সাইকেল-রিকশা করে গেল ওরা। পাশে পাশে ঝণ্টুর দুই বন্ধু সাইকেল চালিয়ে গেল।

খেয়ালবাবু মুখ তুলে তাকাতে, মনোরমা বললেন, তোমার সু পুত্রর জন্যেই ঝণ্টু সঙ্গে বডিগার্ড নিলো। মেজ বলেছে, ও নাকি প্যাঁদাবে ঝণ্টুকে। এমন প্যাদান প্যাঁদাবে যে, হাড়গোড় ভেঙে দেবে।

খেয়ালবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, ঝণ্টুর বডিগার্ডরা কী করবে খালি হাতে? একটা লাঠিও তো নেই।

মনোরমা হাসলেন। বললেন, তোমাদের যুগ চলে গেছে। লাঠি রাখে না ওরা কেউ আজকাল। কোমরের তলায় লুকোনো পিস্তল-রিভলভার গোঁজা থাকে। চাইলে, স্টেনগান ব্রেনগানও পাবে। এখন গুণ্ডামি একটা মস্ত ব্যবসা। টাকা দাও না তুমি—কাকে খতম করে দিতে হবে তা জানলেই খেলা আরম্ভ হবে। এখন এসব ছেলেখেলা। নিজের হাতের জোর বা বুকের সাহসের দাম এখন এক আধলাও নয়।

জানি। খেয়ালবাবু বললেন, মানুষের দাম নেই, যন্ত্রের আছে।

মনোরমা ঠাট্টা করে বললেন, এখুনি কি খাবে?

খেয়ালবাবু লজ্জিত হলেন।

বললেন, না না। শরীরটা খারাপ তাইই তাড়াতাড়ি এলাম।

তারপর দেখলেন ঘড়িতে সাতটা বেজেছে।

পুকুরে ডুব দিতে দিতে খেয়ালবাবু ভাবছিলেন তাঁর চাকরিটা এখনও যায়নি। চাকরি থাকতেই তাঁর যা সমাদর সংসারের সকলের কাছে, চাকরিটা না থাকলে কী যে হবে? তখন কি ঝন্টুর দেওয়া অসম্মানের ভাত-ডাল ও বউছেলে-মেয়ের শীতল উপেক্ষার কাঁথায় নিজেকে মুড়ে রেখেই জীবনটা কাটাবে?

বিড়ালটা ডাকল ওঁয়াও। খেয়ালবাবু গলা জলে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখলেন।

ঘাটের সিঁড়িতে বসে আছে কালো বেড়ালটা। অন্ধকারে বাঘের মত জ্বলছে চোখ দুটো।

খেয়ালবাবু বললেন, শালা। বলেই দুহাত দিয়ে জল ছিটোলেন। কালো, বেড়ালটা কালো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নারকোল গাছের পাতা সমেত ডাল ঝরে পড়ল ঝুপ করে, জলের মধ্যে। সাঁতরে গিয়ে ডাঙায় তুললেন সেটাকে। শুকুলে, ঝাঁটা হবে।

চান সেরে এসে লুঙি পরে উদলা গায়ে খাটের উপর উঠে লণ্ঠনটাকে কাছে নিয়ে বসলেন। ফোটো-কপি মেশিনের সেই ঝকঝকে কাগজটা সন্তর্পণে খুললেন। বাসে আসার সময় সাহস করে খুলতে পারেননি। খুব সাবধানে পাতাটা ওল্টোলেন। পাতা উল্টোতেই খেয়ালবাবুর হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল।

একটা বিড়াল।

কালো বিড়ালের ছবি। বিরাট মেশিনটার উপরে বসে আছে কালো বিড়ালটা।

তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেললেন কাগজটা। বিড়ালটা জানালার পাশেই ছিল। ডেকে উঠল, ম্যাঁও করে। তারপর জানালা দিয়ে উঁকি মারল ওঁর দিকে। খেয়ালবাবুর হাত-পা অবশ হয়ে গেল। বিড়ালটাকে যে তাড়াবেন তেমন গায়ের জোর ও গলার জোরও পেলেন না। আস্তে আস্তে কাগজটা রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। লণ্ঠনটা কমিয়ে রাখলেন।

আধো-অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে দু-হাতের আঙুলগুলোকে চোখের সামনে তুললেন উনি। এই আঙুলগুলোই চাবি টিপে টিপে তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে। তার ছেলেরা, বড় মেজ ছোট, মেয়েরা সকলে এই আঙুলের রোজগারেই মানুষ। দিনের শেষে বড় ব্যথা করে আঙুলগুলো। মাঝে গরম জল করে সেঁক দিতেন। বাতের মত হয়েছে ইদানীং।

মনোরমার কথা মনে পড়ল। আজকাল গায়ের জোর তামাদি হয়ে গেছে।

এখন যন্ত্রর জোরটাই জোর। এই আঙুলগুলোও বেকার হয়ে গেছে একেবারে।

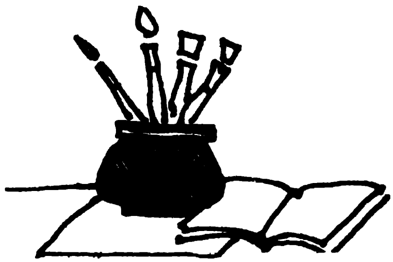
বিড়ালটা আবার ডাকল ওঁয়াও।

খেয়ালবাবু চোখ বুঁজলেন। বাইরে থেকে হাসনুহানার গন্ধ আসছিল। বৃষ্টির পর পুকুর পাড় থেকে সোঁদা গন্ধ।

কালো বিড়ালটা আবারও ডাকল। তারপর বিড়ালটা চারদিক থেকে ডাকতে ডাকতে এসে তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে সেই অলুক্ষণে ডাক ভরে দিল।

বিড়ালটা ক্রমান্বয়ে ডেকেই চলেছিল।

প্রবেশ



বৌদি, ফোন !

সরমা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল।

বিরক্ত সুমি, শাওয়ারের কলটা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে বলল, চান করার সময়ও একটু শান্তি নেই তোমাদের জন্যে। কে ফোন করেছে এই অসময়ে ?

বীণাদিদি।

ও বীণাদিদি ? ধরতে বলো, ধরতে বলো। আমি আসছি এক্ষুনি। বলেই, দরজার হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা ছাড়া-হাউসকোটটাই জল-ভেজা নগ্ন শরীরে জড়িয়ে ভিজে বাথরুম-স্লীপার পায়ে গলিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে প্রায় দৌড়ে এল ড্রইংরুমে।

অনেকদিনের পুরনো কাজের লোক সরমা বলল, আস্তে, আস্তে ! পড়ে যাবে যে।

তারপরই বলল, দেখেছো ! সারা ঘর জলময় করে দিলে গো। কার্পেটটাও ভিজিয়ে দিলে। নিজেই আছাড় খেয়ে মরবে যে। ফেরার পথে।

সুমি ফোনের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সরমা বাথরুমের দরজা থেকে বেডরুম, বেডরুম থেকে ড্রইংরুমের সুমির ভিজে গা-গড়ানো জল মুছতে লাগল বিড় বিড় করতে করতে।

হ্যালো। বীণাদি ? বলো, আমি সুমি।

ওপাশ থেকে কি বলা হলো তা সরমা শুনতে পেলো না। তবে লক্ষ্য করল যে, সুমিতার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দেখা হয়েছিল ? কি বললেন ? সত্যি ? আমি ভাবতেই পারছি না।.....কবে ?.....এই শনিবার ? না না অশেষ তো বলছিল সুমন ইতিমধ্যেই নেমন্তন্ন খাইয়ে দিয়েছে। ......বাঃ.....না কেন ? অশেষের বন্ধু সুদীপের ছেলের জন্যে, আর কেন ? সবিতাদির থ্রুতে আলাপ হল, আর দ্যাখো কেমন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেল। ....কি বলছ ? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি অশেষকে এক্ষুনি ফোন করছি। না না, আমাদের কোনো গাফিলতি হবে না। ওকে তো এখন দিনে দশ ঘন্টা পড়াচ্ছি। তারপর মিস্টার হবসন্-এর কাছে কোচিং নিতে যাচ্ছে। ......হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি যাও। না, না কী যে বল ! কোনোই অসুবিধা হয়নি আমার। চান তো এই পঁচিশবছরে বহু হাজার বার করেছি, বেঁচে থাকলে আরও বহু হাজার বার করব। তুমি যা করলে বীণাদি, কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব, বলতে পারছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ। অশেষকে বলব মেঘুদাকে ফোন করতে।

সুমিতার স্বামী একটি এককালীন ব্রিটিশ এবং অধুনা মারোয়াড়ি মালিকানার কোনো কোম্পানীর বড় অফিসার। সে সবে লাঞ্চ রুমে ঢুকেছিল। এমন সময় তার পি. এস. মিস্ নাগবেকার দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, স্যার, ইটস ভেরী আর্জেন্ট। মিসেস বোস ইজ অন ইওর পার্সোনাল ফোন। প্লীজ টেক দ্যা কল্। অশেষ কার্পেটের উপরে বসানো চেয়ার সজোরে ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

কথাকটি বলেই, মিস্ নাগবেকার, মহিলা পি. এস্‌দের জন্যে নির্দিষ্ট লাঞ্চরুমের দিকে চলে গেলেন। এখন লাঞ্চ টাইম শুরু হয়ে গেছে। পি বি এক্সও বন্ধ।

চ্যাটার্জী টাইয়ের নট ঢিলে করতে করতে অশেষের দিকে চেয়ে বলল, তাও গার্ল-ফ্রেন্ডের ফোন হলে বোঝা যেত। বৌ-এর ফোন পেয়ে এখনও এত দৌড়াদৌড়ি?

লাঞ্চ রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে অশেষ বলল, ব্যাপার আছে। এসে বলব।

সরমা বিরক্ত গলায় বলল, তোমার শরীরের আর চুল-গড়ানো জলে যে ঘর ভেসে গেল গো বৌদি। কত আর নাই-কাজ করব আমি?

করো। করো। লক্ষ্মী সরমা। চাঁদুর বোধহয় হয়ে যাবে সেন্ট-ফেজিয়ার্স-এ।

ছেন্ট ফেজিয়াস্ কি গো?

আঃ। এখন বিরক্ত করো না। তোমার দাদা আসছেন ফোনে। বলেই, মুখ ঘুরিয়ে সরমাকে বলল, কাউকে বোলো না কিন্তু।

মুখ বিকৃত করে গুল-দেওয়া কেলে মাড়ি আর দাঁত বের করে সরমা বলল, আমার বয়েই গেছে কাউকে বলতে। তাছাড়া, ছেন্টেরও আমি কিছু বুঝি না, ফেজিয়াসেরও নয়।

অশেষ হাঁফাচ্ছিল। একটু ভুঁড়ি হয়ে গেছে। খেলাধুলো সব গেছে, তার উপর নিত্যনৈমিত্তিক পার্টি তো লেগেই আছে। মালিকরা মদ সিগারেট ছোঁন না কিন্তু তাদের চাকরির এটা এখন অঙ্গ। উপরতলার সমাজে ঘোরা-ফেরা কাজ-কারবার করতে হলে মদ না খেলে চলে না। দেশ বদলে গেছে। সময় বদলে গেছে। এখন প্র্যাকটিক্যাল প্রাগম্যাটিক না হলে বেঁচে থাকা মুশকিল। এই নব্য নগরসভ্যতার র‍্যাটরেস্-এ ওরা সকলেই সামিল হয়েছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে অশেষ বলল, বল সুমি? বীণাদি......কি বললে? হয়ে যাবে? সেন্ট ফেজিয়ার্স এ? সত্যি? ও মাই। মাই। আই উইল গেট ড্রাঙ্ক টুনাইট। তুমি একটি সুইটী পাঈ ডার্লিং। আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব। চাঁদু কোথায়?

পড়ছে।

কি পড়ছে?

এখন সামস্ করছে।

ভেরী গুড। তুমি কি করছ?

চান করছিলাম।

আঃ ডার্লিং। যাও যাও ভালো করে চান কবো আজকে। উই উইল বীট ইট্ আপ্ টুনাইট। ছাড়ছি।....কি বলছ? কাউকে বলব না? চ্যাটার্জীকেও না? কেন? কি? ওর বোনপোও চেষ্টা করছে? সেন্ট ফেজিয়ার্স-এই? মাই গুডনেস্। থ্রু দ্যা সেম সোর্স? সত্যি। ভাগ্যিস বললে। না-না। পাগল। আর বলি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে লিফটের বোতাম টিপল অশেষ। ফোন ধরতে আসার সময় উত্তেজনায় লিফট্ ডাকার জন্যে অপেক্ষা করার তর সয়নি।

লাঞ্চ রুমে ততক্ষণে অনেকে এসে গেছেন। মক্‌বুল বেয়ারা স্যুপও সার্ভ করে দিয়েছে। চ্যাটার্জী উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছিল। স্যুপ-স্পুন দিয়ে স্যুপ মুখে তুলে বলল, হলটা কি?

অশেষ বলল, চ্যাটার্জীর চোখে চোখ রেখে, ডাহা মিথ্যে কথা ; তেমন কিছু নয়। না। সুমিতার এক ফারস্ট্ কাজিনের ফারস্ট্ প্রেগনান্সী। বেলেভিউতে অ্যাডমিশন নিয়েছিল। এক্ষুনি খবর এসেছে যে, ছেলে হয়েছে।

ওঃ। চ্যাটার্জী বলল। তারপর বলল, বাপ-মায়ের অশান্তির শুরু হল। আই রিয়্যালী পিটী দ্যা প্যারেন্টস।

কেন? এ আবার কি কথা?

বাঃ। ছেলে হতে আর কি মুশকিল। ইজিয়েস্ট ব্যাপারই তো সেটা। এই মুহূর্ত থেকে স্কুলের অ্যাডমিশান নিয়ে ভেবে মাথার চুল পেকে যাবে। আমার একবছরের বড় দাদার বিয়ে হয়েছে দশ বছর। নিউ আলিপুরে থাকে। কোনো ইস্যুই হলো না এই ভয়ে চার বছর। পাঁচ বছরের মাথায় প্রিন্স অফ ওয়েলস এলেন কিন্তু তাকে এখন স্কুলে ভর্তি করতে জুলপী পেকে গেছে। শুধু তাব নয়, আমাদের সকলেরই। দেখি, একটি সোর্স আছে, তাকে ধরেছি। তোমার ছেলের কি হল? হল কিছু?

নাঃ। স্কুলে ভর্তি করার কোনো সোর্স না থাকলে ছেলেমেয়েকে পৃথিবীতে এনে ভাসিয়ে দিয়ে লাভই বা কি?

আমার দাদা-বৌদিও তো তাইই বলে।

কথাটা ভুল বলে না। সকলেই তো ভাই তোমার মত ওয়েল-অফফ নয় যে, ছেলেকে ডুন-স্কুল বা আজমীরে বা গোয়ালিয়রে পাঠাবে? সকলের শ্বশুরমশাই তো আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নয়।

যোগেশদা মানে যোগেশ ঘোষ, চিফ-এঞ্জিনীয়ার, পূর্ব-বাংলার কোথায় যেন বাড়ি ছিল, খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন বিদ্রূপের গলায়।

হাসছেন যে?

চ্যাটার্জী ও অশেষ দুজনেই একসঙ্গে জিগ্যেস করল।

তোমরা, ভাইডিরা কোন ইস্কুলে পড়ছিলা?

অশেষ এবং চ্যাটার্জী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার। অশেষ বলল, দ্যাটস ইরেলিভেন্ট। আমাদের সময় আর এখনকার সময় এক নয়।

ক্যান, আমাগো পোলারা কি ল্যাজ লইয়া জন্মাইতেছে?

যোগেশদা সেই মুষ্টিমেয় বাঙালদের একজন যিনি আজও বাঙাল বলে গর্ব বোধ করেন। পুব বাংলার ভাষায় কথা বলেন। বলেন, যাই কও আর তাই কও "আইসেন বইস্যেন" কইলে যতডা ভালোবাসা ভালোবাসা গন্ধ পাওন যায় তোমাগো আসুন বসুনে তার ছিঁটাফোঁটাও নাই।

মানুষটি বহু বছর ইংল্যাণ্ডেও ছিলেন যৌবনে। ইংরেজি বলেন সাহেবদেরই মত অথচ বাংলা বলবেন, ইচ্ছে করে এমন করে। ওরা বুঝতে পারে না বললে বলেন, হেইডাই তো

ভাষা আমার। বাঙাল হইয়া করলুম খেলুম মরলুম জ্বললুম কইর‍্যা জাত খোওয়াইতে পারুম না। আমি হইতাছি গিয়্যা লাস্ট অফ দ্যা মোহিকানস্। বোঝ্‌লা না।

অশেষ অথবা চ্যাটার্জীর পাঁচ গ্রেড উপরে আছেন। ওঁর লেভেলের অন্য অফিসারেরা অশেষদের লেভেলের অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা বিশেষ করেন না, অত্যন্ত ফর্ম্যাল হয়ে থাকেন। লোকে বলে আর এক বছরের মধ্যেই বোর্ডে যাবেন উনি। অথচ মানুষটা এমন কাঠখোট্টা বাঙালই রয়ে গেলেন। একটুও আধুনিক, অথবা সাহেব হতে পারলেন না। এখনও বাড়িতে লুঙি পরেন, শুঁটকি মাছ খান ; ভাবা যায় না।

চ্যাটার্জী বলল, ল্যাজ নিয়ে জন্মায় না কিন্তু আজকালকার দিনকাল কত কম্পিটিটিভ। ভালো স্কুলিং না হলে জীবনে কোথায় হারিয়ে যাবে ছেলে তার ঠিক আছে ? ইংলিশ-মিডিয়াম্ ভালো স্কুলে না পড়লে কি কমপিট করতে পারবে কারো সঙ্গেই ? অমানুষই হয়ে থাকবে।

আমার প্রশ্নডার জবাব কিন্তু পাই নাই। তোমরা কিন্তু কও নাই এখনও আমারে তোমরা কোন্ স্কুলে পড়ছিলা।

চ্যাটার্জীর বাড়ি বর্ধমান জেলার এক অজ গ্রামে। বর্ধমানেরই একটি স্কুলে সে পড়াশুনা করেছিল। ছাত্র ভালো ছিল। তার বড়মামার মেজশালার সলিসিটর ফার্মে ঢুকে ল এবং অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেছিল কলকাতায় এসে। মীর্জাপুরের অন্ধকার মেস-এ থাকত। ল পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় হয়েছিল। এই কোম্পানীর ও এখন ল অফিসার । চাকরিতে ঢুকে কোম্পানী-সেক্রেটারীশিপটাও পাশ করে নিয়েছে। চেয়ারম্যান নাকি হায়ার লেভেলের কোনো লোককে বলেওছেন যে, সেক্রেটারী গজদার সাহেব রিটায়ার করলে চ্যাটার্জীই সেক্রেটারী হবে। হয়ত বছর পাঁচেক লাগবে আর। এবং তারপর বোর্ডে যাবে। আজ আ ম্যাটার অফ কোর্স্। আর অশেষদের বাড়ি ছিল খুলনাতে। দেশভাগের পর তার বাবা কলকাতায় ভবানীপুরে শালাদের বাড়ি এসে ওঠেন। ওঁরা কলকাতারই বাসিন্দা হয়েছিলেন দু পুরুষ হল। ছেলেবেলার সেই অসম্মানের দিনগুলোর কথা কখনও ভুলতে পারে না। মিত্র ইনস্টিট্যুশানে জায়গা না পেয়ে সে ভর্তি হয়েছিল গিয়ে হারাধন ইনস্টিট্যুশানে। নিজেরও বড় হবার, পায়ে দাঁড়াবার খুব একটা জেদ ছিল। ভালো রেজাল্ট করে প্রেসিডেন্সীতে ঢুকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করবার পর কলকাতায়ই বসবাসকারী বাবার এক বাল্যবন্ধুর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সী ফার্ম-এ ঢুকে সে পরীক্ষা পাশ করে। পরে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সীও করে। ওর বাবা ছিলেন জমিদারী সেরেস্তার মুহুরী। ধুতির উপর হাফ-হাতাওয়ালা ফতুয়া পরতেন। পানজর্দা খেতেন তাও বেশি নয়। এবং নস্যি। এ ছাড়া নেশাও ছিলো না কোনো।

অশেষের পাইপ আর হুইস্কি।

ওদের দুজনের স্কুলের কথা শোনার পর যোগেশদা বললেন, তমাগো কথা তো কনফেস করলা। এহনে আমার কথাডা কই ? দ্যাশ্ ছাইড়া আসনের পর বাবায় তো আমারে দিল এক স্কুলে ভর্তি করাইয়া কুমুদিনী পার্কের আপোজিটে। পাঁচ টাকা মাইনা ছিলরে ভাই। কোন স্কুল কও দেহি ? দুর্গাপতি ইনস্টিট্যুশান। মান্‌ষে কইত আমাগো সময়ে "যার নাই কোনো গতি হে যায় দুর্গাপতি"। কিন্তু কইলে কি হয় ? যহন তোমাগো ছেন্ট ফেজিয়ার্স-ভর্তি হওনের লইগ্যা গ্যাল্লাম গিয়া, ফাদার গেফার, কলেজের প্রিফেক্ট, স্কুলের নাম শুইনা কইলেন কি জানো ? যা কইলেন তা শুইন্যা তো আমার ভিরমী লাগনের যোগাড়।

কি ?

কইলেন, দ্যাটস আ ভেরী গুড স্কুল। সো মেনী গুড স্টুডেন্টস্ কেম ফ্রম দ্যাট স্কুল।

ডক্টর হিতেশ চক্রবর্তী। শুনছো নাম ? আরে এহনে, আমাগো পশ্চিম বাংলার ডাইরেক্টর অফ হেল্‌থ সার্ভিসেস, হেই দুর্গাপতিরই ছাত্র। ভেরী হ্যান্ডসাম মানুষ রে ভাই। আর আরও জুনিয়ার, ঐ তোমাগো ফুটবলার ? মুনী গোস্বামী ? হেও তো। আরও কত্ত পোলায়। স্কুল-ফুল সব বোগাস রে ভাই, আসলে হইতাছে ইন্ডিভিজুয়াল। বাড়িতে মা-বাপের ইন্টারেস্ট যদি থাহে আর পোলার নিজের মগজে যদি মাল এট্টু থাহে তাহলে স্যা উপরে উইঠ্যা আইবই আইব। তারে ঠেকায় কোন্ হালায় ? তাই যদি না হইতরে ভাই, তাইলে তো হক্কল ভালো ভালো স্কুল-কলেজের হক্কল পোলায়ই লাইফে এক্কেরে ক্যান্টার কইর‍্যা থুইত। লাইফে তাদের মধ্যে কয়জন ভাইস্যা গেছে আর আমরাই বা কয়জন আছি কও দেহি একবার ?

চ্যাটার্জী বলল, যোগেশদা আপনি বুঝছেন না। দিনকাল সত্যিই বদলে গেছে। আমাদের ছেলেবেলার দিন কি আর আছে ? এখন একটি ভালো স্কুলে ছেলের অ্যাডমিশান না করাতে পারলে তার জীবন অন্ধকার।

অশেষ বলল, সমাজে স্ট্যাটাস থাকে না। বন্ধু-বান্ধবের ছেলেমেয়েরা মিশবেই না আমাদের সঙ্গে।

তরে একটা হনুমান ছাড়া আর কিছুই কওন যায় না। ভাইবা দ্যাখ, ঠাণ্ডা মাথায়। ভালো স্কুলে, ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এডুকেশান দ্যায় যে তায় সন্দেহ লাই কিন্তু হেই শিক্ষা লইতে পারে কয়ডা পোলায় ? যারে কয় রিসেভটিভিটি তাইই যদি না থাহে, তয় সে পোলার লবডংকা অইব। আরে তোমরা যা কইতাছ্ তাই যদি হওনের কথা ছিল তাইলে তো শুদা বড়লোকের পোলারাই লাট-বেলাট হইত আনে। লাইফে কি তাই দ্যাখস নাকি ? চারধারে চক্ষু মেইলা দ্যাখসও না নাকি তোরা ?

আপনার ছেলে, যে এখন স্টেটস-এ আছে সে কোথায় পড়েছিল ?

হেডার মাথাটা তো তার বাপের মত ভালো ছিল। হেডারে দিছিলাম নরেন্দ্রপুরে। বৌদিই লইয়া গিয়া দিয়া আইছিল। তারপর প্রেসিডেন্সী। বরাবর তো স্কলারশিপ লইয়াই পড়ছে।

তাইই বলুন। সকলের ছেলেরাই তো ব্রিলিয়ান্ট হয় না। যাদের মগজ শার্প নয় তারা কি জীবনে বড় হবার চেষ্টা করবে না ?

ইডিয়টের মত কথা কইতাছো তোমরা। কোনো পোলার মগজই পাঁচ বছরে শার্প থাহে না। মগজরে পরিস্কার করনের, ধার দ্যওনের তো তহনই আরম্ভ। তোমাগো লইয়া হত্যিই পারন যায় না।

লাঞ্চের পর নিজের নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে চ্যাটার্জী আর অশেষ বলল, বাঙালকে নিয়ে সত্যি পারা যায় না। কোন্ যুগে যে বাস করেন যোগেশদা। বড় জ্ঞান দেন সব সময়।

চ্যাটার্জী বলল, বাংলাদেশের কোন জায়গার বাঙাল উনি ? কে, জানে ? আমি তো বাংলাদেশের গায়ের গন্ধ মুছে ফেলেছি।

যাইই বলিস, বাঙাল তুইও যদিও, তবু তুই যোগেশদার মত গ্রস নোস। তোর মধ্যে, রিফাইনমেন্ট আছে। বাঙাল ওরিজিনাল হলে, বড় ইগো থাকে তাদের। কি বল ?

অন্যমনস্ক-গলা অশেষ হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, হয়ত। ওর বাবার কথা মনে পড়ে গেল। বাবারও ইগো ছিল। ভেঙে যেতে রাজি ছিলেন, কখনই মচকাতে নয়। গত বছর বাবা মারা গেলেন ভবানীপুরের সেই গলির বাড়িতে। শেষ দিকটাতে বাবাকে বড়ই অবহেলা করেছিল অশেষ। এই দিনকালে ইচ্ছে থাকলেও পারা যায় না।

২

চাঁদুর বয়স পাঁচ। সে পাশের ঘরে শোয়। হালকা নীল কট্। ডনাল্ড ডাক আর ডল্‌ফিন্‌দের রঙিন ছবি আঁকা তাতে। ছোট্ট বইয়ের আলমারী। পড়ার টেবল্। নীলরঙা টাইলস-এর বাথরুম। জামাকাপড় রাখার ছোট্ট নীলরঙা আলমারি। রঙিন টি ভি-র পর্দায় সুখী পরিবার এবং দারুণ সুন্দর অভ্যন্তরের যেমন দৃশ্য দেখা যায় ঠিক তেমনি করেই অশেষের ফ্ল্যাট সাজানো। মাঝেমাঝে অশেষের মনে হয় যে, তার সব বন্ধু-বান্ধবের ফ্ল্যাট বা বাড়ি কম বেশি একই রকম করে সাজানো। জীবন যাত্রায় বড় একঘেয়েমি। সকলেরই একই আশা আকাঙ্ক্ষা, শুক্র শনিবার রাতে এর তার বাড়ি পার্টি। রবিবার সকালে ক্লাবে গিয়ে বীয়ার বা জিন বা ভডকা খাওয়া। অবস্থাপন্ন সমস্ত মানুষই বোধ হয় এই একইরকম ভাবে বাঁচছে। বিশেষত্ব কিছু নেই।

হালকা হলুদ রঙের সিল্কের নাইটি পরে চাঁপা ফুল রঙের কম্বলের নিচে শুয়ে বেডরুমের নীল আলোর সুইচটাও নিবিয়ে দিল সুমিতা। হাই তুলল একটা। বলল, আজ ওসব থাক বুঝেছো। ভারী ঘুম পাচ্ছে। ঠিক আছে। আসলে এরকমই হয়। কি হবে কি হবে করে এতদিন তুমি কীইড-আপ্ হয়েছিলে তো। আজ যখন বীণাদির কাছ থেকে খবরটা পেলে তখনই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছো। যাইই হোক, অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস্ ওয়েল।

দাঁড়াও অ্যাডমিশনটা হোক আগে। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কাউকেই বোলো না কিন্তু তুমি। কেউ জানলেই, ভাঙচি দেবে।

হুঁ। বীণাদি আর কি বললেন?

বললেন যে, টেস্ট কিন্তু নেবে।

নেবে? আতঙ্কিত গলায় বলল অশেষ।

বলেই, উঠে বসল বিছানাতে। সে কী? তাহলে আর করলেনটা কী বীণাদি?

হ্যাঁ। প্রদীপ সেন না কি তাইই বলেছেন ওঁকে। টেস্ট-এ রীজনেব্‌লি ভালো করা চাই।

মাই গুডনেস্। আমি তো ভেবেছিলাম সেন্ট লরেন্স, ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল, ডন-বসকো এবং পাঠভবনেও আর চেষ্টা করার দরকার নেই। এখন তো দেখছি ঢিলে দিলে একটুও চলবে না।

না। সুমিতা বলল। গলায় কান্নার সুর লাগল ওর। ওর দিকে সহানুভূতির চোখে চেয়ে অশেষ বলল, অ্যাডমিশন টেস্ট যে ছেলের না আমাদেরই তাই-ই বোঝা দুষ্কর। দ্যাখো, নিজেদের সব পরীক্ষা, সব বিপদ ধীরে ধীরে প্রায় কাটিয়েই উঠেছি বলা চলে। যখন ভেবেছিলাম, সুখের জীবন শুরু হবে ঠিক তখনই মনে হচ্ছে দুখের জীবনের আরম্ভ হল। অথচ আমাদের দুজনেরই এই সুখ অথবা দুখের উপরে কিছুমাত্রও হাত নেই। ছেলেমানুষ না হলে, ছেলের বউ ভালো না হলে ওদের নিয়ে যা অশান্তি তা তো আমরা অ্যাভয়েড

করলেই পারতাম।

ছিঃ। কী যে বল। তুমি কি বলছ, চাঁদু না থাকলেই ভালো হতো। খুশী হতাম আমরা? অমন করে বোলো না।

কী বলতে চাইছি বুঝছো না তুমি সুমি!

ব্রান্ডি খাবে নাকি একটা? ছেলের চিন্তা তো আছেই। আমার তোমাকে দেখেও কম চিন্তা হচ্ছে না।

সুমিতা অস্ফুটে কী যেন বলল, বোঝা গেল না।

পাশের ফ্ল্যাটে টিবড়েওয়ালারা ভি সি আর-এ কোনো ইংরেজি ছবি দেখছে। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। গমগম্ করছে আওয়াজ। একটুও কনসিডারেশন্ নেই। একজন মানুষেরও কনসিডারেশন্ নেই অন্যর প্রতি। পথের মোড়ে ট্রাফিক কনস্টেবল এক মুহূর্ত না থাকলেই এই সময়টার, এই যুগের চরিত্রটা যেন আয়নায় ফুটে ওঠে। চাঁদুরা যে কেমন করে বাঁচবে এই যুগে। বড়ই কষ্ট ওদের কপালে।

অশেষ উঠে গিয়ে ড্রয়িংরুমের বাতি জ্বেলে সুমিতার জন্যে একটি কনিয়াক্ আর ওর জন্যে একটি হুইস্কি ঢেলে, সেলার বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে দিল। চাঁদুর ঘরের ফুট-লাইটটা জ্বলছে। মৃদু আলোতে আভাসিত হয়ে আছে ঘর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গ্লাসদুটো হাতে নিয়েই একবার ছেলের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাশ ফিরে দুটি হাত জড়ো করে ঘুমের মধ্যে ছেলেটা কী যেন প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা করছে কি ও-ও, ওর বাবামায়েরই মতো, যেন সেন্ট ফেজিয়ার্স-এ অ্যাডমিশনটা হয়ে যায়?

পাঁচ বছরের শিশু। এই স্কুলের অ্যাডমিশানের পরীক্ষাতেও ধরাধরি করে, কানেকশানস্ বের করে তাকে পার করাতে হবে। যদি ভর্তি হয়ও, স্কুল-লীভিং পরীক্ষায় যদি ভালো না করতে পারে তখন আবার আর এক পরীক্ষা কলেজে অ্যাডমিশানের। তারও পর কেরিয়ারের পরীক্ষা। ততদিন কি বাঁচবে অশেষ? যা হেকটিক লাইফ লীড করতে হয় ওকে। আজ বম্বে কাল মাদ্রাজ, পরশু ব্যাঙ্গালোর তরশু দিল্লি। আগে আগে বেশ একটা ফীলিং অফ ইমপরট্যান্স্ হতো, আজকাল বড় ক্লান্ত লাগে। ভালো লাগে না একেবারেই। তারপর চাকরিতে ঢুকেও তো প্রত্যেক মুহূর্তেই পরীক্ষা। ল্যাং-মারামারি। ইঁদুরের মত কাটাকাটি একে অন্যকে। পাঁচ বছর বয়স থেকে পরীক্ষার শুরু হল চাঁদুর। চলবে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। জীবন মানেই পরীক্ষা। এই জীবন চাঁদুদের বড়ই সংগ্রামের, খেয়োখেয়ির, বড় দ্বেষ, ঈর্ষা, বড়ই রেষারেষির হবে। চাঁদুর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিল অশেষ এই পৃথিবীতে কেন যে আনল ও আর সুমিতা বেচারীকে। শিশুর শৈশব নেই, কিশোরের কৈশোর নেই, যুবকের যৌবন নেই, প্রৌঢ়র বানপ্রস্থ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত টেনশানের, প্রতিযোগিতার। অথচ, এই প্রতিযোগিতা কিসের জন্যে? ভালো চাকরি, ভালো রোজগার, স্ট্যাটাস, ভালো ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফোন, ফ্রিজ, ভি সি আর? শুধু এইটুকু পাওয়ার জন্যেই কি একজন মানুষকে পৃথিবীতে আনা? এই প্রতিযোগিতাতে ছিন্নভিন্নই যদি হতে থাকে সবসময় তবে ওরা বাঁচবেটা কখন? জীবন মানে শুধু কি এই? এইই সব?

বেডরুমে এসে নীল লাইটটা জ্বেলে সুমিতাকে কনিয়াক্‌টি দিয়ে নিজে গাল্প্ করল একেবারে অনেকখানি হুইস্কি।

সুমিতা সচরাচর ড্রিঙ্ক করে না। ক'দিন হল কেমন যেন হয়ে গেছে। বিছানায় উঠে বসে সেও চুমুক দিল।

ওকে অন্যমনস্ক করার জন্যে অশেষ বলল, বিকেলে কি করলে?

ও। বলিনি তোমাকে বুঝি? চাঁদুকে মিস্টার হবসন্-এর স্কুলে নামিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রসদনে গেছিলাম। শ্যামলদাদের সেই প্লে দেখতে। শ্যামলদা ইংরিজিতেই বললেন। কী দারুণ ইংরিজি বলেন! উনি কি ইংল্যান্ডের "হ্যারোতে" পড়াশুনা করেছিলেন? না 'ইটন্' এ?

চুপ করে রইল অশেষ কিছুক্ষণ। তারপর নিজের কানে আশ্চর্য শোনালেও কথাটা বলল সুমিতাকে। বলল, যোগেশদার কাছে শুনেছি, উনি নাকি বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়েছিলেন

সে কি? লা-মার্টস্ বা সেন্ট জেভিয়ার্সেও নয়।

নয়। ওসব স্কুলে বড়লোকের ছেলেরাই পড়তে যায়। শ্যামলদার বাবা তো খুব অল্পবয়সেই মারা যান। শিশুকালে তাঁর মা অনেকই কষ্ট করেই ওঁকে বড় করেছিলেন। জানো তুমি, যোগেশদা হয়ত ঠিকই বলেন। বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল অবশ্য খুবই ভালো স্কুল, কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম তো নয়। মানুষ যদি নিজেকে বড় করতে চায় যোগেশদার ভাষায়, তার মধ্যে যদি নেওয়ার ক্ষমতা মানে রিসেভ্টিভিটি থাকে, তাহলে সেই সব ব্যক্তি নিজেদের গুণে একদিন প্রতিষ্ঠানের চেয়েও অনেক বড় হয়ে ওঠেন। আমি সুগতর কাছে শুনেছি যে, শ্যামলদা নাকি রেডিওর বি বি সি স্টেশান শুনে শুনেই অমন ইংরিজি উচ্চারণ রপ্ত করেছিলেন। সত্যি কী না জানি না অবশ্য। যে বড় হবে, তাকে তার পরিবেশ, অনুষঙ্গ, চারপাশের বিরূপতা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না হয়ত।

সকলেরই তো আর শ্যামলদার মত ওরকম বড় হবার ক্ষমতা নিয়ে আসে না। আমাদের চাঁদু তো সাধারণ। আমি তুমিও তো সাধারণই। তাইই ইচ্ছে করে ছেলেকে একটি ভালো স্কুলে দিই। তুমি যখন অ্যাফোর্ড করতে পারো। তাছাড়া ভালো স্কুলিং-এর দাম তো আছে একটা।

নিশ্চয়ই আছে! তবে, সত্যিই হয়ত বাবা-মায়ের শাসন এবং ছেলের নিজের বড় হওয়ার তাগিদটাই আসল। স্কুলের চেয়ে, সেটা অনেকই বড় ব্যাপার।

হঠাৎই ওরা দুজনে চমকে উঠল, দ্রুত কিন্তু লঘু পায়ে পাশের ঘর থেকে চাঁদুকে দৌড়ে আসতে শুনে। স্লিপিং স্যুট পরে চাঁদু তার ছোট্ট চটি-ফট-ফট করে দৌড়ে এল ও ঘরে। সুমিতা লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। আতঙ্কিত গলায় বলল, কি হয়েছে বাবা? ভয় পেয়েছো? স্বপ্ন দেখেছো?

দেওয়ালের কোয়ার্টজ ক্লক্-এর দিকে চেয়ে দেখল অশেষ রাত বারোটা বেজে কুড়ি।

চাঁদু সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, মাম্মী, "সিজর্স" বানানে ক'টা এস? ক'টা এস?

অশেষ বলল, চারটে।

তাই? তাইইত! আমি তো ঠিকই জানি। সেন্ট ফেজিয়ার্সের সাদা ড্রেস-পরা ফাদার যে বললেন, আমি ভুল বলেছি!

তুমি স্বপ্ন দেখছিলে?

না বাবা। আমি অ্যাডমিশান টেস্ট দিচ্ছিলাম। চাঁদুর ঘুম-ভাঙা আতঙ্কিত মুখের দিকে

চেয়ে সুমিতার দু'চোখ সমবেদনায়, অসহায়তায়, ক্রোধে, হতাশায় জ্বলে উঠেই পরমুহূর্তে জলে ভরে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিল ও জানালার দিকে।

অশেষ চাঁদুকে কোলে তুলে ওদের বেডরুমের বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ওর ঘাড়ে, কানের পেছনে এবং হাঁটুতে ও গোড়ালিতে জল দিল। স্নায়ু সব ঠাণ্ডা হয় অমন করলে। ওর মা বলতেন। মাও এখন ভবানীপুরেই থাকেন সুরেশের সঙ্গে। বড় কষ্টেই থাকেন। কিছু টাকা দেয় অশেষ। জানে যে তা কিছুই নয়, কিন্তু আর পারে না। ওদের লাইফ-স্টাইল যে বদলে গেছে ?

চাঁদু অশেষের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা। আমার ভয় করছে।

কোনো ভয় নেই। আমি আছি না। অশেষ বলল। ঠিক এমনি করে মাও বলতেন ওকে ছোটবেলায়। মায়ের কাছে একমাসের উপর যেতে পারেনি। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

চাঁদুকে বলল, পারবে, তুমি ঠিক পারবে টেস্টে। দেখো তুমি। এখন চলো ঘুমোবে। লাইক আ গুড বয়। তুমি হাঁদা জ্যাঠার মত বাঘ শিকার করবে বলো না ? ঢিসুম। ঢিসুম। তবে ? ভয় পাবে কেন ? চাঁদু ঘোরের মধ্যে বলল, তা হলে ফাদার যে বললেন, না। সিজরর্স-এ একটা এস।

ফাদার জানে না বাবা।

তা হয় না। চাঁদু বলল।

চাঁদুকে শুইয়ে, গায়ে ওর হালকা নীলরঙা কম্বলটা চাপিয়ে মশারি গুঁজে কপালে একটা চুমু দিয়ে অশেষ বলল, গুড নাইট বাবা। ঘুমোও এবারে।

বেডরুমে ফিরে এসে দেখল সুমিতা এক করুণ অসহায় ভঙ্গীতে শুয়ে আছে। ওর হাতের কনিয়াকের গ্লাস ঢেলে কম্বল ভিজে গেছে। অশেষ কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, সুমি।

সাড়া নেই কোনো। অজ্ঞান হয়ে গেছে চাঁদুর মা।

অশেষ তাড়াতাড়ি ওর নাড়ি দেখল। তারপর ডাঃ ভৌমিককে ফোন করল। এই মালটিস্টোরিড বাড়িরই দশতলায় থাকেন উনি। তারপর সারভেন্টস কোয়ার্টারের বেল টিপল। ডাঃ ভৌমিক এলেন স্লিপিং স্যুটের উপর ড্রেসিংগাউন চাপিয়েই। সুরমাও এলো প্রায় একই সময়ে। ডাঃ ভৌমিকের ব্যাগটা নিয়ে বেডরুমে এল অশেষ সুরমা আর ডাঃ ভৌমিকের সঙ্গে।

পরীক্ষা করতে করতেই জ্ঞান ফিরে এল সুমিতার, কিন্তু জ্ঞান আসার আগে ঘোরের মধ্যেই সুমিতা বলল, বীলিভ মী ফাদার। হী নোজ এভরীথিং। বীলিভ মী। ও নার্ভাস হয়েই ভুল বলেছে। সত্যিই কিন্তু ও জানে। ও কি অ্যাডমিশান পাবে না ফাদার ?

ডাঃ ভৌমিক বুঝলেন।

অশেষকে বললেন, কবে ?

পরশু থেকে আরম্ভ। পর পর। সেন্ট লরেন্স, ডন-বসকো, ক্যালকাটা বয়েজ, লা-মার্টস্, সেন্ট-ফেজিয়ার্স।

হুঁ। বলেই, সুমিতার প্রেসার মাপলেন। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে দুটি পাঁচ মিলিগ্রামের ক্যাম্পোজ বের করে দিয়ে বললেন, জল দিয়ে গিলে শুয়ে পড়ুন। কাল ঠিক হয়ে যাবেন।

ডাঃ ভৌমিকের দারুণ প্র্যাকটিস্। মানুষও নাকি অমায়িক। চারখানা গাড়ি। লোকে

পেছনে পেছনে দৌড়ে বেড়ায়। অশেষ শুনেছে যে, ওঁর বাবাও অত্যন্ত বড় ডাক্তার ছিলেন। উনিও নাকি বিদেশে গিয়ে অনেক ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। আজই প্রথম বিপদে পড়ে ডাকল ওঁকে। নইলে ওদের ডাক্তার, ডাঃ সেন।

ডাঃ ভৌমিক লিফ্‌ট-এর সামনে দাঁড়িয়ে লিফ্‌ট-এর বোতাম টিপে বললেন, মিসেসের নার্ভাস ব্রেকডাউন মত হয়েছে। নাথিং টু ওয়ারী বাউট। প্রেসক্রিপশান তো লিখে দিয়েই গেলাম একটা। ওষুধ আনিয়ে কাল সকাল থেকেই দিতে আরম্ভ করবেন।

লিফ্‌টের দরজা বোধহয় কেউ খুলে রেখে দিয়েছে। মালটিস্টোরিড বাড়ির চাকর-আয়ারা রাতে যা খুশি তাইই করে। ডাঃ ভৌমিক কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে লিফ্‌টের অপেক্ষায় থেকে হঠাৎ বললেন, আমি জানি না মিস্টার বোস কলকাতায় আমরা এত বড়লোক বাঙালী আছি, বাঙালী গভর্নমেন্ট আমাদের, আমরা সকলে মিলে কি আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে ক'টি ভালো স্কুলও তৈরি করতে পারি না? কলকাতায় তো বটেই, সমস্ত মফস্বল শহরেও?

স্কুল তো কতই আছে? কিন্তু স্কুলের মত স্কুল কোথায়? মানে, যেখানে ভালো পড়াশোনা হয়, ইংলিশ মিডিয়ামে।

অশেষ বলল।

যে সব স্কুল আছে বাংলা-মিডিয়ামের, তাদেরও কি আমরা আধুনিক ও ভালো করে তুলতে পারতাম না? ইংরিজি শিখতে বাহাদুরীটা কি লাগে? নিউমার্কেটের ফলওয়ালারাও তো ইংরিজি বলে। ইংরিজি শেখার চেয়েও বড় শিক্ষা চরিত্র গঠন। যে সাহেবরা আমাদের বাবাদের শোষণ করেছিলেন তাদের পোশাক, কমোড, হুইস্কি আর পাইপই নিলাম আমরা, চরিত্রটাই ফেলে দিলাম। তখনকার ইংরেজদের গুণও ছিল অনেক। কী বলেন?

আপনি কোন স্কুলে পড়েছিলেন ডাক্তার ভৌমিক?

আমি? বাংলাদেশের পাবনার এক অখ্যাত গাঁয়ের স্কুলে।

আপনার বাবা তো এম আর সি পি, এফ আর সি এস ছিলেন, তাই না?

ডাঃ ভৌমিক একবার তাকালেন অশেষের চোখে মুখ তুলে। বললেন, কে বলেছে আপনাকে? ভুল শুনেছেন। আমার বাবা এম বিও ছিলেন না, পুরোনো দিনের এল এম এফ ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ছিলেন ধন্বন্তরী।

স্যরি। আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাবার কোয়ালিফিকেশান গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

নিচে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হল। কারো দয়া হল বোধহয়।

লিফ্‌টটা এসে গেল। অশেষ, ভদ্রতা করে লিফ্‌ট-এর গেট খুলে দিল। ডাঃ ভৌমিক বললেন, না, সেটাও ভুল শুনেছেন। আমি নিছকই একজন এম বি বি এস ডাক্তার।

আপনার ফীসটা?

হাসলেন ডাঃ ভৌমিক। বললেন, আমি পুরোনো দিনের লোক, প্রতিবেশীকে আত্মীয় বলেই জেনেছি ছোটবেলা থেকে।

লিফ্‌ট্‌-এর মধ্যে মুখ নিচু করে গেটের ভিতরের দিকটা টানতে টানতে বললেন, বোস-সাহেব, স্কুল এবং ডিগ্রীর সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নেই বোধহয়। হয়ত আয়েরও নেই। ওড়িশা থেকে আসা ভালো কাজ জানা কলের মিস্ত্রী, বিহার বা ইউ পি থেকে আসা পানের দোকানদার, এঁরা সবাইই কিন্তু মার্কেন্টাইল ফার্মের অনেকেই বাঙালী অফিসারের চেয়ে বেশি রোজগার

[illegible] একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কি করতে চান আপনারা তাইই ভালো করে ভেবে ঠিক করুন। কলকাতার ভালো ভালো স্কুলে যেসব ছেলেমেয়ে পড়ার সুযোগ পায় বা পেয়েছে, পরবর্তী জীবনে তারা কি সকলেই কেউ-কেটা হয়েছে? সো-কলড্ খারাপ স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে হেরে তারা কখনও গেছে কি যায়নি তাই নিয়েও একটি সার্ভে কবার সময় বোধহয় এসেছে। একমাত্র সন্তানকে কী করে তুলতে চান তাই ভাবুন ভালো করে দুজনে। পরীক্ষা আপনাদেরই।

অশেষ লিফটের বোতাম টিপে রেখে দাঁড় করিয়ে দিল লিফটটিকে। কাকুতি-ভরা গলায় বলল, কী করতে বলেন, আপনি আমাদের ডাক্তার ভৌমিক?

কিছুই বলি না। ছলেকে শিক্ষিত করে তুলুন। জীবিকার সঙ্গে শিক্ষার কোনো বিরোধ যেমন নেই, তেমন কোনো কানেকশানও নেই। যা-কিছু করেই একজন মানুষ জীবিকানির্বাহ করতে পারে। এমনকি যদি কড়াইশুঁটি কি কচুরির দোকানও দেয়। আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, যাঁরা টাই পরে গাড়ি চড়ে অফিসে গিয়ে অন্যের বেশি মাইনের চাকর হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরাই শুধু শিক্ষিত আর অন্যরা সবাইই অশিক্ষিত? ছেলেটাকে শিশুকাল থেকেই কতগুলো প্রি-ডিটার্মিনড আইডিয়াজ-এর চাকর করে তুলবেন না। ওদের মানুষ করে তুলুন। ভালো স্কুলে অ্যাডমিশান হলে ভালো, কিন্তু তা না হলে যে তার জীবন বৃথা হয়ে যাবে এমন মনে করার মত মূর্খতা কিন্তু আর নেই। ফটফট করে ইংরিজি ফুটোলেই সে শিক্ষিত, সে জীবিকায় সফল হবে; তার কোনো মানেই নেই। তাছাড়া জীবিকার জন্যে তো জীবন নয়, জীবনের জন্যেই জীবিকা।

অশেষের হাতের আঙুল আপনা থেকেই ঢিলে হয়ে এল। লিফটটা উঠে গেল উপরে। ওর মনে হল, ডাঃ ভৌমিক যেন ওকে নিচেই ফেলে রেখে নিজে অনেক উঁচুতে চলে গেলেন।

সুরম্যাও তার কোয়ার্টারে যেতে দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে অশেষ আর একটা হুইস্কি ঢেলে বেডরুমে গিয়ে দেখল সুমিতার নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে গেছে। দশ মিলিগ্রাম ক্যাম্পোজ পড়াতে ঘুমে এলিয়ে পড়েছে ও।

গ্লাসটি হাতে নিয়ে দরজা খুলে ও বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে কলকাতায় গতকাল থেকে। উল্টোদিকের চোদ্দতলা মালটিস্টোরিড বাড়িটির কিছু কিছু ফ্ল্যাটে তখনও আলো জ্বলছে। ঐ সমস্তক'টি ফ্ল্যাটেও কি পাঁচ বছরের শিশুরা জীবন ও জীবিকার প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে কাঁচির ইংরিজি প্রতিশব্দ বানানে কটি "এস" আছে তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত? না তাদের মা-বাবারা ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তাদের ভর্তি করতে না-পারায় চিন্তাতে সুমিতারই মত নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভেঙে পড়েছেন আলো-জ্বালা বেডরুমগুলিতে?

অশেষের চোখে হঠাৎই বাঙাল, খাঁটি, সোজা কথার মানুষ যোগেশদার মুখটি ভেসে উঠল। এক ঢোকে হুইস্কিটা শেষ করে দিল ও। ওর মনে হল এই মুহূর্তে ওদের মতো অনেক দম্পতিই শুধু নন, ওদের নয়নমণি চাঁদুদের মত কিছু শিশুই শুধু নয়, পুরো বাঙালী জাতটাই বোধহয় একধরনের নার্ভাস ডেবিলিটিতে ভুগছে। ক্যাম্পোজ খেয়ে ঘুমোলে সেই জড়তা হয়ত শুধু বাড়বেই। যা দরকার তা জেগে থাকার, দু চোখ খুলে রাখার, সবাই যা করে, যা ভাবে; তা না করে নিজের পরিবেশ ও নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে ঠাণ্ডা মাথায় বোধহয় একটু ভাবা দরকার। ভালো চাকরী আর বেশি মাইনেই যে তাদের অনেক আদরে-আনা সন্তানের

জীবনের একমাত্র গন্তব্য নয় এ কথাটা হঠাৎই মনে হল ওর। ভালো থাকা, ভালো-পরার, ভি সি আর আর পয়সার চক্করে ফেঁসে, গরীব বাঙালীদের যা কিছুই গর্ব করার ছিল একদিন তার সবই বুঝি খোয়াতে বসেছে তারা।

সুমিতা কাল যা বলে বলুক, সকালে কোনো বাঙালী স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করাবে চাঁদুকে। তারপর সেই স্কুল যাতে তার সন্তানকে যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে পারে সে জন্যে নিজে তো বটেই, চ্যাটার্জী, যোগেশদা, ডাঃ ভৌমিক এবং অগণ্য বাঙালীদের কাছে সাহায্য চাইবে অশেষ। সরকারের উপর সব দিক দিয়ে চাপের সৃষ্টি করবে। কেরালাও তো কম্যুনিস্ট। কিন্তু শিক্ষিতের হার সেখানে কত বেশি! অশিক্ষিত বেকার মানুষ বাড়লে ভোট পেতে সুবিধে নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু রাজ্যের কি হয় তা ওঁদের বোঝার সময় এসেছে। এই জাতটিকে এমন ঘোরতর স্নায়বিক দৌর্বল্য থেকে টেনে তোলাটা শুধুমাত্র তার নিজের ছেলেকে অতি স্বল্পসংখ্যক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের স্কুলে তথাকথিত শিক্ষিত করে তোলার স্বার্থপর ইচ্ছে থেকে অনেকই বড় ব্যাপার।

চাঁদু ডাকল, বাবা।

তাড়াতাড়ি ঘরে গেল অশেষ বারান্দা থেকে।

অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টের নাম কি বাবা? ডনাল্ড ডাক?

না বাবা। রনাল্ড রিগ্যান্। কিন্তু এসব তোমার আর মুখস্থ করতে হবে না। শিশু ভোলানাথ পড়াব আমি কাল তোমাকে, অবনঠাকুরের রাজকাহিনী, বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী পড়ে শোনাব; দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি, সুনির্মল বসুর ছন্দের টুং-টাং। কাল থেকেই দেখবে পড়াশোনাটা কত আনন্দের। কত মজার। আজ ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মী সোনা। সিজার্স-এর এস নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোমাকে। কাঁচিই আমাদের অনেক ভালো। রাতারাতি এক অদৃশ্য কাঁচি দিয়ে তোমাকে এই মিথ্যে কষ্টর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক সুন্দর দিশি জগতে ফিরিয়ে আনব আমি। ঘুমোও তুমি। আমার আদরের ধন। তোমার স্বপ্নে পরীরা আসুক। শুকসারি, সুয়োরানী দুয়োরানী। ফ্যান্টম আর সাদা-পো' :কের ফাদাররা নাইই বা এলেন।

বাবা। আমার সঙ্গে শোবে তুমি?

নিশ্চয়ই শোব।

অশেষ বলল।

চাঁদুর পাশে শুয়ে, ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল একদা ব্রিটিশ, অধুনা মাড়োয়ারী কম্পানীর ইংবেজি ফুটোনো চাকর। ওর বুকের মধ্যে ছেলেবেলার সব বোধ ফিরে এল। কানে এল গ্রামের রাত-পাখির শীতার্ত স্বর, নদীর উপরের হাওয়ার হু হু শব্দ। নাকে এল প্রথম ভোরের খেজুরের রসের গন্ধ, পাকা ধান আর নদীর কুয়াশার গন্ধর সঙ্গে ভেসে। বড় বড় কই মাছের ধনেপাতা ফুলকপি দিয়ে রাঁধা ঝোলের গন্ধ। বাঙালীয়ানার গন্ধ। ঘুমন্ত চাঁদুকে বুকে জড়িয়ে অশেষ বলল, তোকে আমি শিশুকাল থেকেই এই অপমানের অসম্মানের জগৎ থেকে বাঁচাব। শিশুকাল থেকে এই হিউমিলিয়েশানের মধ্যে বাঁচতে হলে তুই অমানুষ হয়ে যাবি। তোকে জবরদস্ত বাঙালী করে তুলব। দেখি তুই ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিস কি পারিস না জীবনে! বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, বিধান রায়, সত্যজিৎ

রায় এবং অনেকেই যদি ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে না পড়েও বড় বাঙালী হতে পেরে থাকেন তো তুইই বা পারবি না কেন ? তোকে আমি আমার মত এয়ার-কন্ডিশানড অফিসের স্যুট-পরা ফ্যাকাশে পুতুল করব না, রক্ত মাংসর বিবেকসমৃদ্ধ মানুষ করে তুলব। যেমন অনেক মানুষের দরকার এই মুহূর্তে, এই হতভাগ্য রাজ্যে।

দেখিস, চাঁদু।

বাবা। দেখিস তুই!



বাঘের দুধ

ডানদিকে কোথায় চললি রে শাণ্টু ? লাতেহারের পথ কি এদিকে নাকি ?

এদিকেই তো। গাড়ি চালাতে চালাতে মুখ না ঘুরিয়েই বলল শাণ্টু।

পাশে বসা নির্মলবাবু স্বগতোক্তি করলেন, সব কিছু এত অন্যরকম হয়ে গেছে তোদের ডালটনগঞ্জ শহরে এই পঁচিশ বছরে যে, কিছুই আর চিনি বলে মনে হয় না।

শাণ্টু উত্তর না দিয়ে গীয়ার বদলে গাড়িকে সেকেন্ড গীয়ারে দিয়ে লেভেল ক্রশিংটা পেরিয়ে গেল।

হ্যাঁরে ! বাদিকের এই বাড়িগুলো কবে হল রে ? এগুলোও কি বিড়িপাতার ব্যবসাদার গুজরাতীদের ?

শাণ্টু উত্তর দিলো না কোনো।

অনেকই চেষ্টা করেছিল গুরুজন মেসোকে অন্য গাড়িতে চালান করার। কিন্তু মেসো শাণ্টুকে বিশেষই ভালোবাসেন। তাই ঐ গাড়িতেই জবরদস্তি করে উঠলেন তিনি। এদিকে অনেকক্ষণ সিগারেট না খেয়ে এবং আরও অনেকক্ষণ খেতে পাবে না যে, এ কথা মনে করেই ওর মেজাজ বিগড়ে ছিল। যত্ত সব বুড়ো পার্টি ! মোহনদার বৌভাতের পর নতুন বউকে নিয়ে চার গাড়ি, ভর্তি করে ওরা চলেছিল মোহন বিশ্বাসের ছিপাদোহরের ডেরাতে। মুনলাইট পিকনিক হবে সেখানে।

হু-হু করে হাওয়া ঢুকছিল গাড়িতে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা। এখনও রোদ আছে নরম মোমের মত। বিকেলে বড় আরাম লাগে এই শীত-শেষের অবসরের রোদে।

মুখ হাঁ করে অক্সিজেন নিচ্ছিলেন নির্মলবাবু ফুসফুসের আনাচ কানাচ ভরে। কলকাতায় মুখ হাঁ করলেই তো ডিজেলের ধোয়াঁ নয়ত সি এম ডি এর কালি। স্বাস্থ্য যতটুকু ভালো করে নেওয়া যায়।

এক সময় এই ডালটনগঞ্জেই অনেকদিন ছিলেন নির্মলবাবু। শহরে এবং আশেপাশের জঙ্গলে। তখন বড়-সম্বন্ধী বেঁচে। একডাকে চিনত তাঁকে লোকে, মোহন বিশ্বাসের বাবা মুকুন্দ বিশ্বাসকে। কোনো বাঙালীই এখানে এসে তাঁর অতিথি না হয়ে যেতে পারতেন না কোনোক্রমেই।

ধুতির উপর সাদা টুইলের ফুলহাতা শার্ট। কলার তোলা থাকত। আর বুকের বোতাম সব সময় খোলা। বুক পকেটে একটা রুমাল বলের মত গোল করে পাকানো থাকত। এখানের

কুঁয়োর জলে আয়রন থাকাতে দাঁতগুলো সব কালো হয়ে গেছিল বড়দার। তার উপর অবিরাম পান আর সিগারেট তো ছিলোই।

আহাঃ। কী সব দিনই গেছে তখন।

লাতেহারের পথ ছেড়ে গাড়ি ডানদিকে ঢুকলো। নির্মলবাবু বললেন, এ কিরে শাণ্টু? এ যে পাকা রাস্তা দেখছি। পাকা হলো কবে?

শাণ্টু বিরক্তির গলায় বলল, আমি তো এখানে এসে অবধিই দেখছি।

তুই কতদিন আছিস এখানে?

তা কম দিন নয়, পনেরো বছর হবে।

ফুঃ। পনেরো বছর আমি বলছি চল্লিশ বছর আগের কথা। কত অন্যরকম ছিলো সব কিছু।

হবে।

শাণ্টু সংক্ষিপ্তভাবে বলল।

কুট্‌কু-তে নাকি ড্যাম হচ্ছে শুনি?

হুঁ।

শাণ্টু বলল।

বেতলাতে নাকি বিরাট ট্যুরিস্ট লজ হয়েছে?

হুঁ।

শাণ্টু আবার বলল।

শাণ্টু তাকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিল না দেখেও নির্মলবাবু দুঃখিত হলেন না। বড় ভালোমানুষ, আপনভোলা লোক তিনি। ডালটনগঞ্জ ছেড়ে ছোট শালার কোম্পানীর কাজে ওড়িশার সম্বলপুর, ঝাড়সুগুদা, বাম্‌রা এসব জায়গায় কেটেছিল মাঝের ক'টি বছর। তারপর কলকাতার উপকণ্ঠে ছোট একটি বাড়ি করে থিতু হয়েছেন উনি। দীর্ঘদিন পরে মোহনের বিয়ে উপলক্ষে ডালটনগঞ্জে এসে পড়ে কত সব পুরোনো ঘটনা, পুরোনো কথা, ভুলে-যাওয়া কলির মত ফেরারী-পাখিদের মতই দ্রুত ফিরে আসছে আবার স্মৃতির দাঁড়ে। খুবই ভালো লাগছিল নির্মলবাবুর। আবার ভারী খারাপও লাগছিল।

কেন যে ভালো-লাগা আর কেন যে খারাপ লাগা ; তা উনিই জানেন। নিজে একাই শুধু বুঝতে পারছেন। সেই মিশ্র অনুভূতিতে ভরপুর হয়ে আছেন তিনি। কিন্তু সেই অনুভূতির ভাগ আর কাউকেই দিতে পারছেন না। তাঁর সমসাময়িক কেউ আর নেই এখন।

দিতে চাইলেও নেওয়ার লোক নেই কেউ।

এবারে তিনি পিছনের সীটে বসা মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা বললে, বিশ্বাসই করবে না হয়ত, এই বেত্‌লাতেই আসতাম হয় মিলিটারী জীপ, নয়ত পেট্রোলে চলা ছোট ফোর্ড ট্রাকে চড়ে। কাঁচা রাস্তা ছিলো পুরোটাই লাল ধুলোতে ধুলোময়।

দু পাশে গভীর জঙ্গল ছিল। শাল, সেগুন, পিয়াশাল, আসন, গাম্‌হার, পন্নন আর বাঁশ। বাঁশের কঞ্চি এসে লাগত ট্রাকের দু দিকের ডালায়। আর কী হাতি আর বাইসনই না ছিলো। আর বাঘের কথা? চিতাবাঘ তো ছিল মুড়ি-মুড়কির মত। বড় বাঘই কী কম। তখন কাগজ কোম্পানীর বব্ রাইট্ আর অ্যান্ রাইট শিকারে আসতেন বছরে তিনবার করে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে মেয়েদের মন্তব্যের অপেক্ষা করে, সকলকেই নীরব দেখে আবার বললেন, আচ্ছা তোমরা কেউ বাঘের দুধ দেখেছো ?

বাঘের দুধ ?

মেয়েরা সমস্বরে হেসে উঠল।

শাণ্টু বলল, এতক্ষণে একখানা ছাড়লেন মেসো।

আরে ? সত্যি বলছি।

নির্মলবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন।

শোনো তাহলে বলি।

গোপা বলল, মেসোমশাই, ছিপাদোহরে গিয়েই না হয় বলবেন বাঘের দুধের গল্পটা। সকলে মিলে না শুনলে মজাই হবে না। নতুন বউও শুনবে তো। এমন একটা গুল-গল্প।

নির্মলবাবু বললেন, আচ্ছা। শুনোই তখন গুল না ঘুঁটে।

গাড়িটা ঔরঙ্গার ব্রিজ পেরিয়ে, মোড়োয়াই বারোয়াডি কুটকুর পথ ডাইনে ফেলে বাঁয়ে বেতলার দিকে চলল।

এই ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আর বেশী কথা বলবেন না ঠিক করে নির্মলবাবু বাঁযে চেয়ে একমনে জঙ্গল দেখতে লাগলেন। শীত শেষের জঙ্গলের হরজাই গন্ধ নাকে নিয়ে বড় খুশী হলেন অনেকদিন পর।

বেতলার চেকনাকাতে সবগুলো গাড়ি দাঁড়াল। নির্মলবাবু হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন। আরে আরে অ্যাই তো সেই জায়গাটা ! এই যে, যেখানে পালামৌ ফোর্টে যাবার পথ বেরিয়ে গেছে বাঁয়ে এই রাস্তা থেকে, ঠিক ঐ মোড়েই একটা মস্ত শিমুল গাছ ছিলো না ? ম—স্ত গাছ, বুঝলি। একদিন ঠিক এই সময়ে, সন্ধের মুখে দেখি বিরাট একটা দাঁতাল হাতি আমাদের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। মহা মুশকিল। কী করি ভাবছি এমন...

মেসো পান খাবেন ?

রতন সামনের গাড়ির ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এসে জিগগেস করল।

খাওয়া একটা। মেসো বললেন। তারপর বললেন, জর্দা নেই কারো কাছে ?

নাঃ।

দুসস।

নির্মলবাবু বললেন।

জর্দা ছাড়া পানে মজাই নেই।

পাপিয়ার ছেলেকে বেবি এই গাড়িতে চালান করে দিলো।

তারপর আবার চলা।

এখন অন্ধকার নেমে এসেছে। গাড়ির কাঁচ খোলা রাখলে ঠাণ্ডা লাগছে। হেড-লাইটের আলো পড়ছে বাঁকে বাঁকে। এঁকে বেঁকে চলে গেছে এই চওড়া কালো সাপের মত পথটা। কে বলবে যে, এইই সেই পথ। কত সুন্দর হয়ে গেছে, যেন বয়স কমে গেছে সব কিছুর। ছিপাদোহরে পৌঁছেই মনে পড়ল রসগোল্লা আর নিমকির কথা।

নির্মলবাবু বললেন, দ্যাখতো রতন, পাওয়া যায় কি না এখনও ?

মোহন বলল, আনিয়ে রেখেছি মেসো।

রসগোল্লা খেয়ে মেসো বললেন, দূর। কিসে আর ইসে। আমাদের সময় স্বাদই ছিল অন্য। গরুর দুধও কি আর সেরকম আছে?

এইবার ভাইও চেপে ধরলো মেসোকে। বলল, গরুর দুধের কথা থাক এখন আমরা বাঘের দুধের গল্প শুনতে চাই।

বাঘের দুধ?

সকলে কলকল করে উঠল একসঙ্গে অবিশ্বাসী গলায়। তারপর চেয়ারগুলো মেসোর কাছাকাছি টেনে গোল হয়ে বসল সকলে ডেরার সামনের হাতায়।

আকাশের তারারা আজ লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে, চাঁদের জন্যে। ছপ্ছপ্ করছে চাঁদের আলো বন্যার জলের মৎ চারদিকে, বনে জঙ্গলে, মার্সিডিস ট্রাক আর গাড়িগুলোর হালকা শিশিরে ভেজা বনেটের উপর। নির্মলবাবুর দু চোখের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যেও চাঁদের আলো চুঁইয়ে গেলো। উনি শুরু করলেন ঃ সেদিন খুবই শীত ছিলো, বুঝলি। যতদূর মনে আছে ডিসেম্বর মাস, আমি তখন হুলুক পাহাড়ের উপরের ডেরায়...

২

চিরদিনই ভোরে ওঠা অভ্যেস। ঘুম ভেঙেই মনটা বড় খারাপ লেগেছিল। কারণ কাল রাতে ওরা সকলেই ওঁর বাঘের দুধের গল্প নিয়ে ওঁকে ঠাট্টা তামাশা করেছে। ওদের হয়ত গল্পটা না বললেই পারতেন। এখানে ওঁর গল্প সীরিয়াসলি শোনেন এমন একজনও নেই এখন।

একবার পায়চারি করে এসেছেন ইতিমধ্যেই বেলোয়াটিকার দিক থেকে। ফাঁকা টাঁড় ছিলো এদিকটাতে, ওঁর সময়ে ঃ ঝাঁটিজঙ্গল। এখন মডার্ন ডিজাইনের বাড়িতে ভরে গেছে। সর্দারজি উদ্বাস্তুরা এদিকটাতে জাঁকিয়ে বসেছে। মানুষগুলোর বাহাদুরী আছে। ভারতবর্ষ তো বটেই পৃথিবীর সব জায়গাতেই ছড়িয়ে গেছে ওরা। পুরোনো কথা ভুলে গেছে। বাঙালীরা পারলো না। এইই দোষ বাঙালীর। অনেক দোষ।

পুরো শহরটাই কেমন নতুন হয়ে গেছে। ভোল পালটে ফেলেছে যেন। মনে পড়ে, কাছারির সামনে বড় বড় সেগুন গাছে ভরা পথটা দিয়ে সন্ধের পর হাঁটতে ভয়ই করত সেই সময়। এখন কেমন হয়েছে কে জানে? ভাবলেন, একবার যাবেন ঐ দিকে।

বাড়ি ফিরে লুচি আর আলুর তরকারি দিয়ে নাস্তা সেরে এক কাপ চা খেয়ে একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নির্মলবাবু শহরটা ভালো করে ঘুরে দেখবেন বলে।

কাছারির মোড়ে যে বড় আয়না-লাগানো পানের দোকানটা ছিল সেখানে এসেই রিকশা দাঁড় করালেন। এই পানের দোকানের মালিকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিলো। কিন্তু নেমে দেখলেন সেই লোকটি নেই, কিন্তু অবিকল তারই মত চেহারার একটি যুবক, এই তিরিশ-বত্রিশ বয়স হবে। ট্রান্‌জিস্টারে হিন্দি ফিল্মের গান শুনতে শুনতে মুখ নিচু করে পান লাগাচ্ছে।

নির্মলবাবু গলায় আন্তরিকতা মাখিয়ে বললেন, পিতাজী কৈসে হ্যায়?

গুজর গ্যয়া।

বলল, নওজোয়ান ছেলেটি। নৈর্ব্যক্তিক গলায়।

তারপর ওঁর দিকে চোখ না তুলেই বলল, আপ্‌কা ক্যা দুঁ?

নির্মলবাবু একটা ধাক্কা খেলেন। মৃত বাবার পরিচিত লোকের সঙ্গেও কথা বলার সময় নেই ছেলেটির? সময় নেই, সময় নষ্ট করবার। ব্যক্তিগত সম্পর্ক-র সময় নেই আর এ শহরে। সময় নেই, দুটো অকাজের কথা বলার। সকলেই ভীষণ ব্যস্ত রোজগারের ধান্দায়। যেন রোজগারটিই সব, আর সব কিছুই তুচ্ছ। ঘনঘন ট্রাক, গাড়ি, আর সাইকেল রিকশার আওয়াজে চারধার সরগরম। সবাই বদলে গেছে, সবকিছুই বদলে গেছে, একমাত্র উনি নিজে ছাড়া।

ছেলেটি আবারও মুখ নিচু করে বলল, ক্যা দুঁ?

নির্মলবাবু বললেন, মঘাই। গিলা সুপারি। ইলাইচি। কালা-পিলা পাত্তি।

নির্মলবাবু ভাবলেন যে, বলেন তোমার বাবার সঙ্গে...।

তারপরই, ভাবলেন দুস্‌স কী লাভ?

দোকানের বড় আয়নাটাতে চোখ পড়ল। নির্মলবাবু অজান্তেই আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ঠিক যে আয়নাটাতে দাঁড়িয়ে নিজের সবুজ অর্জুন গাছের মত ঋজু চেহারাটা স্তুতির চোখে দেখতেন, সেইখানেই এসে দাঁড়ালেন।

একি! এ কে? এই লোকটা! এ...ছিঃ।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নির্মলবাবু। গোঁফ পেকে গেছে। মাথার সামনেটাতে টাক। পাতলা হয়ে গেছে চুল। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। মুখের চামড়া ঢিলে। কপালে বলিরেখা। এই মানুষটিকে কি উনি চেনেন? গত পঁচিশ বছরে তো কত হাজারবার দাড়ি কামিয়েছেন, কত লক্ষবার আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছেন নিজেকে। কিন্তু কখনও কি নিজেকে দেখেননি? না, দেখতে চাননি?

দোকানী পান দিলো। চোখ না তুলেই বলল, তিশ্‌ পইসা। উনি যন্ত্রচালিতের মত পান নিলেন। যন্ত্রচালিতের মতই পয়সা দিলেন। তারপর রিকশায় এসে উঠলেন।

আচম্‌কা একটা ঢোক গিলে ফেলে ওঁর বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। মারাত্মক জর্দা! অথচ এই দোকানের জর্দা-পানই মুঠো মুঠো খেয়েছেন এক সময়ে। পিক্‌ ফেললেন বার বার। কিন্তু বুকের কষ্টটা বেড়েই চললো।

নির্মলবাবু চমকে গেলেন। বুঝলেন যে, কেবলমাত্র মানুষই বড় তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়; ফুরিয়ে যায়। পথ-ঘাট, শহর-গ্রাম, বন-জঙ্গল সমস্ত কিছুই নতুন জীবন পেয়েছে অথবা পুরোনো জীবনেই নতুন জেল্লা পেয়েছে গত পঁচিশ বছরে। শুধু তিনি নিজেই...

কাছারির মোড়ের এই পানের দোকানের বেল্‌জিয়ান আয়নাটা ঠিক একই রকম রয়ে গেছে। যারা তাতে ছায়া ফেলত তারাই হয় চলে গেছে; নয়তো কত্ত বদলে গেছে।

কিন্তু নির্মলবাবু একাই জানেন যে, আজকের আয়নায় অপ্রতিবিম্বিত, তাঁর চলে-যাওয়া-যৌবন অথবা বাঘের দুধের গল্প;

এই দুইই কতখানি সত্যি ছিল।

একদিন।

প্রত্যেক সত্যিই কোনো বিশেষ সময়ে সত্য অথচ সময়ের ব্যবধানে তাই কত সহজে মিথ্যে হয়ে যায়। তাঁর নিজচোখে দেখা, লাতেহারের জঙ্গলে শীতের সকালে কালো পাথরের উপরে পড়ে-থাকা বাঘিনীর দুধেরই মতো। একদিন সবই সত্যি ছিলো। তিনিও সত্যি ছিলেন। আজ তিনি, তাঁর অনুষঙ্গ সবই মিথ্যে হয়ে গেছে।



স্বামী হওয়া

মহুয়া মিলন থেকে আসা ট্রেনটা টোরী স্টেশনে ঢুকছিল।

স্মিতা এবং আমি নীচু প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়েছিলাম। আজ হাটবার। খুব ভিড় প্ল্যাটফর্মে। নানা জায়গা থেকে হাট করতে এসেছিল ওরাঁও-মুণ্ডা, ভোগতা-কোলহোরা।

সুমন স্যুটকেশটা হাতে করে নামল। নেমেই দৌড়ে এলো আমাদের দিকে। এসে, স্মিতাকে বলল, কেমন আছো বউদি ?

স্মিতা বলল, কেমন করে ভালো থাকি বল ? তুমি এত্তদিন কাছে ছিলে না।

সুমন হাসল। আমিও হাসলাম।

এর পর সুমন আমাকে বলল, রোলস রয়েস্‌টা এনেছো তো ?

বললাম, এনেছি।

তবে, চল।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আমার লজঝড় অস্টিন গাড়িটার পিছনের দরজা খুলে সুমন উঠে বসল। পাশে স্মিতা। আমি ড্রাইভিং সিটে আসীন হলাম।

বসন্তের দিন। হু-হু করে হাওয়া আসছিল। পড়ন্ত রোদ্দুর সেগুন গাছের বড় বড় হাতির কানের মতো পাতার পেছনে পড়াতে সিঁদুরে-রঙা দেখাচ্ছিল পাতাগুলোকে। মহুয়ার গন্ধ ভাসছিল। ঠোঁট-মুখ চড় চড় করছিল রুখু বাতাসে।

স্মিতা বলল, তারপর ? মা-বাবা বিয়ের কথা কী বললেন ?

সুমন বলল, ধ্যুত। সে মা-বাবাই জানেন।

আহা ! লজ্জায় যেন মরে গেলে তুমি।

ওকে গালে টুশ্‌কি মেরে বলল স্মিতা।

আমি লাতেহারের দিকে মোড় নিলাম। কিন্তু লাতেহারে যাবো না।

চাঁন্দোয়ারই এক প্রান্তে আমার কোয়ার্টার। সুমনেরও ' পাশাপাশি। সরকারী চাকরিতে এই রকম জঙ্গুলে জায়গায় যেমন কোয়ার্টার হতে পারে, তেমনই।

কোয়ার্টারে পৌঁছে গাড়িটা খাপ্‌রার চালের একচালা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিলাম।

স্মিতা সুমনকে বলল, তোমার বাহন ছোটুয়াকে বলে দিয়েছি কাল ভোরে চলে আসতে। আজ সকালেও একবার এসে ঘর-দোর ধুয়ে-মুছে গেছে। চানুকে টুল পেতে সামনে বসিয়ে

রেখেছিলাম সব সময়। পাছে কিছু খোয়া যায় তোমার।

সুমন উত্তেজিত হয়ে বলল, চানু কোথায় ? চানু ?

ততক্ষণে সুমনের গলা শুনতে পেয়ে চানু টাল-মাটাল পায়ে দৌড়ে এল বুধাই-এর মায়ের হেপাজত থেকে ছাড়া পেয়ে। বলল, সুমন কাকু, তোমার সঙ্গে আড়ি।

সুমন স্যুটকেশটা নামিয়ে রেখেই চানুকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিয়ে বলল, তা হলে আমি মরেই যাব। তোমার সঙ্গে আড়ি করে কী আমি বাঁচতে পারি ? তোমার মা-বাবা পারলেও বা পারতে পারে। আমি কখনও পারব না।

চানু অত বোঝে না। চার বছর বয়স তার মোটে। সে বলল, আড়ি, আড়ি ; আড়ি।

স্মিতা, সুমন এব আমিও হেসে উঠলাম।

স্মিতা বলল সুমনকে, জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও। দুপুরে খেয়েছিলে কোথায় ?

দুপুরে আবার কোথায় খাব। যা হতচ্ছাড়া লাইন। এ সব জঙ্গলের জায়গা তোমাদের মত কবি-কবি লোকের পক্ষেই ভালো লাগার। সাতসকালে বাড়কাকানাতে খাওয়ার খেয়েছিলাম। পথে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে চা, কার্নি মেমসাহেবের দোকানের আলুর চপ। কালা পাত্তি জর্দা দেওয়া পান। গোটা আষ্টেক। সারা পথে।

স্মিতা বিরক্তির গলায় বলল, তাই-ই। ঠোঁট দুটোর অবস্থা দেখেছ কী হয়েছে। এখানের গরমে ফাটা লাল মাটির মত।

সুমন বলল, কথা না বলে, শিগগিরি খেতে দাও তো।

আমি আমার ঘরে গেলাম। আমার প্রিয় ইজিচেয়ারটাতে বসলাম। আমার সাম্রাজ্যে। আমার বই, বইয়ের আলমারি ; গড়গড়া। ছুটির দিনে গেঞ্জি আর পাজামা পরে সারা দিন বই পড়েই কাটে আমার। আমি বড় কুঁড়ে লোক। স্মার্ট, এনার্জেটিক, সামাজিক বলতে যে সব গুণ বোঝানো হয় তার কোনো গুণই আমার নেই। আক্ষেপও নেই, না-থাকার জন্যে।

তবে এই চাঁদোয়া-টোরীতে সরকারী কাজে বদলি হয়ে এসে পড়ার পরই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। স্মিতার জন্যে। আমি তো সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে থাকব। অবসর সময় বই পড়ব। কিন্তু আমার চেয়ে দশবছরের ছোট ; সম্বন্ধ করে বিয়ে করা স্ত্রী স্মিতা ? তার সময় কী করে কাটবে ? ভাগ্যিস চানু হয়েছিল। এখানে যখন আসি তখন চানুর বয়স পনেরো মাস। তবুও একটা নরম খেলনা ছিল স্মিতার। যে খেলনাকে খাইয়ে-দাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে ওর সময় কেটে যেত।

সময় তবুও কাটতো কী না জানি না, যদি সুমন এখানে বদলি হয়ে না আসত। বয়সে সুমন আর স্মিতা সমানই হবে। পাশের কোয়ার্টারে ও একা এসে উঠল। প্রথম প্রথম হাত পুড়িয়ে খাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অভ্যেস ছিল না রান্না করার। অচিরে স্মিতার সঙ্গে ওর একটা প্রগাঢ় সখ্যতা গড়ে উঠল। যদিও বউদি বলে ডাকত সুমন স্মিতাকে কিন্তু ওরা যে কত বড় বন্ধু একে অন্যের তা আমার মত কেউই জানত না। সুমনকে পেয়ে স্মিতার যত ছেলেমানুষী শখ ছিল সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। পলাশ গাছে উঠে ফুল পাড়ত স্মিতা কোমরে শাড়ি জড়িয়ে সুমনের সঙ্গে। কুরুর পথে আমঝরিয়ার বাংলোয় মুনলাইট পিকনিক করত। লাতেহারের কাছে বহু বছর আগে পরিত্যক্ত কলিয়ারির আশেপাশে ঘুরে

ঘুরে শীতের দুপুরে ছেলেমানুষী প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ চালাতো।

কখনও আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেত ওরা পীড়াপীড়ি করে। আমি না গেলে নিজেরাই যেত। আমিও নিশ্চিন্ত মনে কলকেতে ডালটানগঞ্জের সাপ্লায়ারের দেওয়া অম্বুরী তামাক সেজে গড়গড়ার নল হাতে একটা বই নিয়ে আরাম করে ইজিচেয়ারে বসতাম। ওদের সঙ্গে যেতে যে হলো না এ কথা ভেবে আশ্বস্ত হতাম।

খাওয়ার টেবলে ডাক দিলো স্মিতা। আমিও এসে বসলাম। শিঙারা বানিয়েছে ও। ক্ষীরের পুলি। লাতেহারের পন্ডিতজির দোকান থেকে সেওই আর কালাজামুন আনিয়েছে।

গব্‌গব্‌ করে খেতে খেতে সুমন বলল, আরো দাও, আরো দাও বউদি। তুমি এমন কিপ্‌টে হয়ে গেলে কী করে এক মাসের মধ্যে ?

স্মিতা কপট রাগের সঙ্গে বলল, কিপ্‌টে আমি ? মালখাঁনগরের বোসের ঘরের মেয়ে। ঐসব পাবে না আমার কাছে।

সুমন আমাকে বলল, দেখছো রবিদা। ঐ শুরু হল। সর্বক্ষণ এমন এনিমি-ক্যাম্পে থেকে থেকে আমার হাওড়া জেলার ওরিজিনালিটিটাই মাঠে মারা গেল। বাড়ি গিয়ে ভাত খেতে বসে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা ছাড়া খেতে পারি না দেখে মা আর দিদির তো চক্ষুস্থির। তোমাদের গল্প করতাম সব সময়। দিদিমা বললেন, সুমন তোকে শেষে ঐ রেফিউজিগুলোর আদিখ্যেতায় পেল। ছিঃ ছিঃ।

কি বললে ?

স্মিতা এবার সত্যিই বোধ হয় রেগে উঠল।

সুমন বলল, আহা রাগছ কেন, কী বললাম তাই-ই শোন। আমি বললাম, বাঙালদের মন খুব ভালো হয় দিদিমা। খোলামেলা জায়গায় থাকত তো, আকাশ-জোড়া মাঠ, আদিগন্ত নদী, কত মাছ, কত ঘি, কত কী...।

দিদিমা বললেন, থাক্‌, থাক্‌। সব রেফিউজিই জমিদার ছেল। ওসব গল্প আমাকে আর শোনাসনি। বহু শুনেছি।

বলেই, সুমন হাসতে লাগল।

ও ছেলেমানুষ। ওর মনে কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু ও এ কথাটা না বললেই ভালো করত। সকলেরই জমিদারি বা সচ্ছল অবস্থা না থাকলেও যাদের ছিল এ রকম কথা শুনলে তাদের বড়ই লাগে।

এখন বোধ হয় লাগে না আর। প্রথম প্রথম লাগত। এখন ব্যথার স্থান অবশ হয়ে গেছে। ক্ষত হয়েছে পুরোনো।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।...

...বরিশালে আমাদের দোতলা বাড়ির চওড়া বারান্দায় পূর্ণিমার রাতে বসে আছি ইজিচেয়ারে। থামের ছায়াগুলো পড়েছে বারান্দাতে কালো হয়ে। দীঘির পাড়ের সার সার নারকোলগাছের পাতায় চাঁদের আলো চক্‌চক্‌ করছে। সেরেস্তার দরজা জানালা বন্ধ। কুন্দনলালজী তাঁর ঘরের সামনে চৌপায়ায় বসে দিলরুবাতে বাহারে সুর তুলছেন। গ্রামের লক্ষ্মীরা সন্ধ্যারতি শেষ করে শাঁখ বাজাচ্ছে। বাতাসে নারকোল পাতার নড়াচড়ার শব্দ। আরো কত কী গাছ। জামরুল গাছ, আমবাগান, লিচু গাছ, জলপাইগাছ, নিচে হাসনুহানা

কাঠটগরের ঝোপ। পাশে পাশে হরেক রকমের চাঁপা। আমার দোতলার ঘরের জানালা অবধি উঠে এসেছে একটা কনকচাঁপার গাছ। গাড়ি ঢোকার পথের পাশে ছিল ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার সারি।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম।

স্মিতা বলল, কী হল? তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সুমন বলল, রবিদাদা রাগ করলে নাকি?

আমি হাসলাম। বললাম, না রে পাগল।

স্মিতা সুমনকে বলল, আর দুটো শিঙারা খাবে?

সুমন বলল, দ'ও। কত্তোদিন পর তোমার হাতের খাবার খাচ্ছি।

তারপর বলল, আসলে, কলকাতায় গিয়ে তোমাদের গল্প, বিশেষ করে বউদির গল্প সকলের কাছে এতই করেছি, যে তোমাদের সকলেই হিংসে করতে আরম্ভ করেছে। বউদিকে তো বেশী করে।

স্মিতা চায়ের কাপটা মুখের কাছে ধরে ছিল। দেখলাম, কাপের উপর ওর দুটি টানাটানা কালো চোখ সুমনের ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেই নিথর হয়ে গেল।

চা খাওয়ার পর আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম।

সুমন চানুকে কাঁধে করে স্মিতার সঙ্গে ওর কোয়ার্টারে গেল। স্মিতা সব গুছিয়েগাছিয়ে দিয়ে আসবে। অগোছালো, একা লোকের সংসার।

যাওয়ার সময় স্মিতা বলে গেল বুধাই-এর মাকে যে, একটু পর এসে যেন চানুকে নিয়ে যায়। খাওয়ার সময় হয়ে যাবে চানুর।

ওরা দুজনে যখন ফিরল সুমনের কোয়ার্টার থেকে তখন রাত গভীর। আমি এডওয়ার্ড জোস্টিং-এর লেখা হাওয়াই-এর ইতিহাস পড়ছিলাম। ইতিহাস পড়তে পড়তে হাজার বছরের ব্যবধান এত্ত সামান্য মনে হয় যে ঘন্টার খবর রাখতে তখন আর ইচ্ছে করে না।

দুপুরেই রান্না সেরে রেখেছিল স্মিতা। বুধাই-এর মা গরম করে দিলো খাওয়ার-দাওয়ার।

স্মিতা খাবার সাজিয়ে ও এগিয়ে দিতে দিতে বলল, দ্যাখো, সুমন কত কী এনেছে আমাদের জন্যে। এইটা আমার শাড়ি। বলেই, চেয়ারের উপর থেকে শাড়িটা তুলে দু হাতে মেলে ধরে দেখালো। তারপর বলল, এরকম একটাও শাড়ি তুমি আমাকে দাও নি।

আমি বললাম, এ তো দারুণ দামী শাড়ি।

সুমন বলল, বউদি কী আমার কম দামী?

স্মিতা আবার আমাকে বলল, এই যে, তোমার পাঞ্জাবি ও পায়জামা। এই চানুর জামা-প্যান্ট।

আমি বুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললাম, করেছো কী সুমন, এই রকম নকশা কাটা চিকনের পাঞ্জাবি কি আমাকে মানায়? এ তো ছেলেমানুষদের জন্যে।

সুমন বলল, আপনি তো প্রায় তিন বছর কলকাতা যান না। এখন তো এই-ই ক্রেজ। ঘাটের মড়ারা পর্যন্ত পরছে আর আপনি তো কিশলয় এখনও।

স্মিতা নরম গলায় বলল, এই যে শুনছ; দ্যাখো।

আমি বললাম, কি?

অ্যাই দ্যাখো, আমার জন্যে আরো কী এনেছে ?

বলেই ছোট দুটো প্যাকেট খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিলো। দেখি, এক জোড়া বেদানার দানার মত রুবির দুল, আর একটা ইন্টিমেট পারফ্যুম। ছোট্ট।

আমি সুমনকে বকলাম। বললাম, তুমি একটা স্পেন্ডথ্রিপট্ হয়ে গেছো। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। সারা জীবন পড়ে আছে সামনে। বিয়ে করবে দুদিন পর। এমন বেহিসাবীর মত খরচ করে কেউ ?

স্মিতা বলল, দ্যাখো না, বেশী বেশী বড়লোক হয়েছেন !

সুমন বলল, বড়লোকদের জন্যে বড়লোকি না করলে কী চলে ?

খেতে খেতে আমি ভাবছিলাম সুমন বেশ সুন্দর সপ্রতিভ কথা বলে, যা আমি কখনোই প্পারিনি। পারবো না। স্মিতার যে ওকে এত ভালো লাগে তার কারণ অনেক। চিঠিও নিশ্চয়ই ভালোই লেখে। আমার তো এক লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। আমাকে অবশ্য কখনও লেখেনি ও অফিসিয়াল ব্যাপারের চিঠি ছাড়া। তবে স্মিতাকে প্রায় তিন-চারটে করে চিঠি লিখত প্রতি সপ্তাহে। যতদিন ছিলো না এখানে। এখানে ডাক পিওনে চিঠি বিলি করে না। আমার অফিসের পিওন ছেদীলাল মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে ডাক নিয়ে আসে রোজ। ভারি ভারি চিঠি আসত পুরু খামে। সুমনের সুন্দর হাতের লেখায় স্মিতার নাম লেখা থাকত। কোনোদিন ছেদীলাল পোস্ট অফিসে যেতে দেরি করলে বুধাই-এর মাকে পাঠাতো স্মিতা আমাকে মনে করিয়ে দিতে চিঠি আনার জন্যে।

যে ক'দিন সুমন ছিলো না, লক্ষ্য করলাম স্মিতা কেমন মনমরা হয়ে থাকত। বেলা পড়ে এলে, গা-টা ধুয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, শালজঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চেয়ে, স্মিতা বাইরের সিঁড়ির উপর বসে থাকত। শেষ বিকেলের আলোর মতো নরম হয়ে আসত ওর মুখের ভাব সুমনের চিঠি পড়তে পড়তে। ঘর থেকে আমি ডাকতাম ওকে, ও শুনতে পেতো না। কোথায়, যেন কত দূরে চলে যেত ও মনে মনে।

২

সুমন শিগগিরি কলকাতা যাবে। ওর বিয়ে ঠিক করেছেন মা-বাবা। সকালে রাঁচি গেছে ও নতুন স্কুটার ডেলিভারী নিতে।

অফিস থেকে ফিরছিলাম হেঁটেই। আমাদের অফিসটা কোয়ার্টারের কাছেই। দু ফার্লং মত। অফিস যাতায়াতের জন্যে গাড়ি কখনোই নিই না এক বর্ষাবাদলের দিন ছাড়া। আকাশে তখনও আলো আছে। জঙ্গল থেকে শালফুলের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। তার সঙ্গে মহুয়া এবং করৌঞ্জের গন্ধ। পথের পাশে, জঙ্গলের শাড়ির পাড়ে ফুলদাওয়াই-এর লাল ঝাড়ে মিনি-লঙ্কার মত লাল লাল ফুল এসেছে। মাঝে মাঝে কিশোরীর নরম স্বপ্নের মত ফিকে বেগুনী জীরহুলের ঝোপ।

লাতেহারের দিক থেকে একটা ট্রাক জোরে চলে গেল চাঁদোয়ার দিকে। লাল ধুলো উড়ল, মেঘ হল ধুলোর ; তারপর আল্তো হয়ে ভাসতে ভাসতে পথের দু পাশের পাতায় গাছে ফিস্ফিস্ করে চেপে বসল।

মিশিরজী আসছিলেন সাইকেল নিয়ে বস্তির দিক থেকে। হাওয়াতে তাঁর টিকি উড়ছিল

দেহাতী খদ্দরের নীল পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে। দূর থেকেই আমাকে দেখে বললেন, পরনাম্ বাবু।

আমি বললাম, প্রণাম।

হিন্দীটা আমি তখনও যথেষ্ট রপ্ত করতে পারিনি। সেদিকে সুমন পটু। পানের দোকানের সামনে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জর্দা পান খেতে খেতে ওর সমবয়সী স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে এমন ঠেট হিন্দীতে গল্প করে অথবা হিন্দী সিনেমার গান গায় যে, কে বলবে ও স্থানীয় লোক নয়! সব মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটা আশ্চর্য সহজাত ক্ষমতা আছে সুমনের। ওর মধ্যে অনেক কিছু ভালো জিনিসই আছে যা আমার মধ্যে নেই।

মিশিরজী সাইকেলের টায়ারে কির্কির্ শব্দ করে নামলেন: বললেন, হালচাল সব ঠিক্কে বা?

আমি বললাম, ঠিক্কেই হ্যায়।

সুমনবাবু কি কোলকাত্তাসে শাদী করিয়ে আসলেন এবার?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো।

মিশিরজী অবাক হয়ে বললেন, আভ্ভি যাত্তে দেখা উন্‌কা স্কুটারমে। পিছুমে কই খাবসুরত্ আওরত থী। বড়ী প্যায়ার সে সুম্মনবাবুকা পাকড়কে বেঠী হুয়ী থী।

আমি অবাক হলাম। বললাম, নেহী তো। বিয়ে তো করেনি।

তাজ্জব কি বাত্। তব্ সুমন্‌বাবুকা সাথ্‌মে উও ক'ওন থী?

আমার মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, মেরা বিবি ভি হোনে সক্‌তি। দুজনের মধ্যে খুব দোস্তী।

মিশিরজী বললেন, অজীব আদমী হ্যায় আপ্ বড়াবাবু। দোস্তী উর পেয়ার কখনও এক হয়? আর মরদ ঔর আওরতের মধ্যে কি দোস্তী হয় বড়াবাবু? খালি পেয়ারই হোবে।

তারপরই হো হো করে হেসে বললেন, আপ বড়ী হিউমারাস্ আদ্‌মী হেঁ। নেহী তো, নিজের ধরম পত্নী কি বারেমে অ্যায়সী মজাক্ কেউ করতে পারে কভ্‌ভী?

আমার মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল যে, মজাক্ করিনি আমি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল, স্মিতা সব সময় আমাকে বলে তুমি খুব বোকা। কোথায় কী বলতে হয় জানো না।

সত্যিই বড় বোকা আমি।

বাড়ি ফিরেই জানতে পেলাম যে, সত্যিই আমি মজাকী করিনি। রাঁচি থেকে নতুন স্কুটার ডেলিভারী নিয়ে এসেই সুমন তার বউদিকে পিছনে চড়িয়ে টোড়ী থেকে বাঘড়া মোড়ে যে পথটা চলে গেছে তার মাঝামাঝি জায়গায় গভীর জঙ্গলের মাঝে বড়্‌হা-দেওতার থানে পুজো চড়াতে গেছে।

চানুটা কান্নাকাটি করছিল। আমাকে বলল; বল খেলতে। আমি এসব পারি না। তবুও, চা টা খেয়ে বুধাই-এর মাকে বাড়ির কাজ করতে বলে আদর্শ বাবার মত চানুর সঙ্গে ওর লাল রবারের বল নিয়ে কোয়ার্টারের পিছনের মাঠে বল খেলতে লাগলাম।

আমার মন পড়েছিল হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহার রাজত্বে। অন্যমনস্ক থাকায় অচিরে বলটা লাফাতে লাফাতে কুঁয়োয় গিয়ে পড়ল। বালতি নামিয়ে অনেক চেষ্টা করেও

উঠোতে পারলাম না বলটাকে। চানু কাঁদতে কাঁদতে বলল, সুমনকাকা তুলে দিয়েছিল, তুমি পারলে না। তুমি কিচ্ছু পারো না, বাবা।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, সুমনকাকা এসেই তুলে দেবে।

তারপর চানুকে আবার বুধাই-এর মার জিম্মাতে দিয়ে আমি আমার ইজিচেয়ারে শায়িত হয়ে রাজা কামেহামেহার কাছে ফিরে গেলাম।

ওদের ফিরতে বেশ রাত হল। স্মিতার শাড়ি এলোমেলো, ধুলোলাগা বিস্রস্ত চুল। খোঁপায় দলিত জংলী ফুল আর মুখে কী এক গভীর আনন্দের ছাপ।

সুমন বলল; স্কুটারটা খারাপ হয়ে গেছিল বাঘের জঙ্গলে। কী ভয় যে করছিল, কী বলব। বাঘের জন্যে নয়, পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত হল বলে।

আমি বললাম, ফাজিল।

চানু বলল, এক্ষুনি আমার বল তুলে দাও সুমনকাকু। বাবাটা কিছু পারে না। বল পড়ে গেছে কুঁয়োর মধ্যে।

সুমন ঐ অন্ধকারেই টর্চ হাতে করে কুঁয়ো পাড়ে গিয়ে চানুর বল তুলে নিয়ে এলো। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেল।

সে রাতে স্মিতাকে আদর করতে যেতেই ও বলল, আজ থাক লক্ষ্মীটি। আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

ওর সুন্দর, ছিপ্‌ছিপে এলানো শরীর, গভীর নিঃশ্বাস, ওর বুকের ভাঁজে সুমনের দেওয়া ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ সব মিলেমিশে ওকে বিয়ের রাতের স্মিতার মতো মনে হচ্ছিল।

আমি আর কিছু বলার আগেই স্মিতা ঘুমিয়ে পড়ল। চাঁদের আলোর একফালি জানালা দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছিল। স্মিতার মুখে বড় প্রশান্তি দেখলাম। খুব, খুব, খুউব আদর খাওয়ার পর, আদরে পরম পরিতৃপ্ত হবার পর মেয়েদের মুখে যেমন দেখা যায়।

আমার ঘুম আসছিল না। মিশিরজীর দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক। পান খেয়ে খেয়ে কালো হয়ে গেছে সেগুলো। গায়ে দেহাতি ঘামের পুরুষালী গন্ধ। হঠাৎ মিশিরজীর উপর খুব রাগ হল আমার। আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে টেবল-লাইট জ্বালিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহা ও রানী কাহুমানুর কাছে ফিরে গেলাম। খুব প্রশান্তি।

ইতিহাসের মতো আনন্দের, শান্তির আর কিছুই নেই।

পরদিন চা খেতে খেতে স্মিতা বলল, সুমনের বিয়ের কথা লিখে আবার চিঠি দিয়েছেন ওর বাবা। কাল-পরশু ওর এক কাকা আসবেন রাঁচি হয়ে, ওর কাছে ঐ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে। আমি কিন্তু খেতে বলে দিয়েছি তাঁকে। যেদিন আসবেন, সেদিন রাতে।

আমি বললাম, বেশ করেছো। না বললেই অন্যায় করতে।

৩

সুমনের কাকার চেহারাটা আমার একটুও ভালো লাগল না। ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমেই সকালের বাসে এসে নাকি এখানের নানা লোকের সঙ্গে দেখা করেছেন। সুমনের কাছে যখন অফিসে এসে পৌঁছন, তখন বিকেল চারটে। রাতে যখন খেতে এলেন আমাদের বাড়ি,

তখনই তাঁকে দেখলাম। অশিক্ষিত বড়লোকদের চোখেমুখে যেমন একটা উদ্ধত নোংরা ভাব থাকে, এই ভদ্রলোকের মুখেও তেমন। বালিতে থাকেন। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করেন। কালোয়ার ভদ্রলোক কেবলই স্মিতাকে লক্ষ্য করছিলেন। বেশ অভব্যভাবে।

আমার মনে হল, উনি আসলে সুমনের বিয়ের কারণে আসেননি। এসেছেন স্মিতাকে দেখতে।

খেতে খেতে অসম্মান ও অপমানে আমার কান লাল হয়ে উঠল।

সেই রাতেই আমি প্রথম স্মিতাকে কথাটা বললাম। না বলে, পারলাম না। মিশিরজীর কথা বললাম। সুমনের কাকার কথা বললাম। বললাম, ছোট জায়গা, অশিক্ষিত অনুদার সব লোকের বাস, বাড়ির বাইরে একটু বুঝে শুনে চলাফেরা করতে।

স্মিতা চুপ করে আমার কথা শুনল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কিছুই বলল না।

আমি বললাম, তোমার ব্যবহারে সুমনকে যদি তোমার স্বামী বা প্রেমিক বলে ভুল করে বাইরের লোকে, তাহলে আমার পক্ষে তা কী খুব সম্মানের?

স্মিতা রেগে উঠল। বলল, আচ্ছা। তুমি কী? স্কুটারে বসলে যে চালায় তাকে না জড়িয়ে ধরে কেউ বসতে পারে?

তারপর বললেন, মিশিরজী বা কে কী বলল, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। তুমি কী বলো সেইটেই বড় কথা।

আমি বললাম, আমি কি কখনও কিছু বলেছি? কিন্তু নিজের সম্মানের কারণে না বলেও তো উপায় দেখছি না এখন। তোমাকে যদি লোকে খারাপ বলে তা কি আমার ভালো লাগবে?

স্মিতা বলল, নিজের মনের কথাও যে ঐ, তাতো বললেই পারো। অনেকদিন আগে বললেই পারতে। নিজের কথা অন্যের মুখের বলে চালাচ্ছো কেন?

আমি স্মিতার কথায় ব্যথিত হলাম। কিছু না বলে ইজিচেয়ারের নিরুপদ্রব রাজত্বে ফিরে গেলাম।

কয়েক দিন পরেই সুমনের খুব জ্বর হল। আমি বলেছিলাম ও আমাদের বাড়িতেই এসে থাকুক। ছেলেমানুষ, বিদেশে বেহুঁশ অবস্থায় একা বাড়িতে থাকবে কি করে? তা ছাড়া, ক'দিন পরেই ওর বিয়ে। কী অসুখ থেকে কোন অসুখে গড়ায় তা কে বলতে পারে?

স্মিতা জেদ ধরে বলেছিল, না। আমাদের বাড়িতে ও মোটেই থাকবে না।

বলেছিলাম, তাহলে ওর সেবা-শুশ্রূষা করো। রাতে না-হয় আমিই গিয়ে থাকব। তুমিও থাকতে পারো ইচ্ছে করলে।

স্মিতা বলল, থাক্, এত ঔদার্য নাই-ই বা দেখালে। তোমার মিশিরজীরা কী তাহলে চুপ করে থাকবে?

সারাদিন স্মিতাই দেখাশোনা করল। রাতে আমিই গেলাম সুমনের বাড়ি। ওর শোবার ঘরে ক্যাম্পখাট পেতে, থার্মোমিটার, ওষুধ, ওডিকোলন সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেল স্মিতা।

নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না আমার। অনেকক্ষণ জেগে বসে বসে সিগারেট খেলাম। তারপর পাশের ঘরে গেলাম। সুমন তখন ঘুমোচ্ছিল। পাশের ঘরের টেবিলে একটা চিঠি

পড়েছিল। ইনল্যান্ড লেটারে লেখা। সুমনের নামের। সুমনের মার লেখা চিঠি।

কেন জানি না, ঐ নিস্তব্ধ রাতে, ঝিঁঝিঁর ডাকের মধ্যে আমার মন বলল, এই চিঠির ভিতরে এমন কিছু আছে যা স্মিতা ও সুমনের সম্পর্ক নিয়ে লেখা। টেবল-লাইটের সামনে চিঠির ভিতরে আঙুল দিয়ে চিঠিটা গোল করে ধরে পড়তে লাগলাম চিঠিটা। যতটুকু পড়তে পারলাম, তাই-ই যথেষ্ট ছিল।

সুমনের মা লিখেছেন, সুমনের কাকার চিঠিতে জানতে পেরেছেন তিনি যে, সুমন একটি ডাইনির পাল্লায় পড়েছে। এক ভেড়ুয়ার বউ সে। সুমন জানে না যে, সুমনের কত বড় সর্বনাশ সেই মেয়ে করছে ও করতে চলেছে। সুমন ছেলেমানুষ। মেয়েদের পক্ষে কী করা সম্ভব আর কি অসম্ভব সে সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই নেই। সুমনের ভাবী শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের কোনো আত্মীয়ের কাঠের ব্যবসা আছে লাতেহারে। তাঁরাও খোজ নিয়ে জেনেছেন যে, সুমনের কাকা যা জানিয়েছেন, তা সত্যি। পাত্রীপক্ষ বেঁকে বসেছে যে, ঐ বজ্জাত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ না করলে এবং বিয়ের পরেই ওখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসার চেষ্টা না করলে এ বিয়ে হবে না। এত সুন্দরী ও বড়লোকের মেয়েও আর পাওয়া যাবে না। তাদের দেয় পণের টাকাতেই সুমনের বোন মিনুর বিয়ে হয়ে যাবে। যদি সুমনের তার বাবা, মা, বোন তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং তার নিজের সম্বন্ধেও কোনো মমত্ব থাকে তাহলে এই রেফিউজি ডাইনির সঙ্গে সব সম্পর্ক এক্ষুনি ত্যাগ করতে হবে। সুমনের ট্রান্সফারের জন্যে অথবা সেই ডাইনির ভেড়া স্বামীর ট্রান্সফারের জন্যেও পাটনাতে তাঁরা মুরুব্বি লাগিয়েছেন। সুমনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ও তার কচি মাথা ঐ ডাইনি কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে। অমন ছেনাল মেয়েছেলের কথা ওঁরা জন্মে শোনেননি।

বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। হাওয়াই-এর ইতিহাসটা বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। আমার ঘুম হবে না। কামেহামেহার সঙ্গে থাকলেই ভালো করতাম।

পরে মনে হল, এ চিঠিটা স্মিতাকে দেখানো উচিত। আমার মতো স্বামী বলে কী আমার চোখের সামনে যা নয় তাই করে বেড়াবে। ওদের মধ্যের সম্পর্ক কতদূর গড়িয়েছে তা কে জানে ? এই সম্পর্কে সুমনের উৎসাহই বেশী ছিল, না স্মিতার নিজের ; তা ভগবানই জানেন। এ সংসারে ভালোমানুষীর শাস্তি এইভাবেই পেতে হয়। ভালোমানুষ মানেই বোকা মানুষ। যে নিজের জরু-গরু শক্ত হাতে পাহারা দিয়ে রাখতে না পারে তার মান-সম্মান এমনি করেই ধুলোয় লুটোয়। বড় বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন এই পৃথিবী ; এই মেয়েছেলের জাত। এরা কার ছেলে কখন কোলে করে বড় করে ফেলে তা আমার মতো ভেড়া স্বামীর জানার কথা নয়।

দা ল্যাম্ব্। মেড়া। সত্যি সত্যিই আমি একটা ভেড়া !

৪

সুমনের জ্বর যেদিন ছাড়ল সেদিনও লিকুইডের উপর রাখল স্মিতা ওকে। পরদিন সুমন যা যা খেতে ভালোবাসে সুজির খিচুড়ি, মুচমুচে বেগুনী, কড়কড়ে করে আলুভাজা, হট্-কেসে ভরে খাওয়ার নিয়ে গিয়ে খাইয়ে এল স্মিতা।

জ্বর ভালো হতেই সুমন একদিন বলল, রোজ রোজ আমাদের বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়া

করতে ওর অসুবিধা হয়। এবার থেকে ছোটুয়াই রেঁধে-বেড়ে দেবে ওকে। তা ছাড়া, সাতদিন পর তো ও চলেই যাচ্ছে। বলল, স্মিতার কষ্ট এবার শেষ হবে।

সুমনের বিয়েতে সুমন আমাদের কাউকেই কলকাতায় যেতে বলল না। আমাদের নামে ওদের বাড়ি থেকে কোনো কার্ডও এল না। সুমনই একটা কার্ডে কালো কালি দিয়ে আমাদের নাম লিখে পাঠিয়ে দিল ছোটুয়ার হাতে।

স্মিতা আমাকে বলল, বিয়ে করতে যাচ্ছেন, ভারী লজ্জা হয়েছে বাবুর। বিয়ে যেন আর কেউ করে না। নিজে হাতে কার্ড দিতেও লজ্জা।

সুমন যেদিন যায়, রাঁচি হয়ে গেল ও। আমরা বাস স্ট্যান্ডে ওকে তুলে দিয়ে এলাম। চানু বলল, কাকীমাকে নিয়ে এসো কিন্তু সুমনকাকু, আমরা খুব বল খেলব।

স্মিতা হেসে বলল, তোমার ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখব, স্টেশনে তোমাদের আনতে যাব আমরা। সেদিন তোমার বাড়িতে রান্নাবান্নার পাট রেখো না। আমাদের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবে ; থাকবে সারা দিন।

সুমন জবাব দিলো না কোনো।

শুধু বলল, চলি।

বাসটা ছেড়ে দিলো।

সুমন চলে যাওয়ার পরই আমাদের বাড়িতে আশ্চর্য এক বিষাদ নেমে এল। সুমন এর আগেও অনেকবার ছুটিতে গেছে। কিন্তু এবারের যাওয়াটা অন্যরকম। যে সুমন বাসে উঠে চলে গেল সেই সুমন আর ফিরবে না এই টোড়িতে। আমি সে কথা জানতাম। স্মিতাও জানতো। যদিও ভিন্নভাবে।

এবারে গিয়ে অবধি একটাও চিঠি দিলো না সুমন স্মিতাকে। আমাকে না জানিয়ে ছেদীলালকে পোস্টাপিসে পাঠাতো স্মিতা চিঠির খোঁজে। স্মিতার মানসিক কষ্ট দেখে আমি এক পরম পরিতৃপ্তি পেতাম। যে নিজে কাউকে আঘাত দিতে শেখেনি, দুঃখ দিতে জানেনি, তার অদেয় আঘাত ও দুঃখ যে অন্যজনকে অন্য কোণ থেকে এসে বাজে এই জানাটা জেনে ভারী ভালো লাগছিল আমার।

মনে মনে বললাম, শাস্তি সকলকেই পেতে হয়। তোমাকেও পেতে হবে, স্মিতা।

স্মিতা আমার সঙ্গে কোনোদিনও সুমনের এই হঠাৎ পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেনি। সুমনের সঙ্গেও করেছিল বলে জানি না। করলেও, তা আমার জানার কথা নয়। ওদের সম্পর্কটা গভীর ছিল বলেই, সুমনের হঠাৎ পরিবর্তনের আঘাতটা স্বাভাবিক কারণেই বড় গভীরভাবে বেজেছিল ওর বুকে।

এ কথা বুঝতাম।

স্মিতা মুখ বুজে সংসারের সব কর্তব্যই করত। আমাকে খেতে দিত। জামা-কাপড় এগিয়ে দিত। লেখাপড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখত। শোওয়ার সময় মশারি গুঁজে দিত। তারপর নিজে বারান্দায় গিয়ে বসে থাকত। মাঝ রাতে উঠে বাথরুমে যেতে গিয়েও দেখতাম স্মিতা বারান্দায় বসে আছে অন্ধকারে।

বলতাম, শোবে না?

পরে। অস্ফুটে বলত ও।

শুধোতাম, মশা কামড়াচ্ছে না?

ও বলত, নাঃ।

আমি মনে মনে বলতাম, পোড়ো, নিজের কৃতকর্মের আগুনে পুড়ে মরো নিজে।

ব্যাটারীতে-চলা একটা রেকর্ড প্লেয়ার ছিল আমাদের বাড়িতে। বিয়ের সময় কে যেন দিয়েছিল। তাতে ঐ সময় একটা গান প্রায়ই চাপাত স্মিতা। রবিঠাকুরের গান ঃ "মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়..." ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম লাইন ঃ পুরানো সেই দিনের কথা...

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো আসক্তি নেই। খুব বেশী শুনিও নি। কিন্তু ঐ গানটার মধ্যে একটা চাপা দুঃখ ছিল। সেটা আমার অসহ্য লাগত।

একদিন স্মিতা সন্ধ্যাবেলায় পাণ্ডে সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিল চানুকে নিয়ে তাঁর মেয়ের জন্মদিনে। সেই সময় তাক থেকে বই নামাতে গিয়ে আমার হাতের ধাক্কা লেগে রেকর্ডটা মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল।

আমি কী অবচেতন মনে রেকর্ডটাকে ভাঙতেই চেয়েছিলাম? জানি না।

বুধাই-এর মা শব্দ শুনে দৌড়ে এল। আমি বললাম, বই নামাতে গিয়ে পড়ে গেল। এগুলো তুলে রাখো। বউদি এলে দেখে যে কী করবে, বউদিই জানে।

স্মিতা ফিরে এসে শুনল। ও ভাঙা টুকরোগুলোকে ফেলে না দিয়ে যত্ন করে তুলে রাখল। আমাকে কিছুই বলল না। জবাবদিহিও চাইল না।

"আরেকটি বার আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয়,
মোরা সুখের দুখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তায়"...।

খেতে দাও বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। কখনওই চেঁচাই না আমি। কিন্তু সে রাতে চেঁচালাম। কি জানি, কেন?

স্মিতা আমাকে খেতে দিলো। চানুকে খাওয়ালো।

আমি বললাম, খাবে না?

নিরুত্তাপ নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, তোমরা খাও। এই-ই তো খেলাম। খিদে নেই। পরে খাবো।

আমি বুঝতে পারছিলাম স্মিতা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

বুধাই-এর মা বলল, তুমি বিমার পড়বে, মাঈজী। কিছুই খাওয়া-দাওয়া করছো না তুমি।

স্মিতা ওকে ধমকে বলল, তুমি চুপ করো তো। অনেক খাই।

আমি আঁচাতে আঁচাতে ভাবছিলাম সুমন চলে যাবার পর সত্যিই অনেক রোগা হয়ে গেছে স্মিতা। কিন্তু কী বলব, কেমন করে বলব; ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, নিজের শরীরের অযত্ন করলে নিজেই ঠকবে।

স্মিতা আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। আমার হাতে লবঙ্গ দিলো। রোজ যেমন দেয়। তারপর আমার সামনে থেকে নিঃশব্দে চলে গেল।

কাল সুমনরা আসবে।

স্মিতা আর আমি দুজনেই গাড়ি নিয়ে রাঁচী গিয়ে ফিরায়েলালের দোকান থেকে সুমন আর সুমনের স্ত্রী অলকার জন্যে আমাদের সাধ্যাতীত প্রেজেন্ট কিনে এনেছি। ফুলের অর্ডার দিয়ে এসেছি। কাল সকালের বাসে টাটকা মাছ, ফুল, রাবড়ি, সন্দেশ সব নিয়ে আসবে বলে বাসের ড্রাইভারকে টাকা এবং বকশিসও দিয়ে এসেছি।

স্মিতারও ভাই নেই ; আমারও নেই। বেশ ভাইয়ের বিয়ে, ভাইয়ের বিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের।

ভোর পাঁচটা থেকে উঠে পড়েছে স্মিতা। এ'কদিনে, অনেক রোগা হয়ে গেছে ও সত্যিই। কিন্তু চেহারাটা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। চোখ দুটি আরও বড় বড়, কালো ; কাজল টানা। বিরহ, মানুষকে সুন্দর করে। চোখের সামনেই দেখছি।

অন্যান্য রান্না করতে না-করতেই মাছ এসে গেল। দই-মাছ করেছে কাতলা মাছের। খুব ভালোবাসে সুমন। মুড়িঘন্ট। মাছের টক। মুরগীর কারি। পোলাউ। সঙ্গে তো মিষ্টি ও রাবড়ি আছেই। রাতের জন্য আরও বিশেষ বিশেষ পদ। ফিশ-রোল।

আমি অফিসে একবার বুড়ি-ছুঁয়েই চলে এসেছি। অফিসে সুমনের সব সহকর্মীরাও উৎসুক হয়ে কখন ওরা এসে পৌঁছায়, তার প্রতীক্ষায় ছিল। আমার এখানেই চলে আসতে বলেছি সকলকে সুমনের "বড়ো-ভাই" হিসেবে। ওদের সকলের জন্যে মিষ্টি-টিষ্টিও এনে রেখেছি। বউ দেখে মিষ্টিমুখ করে যাবে বলে।

স্মিতা রান্না-বান্না এগিয়ে নিযেই সুমনের কোয়ার্টারে গেল ফুলশয্যার ঘর সাজাতে। নিজের আলমারী খুলে নতুন ডাবল-বেডশীট, বেডকভার, ডানলোপিলো বালিশ, মায় আমার সাধের কোলবালিশটিকে পর্যন্ত ধোপাবাড়ির ওয়াড় টোয়ার পরিয়ে ভদ্রস্থ করে নিয়ে চলে গেছে।

এমনই ভাব যে, সুমন নতুন বউ এর সঙ্গে শোবে না তো যেন স্মিতার সঙ্গেই শোবে।

মেয়েদের ভালোবাসার রকমটাই অদ্ভুত।

যে সময়ে ওদের আসবার কথা, সে সময়ে ওরা এলো না। আমি দুবার খোঁজ নিলাম অফিসে কোনো ফোন এসেছে কি না রাঁচী থেকে তা জানার জন্যে। রাঁচী এক্সপ্রেস ভোরেই পৌঁছয়। রাঁচী থেকে আসা সব বাসও চলে গেল।

দুপুরের খাওয়ার-দাওয়ার সব তৈরী, এমন সময় আমাদের অফিসের চৌধুরী এসে বলল যে, তার কাছে সুমন চিঠি লিখেছে যে, প্লেনে আসছে কোলকাতা থেকে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আসবে এখানে। বিকেল বিকেল পৌঁছবে। রাঁচীর মেইন রোডের কোয়ালিটিতে লাঞ্চ করে। আমাকে কিছুই জানায়নি শুনে চৌধুরীও খুব অবাক হল।

স্মিতাকে জানালাম। বললাম, চলো, তাহলে বসে থেকে আর লাভ কী হবে ? আমরা খেয়েই নিই।

স্মিতা আমাকে খেতে দিলো। কিন্তু নিজে খেলো না। বলল, সারাদিন রান্নাঘরে ছিলাম, গা-বমি-বমি লাগছে।

স্মিতা এই খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ওর আনত চোখে বড় ব্যথা দেখলাম।

সন্ধের মুখে মুখে সুমন আর অলকা এল ট্যাক্সিতে করে। সঙ্গে কোয়ালিটির খাবারের প্যাকেট। রাঁচীর কোয়ালিটী থেকে তন্দুরী চিকেন আর নান্ নিয়ে এসেছে রাতের খাওয়ার জন্যে।

এ খবরটা আমি আর স্মিতাকে দিলাম না।

ওরা যেহেতু আমাদের বাড়িতে এলোই না, অফিসের সকলে ওখানেই গেল।

বুধাই-এর মা এবং আমি নিজে মিষ্টি-টিষ্টি সব বয়ে নিয়ে গেলাম ওর কোয়ার্টারে। সুমনের দাদা হিসাবে সকলকে যত্ন আত্তি করলাম।

সকলে বলল, বউদি কোথায়? ভাবিজী কোথায়?

আমি বললাম, আসছে।

তারপর আমি নিজেই স্মিতাকে নিতে এলাম। দেখলাম, স্মিতা চান করে সুমনের কোলকাতা থেকে আনা সেই সুন্দর লাল আর কালো সিল্কের শাড়িটা পরেছে। কানে সুমনের দেওয়া বেদানার দানার মত রুবির দুল। গায়ে সুমনেরই ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ।

আমি বললাম, চলো স্মিতা।

স্মিতা বলল. সুমনের স্ত্রী কেমন দেখলে?

আমি বললাম, দেখিনি এখনও।

চানু আগেই বুধাই-এর মায়ের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। আমি আর স্মিতা এগোলাম।

আমাদের দেখে সুমন উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীকে বলল, এই যে রবিদা আর বউদি।

সুমনের স্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করল। স্মিতার দিকে ফিরেও তাকাল না।

সুমন ঠাণ্ডা, নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, বউদি। কেমন হয়েছে আমার বউ?

স্মিতা মুখ নীচু করে বলল, ভালো; খুব ভালো।

বলেই বলল, তোমরা খেতে, রাতে আমাদের ওখানে যাবে তো?

অলকা কাঠ কাঠ গলায় সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, রাতের খাও' তো নিয়ে এসেছি রাঁচী থেকে। কষ্ট করার কী দরকার ওঁদের?

স্মিতা কিছুই বলতে পারল না।

আমি বললাম, তোমরা যা ভালো মনে করো, করবে।

অফিসের সহকর্মীরা হই হই করে উঠলো। বলল, ইয়ার্কি নাকি? দাদা বউদি কাল রাঁচী থেকে বাজার করে আনলেন, সারা দিন ধরে রান্না করলেন বউদি, আর তোমরা খাবে না মানে? এ কেমন কথা?

অলকা আমাকে বলল, তাহলে এখানেই যদি পাঠিয়ে দ্যান। আমরা বড় টায়ার্ড!

চানু কিছুক্ষণ সুমনের কোলের কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে বুঝলো যে, সুমনের উপর তার যে নিরঙ্কুশ দাবি ছিল তা আর নেই। শাড়ি-পরা একজন নতুন মহিলা এখন তার সুমনকাকুর অনেকখানি নিয়ে নিয়েছে। সুমনকাকু বল খেললো না, তাকে কাঁধে চড়াল না, তাকে তেমন আদরও করল না দেখে; সে তার মায়ের আঁচলের কাছে সরে গেল। শিশুরা আদর যেমন বোঝে; অনাদরও।

স্মিতা সুমনকে বলল, তাহলে তাই-ই হবে। খাওয়ার সব এখানেই পাঠিয়ে দেবো। ক'টা

পাঠাবো ? ন'টা নাগাদ ?

সুমন এই প্রথমবার চোখ তুলে তাকাল। স্মিতাকে দেখল। ওর ভালোবাসায় মোড়া শাড়িতে, ওর আদরে দেওয়া রুবির দুল পরা স্মিতা। কিন্তু স্মিতা যে খুব রোগা হয়ে গেছে তাও নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়ল। সুমনের চোখ দুটি এত আনন্দের মাঝেও হঠাৎ ব্যথায় যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত স্মিতার মুখে তাকিয়ে থেকেই চোখ নামিয়ে বলল, আচ্ছা বউদি। ন'টার সময়ই পাঠিও।

সঙ্গে সঙ্গে সুমনের স্ত্রী সুমনের দিকে তাকাল।

স্মিতা চানুকে নিয়ে, পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেল। আমি রয়ে গেলাম, তক্ষুণি চলে গেলে খারাপ দেখাতো' চেনা-জানা এত লোক চারপাশে।

কত লোক কত কথা বলছিল, রসিকতা, হাসি, ঠাট্টা। ওদের শোবার ঘর ভারী সুন্দর করে সাজানো হয়েছে একথা সকলেই বলল।

অলকা কোনো মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, কে সাজালেন শোওয়ার ঘর ?

তিনি বললেন, রবিদাদার স্ত্রী, স্মিতা বৌদি।

অলকা বলল, তাই-ই বুঝি ?

অতিথিরা একে একে প্রায় সকলেই চলে গেলেন। বুধাই-এর মা আর ছোটুয়া যতক্ষণ না ওদের খাওয়ার নিয়ে এলো ততক্ষণ আমাকে থাকতেই হল। বুধাই-এর মা এসে বলল বউদির শরীর খারাপ—সারাদিন রান্নাঘরে ধকল গেছে—বাড়ি গিয়েই শুয়ে পড়েছিল। এই খাবার-দাবার কোনোরকমে বেড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে।

তারপর বুধাই-এর মা সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, বউদি আসতে পারলো না।

সুমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল কথাটা শুনে।

অলকা আমাকে বলল, আপনি তাহলে যান ওঁর কাছে। শরীর খারাপ যখন।

আমি বললাম, আপনারা একা একা খাবেন ?

চৌধুরী বলল, আরে দাদা ওরা তো এখন একাই থাকতে চাইছে। দেখছেন না, আমাদের সকলকে কীভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি হাসলাম। হাসতে হয় বলে। তারপর বললাম, আচ্ছা' তাহলে তোমরা ভালো করে খেও।

দু-একজন কৌতূহলী, অত্যুৎসাহী মহিলা বাসরে বর-বউকে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে রয়ে গেলেন।

সুমন দরজা অবধি এলো একা একা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে কী যেন বলবে বলবে করল ; তারপর বলল না। শুধু বলল, আচ্ছা রবিদা।

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম' তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। চানু ঘুমিয়ে পড়েছে। বুধাই-এর মা একা বসে আছে খাওয়ার ঘরে, মোড়া পেতে ; দেওয়ালে মাথা দিয়ে।

বুধাই-এর মা বলল, দাদাবাবু আপনি খাবেন না ?

বউদি খেয়েছেন ?

বউদির শরীর ভালো না। শুয়ে রয়েছেন।

আমি বললাম, আমাকে এক গ্লাস জল দাও বুধাই-এর মা। আমিও খাবো না। শরীর

ভালো নেই।

বুধাই-এর মা জল এনে দিয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

আমি চমকে উঠে তাকালাম তার দিকে। তার চোখেও দেখলাম বড় ব্যথা।

বললাম, তুমি খেয়ে, শুয়ে পড়ো বুধাই-এর মা।

বুধাই-এর মা বলল, আমার খিদে নেই একদম।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখি স্মিতা সেখানে নেই। পাশের ঘরে ঢুকলাম। দেখি, চানুর পাশে স্মিতা উপুড় হয়ে সন্ধেবেলার সেই লাল-কালো সিল্কের শাড়িটা পরেই শুয়ে আছে। ওর হালকা ছিপছিপে সুন্দর গড়নে চানুর পাশে অল্পবয়সী ওকে, চানুর মা বলে মনেই হচ্ছিল না।

আমি কাঠখোট্টা লোক। বুঝি কম। ভাবি কম। কিন্তু কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে-পড়া আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট আমার ছেলেমানুষ স্ত্রীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম দরজায় দাঁড়িয়ে।

তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে পায়জামা-গেঞ্জি পরে আমি ইজিচেয়ারে শুলাম।

অন্ধকার রাতে তারারা সমুজ্জ্বল। জঙ্গলের দিক থেকে মিশ্র গন্ধ আসছে হাওয়ায় ভেসে। শিয়াল ডাকছে লাতেহারের দিকের রাস্তা থেকে। গোঁ গোঁ করে মাঝে মধ্যে দুটি একটি মার্সিডিস্ ডিজেল ট্রাক যাচ্ছে দূরের পথ বেয়ে। আজ বাইরেও রাত বড় বিধুর। রাতের পাখিরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। ঝিঁঝির একটানা ঝিন্‌ঝিনি রবের ঘুমপাড়ানি সুর ভেসে আসছে জঙ্গলের দিকে থেকে।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আমি কত কী ভাবছিলাম। এমন সময় ঘরে একটা মৃদু খস্‌খস্ শব্দ হল। পারফ্যুমের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। স্মিতা কথা না বলে সোজা এসে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমার মধ্যে যে খারাপ মানুষটা বাস করে সে বলল, আঘাত দাও ওকে এমন শিক্ষা দাও যে, জীবনে যেন এমন আর না করে। ওর প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও অনীহাতে আমার মন ভরে উঠল। ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল আমার মধ্যের সেই আমিত্বময় সাধারণ স্বামী।

কান্নার বেগ কমলে আমি বললাম, কি হলো?

ও বলল, আমার জন্যে আজ তোমার এত লোকের সামনে..... ; আমার জন্যেই। আমি জানি।

আমি চুপ করে রইলাম।

আমাকে তুমি শাস্তি দাও।

কিসের শাস্তি?

ভুলের শাস্তি।

আমি বললাম, ব্যঙ্গাত্মক স্বরে, ভালোবেসেছিলে বলে অনুতাপ হচ্ছে?

স্মিতা এবার মুখ তুলল। আমার পায়ের কাছে হাঁটু-গেড়ে বসে বলল, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসা....

আমি বললাম ; আমিই কি বললাম? বললাম, আমার কী এমন রূপ গুণ আছে যাতে

তোমার শরীরে ও মনে চিরদিন একা আমিই সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারি ? সংসারের একজন স্বামীরই কী আছে ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, আমার ভাগে যা পড়েছিল তাই-ই তো যথেষ্ট ছিল। সেই ভাগের ঘরে কোনো শূন্যতা তো কখনও অনুভব করিনি স্মিতা ! সত্যিই করিনি।

স্মিতা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার বোকা, অগোছালো, ভুলোমনের স্বামীর দিকে।

দূরের ঝাঁটি জঙ্গল ভরা মহুয়াটাঁড়ে চমকে চমকে রাত চরা টি-টি পাখিরা ডেকে ফিরছিল। হাওয়া দিয়েছিল বনে বনে। কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করছিল বাইরে।

ভাবছিলাম, এই মুহূর্তে আর একজন মানুষ সুমন, তার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। স্মিতারই ভালোবাসার হাতে-পাতা বিছানাতে।

সুমন এখন কী ভাবছে কে জানে ? কিন্তু যদি স্মিতার কথা সুমন একবারও ভাবে তাহলে আমার মতো সুখী এ মুহূর্তে আর কেউই হবে না।

অনেক বছর আগে বিয়ের রাতে যজ্ঞের ধোঁয়ার মধ্যে বসে যেসব সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম তার বেশিরই মানে বুঝিনি। সেদিন আমি আমার কোনো যোগ্যতা ব্যতিরেকেই স্বামী হয়েছিলাম স্মিতার।

স্মিতা কাঁদছিল নিঃশব্দে। আমার বুক ভিজে যাচ্ছিল ওর চোখের জলে। কিন্তু ভীষণ ভালোও লাগছিল।

স্মৃতিতে হঠাৎই বউভাতের রাতটা ফিরে এল। তখন মা বেঁচে ছিলেন। জ্যাঠামণি, রতনমামা। স্মিতার বাবাও। আরো কেউ কেউ। আজ যাঁরা নেই। আমার পুরোনো বন্ধুরা, কত আনন্দ, কল্পনা সে-রাতে ; সুগন্ধ, সানাই...।

স্মিতার মাথায় হাত রেখে বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হলো যে যে-আমি টোপর মাথায় দিয়ে সমারোহে গিয়ে স্মিতাকে একদিন তার পরিবারের শিকড়সুদ্ধু উপড়ে এনেছিলাম তার সঙ্গে যে মানুষটা তার স্ত্রীর সুখে দুঃখে জড়াজড়ি করে অনেক অবিশ্বাস ও সন্দেহ পায়ে মাড়িয়ে বিবাহিত জীবনের কোনো বিশেষ বিলম্বিত মুহূর্তে সত্যিই স্বামী হয়ে উঠলাম, তাদের দুজনের মধ্যে বিস্তরই ব্যবধান।

"বর হওয়া" আর "স্বামী হওয়া" বোধহয় এক নয়।